উদ্বোধন—বর্ষসূচী

মাঘ ১৩৪১—পৌষ ১৩৪২

উদ্বোধন—বর্ষ-সূচী

মাঘ—১৩৪১

রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে এসেছিলেন—তাঁর ধর্ম্মে কিছু ভাঙ্গাচোরা নেই, তাঁর ধর্ম্ম হচ্ছে গড়া। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মলাভ করেছিলেন। সে ধর্ম্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে। "আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার।"—আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তাহলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন করবে। ঈশ্বর সকলের কাছে আসবেন—সেই সমত্বভাব সকলেরই আয়ত্বের ভিতর রয়েছে।

—বিবেকানন্দ

যুগ-উৎসব-জয়গান

আঁধার ভেদিয়া ছুটেছে তরণী,—বক্ষে ব্যাকুল যাত্রী দল!
সমুখে পিছনে কোটি তরঙ্গ—হাসে ক্রূর হাসি সে খলখল!
আঁধার আকাশে ম্লান হাসি হাসে অতীত যুগের তারকাচয়
স্তব্ধ গভীর ঝঞ্ঝা-অধীর বিশ্বজীবন বিষাদময়!
বিশ্বতরণী কাণ্ডারী হীন লক্ষ-বিহীন আঁধার পথ!
কই কত দূরে অতীতের পারে ঝলিয়া উঠিবে ভবিষ্যৎ?

আকাশ চিরিয়া হতাশা উঠিল—এস, ওগো আজ, এস গো নামি
আদর্শহীন বিশ্বের বুকে কাণ্ডারী রূপে জগত স্বামী!

এস তুমি এস সাধকের রূপে, এস গুরুরূপে এস গো আজ
মানুষের মাঝে এস গো নামিয়া, সাজি অসহায় মানুষ-সাজ !
কোটি কণ্ঠের যুগ-আহ্বান আকুল করিল প্রেমিক প্রাণ !
তাই ধরা দিল যুগ-আদর্শ ! তাই উঠে আজ এ জয়গান !

সমুখে পিছনে শতশতাব্দী—আঁধারে আলোয় মিশায়ে যায় !
তাহার মাঝেতে তব রূপখানি চির উজ্জ্বল দিবা ভায় !
নিম্নে উতলা বিপুলা পৃথ্বি উতলা বিপুল সাগর-জল !
ঊর্দ্ধে উতলা আকাশের বায়ু—উতলা ঘটনা-মেঘের দল।
সকলের মাঝে তুমি চিব-থির—চিরথির তব সু-নির্দ্দেশ !
চিবথির তব আকাশ আলোক—নাহি এতটুকু আঁধার লেশ !

যুগে যুগে তুমি আসিয়াছ স্বামী, হাসিয়া দিয়াছ অভয় বর—
যাচিয়াছ তুমি প্রতি দ্বারে দ্বারে জ্ঞান-প্রেমধনে ভরিয়া কর।
ফিরিয়া গিয়াছ কত বাব তুমি, ফিরায়ে দিয়াছে কত না বাব
বার বার তুমি আসিয়াছ ফিবে—সহিতে কত না অত্যাচার।
আবাব আসিলে যুগ-অবতাব—তারিতে যুগেব পাতকী প্রাণ—
ঘুচাতে যুগের আঁধারেব জ্বালা ! তাই উঠে আজ এ জয়গান !

যতবার এলে যত রূপে তুমি এবারে তাহাব সমন্বয় !
নূতন যুগেব নূতন বার্ত্তা—ছড়ায়ে পড়িছে বিশ্বময় !
অবতারমালা বক্ষে দুলিছে—কণ্ঠে কথার অমৃতবান—
বর্জ্জন নয় বরণ আজিকে—বিরোধ ঘুচিয়া মিলন গান !
তোমার জীবনে যুগের সাধনা—নূতন যুগের সূচনাকার
বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাট সাধনা—মূর্ত্ত প্রতিমা তুমি যে তার !

ত্যাগ ও প্রেমের অমৃত বার্ত্তা—এই শুধু আজ বিশ্ব চায়
তোমার সংঘ তোমার অঙ্গ—তোমাব বার্ত্তা ছড়িয়ে যায় !
তোমার বিশ্বে তোমার বার্ত্তা—তুমিই দাও গো ছড়ায়ে আজ
তোমার মন্ত্রে লভুক বিশ্ব নূতন জীবন মরণ-মাঝ !
শতাব্দীবোই যুগের আলোয় ভরিয়া উঠিছে সবার প্রাণ—
'উদ্বোধনে'র বক্ষে বাজিছে—যুগ-উৎসবে এ জয়গান।

তোমারে ঘিরিয়া উৎসব জাগে সারাটি বিশ্ব জুড়িয়া আজ
বর্ষ ব্যাপিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়া—নূতন ভাবের নূতন সাজ।
'বিশ্ব মিলন মন্দির' ছবি স্বপনের মাঝে চকিয়া যায়
ভিতরে বাহিরে তোরণে চূড়ায় সকল ধর্ম্ম দীপ্তি পায়!
যুগ যুগ ব্যাপী বিশ্ব-সাধনা তাহার আজিকে সমন্বয়
যুগ-কর্ত্তার কল্পনা ইহা—যুগের প্রতীক স্বপ্ন নয়।

তোমার প্রেমের পতাকার তলে বিশ্ব আবার মিলিতে চায়
তোমারি নামের পতাকা বহিয়া ভারত আবার ছড়ায়ে যায়।
তোমার নামেতে সকল ভুলিয়া—তোমারি নামেতে মাতিতে চাই
জীবন ভরিয়া যুগে যুগে যেন—তব জয়গান গাহিতে পাই!
তোমার বীণার ঝঙ্কারে প্রভু স্পন্দিয়া উঠে বিশ্বপ্রাণ।
সমাগত ওই যুগ-উৎসবে—তোমার চরণে এ জয়গান।

কথা প্রসঙ্গে

(বিশ্বাসের মুক্তি-বোধন)

সরল উদার না হলে বিশ্বাস হয় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

দেখতে দেখতে উদ্বোধনের একটা বর্ষ কাল-সাগরে আপনহারা হলো, কিন্তু বর্ণমঞ্জুষায় রেখে গেল সে অনাদিযুগ হতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত, কত মনীষীর আবিষ্কৃত ভাব, সুর, ছন্দের বিচিত্রা মণিরত্ন-মালা। ছত্রিশটী শীত সে অতিক্রম করে এসেছে, তাতে বাধাও ছিল, তার যথেষ্ট। কিন্তু বাধাই ত গতির চিহ্ন। তরণী চলে, তাই তার পারিপার্শ্বিক বাধা ও চাঞ্চল্য দেখি তরলের তরঙ্গে;—পৃথিবী চলে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আকাশে তার বাধা বা চাঞ্চল্য নিরূপিত হয়নি বোলে, দার্শনিকের সংশয় ওঠে পৃথিবী চলে, না সূর্য্য চলে। উদ্বোধনের যখন বাধা আছে, প্রতিপত্তি আছে, প্রতিবাদ আছে, তখন তার গতি ও জীবনও স্বীকার্য্য।

সকল চলার একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্বোধনের উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বিগত পাঁচহাজার বছরের সকল আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিগণের কেন্দ্রীভূত মূর্ত্তি। একটা কৃত্রিম তারা-মণ্ডলের (Planetarium) মধ্য দিয়ে আমরা যেমন প্রত্যেক তারাগুচ্ছদের চেনবার, বিচার করবার, বিশ্লেষণ করবার অবকাশ পাই, ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও জীবনী হচ্চে চিদাকাশের আদর্শ-মণ্ডল। যত সব আদর্শ পুরুষেরা জ্ঞানাকাশে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে রয়েচেন, সকলকে চিন্তে গেলে,

তাঁর বাণী ও জীবনীর মধ্য দিয়ে না গেলে, ধর্ম্ম ও নিজের জীবন অসম্পূর্ণ, অনুদার হয়ে থাকবে।

উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস প্রায় একই জিনিষ। একটা জিনিষ জানতে গেলে একটা বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস যে প্রথমেই অভ্রান্ত থাকে, তা নয়। যেখানে জ্ঞান অভ্রান্ত সেখানে জানার ইচ্ছাও নেই—আত্মা সেখানে তৃপ্ত—বিশ্বাস সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষ যখন একটা আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তখনই পরিপূর্ণ আলোকে সর্ব্ব বস্তুকে দেখবার মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তখনই একটা সন্দিগ্ধ-বিশ্বাসকে অবলম্বন কোরে জীবন গতির প্রথম স্পন্দন অনুভূত হয়। আমরা চলেছি অজানার অনুসন্ধানে—বিশ্বাসের যষ্টিই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই নববর্ষের উদ্বোধনের প্রথম অভিব্যক্তির পর্ণপুটে উনবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে বিশ্বাস পরিত্যক্ত ও শৃঙ্খলিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে কিরূপে বিজ্ঞান তার মুক্তি বিধান কোরে আত্মজ্ঞানের বোধন ক্রিয়া উদ্‌যাপন করলে, সেইটাই আমাদের এই নিবন্ধে আলোচ্য।

পরিপূর্ণ সত্য লাভের জন্য আমরা সদাই উদ্‌গ্রীব। এখন কি উপায়ে যে সে পূর্ণ সত্য পাওয়া যাবে সেইটাই বিবেচ্য। এ সত্যকে জানবার জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দরকার কি-না? বিজ্ঞান কারণকে ধরবার জন্য বিশ্লেষণ করতে করতে পরমাণুকে চুরমার করে ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পোসিট্রন এই চারটী আলোক উপাদান পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। প্রত্যেক যুগের বৈজ্ঞানিকরা বলেচেন, এই 'এই হলো শেষ কারণ'। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তারও কারণ বেরিয়ে পড়চে। কাজেকাজেই আদি কারণ ঈশ্বরের কথা আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক বিশ্বাস করে না নিতে পারলেও, অসম্ভব বলে ত্যাগ করতে পারি না। কারণ সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে দেখা যাচ্চে যে বিজ্ঞান Law of Probability বা শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট ও সম্ভব অনুমানের ওপর চলেচে।

আজকাল বৈজ্ঞানিকের কাছে একখানা তক্তা বলে কিছু নেই—সব ফাঁক্ ফাঁক্ পরমাণুপুঞ্জ; দেহের প্রতি স্কয়ার ইঞ্চিতে ১৪ পাউণ্ড করে বায়ুমণ্ডলের চাপ; সব আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সেকেণ্ডে ২০ মাইল করে ছুটচি; আপেক্ষিকতার দিক থেকে একটা দরজায় আমরা ঢুকচি না বেরুচ্ছি কিছু বোঝবার যো নেই। এডিংটন (Arthur Stanley Eddington) তাই রহস্য করে তাঁর *Science and the Unseen World* নামক গ্রন্থের এক জায়গায় বলেচেন, "Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a scientific man to pass through a door" আকাশ-কণিকা, বিদ্যুতিন থেকে আরম্ভ করে কত কি তত্ত্বই বেরুল, কিন্তু এই যে জ্ঞান যা দিয়ে সব জানতে হয় বা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আদি-কারণ বা রচনার অপূর্ব্ব কৌশল হেতু মনের যে বিস্ময় বা ভাব বা ভক্তি—কী?—তা এখনও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান স্পর্শও করতে পারেনি। আমরা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে এডিংটনের একটা স্বীকারোক্তি দেখি। —একদিন, জলবেগ-গণিত-বিদ্যার (Hydrodynamics) মধ্য দিয়ে বায়ুচালিত হয়ে কিরূপে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, "এই সব কাল্পনিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা প্রথমাবস্থ তরঙ্গ সম্বন্ধে অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি।" আর একবার তিনি ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করচেন, এমন সময় তাঁর একটা কবিতার কথা মনে পড়লো এবং তিনি পড়লেন—

"There are waters blown by changing
winds to laughter

And lit by the rich skies,
all day And after
Frost, with a gesture, stays
the waves that dance
And wandering loveliness
He leaves a white
Unbroken glory, a gathered
radiance,
A width, a shining peace,
under the night"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন যেন সূর্যকিরণ-স্নাত তরঙ্গের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো, কখনও বা চন্দ্রালোক-শুভ্র কঠিন হিমানীর অখণ্ড গৌরব এক জ্যোতির্ম্ময় শান্ত দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ সৃষ্টি করল। তখন তিনি নিজের মনকে সমাহিত করে বললেন, "এটা আমাদের অনুভূতির অধোগতি নয়। এই অপূর্ব্ব আনন্দ তত্ত্বের দিকে আমরা পেছন ফিরে বলতে পারি না—একজন বৈজ্ঞানিকের ছটা দক্ষ ইন্দ্রিয় নিয়ে এরূপভাবে প্রকৃতির রূপ-তরঙ্গে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।" আমরা দেখছি, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার বিচ্ছেদ ঘটে তখন, যখন আমাদের মন বিশ্লিষ্ট ও মেয় সত্তাকে অতিক্রম করে সংশ্লিষ্ট অপরিমেয়কে অনুভব করতে চায়। তিনি বলেন যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রবণতা আমাদের এমন এক সুচ্চস্থানে নিয়ে যায়, যেখান থেকে আমরা দর্শনের গভীর সমুদ্রকে অবলোকন করতে পারি, "The recent tendencies of science do, I believe, take us to an eminence from which we can look down into the deep waters of philosophy."

জোয়াড (C. E. M. Joad) তাঁর *The Future of Life* নামক গ্রন্থে, প্রাণিতত্ত্বের দিক থেকে বলেন যে এক অনাদি অবচেতন (Unconscious) প্রাণ তার বৈরূপ্যশক্তির দ্বারা (Doctrine of Emergence) ক্রমবিকাশের পথে চেতনাকে লাভ করেচে; কালেতে এর অবসান হবে এক বিশুদ্ধ চেতনায়। বেদান্তীরা যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'মূলে যদি শুদ্ধতা না থাকে, তা হলে তার পরিণাম শুদ্ধতায় কিরূপে অবসান হবে?' তিনি বলেন, 'কী আর বলব, দেখতে পাচ্ছি, প্রাণিতত্ত্বে গণিত ও ভূতবিদ্যার আইনের ব্যত্যয় ঘটচে; যেমন জলের রসবত্তা, তার কারণ উদ্‌যান ও অম্লযান পরমাণুতে দেখা যায় না'। বেদান্তীরা বলেন, 'কিছু নেই থেকে ত কিছু হতে পারে না। পরমাণুর সংযোগ, তার রস শক্তিকে নিরাবরণ করায়, মনে রসবত্তার সৃষ্টি করে। সেই রসবত্তার জ্ঞান যদি মনে না থাকে, তা হলে বাইরে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' কারণের সঙ্গে কার্য্যের সরূপ ও বিরূপ সম্বন্ধ থাকে। মৃত্তিকা ঘটে সরূপ সম্বন্ধে রয়েচে, আর বিরূপ যে ঘট-প্রকারতা, যা আবেষ্টনীর প্রতিবাধা হেতু শক্তিরূপে অনভিব্যক্ত বা প্রাগ্‌ভাব বা মৃত্তিকা-দ্রব্যরূপ-কারণ-নিষ্ঠ হয়েছিল, তাই কার্য্যরূপে তার কারণরূপ মৃত্তিকাকে আবরিত কোরে ঘটরূপে বিকশিত করে। এই ঘট-প্রকারতার জ্ঞান যদি পূর্ব্ব হতেই মনে না থাকত, তা হলে মৃত্তিকাকে কোন প্রকারে বিকৃত করে ঘটে পরিণত করতে পারা যেত না। মৃত্তিকার এই পরিবর্ত্তন, বেদনের (Sensation) মধ্য দিয়ে মনের মধ্যে ঘটের অনুভূতি, যা সেখানে পূর্ব্ব হতেই বর্ত্তমান ছিল তাকে প্রবুদ্ধ করে তোলে। একটা কার্য্যের দুটো দিক থাকে—একটা নৈমিত্তিক (Subjective) আর একটা ঔপাদানিক (Material)। জলের মধ্যে পরমাণুকে আমরা উপাদান কারণরূপে পাই, কিন্তু তার নৈমিত্তিক বা বৈরূপ্য বা Emergent হলো দ্রবনিষ্ঠ শক্তি-বৈচিত্র্য+ মানসিক পূর্ব্ব-সংস্কারের উপলব্ধি। দ্রষ্টার

দিক বাদ দিয়ে প্রাণীর জাত্যন্তর (Variation of Species) বুঝতে গিয়ে ডারউইনকে (Darwin) যদৃচ্ছার (Chance), লামার্ককে (Lamark) মাত্র আবেষ্টনীর এবং জোয়াডকে অকারণ-Emergence এর আশ্রয় কল্পনা করতে হয়েছে।

তারপর জোয়াডের মূলতঃ অবচেতন প্রাণ যে ভবিষ্যৎ-শুদ্ধচৈতন্যে পরিণত হবে—এই ভবিষ্যৎটা হলো প্রাণের কালিক সম্বন্ধ, কাজেকাজেই সে শুদ্ধচৈতন্যকে দৈশিকও বলতে হবে, এবং সেই জন্য সেটা একটা কার্য্য বস্তু, এবং সকল কার্য্য বস্তু যেমন তার কারণে মিশে যায় (ঘট যেমন মৃত্তিকায়) তেমনি এই শুদ্ধচেতন প্রাণকেও কালে তার মূল অন্ধ-অবচেতন অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। বৈজ্ঞানিকদের ভাষাতেই তার হেতু বলা যাচ্ছে—এই পৃথিবী এক সময় সৃষ্টির ঘনান্ধকারে মৃত্যুরূপে ছিল—তখন প্রাণ-স্পন্দ ছিল না—সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। তারপর সৃষ্টি-বিকাশের কোন সুদূর অতীত স্তরে, যে কোন অজ্ঞাত কারণে হোক এই প্রাণতত্ত্বের উদ্ভব হলো। জোয়াড বলেন, "প্রাণ জড় বস্তু হতে পৃথক। প্রথমে এ ছিল অন্ধ,—প্রগতির স্তরে স্তরে কেবল হোঁচট্‌ খেয়ে চলছিল। তখন এতে ছিল মাত্র একটা সহজাত প্রেরণা। ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে, এতে কালে, সামান্য চেতনার বিরূপ-অভিব্যক্তি দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে তা বৈজ্ঞানিকের উৎকৃষ্ট চেতনায় প্রকাশ পেল এবং এই ক্রমাভিব্যক্তির ফলে ভবিষ্যতে এই অবচেতন প্রাণ এক শুদ্ধ চেতনায় পরিসমাপ্ত হবে।" কিন্তু আকাশ-তত্ত্ববিদেরা (Astro-Physicists) এই ভবিষ্যৎ-বাণীটা বাদ দিয়ে প্রাণের পরিণাম সম্বন্ধে বিপরীতদিকেই বলতে পারেন। তাঁরা বলেন, একটা সময় ছিল যখন আমাদের গ্রহটি মনুষ্যাবাসের অনুপযুক্ত ছিল—প্রথম ছিল অতি তপ্ত, তারপর অতি শীতল। আবার এমন সময় আসবে, যখন এ পৃথিবী মনুষ্যাবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে—প্রথম অতি শীতল, তারপর অতি শুষ্ক। সূর্য্য যখন তার তাপ বিকীরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, যা এখনও সুদূর ভবিষ্যতে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। তখন মানুষকে এই পৃথিবী হতে নিশ্চয় বিদায় নিতে হবে, কারণ তখন হেথায় জল নেই, বাতাস নেই, আহার নেই। পৃথিবীর শেষ অধিবাসীরা ঠিক আদিম কালের মানুষের মত একইরূপ দুর্ব্বল ও বুদ্ধিহীন হয়ে পড়তে বাধ্য হবে, কারণ সভ্যতার সকল উপাদান ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, বিজ্ঞান সব বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হতে থাকবে। এই যে আমাদের চিন্তা, ভালবাসা, বেদনা, আশা সব কোথায় অন্তর্হিত হবে। পৃথিবী তখনও চলতে থাকবে—হৃদয়ে এক মৃত্যু-শীতলতা আর সামনে এক নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ অবকাশ।—তাই বেদান্ত বলছেন, "দৃষ্টত্বাৎ নশ্বরম্‌।" সেইজন্য জোয়াড, বার্ণার্ডশ প্রভৃতি প্রাণাত্মবাদীদের "Pure Thought" অনেকটা কোপার্ণিকাসের পূর্ব্বেকার (Pre-Copernicans) সেমিতিক (Semite) জাতির কল্পিত আকাশের পরপারে স্বর্গের মত। তাই বেদ বলছেন, "আত্মার অনুসন্ধান করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।" বৈজ্ঞানিক যখন প্রতিপদক্ষেপে অনুমান করছেন, তখন জগৎ কারণ আত্মার অনুমান করে তার সন্ধান করাটা আর দোষের কি? প্রাচীন ইউক্লিড, টলেমি, নিউটন (Euclid, Ptolemy, Newton), জীবন-প্রগতিতে তাঁদের নিজের নিজের কাজ করে চলে গ্যাছেন, বোহর, রুদারফোর্ডের (Bohr, Rutherford) আণবিক উপাদান আবার বদলাতে আরম্ভ করছে, আইনষ্টিন, হাইসেনবার্গও (Einstein, Heisenberg) কালে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তার এখনও কিছু ঠিক

নেই। মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck) তাঁর প্রথম জীবনে বাইবেলী স্বর্গ ও নরক দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন ; ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভগবান তাঁর কাছে মাত্র—প্রেমময়—"No more than the loveliest desire of our soul" *(Wisdom and Destiny)*। কিন্তু ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর *The Life of Space* নামক নিবন্ধে দেখি, তাঁর নিকট ব্রহ্মবস্তু—বিরাট, অপরিণামী, অনাদি, জ্ঞানাতীত, গুহ্যাতিগুহ্য, শূন্যাতিশূন্য (En sof) রহস্যাতিরহস্য, চির-জিজ্ঞাসাসূত্র—তিনি জোহরের অনন্ত, বেদের তৎ—"I bow before Him and am silent The farther I push forward, the farther He withdraws His bounds The more I reflect, the less I understand The more I gaze, the less I see, and the less I see, the more certain am I that He exists"

এ থেকে বেশ বুঝতে পারা যাচ্চে, বিজ্ঞান এখন এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে শুদ্ধ-বুদ্ধির পর বিশুদ্ধ ভাব কল্পনার সাহায্য ব্যতীত সে অপরোক্ষ অনন্তকে ধারণা করা অসম্ভব। ধর্ম্মকেও যেমন ক্ষুরধার যুক্তি ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর বিশুদ্ধ-কল্পনা সহায়ে অগ্রসর হয়ে, একটা তত্ত্বের অনুমান দ্বারা, ব্যবহারিক প্রয়োগে তার ফল-দৃষ্টে, অনুমানের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হয়—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও ঠিক সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েচে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত আবার ধর্ম্মতত্ত্বেরও পরিকল্পনার উচ্চ-নীচ স্তর আছে,—তাই ধর্ম্মের সংজ্ঞাও অসংখ্য। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিবর্ত্তন —চিরন্তন বিশ্ব-কাব্যে নূতন শব্দ-সম্পদের মহাদান। মূলসত্তা অপরিবর্ত্তিত থেকে, বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীর ভেতর দিয়ে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি! ব্যক্তির অ-ব্যক্তিত্বে, রূপের অরূপে, সীমার অসীমে অনাদি সুরসংযোগ বর্ত্তমান! কিপলিংএর (Kipling) একটি ছন্দ মনে পড়চে—

My brother kneeleth,—saith Kabir,
To brass and stone in heathen wise.
But in my brother's voice I hear
My own unanswered agonies
His God is as his fates assign,
His prayer is all the world's,—
and mine.

মধ্য-যুগের বৈজ্ঞানিকদের প্রত্যক্ষই ছিল একমাত্র প্রমাণ—ভূতবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণতত্ত্ব, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্বের কতকগুলি মাপ-কাটি, যথা—দাঁড়িপাল্লা, তাপমান, বিদ্যুৎবাহক, সংযোগ, বিভাগ, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, শারীর বিশ্লেষণ, তুলনামূলক-সংখ্যা-জ্ঞান প্রভৃতি একমাত্র সত্যলাভের উপায় ছিল। সামনে একটা জিনিষ রয়েচে সেটাকে আমরা বিশ্ব বলচি—যা এক বিশাল জড়স্রোতে পূর্ণ—যার অণুবীক্ষণের দিক হলো অণু, পরমাণু, বিদ্যুতিন এবং দূরবীক্ষণের দিক—সৃষ্টি-মেঘ, সূর্য্য, নীহারিকাপুঞ্জ —সেথায় প্রচণ্ড আণবিক ঝড়—সংযোগ-বিয়োগ, ঘাত-প্রতিঘাত, ঋণি-ধনী, ইতি-নেতির বিষম জটিলতা—সমগ্র জড়সমুদ্র মন্থন করে, সুস্থ শরীরে রক্তাধারের মত জ্ঞান, করুণা, ত্যাগ ও প্রেমকে মন্থিত করে তুলচে।—First Cause! আদি কারণ কী? বিজ্ঞানও যেমন সেটাকে একটা অনুমান-কল্পনার ভেতর এনে ফেলেচে—ধর্ম্ম দর্শনের ভেতর দিয়েও ত তাই করচে; বরং এক একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান-পর দর্শনের পক্ষে তার সসীম দৃষ্টি-ভঙ্গীকে অতিক্রম করে, অসীমের অপরোক্ষ চকিত-স্পর্শ পাওয়া বড় দুর্ঘট; পরন্তু সকল বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে, সর্ব্বদিক-স্পর্শী শুদ্ধ-ভাবের মধ্য দিয়ে বস্তুর যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা ধর্ম্মপর দর্শনের পক্ষে অধিকতর সুলভ —একথা স্বীকার করতেই হবে। মধ্য-যুগের

বিজ্ঞান-প্রতীক নিউটন (Newton) তাঁর *Opticks* নামক গ্রন্থে অন্তর-আত্মার একটা স্পর্শ পেয়েই স্বীকার করেছিলেন যে আদি-কারণ একটা যন্ত্রবৎ জড় নয়—"The main business of Natural Philosophy is to argue from Phenomena without feigning Hypotheses, and to deduce Causes from Effects, till we come to the very first Cause, which certainly is not Mechanical" আর আজকালকার বিজ্ঞান-দার্শনিকদেরও সেই একই কথা—"সৃষ্টির পেছুনে একটা চেতনার দিক আছে—যা সর্ব্বব্যাপী—উচ্চনীচে সমান—যা অনুভব করে, প্রযত্ন করে, সম্পাদন করে।" * "বিশ্বটা একটা বিরাট যন্ত্র নয়—একটা বিরাট চিন্তা—এর পেছুনে রয়েছে স্রষ্টার কৌশল ও অধিষ্ঠান বা নিয়মন—যার কিছু প্রকাশ আমাদের মনেতেও আছে।" † "সৃষ্টির পেছুনে এমন একটা চিন্তা কাজ করচে যা মঙ্গলময়ী, কুশলা, উদ্দেশ্যপূর্ণা, ভবিষ্যৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না, গভীর অববোধবতী, অবস্থার উপযোগ্যতা সম্পন্না।" ‡ দেখচি, বিজ্ঞানী চিরকালই ঈশ্বর বিশ্বাসী, কিন্তু বিজ্ঞান কোনও কালেই ঈশ্বরের সন্ধান পায় না, কারণ এখনও পর্য্যন্ত তা তার প্রতিপাদ্য বিষয়ই নয়।

সবই ত বিশ্বাস। তবে বিশ্বাস মানেই যে কুসংস্কার তা নয়। বিশ্বতত্ত্বের ওপর সৃষ্টির সূচীকার্য্য বোঝবার জন্য যখন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি থৈই হারিয়ে ফেলে, তখনই সুকল্পনা বা শুদ্ধভাবোধ বিশ্বাস তাদের একটা থেই ধরিয়ে দেয়, যাকে অবলম্বন করে আবার তারা জীবন প্রগতিতে অগ্রসর হতে পারে। বিশ্বাস মানুষকে চিরকাল অল্প সত্য হতে অধিকতর সত্যে নিয়ে যাচ্ছে। চল্লিশ বছরের আগেকার পরমাণু বিংশ শতাব্দীতে অনেক উন্নতি লাভ করেছে সত্য, কিন্তু অণু, পরমাণু ও আকাশ কণিকাতে বিশ্বাসই পরমাণুর প্রগতি পথের পান্থনিবাস-ত্রয়। সমস্ত জিনিষই মাটিতে পড়ে।—কেন? কেউ কিছুই বলতে পারে না। বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দ্বাদশ শতাব্দীতে একবার ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর এই "আকৃষ্ট-শক্তি"র নির্দ্দেশ করেছিলেন, কিন্তু সে কথা কেউ কাণ দিয়ে শোনবার উপযুক্তই মনে করেনি। যা হোক শেষে নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে আপেল ফল পড়তে দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নির্দ্দেশ করলেন। এ শক্তি বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরোক্ষ করবার উপায় নেই, বৈদ্যুতিক আকর্ষণের চাইতেও '১'এর পর চল্লিশটা '০' বসালে যা হয়, ততগুণ সূক্ষ্ম। তবে কি করে একে মানা চলে?—যতদিন না জগৎ রচনা কৌশলের অঙ্গরূপে এর চাইতে ভাল একটা বিশ্বাস, আর দশটা জগৎ ব্যাপার পরীক্ষা করে, মানুষ কল্পনা না করতে পারচে, এটা ততদিন মানতে হবেই।—সংশয়ের দোলন হেতু অজ্ঞানের যাতনায় নিউটন একটা জ্ঞানের প্রলেপ দিলেন—মানুষ মনে করলে—তিনি ঋষি, নব-বাইবেলের লেখক, জগৎ রহস্যের প্রায় সমাধান হয়ে গ্যাছে। আর আজ! জগৎটা আপেক্ষিক—দ্রষ্টার দিক বাদ দিয়ে দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্যই নেই।

* It begins to be evident that there is some-thing of the psychological order, immanent in all things, low as well as high, which feels and strives and achieves *Bergson*

† The universe begins to look more like a great thought than a great machine. * * The universe shews evidence of a designing and controlling power, that has something in common with our individual mind.—*Sir James Jeans*

‡ There is evidence of mind at work, beneficient and contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a farseeing insight, a deep understanding, an adaptation to conditions.—*Sir Oliver Lodge.*

দৃশ্য এত কাল ছিল তিন সত্তার ওপর, এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব চাইতে বড় সত্তা তার চতুর্থ কালাত্মা। এই অদ্ভুত সীমাতীত বিশ্বে যেখানেই জড় সেখানেই দেশের বক্রতা (Curvature of Space)—তাই তাদের গুড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই—মাধ্যাকর্ষণ-টর্ষণ কিছু নয়।

তাই বলতে হয়, বিজ্ঞানও ধর্ম্মের মত চলেচে তার বিভিন্ন প্রগতির স্তরের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের যষ্টি অবলম্বনে। ঋক্ সূক্ত থেকে আরম্ভ করে 'কথামৃত' পর্য্যন্ত বিশ্বের যা যথার্থ সত্তা তা এতটুকুও বদলাইনি—মাত্র মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তির সহিত বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে সেই সত্তারও যেন উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি হচ্চে বলে বোধ হচ্চে। বাস্তবিক কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের নানাবিধ খুঁটিনাটির মধ্যেও সে সত্তা পরিপূর্ণভাবেই সদা জাগ্রত হয়ে আছেন। মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রযত্নের ফলে তা থেকে যেন এক একটা নির্ম্মোক খুলে পড়্চে, আর সেই সত্তা সম্বন্ধে মানুষের উচ্চ হতে সূচ্চতর ধারণার অভিব্যক্তির সহিত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের নব নব বৈশিষ্ট্য সম্পাদিত হচ্চে। মানুষ কিছুতেই স্থির নয়—কারণ তার অন্তরসত্তা "মহাসিন্ধুর ওপার হতে" ক্রমাগত আহ্বান করচে তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য—এই যে মানবাত্মার অতৃপ্তি যা প্রথম সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভে সঞ্জাত হয়েছিল, "স বৈ নৈব রেমে" (বৃউ, ১।৪।৩), যা জব্ গ্রন্থের 'The Undying fire", ইদানীং সোপেনহাউয়ার (Schopenhauer) যাকে Unconscious urge, বার্গসোঁ (Bergson) যাকে Creative change, ফ্রয়েড (Freud) যার বস্তু-দিকটাই মাত্র আবিষ্কার করেচেন—সেই নিরোধ ব্যুত্থানরূপা মহাশক্তি জীবকে সৃষ্টি ও ধ্বংস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার স্বস্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয়া সত্তার দিকেই নিয়ে যাচ্চেন। পরিপূর্ণতা মানবের মধ্যে অনাদিকাল হতেই সুপ্ত হয়ে রয়েচে—কেবল স্বপ্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা লাভের জন্য অপেক্ষা করচে। কারণে যদি পূর্ণতা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে কার্য্যের ভেতর যা কিছু বিকাশ বা discovery or invention সবই কারণের পরিপূর্ণতাকে সংকুচিত করেই ঘটচে। কারণ পরিপূর্ণ কেন ?—না বিশ্বের যা কিছু নব নব অভিব্যক্তি দেখচি সবই কারণ সাপেক্ষ—কিছু নেই থেকে ত আর কিছুর অভিব্যক্তি হতে পারে না। তাই দেখচি চরম সত্য যা অনাদি কালে ঋষিরা "একঃ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেচেন, মানুষ সেই বিশ্বাসকে অতিক্রম করে আজ পর্য্যন্ত এক চুলও অগ্রসর হতে পারে নি।

সীমার মধ্যে ক্রমবিকাশ কথাটা অর্থহীন—কারণের নির্ব্বিশেষ পরিপূর্ণতা, কার্য্যে নিশ্চিত একটা বিশিষ্ট অপূর্ণ প্রকাশ। সীমার মধ্যে থাকাই দাসত্ব। তাই স্বামিজী বলচেন, "The search of freedom is the search of all religions"—পরিপূর্ণতাই স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ধর্ম্মের আমরণ চেষ্টা। তাই বেদান্তীরা ক্রমবিকাশ অর্থে আত্মার সসীম উপাধি সকল বিনষ্ট করে অসীমের পথে প্রগতিকেই লক্ষ্য করেন। এ পথের একমাত্র সম্বল বিশ্বাস—পথ-শ্রান্ত মানব এ অনন্ত চলার পথে অব্যয় অরূপের বিভিন্ন প্রতীকে বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্রাম করে। তাই স্বামিজী বলেছেন, "Man made God after his own image" কিন্তু তিনি একথা কখনও বলেননি যে মানুষকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় চিরকাল আবদ্ধ থাকতে হবে, "It is very good to be born in a church, but it is very bad to die in a church" যদিও একথা সত্য যে এখনও পর্য্যন্ত মানুষের মন নাম রূপ ব্যতিরেকে বিশ্বের কোন বস্তুরই স্বরূপ চিন্তা করতে পারে না—"We are all born idolators"—এখনও

পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকই হোক বা ধার্ম্মিকই হোক, অধিকাংশ সময়ই মানুষকে সেই আদি কারণের বিষয় বিস্মৃত হয়েই কাজ করতে হয়—"The vast majority of men are born atheists"—তথাপি ডুমা (Duma), ডালটন (Dalton) থেকে আরম্ভ করে, বোহর (Bohr), রুদার ফোর্ড (Rutherford) সাড্‌উইক (Chadwick) ডাইরাক (Dirac), এ্যানডারসন (C D Anderson), ব্ল্যাকেট (P M S Blackett), ওসিয়ালিনি (G P S Occhialini), কুরি (Curie), জোলিয়টস্ (Joliots), মেঘনাদ সাহা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা অসীম ধৈর্য্যে পরমাণুরাজ্যে যেমন যুগান্তর উপস্থিত করেছেন, ঠিক তেমনি করে মহাজন প্রদর্শিত বিশ্বাসাবলম্বনে স্বরাজ্য লাভের পথে প্রত্যেক মানুষকেই অগ্রসর হতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দর্শন বিশ্বাসকে কুসংস্কারের অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান Law of Probability-র সাহায্যে তার মুক্তি বিধান করলে। এখন উদ্বোধন সকল কুসংস্কারের গ্রন্থি বর্জ্জিত বিশ্বাসের যষ্টি অবলম্বনে, নববর্ষে পুনরায় তার যাত্রা আরম্ভ করলে, তার সকল কর্ম্মের ফলাফল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা

২০শে জানুয়ারী, ১৯২১ সাল, শ্রীশ্রীমহারাজ কলিকাতা হতে কাশী এসেছেন। অদ্বৈত-আশ্রমের উপরকার ঘরে আছেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে বলচেন, "মোটরে মোগল সরাই হতে আসবার সময় দুধারে খোলা মাঠ দেখেও যে আনন্দ হলো না,—এমনি ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, যেমনি bridge পার হয়ে আসা, অমনি এমন একটা মাধুর্য্য অনুভব করলাম, কী বলব। শিব-ক্ষেত্র। শিবই গুরু! একদিকে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে বাহিরের অভাব দূর করচেন, আর একদিকে বাবা বিশ্বনাথ ধর্ম্ম দিচ্ছেন! ঠাকুর যখন কাশী আসেন, তখন এক দাড়ীওয়ালা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরকে আসল ৺কাশী দেখিয়েছিলেন তিনিই কাল-ভৈরব। ঠাকুরের দেহটা তখন অচেতনের মত পড়ে ছিল।"

সন্ধ্যা হয়েচে। শ্রীশ্রীমহারাজের হাতে গঙ্গাজল দেওয়া হলো:—গ্রহণ করে বললেন,—"সবার হাতে দাও।"—বললেন, "গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, অভীষ্ট দায়িনী—ইষ্টদর্শনের সহায়ক। ঠাকুর বলতেন, 'গঙ্গাজল, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আর বৃন্দাবনের রজঃ—সব ব্রহ্মস্বরূপ।"

তারপর বলতে লাগলেন, "কুলকুণ্ডলিনী যখন অধঃমুখ থাকেন, তখন জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভির বিষয় নিয়ে থাকে। কুলকুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখ হলে ভগবৎ বিষয়ে মন যায়। সত্ত্বগুণ বাড়লে ঈশ্বরের রূপ দেখতে ইচ্ছা হয়। তাঁর নাম করতে, ধ্যান করতে ভাল লাগে।"

প্রাতে সু—মহারাজের প্রতি—কিরে কিছু কি করছিস?"

সু—মহারাজ, মনটা বসে না, রস পাই না।

শ্রীশ্রীমহারাজ—মহানিশায় জপ করে দেখ

দেখি ; না পাবলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে। পুরশ্চরণ কর—খুব ধ্যান ভজনে ডুবে যা, কিছু কর।

রা—মহারাজ—মহারাজ, রাত্রে খাওয়ার জন্য, সকালে উঠতে পারি না, উঠলেও শরীর মনে জড়তা, হজম হয় না, অথচ না খেলেও দুর্ব্বল মনে করি, এর কি করব ?

শ্রীশ্রীমহারাজ—রাত্রের খাওয়াটা কমিয়ে দাও। প্রথমে বার আনা আন্দাজ খাবে, পরে আট আনা আন্দাজ হয়ে যাবে। প্রথমটা শরীর দুর্ব্বল বোধ হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। বরং শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। আমরা তখন একাহারী ছিলাম—তাতে বেশ শরীর হালকা থাকত।

সন্ধ্যার সময় মহারাজের কাছে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আছেন। মহারাজ বলচেন, "কোন মহাপুরুষের কাছে জেনে নিয়ে methodically (নিয়মিত) ভাবে করতে হয়—haphazardly (এলো মেলো ভাবে) করলে কি হয় ? মাঝে ছেড়ে দিলেই, আবার ফের খাটতে হয়—আগেকারটা অবশ্য একেবারে নষ্ট হয় না। সাধন ভজন করলেই কাম ক্রোধাদি সব চলে যাবে। এখন মন রজঃ তমোতে আচ্ছন্ন রয়েচে, সেটাকে শুদ্ধ করতে, সূক্ষ্ম করতে হবে। সত্ত্বগুণে নিয়ে যেতে হবে। তখন ধ্যান জপ ভাল লাগবে। বেশী বেশী করতে ইচ্ছা যাবে। তার পর মন যখন শুদ্ধ সত্ত্ব হবে, তখন ঐ নিয়েই থাকবে। মন এখন জড়, তমোতে আচ্ছন্ন আছে, কাজেই তার জড়ের ওপর আকর্ষণ। এই মন যখন চেতন হবে, তখন চেতনকে টানবে। মন সূক্ষ্ম হলে তখন মনের Capacity (ধারণ শক্তি) বেড়ে যাবে—ঈশ্বরীয় তত্ত্ব শীঘ্র শীঘ্র বুঝতে পারবে। আর সময় নষ্ট করিস নে। রিপু সব প্রবল হয়ে রয়েচে, এখন তাদের বেগ সহ্য করতে হবে, তাতে কষ্টও হবে। কিন্তু সাত আট বছর খাটু পরে জীবনটা সুখে কাটাবি। এক বছরেই ফল বুঝতে পারবি। মেয়েরা পারচে, আর তোরা পারবি নি ? এই কাশীতে একটি মেয়ে এক বছরে বেশ উন্নতি করেচে—বেশ আনন্দ পাচ্চে। মেয়েদের বিশ্বাস বেশী তাই চট্ করে কাজ হয়। ঠাকুর নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েচেন—একটু করলা দেখবি, তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্চেন। তিনি ত সব বিপদ আপদ হতে রক্ষা করচেন। তাঁর কত কৃপা এসব কি বোঝান যায়।

"ধ্যান করতে বসবার সময় প্রথমে একটা আনন্দময় স্বরূপ চিন্তা করে নেবে—তাতে nerve (স্নায়ু) গুলো soothed (উত্তেজনাহীন) হয়ে যাবে,—যেমন ইষ্ট মূর্ত্তিকে সহাস্য আনন্দময় ভেবে চিন্তা করবে। *নইলে শুঁটকো ধ্যান হয়ে যাবে।* —এ সব শুনিস্—এগুলো realise (উপলব্ধি) কর। পড়াশুনা বিচার যথেষ্ট হয়েচে—এখন কিছু কর। আর যেটা নিজের ভাব তাই নিয়ে প্রথম আরম্ভ করতে হবে। পরে পাকা হয়ে গেলে, সব নিয়ে আনন্দ করা চলে। Emotional (ভাবপ্রবণ) হতে নেই, feeling (ভাব) চেপে রাখতে হয়। জপের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি চিন্তা করতে হয়, নইলে ভাল হয় না। পূর্ণ মূর্ত্তি ধ্যান না হলে, যেটুকু সামনে আসে, তাই নিয়েই ধ্যান আরম্ভ করতে হয়। প্রথমে পাদপদ্ম থেকে ধ্যান আরম্ভ করবে। না পারলেও struggle করবে। না এলে ছাড়বে কেন ?—এতো করতেই হবে। করতে করতেই হবে—ধ্যান কি সহজেই হয় ? ধ্যানের next step (পরের স্তর)ই ত সমাধি। নির্ভরতা প্রভৃতি সবই সাধন করতে করতেই ভেতর থেকে বেরুবে। তাঁকে সব ছেড়ে দে—সম্পূর্ণ শরণাগত হ। শুধু পাঠ কি হয়। ওত সোজা ব্যাপার। কাম দমন—"যাঁহা রাম, তাঁহা নেহি কাম" —তুলসীদাস বলচেন। কাম দমন করা, মন জয় করা, এ যেন আকাশ গমনের মত শক্ত ব্যাপার।"

ক্ষে—বা। আপনি একা আর কত বলবেন? পাঁচজন প্রশ্ন করলে তবে কথা হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ। তোদের কি জিজ্ঞাসা আছে বল।

রা—ম। মহারাজ ধ্যান কেউ হৃদয়ে, কেউ শিরে করে, কিন্তু আমি বাইরে যেমন দেখি, যেমন আপনাকে দেখছি—সেইরূপ ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। কোন্ ভাবে ধ্যান করা উচিত?

শ্রীশ্রীমহারাজ। দেখ ও সব উপাসনা ভেদে ভিন্ন আছে। সাধারণতঃ উপাসকদের হৃদয়ে ধ্যান করা ভাল। দেহটা যেন মন্দির—তা ঠাকুর যেন তাতে প্রতিষ্ঠিত রয়েচেন—ভাববে। ধ্যান করতে করতে মন যখন স্থির হবে, তখন যে কোন জায়গায় ধ্যান করা যায়। ধ্যান করতে করতে প্রথম জ্যোতিঃ দর্শন হয়, কিন্তু এরূপ জ্যোতিঃ-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরে একটা আনন্দ আছে, তখন মন এগুতে চায় না, এর পর জ্যোতিঃ ঘন দর্শন হয়, তখন তাতে মন তন্ময় হয়ে যেতে চায়। কখনও কখনও বা দীর্ঘ প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতে মন তন্ময় হয়। দর্শন অনুভূতির রাজ্যের কি ইতি আছে? যত এগোও—অনন্ত। অনন্ত। অনেকে একটু জ্যোতিঃ টোতি দেখে মনে করে এই শেষ, তা নয়। যেখানে গিয়ে মনের বিকল্প শেষ হয়, কেউ কেউ বলে—ওখানেই শেষ। আবার কেউ কেউ বলে—**ধর্ম্মের ঐখানেই আরম্ভ।**

রা—ম। মহারাজ, সাধারণতঃ দেখি মন খানিকটা এগিয়ে আর এগুতে চায় না। যেন এগুতে পারে না। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীমহারাজ। ওটা মনেরই দুর্ব্বলতা। মনের যতটা capacity (ধারণ শক্তি) ততটা গিয়ে, আর যেন পাচ্চে না। সকলের মনের এক রকম শক্তি ত আর নয়। সুতরাং মনের শক্তি বাড়াতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য থাকলে, ঠাকুর বলতেন, মনের একটা খুব শক্তি বেড়ে যায়। সে মন সামান্য কাম ক্রোধে চঞ্চল হয় না—ও সব অতি তুচ্ছ বোধ হয়—ঠিক্ ঠিক্ আত্মবিশ্বাস আসে যে ওসব আমাকে কিছু করতে পারবে না। সাধন পথে অনেক বিঘ্ন আছে—বাহিরের বিঘ্ন আর কতটুকু। ভেতরের অনেক রকম বিঘ্ন আছে, তাই পূজাদিতে আসন মুদ্রাদির ব্যবস্থা।

রা—ম। মহারাজ আমার মনে হয়, আপনি আমাদের প্রত্যেককে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বল, তুই কি করিস, তোর কি difficulty' (কষ্ট) —এই ভাবে আমাদের খুব সাহস উৎসাহ দেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ। ওকি জান, ওটা সব সময় হয় না। কখনও কখনও মনের এমন অবস্থা থাকে, মনে হয় যে পায়ে ধরে বলি, বাবা এই কর, এই কর। আবার কখনও কখনও মনে হয়, 'আমি কি করব ঠাকুর আছেন, তিনি যেমন করাচ্চেন তেমনি হচ্চে। আর কাকেই বা বলি, তিনিই করণ কারণ, তিনিই সব। আর বল্লেই বা নেবে কেন? তবে কি জান, সে দিক থেকে যদি প্রেরণা আসে, তবে বল্লে লোকে নেয়।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ-স্মৃতি

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনের দিন মঠে নানারূপ দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ হইতেছিল। সবই শুষ্ক, নীরস বোধ হইতে লাগিল। সময় বৃথা যাইতেছে মনে করিয়া বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। কয়েকদিন পূর্ব্বে মঠে, কোন এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে, খুব ভোরে উপস্থিত হইয়া দেখি, গঙ্গার দিক্কার বারান্দায় উপনিষদ্ পাঠ হইতেছে। দিব্যকান্তি এক যুবক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অঙ্গে গৈরিকবাস, দীর্ঘাকৃতি অতি রমণীয় মূর্ত্তি। চমৎকার উচ্চারণ, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর কথোপকথন বিষয়ক। মনে একটি অস্থির ভাব লইয়া গিয়াছিলাম। সাময়িক একটু ভাল বোধ করিলেও উহা স্থায়ী হইল না। ইতস্ততঃ ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। মনের অস্বস্তিবোধ পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল। আজ বিশেষ ভাবে সুস্থির হইয়া যাইতে পারিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নীরস প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণে কোন উপকার বোধ হইল না। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী উঠিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাঁহার স্বল্প কয়েকটি কথায় আশাতীত ফল পাইলাম। বক্তার বক্তৃতায় বিস্তার আড়ম্বর নাই, ভাষার অসাধারণ লালিত্য নাই, অথচ বক্তৃতার ভাব মর্ম্মস্পর্শ করিল! সন্ন্যাসী প্রবরের মুখাকৃতিতে কোন বিশেষত্ব ছিল কিনা তখন বোধ করিতে পারি নাই। বরং তাঁহাকে সাধারণ রকমের লোক বলিয়াই তখন মনে হইয়াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্বদিনের উপনিষদ্ পাঠকের সুন্দর বদন ও সুমিষ্ট ভাষণ মনে লাগিয়া থাকায়, ইঁহার চেহারায় তেমন আকর্ষণ হয় নাই। ইনি দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ২।৪টি কথা মাত্র বলিয়াই দার্শনিক বিচার শেষ করিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম যে বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী বাদ, জগৎ এবং জীব ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বিভিন্নও নহেন অথচ একও নহেন—যেমন খোলা, শাঁস ও বীচি লইয়া বেল। তিনি বলিলেন, "সকল মতা-বলম্বীরাই উপাসনার পক্ষপাতী, বিবাদ ভুলিয়া যাইয়া উপাসনা পরায়ণ হও। ঈশ্বরের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা কর। মা সম্বোধনে তাঁহাকে ডাক। পিতা বলিলেও কাঠিন্যভাব আসিতে পারে। মা বলিলে একেবারে কোমল হইয়া গেল! সঙ্কোচ দ্বিধার লেশও রহিল না। মহাসমন্বয়াচার্য্য রামকৃষ্ণদেবের ইহাই শিক্ষা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

আমি খুব আশা ভরসা লইয়া ফিরিলাম। অনেক দিন পরে জানিয়াছিলাম, উক্ত বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে হরিমহারাজ নামে সুপ্রসিদ্ধ সাধু!

অতঃপর একদিন মঠে স্বামী সুবোধানন্দ স্নেহ করিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং পূজনীয় হরিমহারাজের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি নিজেও তাঁহাকে আমার কথা লিখিয়া জানাইলেন। হরিদ্বারে গত পূর্ণকুম্ভমেলার পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ণকুম্ভমেলার কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তখন কনখলে অবস্থান করিতেছেন। ইচ্ছা, কুম্ভমেলায় গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করি। পত্রদ্বারা কুম্ভ দর্শনে আসিতে উৎসাহিত করিলেন, কিন্তু তিনি তখন উত্তর-কাশীতে যাইবেন জানাইলেন। আমি হরিদ্বার গিয়া তাঁহার দর্শন পাইলাম না। কিছুকাল পরে জানিলাম তিনি পূজার সময় বলরাম মন্দিরে অসুস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রণাম ও দর্শনান্তর

তাঁহার নিকট কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বলিলেন, 'যখন মঠে বা কাশীতে থাকিব তখন হইবে।' পরে একবার গ্রীষ্মকালে কাশী গিয়া সেবাশ্রমে তাঁহার দর্শন মিলিল। রাজনৈতিক বিষয়ক কথা অনেক কহিলেন এবং নিভৃতে আমাকে ডাকিয়া কি সাধন করি জানিতে চাহিলেন। যাহা করি বলিলাম, তখন আমাকে আমিষ (মৎস্য) আহার পরামর্শ দিলেন। যে সাধন করিতাম তাহা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ঐরূপ সাধনে অনেকে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যায়, তুমি ব্রহ্মচারী, তাই তোমার কোন অনিষ্ট হয় নাই।" আমি দুর্ভাগা, তখন তাঁহার নিকট হইতে কোন সাধন প্রার্থনা করিবার কথা আমার মনে উঠিল না। তিনি খুব সম্ভবতঃ প্রার্থিত হইলে, বিশেষ উপদেশাদি প্রদান করিতেন। যাহা হউক, যে কয়দিন কাশী ছিলাম, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। এই দর্শনের ছয় মাস পরে, ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে কাশী গিয়া প্রায় ৩ মাস থাকিবার সুবিধা হইয়াছিল। প্রত্যহই হরিমহারাজের নিকট যাইতে লাগিলাম। একদিন গীতার একটি শ্লোকের অর্থ বুঝিতে চাহিলে, সেই দিন হইতে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। একদিন দশম অধ্যায়ের—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থং অহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

শ্লোকগুলি পড়িয়া, "আত্মভাবস্থঃ"র ব্যাখ্যা করিতেছেন। বলিলেন, স্বামিজী ঠাকুরের নিকট গীতার এই শব্দের অর্থ বলিতেছেন, 'ভগবান্ অন্তরে থাকিয়া অজ্ঞান দূর করিয়াছেন।' গিরিশ-বাবু বলিতেছেন, 'তিনি সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান নাশ করেন।' যখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ তর্ক হইতেছে তখন স্বামিজীকে উৎসাহিত করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "বল্ না, আমি তোর সঙ্গে আছি।"

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলনভূমি

যথার্থই সকল ধর্ম্মের পার্থক্য শুধু শব্দে, নামে এবং ভাষায়। উহার মূলতত্ত্ব এক বা অভিন্ন। আল্লা অর্থে ঈশ্বর এবং আকবর অর্থে মহান্; দেব বা গড্ অর্থে ঈশ্বর এবং পরম বা মহা অর্থে মহান্ বুঝায়। আল্লাহো আকবর শব্দের বুৎপত্তি গত অর্থ পরম ঈশ্বর বা মহাদেব। পার্শী ধর্ম্মের "অহুর মজ্‌দ শব্দের অর্থ অসুর মহান্। রহিম ও শিব উভয়ের মানে মঙ্গলকর এবং রহমন ও শঙ্কর শব্দের অর্থ সুখজনক! এবম্বিধ মিলন ভূমির অনুসন্ধান করা যেমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ তেমন সব বিষয় কেবল পার্থক্য বা পৃথকত্বের সন্ধান করা আবার অপর একদল লোকের বিশেষত্ব।

চীনদেশে যখন অপরিচিত ব্যক্তিগণ একত্রিত হন, তখন প্রচলিত প্রথামত একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "আপনি কোন্ মহান্ ধর্ম্মাবলম্বী?" একজন হয়তো তাও-মতে বিশ্বাসী, অপরজন হয়তো কনফুসে মতাবলম্বী এবং আর একজন হয়তো ভগবান্‌বুদ্ধের মতানুসরণ প্রিয়।

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা পরস্পর, একে অপরের ধর্ম্মকে প্রশংসাসূচক বাক্যাদি বলিয়া অভিনন্দিত করিলে সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, "ধর্ম্মমত অনেক কিন্তু বিবেক এক, আমরা সব ভাই।" চীনদেশের সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক লু সান্ য়্যান বলেন, "ধর্ম্মমতসমূহ একেবারেই অভিন্ন, উন্নতমনা ব্যক্তিগণ সকলধর্ম্মে একই সত্য দর্শন করেন এবং সংকীর্ণচিত্ত মানুষের মনেই পার্থক্য প্রতিভাত হইয়া উঠে। অনৈক্য, বিরোধ অসামঞ্জস্য ও পার্থক্য ইতর প্রাণিসমূহের মানসিক গুণের পরিচায়ক এবং একত্ব, অভেদত্ব, সমন্বয় ও অদ্বৈত, জীবশ্রেষ্ঠ মানব মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।"

ইংরাজী 'রিলিজিয়ন্' শব্দটী খৃষ্ট জগতে বিশেষ পরিচিত। ইহা লাটিন re এবং legere এই দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ "পুনঃ একত্রিত হওয়া" অর্থাৎ যাহা ভগবানের সঙ্গে মানুষকে এক করিয়া দেয় তাহাই 'রিলিজিয়ন্'। ইহার যথাযথ অর্থবোধক সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম্ম', ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যাহা ঈশ্বরকে ধরাইয়া দেয় তাহাই ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পালি শব্দ 'ধম্ম', সংস্কৃত ধর্ম্ম শব্দেরই অপভ্রংশ, সুতরাং উভয়ের অর্থ অভিন্ন। ইসলাম্ শব্দের একটী সুন্দর তাৎপর্য্য আছে; সেলাম্ শব্দের মানে শান্তি অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের অনুসরণ এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণই ইসলাম শব্দের মূলগত অর্থ। খৃষ্টান ধর্ম্মের Christos শব্দের মানে ঈশ্বর জ্ঞানে স্নাত হওয়া। 'বৈদিকধর্ম্ম' এই শব্দ দুইটীর অর্থও 'জ্ঞানের ধর্ম্ম' সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সনাতন ধর্ম্মের মানে 'অনাদি পন্থা'। চীনদেশের তাও ধর্ম্মের অর্থ বন্ধন মুক্তি। এতদ্দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে 'ধর্ম্ম' শব্দটী পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতে প্রায় একার্থবোধক।

প্রত্যেক ধর্ম্মই বিভিন্ন ভাষার আবরণে স্বীকার করেন যে মনুষ্য মূলতঃ ভগবান হইতে অপৃথক এবং জগৎ এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার সতত পরিবর্ত্তনশীল পরিচ্ছদস্বরূপ। ভগবান মানুষের মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং মানুষ ভগবানকে আপনার মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল দার্শনিকতত্ত্ব। হিন্দুর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বেদান্তের সার মর্ম্ম—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। ইস্‌লামের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানসরিফে আছে, "আমি মানুষের মধ্যে, কিন্তু অন্ধ আমাকে দেখিতে পায় না।" মুস্‌লিম সুফি সম্প্রদায় বলেন, "আমি তোমার নিকট হইতেও নিকটতম।" ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থ Old Testament সবিশেষ ইসাই মতাবলম্বিগণ প্রচার করেন, "আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নাই।" বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র 'উদানে' উল্লেখ আছে যে সমাধি উত্থিত ভগবান বুদ্ধ উপনিষদের ঋষির সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে পালি ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন "সো ব্রহ্মণো ব্রহ্মবাদম্ বদেয়।" জারাথুষ্ট্র সম্প্রদায়ের ওরমজ্‌দ্ যাস্ত অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে সমস্বরে এই একই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি কেমন আশ্চর্য্য, আমাকে প্রণাম।" তাও ধর্ম্ম—উপদেশ দান করেন, "তোমার মধ্যে তাওকে দেখ, তুমি সব জানিতে পারিবে।" কনফিউসে ধর্ম্মের শেষ কথা, "অপরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ যাহাকে বাহিরে অনুসন্ধান করেন, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আপনাদের অভ্যন্তরে দেখেন।" উদ্ধৃত মহাবাক্যাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হয় যে জগতের ধর্ম্ম সমূহের উচ্চতম আদর্শে মূলতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই।

যাঁহারা এই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন অথবা এই অদ্বৈত, অভেদ বা একত্বাবস্থা লাভ করিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত, পরমহংস, দিব্যপুরুষ, পূর্ণপুরুষ, প্রেমোন্মাদ ও অবতার প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। বৌদ্ধমতে

এই মহাপুরুষদিগের নাম বুদ্ধ বা অরহৎ, জৈনমতে তীর্থঙ্কর ও ভবপারের মাঝি, খৃষ্টান্‌মতে মেসায়া এবং ইস্‌লাম মতে ইঁহারা ইনচান্‌উলকামিল্‌, মরদাইতান্‌ম্‌ ও মজ্‌হরাইআত ম্‌ বলিয়া অভিনন্দিত।

ধর্ম্মের শেষ সীমায় পৌছিতে প্রত্যেক ধর্ম্মের সাধককে তিনটী প্রধান অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। ইস্‌লাম এই অবস্থাত্রয়ের নাম দিয়াছেন ইত্তাদিয়া, সুহাদিয়া, এবং ওহাজাদিয়া। ইহাদের অবিকল হিন্দুনাম দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এবং খৃষ্টীয় নাম Dualistic Theism, Panantheism and Absolutism এই তিনটী ধর্ম্মের তিনটী নামে অর্থগত কোন প্রভেদ নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভের জন্য তিনটী পথ স্বীকৃত হইয়াছে। হিন্দুর জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সঙ্গে ইস্‌লামের চকিবৎ, তরিকৎ ও সরিয়তের কোন ভেদ দেখা যায় না। বৌদ্ধমতের অষ্টপন্থাকে তিনটী প্রধানভাগে বিভক্ত করতঃ উহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে—সম্যকদৃষ্টি (জ্ঞানযোগ), সম্যক সংকল্প (ভক্তিযোগ) এবং সম্যক ব্যায়াম (কর্ম্মযোগ)। ইহাদের সঙ্গে জৈনমতের সম্যক দর্শনম্‌, জ্ঞান-চরিত্রম্‌ ও মোক্ষমার্গের তাৎপর্য্যের কোন প্রভেদ নাই। খৃষ্টমতে এই অবস্থাত্রয়ের নাম—The way of knowledge, The way of devotion and The way of works of charity

হিন্দুধর্ম্মের সব সম্প্রদায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমত। ইস্‌লাম মতে ইহাদের নাম— নাপ, দিল্‌ ও রোয়া; সুফিমতে জিস্‌মাইকুল, রুয়াইকুল এবং আকুলাইকুল, জৈনমতে ঔদারিক, তৈজস ও কর্ম্মণ্য; বৌদ্ধমতে নির্ম্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্ম্মকায়; খৃষ্টমতে Body, Soul ও Spirit, এবং ইহুদী মতে নাফেস, রোয়া ও নেশামা। এই শব্দগুলি ভাষায় মাত্র ভেদ, বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

ধর্ম্মলাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই নিয়মগুলিও সব ধর্ম্মেই এক এবং অভিন্ন। হিন্দু যোগশাস্ত্রের পঞ্চবিধ 'যম'এর সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের পঞ্চশীলের কোন প্রভেদ নাই। ভগবান খৃষ্টের দশটী উপদেশকে পাঁচটী ভাগে বিভক্ত করতঃ বৌদ্ধ মতের পঞ্চশীলের সঙ্গে অভেদ করা যাইতে পারে। কোরাণে উল্লিখিত 'ফকির' ও 'শুক্রে'র অর্থের সঙ্গে হিন্দুর অপরিগ্রহ ও সন্তোষের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না", মহম্মদ উপদেশ দিয়াছেন, "ভালদ্বারা মন্দকে জয় কর", বুদ্ধদেব বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রেম দ্বারা হিংসাকে জয় কর" ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, "সত্যকে আশ্রয় করিয়া অসত্যকে দূর কর", লাউজীর বাণী "ইষ্টদ্বারা অনিষ্ট'ক বিতাড়িত কর" এবং কন্‌ফুসে প্রচার করিয়াছেন, "ভালর সঙ্গে ভাল, মন্দের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার কর, মন্দকে ত্যাগ করিবার জন্য।" নিরপেক্ষ পাঠক বিচার-পূর্ব্বক দেখিবেন বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্যগণের এই প্রধান উপদেশগুলিকে এক সামঞ্জস্যে সমন্বিত করা সম্ভব কি না।

একটী গল্প আছে যে ছয়জন অন্ধ তাঁহাদের হস্তদ্বারা হস্তীর এক এক অংশ স্পর্শ করতঃ উহার আকার সম্বন্ধে বিবাদনিরত হইয়াছিলেন। আমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্ম বিষয়ক বিরোধ অবিকল এই গল্পোক্ত অন্ধদের বিবাদের সঙ্গে কোন অংশে ভেদ নাই। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সুফি সাধক মৌলানা রুমের একটী ছোট গল্প বিশেষ উপভোগ্য। "একদা ইতালী, আরব, তুরস্ক ও ইংলণ্ড দেশের চারিটী লোক একসঙ্গে কোথাও যাইতেছিলেন। দীর্ঘ পথ ভ্রমণে সকলেই ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে

প্রয়োজনের তাড়নায় ইঙ্গিতে ভাব ব্যক্ত করতঃ আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহের জন্য সকলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইল। কিন্তু কোন্ জিনিষ ক্রয় করা হইবে? আরবী বলিলেন—'এনাব্', তুর্কী উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলেন—'লিজাম্', ইংরাজ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন 'গ্রেপ্‌স্' এবং রোমী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন 'আস্তাকিল্'। এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হইল; ইত্যবসরে একজন ফেরিওয়ালা এক ঝুড়ি ফল মাথায় করিয়া সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইল, পৃথিবীর অনেক দেশের ভাষা তাহার জানা ছিল। সে সহাস্যে ফলের ঝুড়ির আবরণ উন্মুক্ত করতঃ পথিকদের সম্মুখে উপস্থিত করিল। এতদ্দৃষ্টে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সকলের মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। প্রত্যেকেই ঝুড়ির মধ্যে আপন আপন আকাঙ্ক্ষিত একই সুমিষ্ট আঙ্গুর দেখিয়া আনন্দে উহা গ্রহণ করিলেন এবং অনর্থক বিবাদের জন্য লজ্জিত হইলেন।"

আমাদের হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম বিরোধ প্রকৃতপক্ষে এই পথিকদের বিবাদের মত হাস্যোদ্দীপক নয় কি?

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি প্রশ্ন করা হয় যে সব ধর্ম্মের চরম উপলব্ধি যে এক, উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথায়? উত্তরে আমরা বলিব যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সর্ব্বধর্ম্মের সম্মিলন ভূমির জীবন্ত-প্রতীক। হে ভারত, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ কর বা না কর তাহাতে যায় আসে না, কিন্তু জগতে সাম্য স্থাপন করতঃ নেশান প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমাকে বাঁচিতে হইলে তাঁহার সমন্বয় ভাবকে তোমার গ্রহণ করিতেই হইবে। নান্যঃ পন্থা।

—সুন্দরানন্দ

ব্রহ্মজ্ঞান

অধ্যাপক—শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, এম্-এ

ভারতের ঔপনিষদিক যুগই ঋষিযুগ, উহাই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার ও প্রচারের যুগ ছিল। জগতের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এই প্রাচীনযুগেরই আবিষ্ক্রিয়া। এই যুগের সর্ব্বত্যাগী সাধনশীল ঋষিগণ, সর্ব্বত্যাগী হইয়াও মানব কল্যাণে ব্রতী হইয়া, বিষয় বিভ্রান্ত জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভের জন্য আহ্বান করিতেন। ঋষিপ্রোক্ত পরমপুরুষার্থই মোক্ষ,—শ্রুতি বলিয়াছেন "চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থঃ" এই মরজগতে পুরুষার্থ চারিটি, যথা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ইহাদের মধ্যে উত্তম পুরুষার্থ মোক্ষ। তাহাতে প্রশ্ন হইল মোক্ষ উত্তম পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ, তাহাতে শ্রুতি প্রমাণ "ন স পুনরাবর্ত্ততে" অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইলে জীবকে আর শরীর গ্রহণ করিতে হয় না তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ কি প্রকারে হয়, "স চ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ" এই উত্তরে ইহাই জ্ঞান জন্মে যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন দ্বারাই মানবকুল একমাত্র মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বলিলে কি প্রতীয়মান হয় তাহাই এখন বিচার্য্য।

আর্য্য ঋষিগণের মতে জীব ও ব্রহ্মে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই, শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা উ, ৩।১৪।১) ব্রহ্মই সব, ব্রহ্ম ভিন্ন

কিছুই নাই। এই দৃশ্যমানাদৃশ্যমান জাগতিক পদার্থ সকল ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই স্থিত, প্রলয়ে ব্রহ্মেই প্রলীনত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ তিনি ভিন্ন এখানে বহুর অস্তিত্ব অসম্ভব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ উ ৪।৪।১৯) জাগতিক সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্‌ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে ঔপাধিক যে জীবভাব তাহা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করা কর্ত্তব্য। ঔপাধিক জীবভাব পরিহার হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির অবস্থার সাযুজ্যত্ব হয়। জীব উপাধির অবসানে ব্রহ্মভাব নামক স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ং" তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতর লাভাবস্থা।

ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন, ব্রহ্মভাব কি—না সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তাঁহার ভাব, ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্য হইতেই শাশ্বত স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহাই বুঝিতে হইবে। জীবের ব্রহ্মেতে স্থিতি হইলে আর কিছুতেই অভিনিবেশ থাকিবে না। যাবৎকাল ব্রহ্মেতে স্থিতি না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় না। এখানে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের অর্থ বহুজ্ঞান ও বহুর পশ্চাদনুসরণ। এই নিমিত্তই পূর্ব্বাচার্য্যগণ মুক্তিপ্রদ অদ্বৈত তত্ত্বেরই সাধনা করিতেন। তাঁহারা "দ্বন্দ্বাতীতং পরমসুখদং" যে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ তাঁরই অনুভূতির জন্য লালায়িত হইয়া থাকিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন জীব স্বীয় স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়াই, ব্যক্তিত্বাভিমানে জড়িত ও বদ্ধভাব লাভ করিয়াছে; এবং তাঁহারা ইহাও বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে এই বদ্ধভাবের মধ্যে সর্ব্বদাই অতৃপ্তি এবং নিত্যানন্দের একান্তই অভাব। এই অভাব দূরীকরণের জন্যই ঋষিযুগের ঋষিকুল হইতে শঙ্করাচার্য্য ও যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্ত সকলেরই ঐকান্তিকী সাধনা ছিল।

পুরাকালে,—ভারতের মহর্ষিগণ এই অনন্ত অপরিসীম সৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণও Evolution process (ক্রমবিকাশ) দ্বারা একমাত্র Nebulae নীহারিকা হইতে এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বের উদ্ভব স্থির করেন, সেইরূপ ভারতের আচার্য্যগণও ব্রহ্মকেই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। তাহার মধ্যে ইহাই পার্থক্যবিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, বর্ত্তমান যুগের প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ জড় ও শক্তির মধ্যে একটি দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া একতত্ত্বের সম্যক্ মীমাংসা করিতে সক্ষম হইতেছেন না। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্যাগী সাধককুলচূড়ামণি আর্য্যঋষিগণের সিদ্ধান্ত এক অপূর্ব্ব মীমাংসা। তাঁহাদের মতে জড় ও চৈতন্য একান্ত বিভিন্ন বস্তু নয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহা তাঁহার ভাষ্যে পরিষ্কার ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। কত কত যুগ পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ইহা ঘোষণা করিয়াছেন, জড়তা—চৈতন্য নিহিত যে শক্তি তাহারই অবস্থা বিশেষমাত্র, সেই এক শক্তিই অবস্থা বিশেষে তেজ, ক্ষিতি, অপ্, মরুদিত্যাদি। এই মীমাংসা কার্য্য-কারণভাবে অনিবার্য্যরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; কেন না, বিশ্বের এই বহুলতা বা বিচিত্রতাকে যদি Evolution (ক্রমোন্নতির) ফল বলা হয়, তাহা হইলে Involution (ক্রমসংকোচ) ক্রমে একের সিদ্ধান্তে অন্তের উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নম্ অন্নাদ্রেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ দ্বিতীয়বল্লী); এবং আপনারা বোধ হয় অনেকেই কেনোপ-নিষদের তৃতীয় খণ্ডোক্ত বিষয় বিদিত আছেন। ঐ গল্প দ্বারা ঋষি বুঝাইয়াছেন যে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি একমাত্র সেই ব্রহ্মশক্তিতেই শক্তিমান্। তাঁহাদের পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও সত্তাই নাই। বাহুল্যভয়ে সেই ঋষি-প্রমাণ এখানে আর

উল্লেখ করিলাম না। এই বিভুশক্তি বা ব্যাপ্ত চৈতন্যের জ্ঞানই ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান। এইরূপভাবে ক্রমশঃ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি ব্রহ্মের বহু ভোগ্যতা ও বহুজ্ঞেয়তার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইবে, অথচ এই সাধনায় অভ্যস্ত হইয়া জীব যখন আমিত্বের সীমা উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করে, তখনই তাহার সিদ্ধির পথ অবাধিত হইয়া যায়। এই ক্রিয়া যোজনা হইতেই আমার, তোমার অভিব্যক্তি ও সাংসারিক লীলাভিনয় হয়, আবার সেই ক্রিয়ার যদি একান্ত অভাব দাঁড়ায় তাহা হইলেই আমি ও তুমি, সেই মহাশক্তিমূলে গিয়া এক মহাজলধিতে মিশিয়া যাইব।

এই শক্তিমূলে পৌঁছানই ভূমানন্দ বা মুক্তির অবস্থা। ইহাই জীবের একমাত্র কাম্যবস্তু, কিন্তু ইহাতে চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে যে ক্রিয়াবিশিষ্ট জীবের পক্ষে নিষ্ক্রিয়তা বা স্থৈর্য্যজ্ঞান সম্ভবপর কিনা? সে স্থলে বক্তব্য এই যে—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চলিষ্ণু শকটে আরোহণ করিয়া আছে তাহার পক্ষে ভূপৃষ্ঠস্থ তরুলতাদি সকল পদার্থকেই সে যেমন চলিষ্ণুত্বে উপলব্ধিভূত মনে করে, অর্থাৎ তরুলতার স্বরূপ জ্ঞান তাহার পক্ষে সেই অবস্থায় অসম্ভব, এইরূপ ভাবে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরও ব্রহ্মে নিষ্ক্রিয়তা জ্ঞান অসম্ভব। এই কারণেই ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,—ক্রিয়াধীন অবস্থায় জীব ক্রিয়াস্বরূপ জ্ঞানই লাভ করিতে সমর্থ হয়। স্থির অচঞ্চল সর্ব্বালোড়ন-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মসত্তার জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনুভূতির অর্থ হইতেছে "সমাধি" বা ঐকান্তিকী নিষ্ক্রিয়তা। যদি ব্রহ্মানুভূতি অর্থাৎ ঐকান্তিকী নিষ্ক্রিয়তাই সমাধি হয় তাহা হইলে কি প্রকারে "অবাঙ্‌মনসো-গোচরঃ", বাক্য ও মনের অতীত হইয়া জীবত্বের পর্য্যবসানে এই সমাধি লাভ হয়। তবে কি ঋষিরা রূপকচ্ছলে ভ্রান্তি জন্মাইবার জন্যই ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচরীভূত এই কথা বলিয়াছেন। না, তাহা নয়—ব্রহ্ম বস্তুতই বাক্য মনের অগোচর। এই একাদশেন্দ্রিয় যখন স্তব্ধীভূত হয়, তখনই তিনি গোচরীভূত হইয়া থাকেন ইহাই উক্ত বাক্যার্থ।

এস্থলে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে—ব্রহ্মকে ক্রিয়ারহিতস্বরূপে বলা হইল কেন; আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের মধ্যেও চৈতন্যের সমাবেশ করিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ ইহাও আশা করা যায় আরও নিম্ন পদার্থের মধ্যেও উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে, তাহা হইলে দেখা যায়; নাম যাহাই দেওয়া থাকনা কেন, এক শক্তি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব. ইহাই স্বীকৃত হইল। এখন উহাকে আদ্যাশক্তিই বল বা ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই বল অথবা মায়াশক্তি হউক, তাহাতে এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুর কোনই ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই অচিন্ত্যব্যাপ্ত শক্তির বিশ্বরূপী লীলা,—যেমন একই জল কখনও বাষ্প, কখনও মেঘ, কখনও বা কুজ্ঝটিকা হইয়া জলের বহুরূপী লীলার ক্রিয়ায় প্রতিভাত হয়—সেইরূপ এই শক্তি তদপেক্ষা অনন্তগুণে অনির্ব্বচনীয়-রূপে বহুরূপী হইয়া আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয় এবং আমি, তুমি সকলেই সেই শক্তির এক একটী ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র।

আমরা যেরূপভাবে রামধনুর বিচিত্র ব্যাখ্যা পাইয়াছি, ঋষিগণও সেইরূপ উপর্য্যুক্ত শক্তির মৃদুমধ্যাতিবিক্রমাত্রভেদকেই এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানে বিচিত্রতা অর্থে মূলের কোন ঐকান্তিক প্রভেদ বা বিভিন্নতা সম্পাদন নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে দেখা গেল যে ক্রিয়ার খর্ব্বতাসাধন ভিন্ন শক্তির মূলে পৌঁছিবার গত্যন্তর নাই।

অহন্তাবাত্মক যে "অহম্" ইত্যাকার জ্ঞান, ইহা একটি স্পন্দন সমষ্টিমাত্র সুতরাং এই জন্য স্পন্দনের

থর্ব্বতা সাধন ব্যতীত, আমিত্বের বা জীবত্বের পরিবর্জ্জন সম্ভবপরই হয় না। সেই নিমিত্তই (ব্রহ্মজ্ঞান) সাধনার অর্থ আকুঞ্চন বা ক্রিয়ার থর্ব্বতা সাধন। ক্রিয়ার্থে নিষ্ক্রিয় বা নিগুর্ণ, যদি এস্থলে আমাদিগের মনে নিষ্ক্রয় বা নিগুর্ণ কথার দ্বারা কোনও অভাব বিশিষ্ট শূন্য-গর্ভ বস্তুর প্রতীতি জন্মায়, তাহা অত্যধিক ভ্রমাত্মক জ্ঞান। নিষ্ক্রিয় বা নিগুর্ণ বলিলে, ক্রিয়া বা গুণের স্ফুরণের অভাব মাত্র সূচিত হয়, এতদ্ব্যতীত উহা অন্য কোনও অভাব সূচিত করে না। ফলতঃ নিগুর্ণ অবস্থা বা প্রসুপ্তাবস্থা ও বীজাবস্থা—যাহাকে ইংরাজীতে Latent বা Potent অবস্থা বলে—উহা তাহাই। নিগুর্ণ বলিতে আমাদিগকে পুঞ্জীভূতগুণের এবং নিষ্ক্রিয় বলিতে পুঞ্জীভূতশক্তির আধারকে বুঝিতে হইবে। নিষ্ক্রিয়তা বা ক্রিয়শীলতা, নিগুর্ণতা বা সগুণতা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একের পরিহারে অন্যের স্থিতি অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। ক্রিয়ার কথা বলিলেই বুঝিতে হইবে উহা নিষ্ক্রিয়তার অপেক্ষা করে। বর্ণহীন আলোকে যেভাবে রামধনুর বিচিত্রবর্ণের উৎপত্তি, সেইরূপেই নিগুর্ণকে আশ্রয় করিয়া নাম, পঞ্চতন্মাত্র গুণ বিশিষ্ট জগতের যাবতীয় সৃষ্টি। ইহাকে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক মতে দেখিলেও পরিষ্কার দেখা যাইবে। যেমন দেখ—একধারে একটি কম্পমান রশ্মি—উহার একপ্রান্তে নিষ্ক্রিয়তা আর অন্য প্রান্তে ক্রিয়ার আস্ফালন। তাহা হইলে নিষ্ক্রিয়তা হইতে ক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়া ধীরে ধীরে উহার আতিশয্যে পরিণতি। কি সুন্দর কল্পনা কর দেখি, একপ্রান্তে সেই বিরাট স্তব্ধ প্রশান্তি, অন্যপ্রান্তে আছে তার মহাকালের বিশ্ব-বিস্ময়কর তাণ্ডব নৃত্য। এই সুন্দর ভাব আমরা কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই সহসা ঋষিবাক্য যে অর্থে ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বা নিগুর্ণ বলিয়াছে আমরা সম্যক্‌রূপে না বুঝিয়াই অনেক সময়ে শব্দাতঙ্কে ভীত হইয়া পড়ি। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিবার প্রয়াসও পাই না।

এখন বলা যাইতে পারে, যদি নিষ্ক্রিয়তাই ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা হয়, তাহা হইলে বিষ, অথবা Chloroform (সংজ্ঞালোপকর ঔষধ বিশেষ) দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সাধন সিদ্ধ হয়। বাস্তবিক ইহা কোনও যুক্তিই নহে। কারণ বিষদ্বারা শরীরের ক্রিয়ার মৃদুতা সম্পাদিত হয় না বরং ক্রিয়ার আতিশয্য সম্পাদিত হয়। নিদ্রাবস্থা, মূর্চ্ছাবস্থা, বিষক্রিয়াবস্থায়, ক্রিয়াতিশয্য হইয়া থাকে। ইহা মহামতি চরক ও আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জন্যই ইহাতে আর অন্য কোনও যুক্তির আবশ্যকতা নাই।

অতএব সমাধির অবস্থা ক্রিয়ার মৃদুতা দ্বারা আনীত হয়, উহা কোনপ্রকার কৃত্রিম উপায় দ্বারা আনীত হইতে পারে না। জীবকুল একমাত্র পরমপুরুষের দর্শন করিবার অধিকারলাভ অন্য কোন ভাবেই করিতে পারে না। সমাধি দ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই সমাধি দ্বারা জীবের আত্মদর্শন লাভ হইলে সেই সঙ্গেই পরমাত্মার সহিত তাহার একত্ব জ্ঞানও লাভ হয়। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই শঙ্কর জীবন্মুক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন হয় স্বরূপমাত্র দেহাদিতে; এবং ব্রহ্মজ্ঞান পরমাত্মভাবরূপ নিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া। ব্রহ্মজ্ঞান শব্দে ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় পদার্থে যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান তাহার নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞান। আর ব্রহ্মদর্শন শব্দে যাবতীয় বস্তুতে কল্পিত অদর্শনের নিবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন। এই দর্শন জগতের নামান্তর। ইহাই অদ্বৈততত্ত্ব বা নিরাকার চৈতন্যবাদ। যাহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্বদা নিহিত, তাহার দর্শন বা জ্ঞান সমাধি-প্রকারের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ॥

সংগীত

[রচনা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

বীণাপাণি

অয়ি মানস-সরস-নীর নিবাসিনি !
নমি সুধাকর-সিতকর বিভাসিনি ॥
চরণ-মৃণাল তব মণ্ডিত কোকনদে,
কুবলয়ে, কহ্লারে, মঞ্জীর তব পদে
গুঞ্জনশীল লোল রচে অলি মধুমদে,
মঞ্জুভাষিণি, দেবি সুহাসিনি ॥

তটগত সুরনর কিরীট-মণির কর
রচে তব আরতি প্রদীপে।
মধুর কলস্বনে ভক্ত কোবিদগণে
গাহে ভুয় চরণ-সমীপে।
চন্দন-বনজাত সমীরণে চঞ্চল
কুন্দমালিকা ফুলে, অংশুক অঞ্চল
তব বীণা নিনাদনে মুখরিত জল থল,
শঙ্খধবলা তমোবিনাশিনি ॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

যোগিয়া—ঢিমে তেতালা

ঋ=কোমল ঋষভ, দ=কোঃ ধৈবত্

স্থায়ী।

১ ২
সন্‌া সঋা ‖{ ' মা পদা পা দা । নদা পা মগা মা I পা -মা গা -ঋা ।
অ • য়ি • মা ন • স স র • স নী • র নি • বা •

৩ ৩
(গঋা সা সন্‌া সঋা) } I গঋা সা সন্‌া সা ।
সি • নি 'অ • য়ি •" সি • নি, ন • মি

• ১ ২´
[গা ঋা সন্‌া ন্‌সা । ঋা ঋসা গা মা I পা মা -না নদা ।
I { ঋা ঋা গমা গঋা । মা নদা পা পা I মা গা -ঋা গমা ।
সু ধা ক • র • সি ত • ক র বি ভা • সি •

৩
পা -া দা দা] । ১
গা -মা গা মা } I না র্সনা র্সা ঋর্সা । নর্সা না দা পা I
নি • "ন মি" সু ধা • ক র • সি • ত ক র

২´ ৩
মগা মা পা -মগা । ঋা -সা সন্‌া সঋা II
বি • ভা সি • • নি • "অ • য়ি •"

অন্তরা ।

• ১ ২´ ৩
I [দা দা মা দদা । দা না র্সঋা র্সা I না -ঋা র্সা র্সনা । দা না দনা র্সা I
II { মা পা দা র্সর্সা । ঋা র্সা নর্সা র্সা I ঋা -া ঋা র্গঋা । র্সা না র্সঋা র্সা I
চ র ণ মৃ ণা ল ত • ব ম ন্ ডি ত • কো ক ন • দে

• ১ ২´ ৩
ঋা ঋা ঋা র্গা । র্মা -র্গঋা -া ঋা I না -র্সা না র্সা । ঋা র্সা নদা পা] I
দা দা না র্সা । ঋা -র্সর্সা -না র্সা I না -র্সা না দা । না দা পমা পা } II
কু ব ল য়ে ক হ্‌ লা • রে ম ঞ্ জী র ত ব প • দে

• ১ ২´ ৩
I [না -া র্সা র্সা । ঋা -র্সা না র্সা I না দপা পা দা । পা নদা পা মা] I
I { মা -া মা মা । পা -া পা -া I দা দনা না দা । দা নদা পা পা } I
গু ঞ্ জ ন শী ল্ লো ল্ র চে • অ লি ম ধু • ম দে

• ১ ২´ ৩
I { না র্সা র্সা নঋা । র্সা র্সা নদা পা I মা -পা দমা -ঋা । (গঋা সন্‌া সন্‌া সঋা) } I
ম ঞ্ জু ভা • বি পি দে • বি সু • হা • • সি • নি • অ • য়ি •

৩
গঋা সন্‌া সন্‌া সঋা II
সি • নি • "অ • য়ি •" স্থায়ীর "অয়ি"।

সঞ্চার।

।[পা পা পা দা । র্সা র্ঋা র্গা র্ঋা । র্সা র্ঋা র্মা র্মা । র্ঋর্গা র্ঋা র্সা র্সা ।

। { সা ঋা মা মা । পা পা পা দা । মা পা দা র্সা । র্ঋর্সা না দা পা ।
তটগত সু॰রনর কিরীটম ণি॰রকর

। র্ঋা র্মা -র্পর্মা । র্ঋা র্ঋা র্সা না । দা পপা পা -দা । মা -গা -ঋা -ঋসা] ।
। দা পা -পদা । মা না দা পা । র্সা নর্মা দা -মা । দা -মা -গা -ঋসা } ।
॰*রচে॰॰ তবআর তিপ্রদী॰ পে॰॰॰॰

।[ঋা মা পা দা । পদা -র্সর্ঋা র্গা র্ঋা । র্সনা -দপা র্সনা দপা । মা -গঋা সা ন্‌সা ।
। { ঋা মা পা দা । সঋা -মপা দা না । র্সনা -দপা মপা দনা । দা -পমা গা ঋসা ।
মধুরকল॰ ॰॰॰ বনে ভ॰ ॰কৃত॰কো॰ বি॰দ্‌গণে॰

ঋমা পা দমা পা । মা গা -মা মা । গা -ঋা গা -ঋা । গমা -গঋা -সন্‌ সা }] ।
গা॰হে ভূ॰॰য় চর॰॰ণ স॰মী॰ পে॰॰॰॰॰॰॰

উক্ত অংশটি প্রথম গুম্ফ "{ }" বন্ধনীদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ সুরে গেয়েই, দ্বিতীয় বার স-সুর "মধুর" শব্দ হতে স-সুর "কোবিদগণে" শব্দ পর্য্যন্ত—প্রমুখ বক্র-ব্র্যাকেটের "[" পরেই যে সুর শীর্ষদেশে আরম্ভ হয়েছে—ঠিক সেই প্রদত্ত সুরেই গেয়ে, তার পর স সুর "গাহে ভূয়" শব্দ হতে সেই মাত্র এক সাবিকার সুরেই পুনরায় গেয়ে "সঞ্চার" নামক কলি শেষ করতে হবে। এই অংশ শেষ করে "ভোগ" নামক অংশটিকে ধর্ত্তে হবে, "স্থায়ী" নামক ১ম অংশে ফিরে যেতে হবে না, যেমন 'অন্তর' নামক অংশ বা কলি শেষ করে "স্থায়ী"তে ফিরে যেতে হয়।

---

* ।=১ মাত্রাকাল বিরাম চিহ্ন।

-।=১ মাত্রাকাল স-সুর উচ্চারণের চিহ্ন। প্রভেদ এইমাত্র যে বিরামের বেলা হাইফেন-বিবর্জ্জিত সুর-বিরহিত মাত্রার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। একমাত্রা কাল পূর্ব্ববর্ত্তী সুরকে আরও টান্‌লে আকার চিহ্নের পূর্ব্বে ছোট কসি বা হাইফেন বসাতে হয়। কৃত্রিক নিস্তব্ধতাও সুরের সৌন্দর্য্যকে বাড়ায়। বোম্বাই নগরীর মস্তবড় "শাস্ত্রীয় গণেশ সঙ্গীত শালা"তে গান্ধার সুর যোগিয়াতে ব্যবহার করা হয় না।

ভোগ।

। [র্মা -পা দা দা। না র্সা না র্সা । র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্গা। র্ঋা -না র্সা র্সা ।

। { সা -না ন্া দ্া। ন্া দ্া প্া প্া । ম্া 'প্া দ্া ন্া। ন্া -া সা সা ।
চ ন্ দ ন ব ন জা ত স মী র ণে চ ঞ্ চ ল

র্সা -র্ঋা র্গা র্মা। র্মা র্মা র্গা র্গা । র্ঋা -না র্সা র্সা। না -র্ঋা র্সা র্সা] ।

সা -না ঋা গা। মা পা পা পা । দা -না দা পা। গা -মা গা মা } ।
কু ন্ দ মা লি কা কু লে অ ং শু ক অ ঞ্ চ ল

। [মা পা দা র্সা। র্ঋা র্সা র্ঋনা র্সা । না দা র্সর্ঋা র্সা। না দা পা পা ।

। { না র্সা র্ঋা র্সা। না দা নদা পা । মা মা নদা পা। মা মা গা মা ।
ত ব বী ণা নি না দ • নে মু খ রি • ত জ ল থ ল

মা -া নদা দা। পা পা দা দা । মপা দা না -র্সা। (না -দপা -মগা -ঋসা)} ।
শ ঙ্ খ • ধ ব লা ত মো বি • না শি • নি • • • • • •

পদা -পসা সন্া সঋা ।। ।।
নি • • • "অ • য়ি •"

এই "অয়ি" স্থায়ী নামক প্রথম কলির "অয়ি"। তাই সেখানে সে "অয়ি" স-স্বর উচ্চারণ না করে এখানকার "অয়ি" স-স্বর উচ্চারণ করেই স্থায়ীতে "মানস সরস" শব্দদ্বয় হতে স-স্বর ধরে···

"গঋা সা"··তে এসে স্থায়ী শেষ করতে হবে, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে গীতটির গাওয়াও শেষ হয়ে যাবে।
সি • নি

যোগিয়ার উত্তরাঙ্গ প্রবল হলেও উদারা সপ্তকেরও কতক স্বর অন্তর্গত করা হল। এই রাগিনীর বা রাগের মাধুর্য্য অবরোহণে বেশী ফোটে।

গীতা

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

মণি, মন্ত্র ও ঔষধাদির ন্যায় গানের শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত। কারণ গান গায়কের আন্তর ভাবের বাহ্য প্রতিমূর্ত্তি। শক্তিশালী গায়কের গানের শক্তি ভুবনমোহিনী। অগ্নিরূপে আকৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় গানের মোহন স্বরে চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম, বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলেই সমভাবে সম্মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—জিঘাংসু ব্যাধের বাঁশীর গানে মুগ্ধ হইয়া হরিণ ও পক্ষী পাশবদ্ধ, বিষবৈদ্যের (সাপুড়িয়ার) ডমরুর গানে সর্পকুল, ও "ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি"র গানে (Lullaby) রোরুদ্যমান শিশুও মৌনাবলম্বন করে।

"গীতেন হরিণা বন্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বলাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি হি॥"

ইহার মূল রহস্য গানই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত। সৃষ্টির আদিম ঊষায়—শ্রীভগবানের আদিম গান বেদ। তাই ঐ বেদের পরিচয়ে দেখিতে পাই "গীতিষু সামাখ্যা," "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" ইত্যাদি। তারপর সৃষ্টির মধ্যাহ্নে বা মধ্যযুগে কালানুবোধে কিংবা যুগপ্রয়োজনে এ সুপ্রাচীন বেদগানের সুলভ ও নবীন সংস্করণ উপনিষদ্ বা বেদান্ত। পরিশেষে দ্বাপরের অন্তে আসন্ন কলির দুর্গত ও দুর্ব্বল জীবের অশেষ কল্যাণসাধনার্থ করুণাময় ভগবান দুগ্ধ হইতে ঘৃতের ন্যায় পূর্ব্বগীত বেদবেদান্তের সার সর্ব্বস্বরূপে তাঁহার প্রিয় লীলাভূমি ভারতে গীতার কীর্ত্তন সুপ্রচার করিয়াছেন। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষীর মহীয়সী উক্তিতে শুনিতে পাই,—"মানুষ যখন গান বা খেলা করে, তখনই আমরা তাহার সবখানা দেখিতে পাই।" এই মতে গীতাতে আমরা শ্রীভগবানের সারতত্ত্ব সম্যক্ উপদিষ্ট দেখিতে পাই। তাহার নিজের উক্তি—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্"। এই উক্তি শাস্ত্রীয় যুক্তিতেও বুঝিতে পারি "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা"। এ বিষয়ে ভারতীয় সাধনার রসগ্রাহিণী স্বর্গীয়া বিদুষী মহিলা এ্যানি বেসান্তের উপলব্ধিমূলক নির্দ্দেশ—"Among the priceless teachings that may be found in the great Hindu poem of the Mahabharata, there is, none so rare and precious as this —"The Lord's Song" Since it fell from the divine lips of Sri Krishna on the field of battle, and still the singing emotions of his disciple and friend, how many troubled hearts has it quieted and strengthened, how many weary souls has it led to Him!"

আলোচিত তত্ত্বটির সার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্নোদ্ধৃত মহাবাক্যটির তাৎপর্য্য বুঝা একান্ত দরকার। গীতার পাঠক্রম প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

অর্থাৎ, সমগ্র উপনিষদ্ একটী কামধেনু, গীতারূপ অমৃত উহার দুগ্ধ, অর্জ্জুন উহার বৎস ও শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা। তাৎপর্য্যে বুঝা যায়, উপনিষদ্ বা বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্মের উদ্‌ঘাটক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কারণ তিনি গোপালনন্দন। গোদোহন

তাঁহার পৈত্রিক কার্য্য ও স্বধর্ম্ম। গো অর্থাৎ বাঙ্ময় বেদের তিনিই রক্ষক ও প্রচারক বলিয়া ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে "গোব্রাহ্মণহিতায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু গাভী দোহনকার্য্য কেবল সুদক্ষ দোহক থাকিলেই সুনিষ্পন্ন হয় না। দোহনের মুখ্য উপায় বৎস। প্রথমে বৎস দুগ্ধ পান না করিলে গাভী দুগ্ধ দেয় না। সুদক্ষ দোহক শত সহস্র প্রযত্নেও দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না। তাই উপনিষদ্ ধেনু দোহন কার্য্যে পার্থ অর্থাৎ অর্জ্জুনের মত ভক্তবৎসের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ফলিতার্থে ভক্তের সাহায্য ও কৃপা-ব্যতিরেকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ—শ্রীভগবানের তত্ত্বের যথাযথ উপলব্ধি হয় না। সিদ্ধান্তটী শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভক্তিসম্পুট "ভক্তিসূত্রে"র ৩৮ সংখ্যক লক্ষণে "মুখ্যতস্তু মহৎ কৃপয়ৈব" বলিয়া বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। দেবর্ষির সাক্ষাৎ বিশ্বাস ভক্তই ভগবৎ লাভের পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। "ভক্তিরত্নাকরে"ও দেখিতে পাই—

ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি বলে সর্ব্বজন।
ভক্ত দিলে মিলে ঐ ভকতি রতন॥"

এই গীতামৃতের সারতত্ত্ব কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-যোগের পথিক হইতে হইলে ঐ পথের মহাজন শ্রীমৎ অর্জ্জুনের প্রতি উপদিষ্ট শ্রীভগবানের অমৃতময় উপদেশগুলি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতে হইবে। তাঁহার আজ্ঞামূলক উপদেশ

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

১৮।৬৭।

এই আজ্ঞাবচনে "অভক্ত" শব্দে নঞর্থে ভক্ত ভিন্ন ও ভক্তবিরোধী দুই শ্রেণীর আসুরীক জীব লক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং গীতা বুঝিতে হইলে ভগবানে ভক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। শ্রদ্ধাহীনের গীতাপাঠ ও শ্রবণ ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। স্বয়ং ভগবানের সতর্ক ইঙ্গিত—

"সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসার মলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥"

এই শ্রদ্ধার মূল ভগবৎ কথায় রতি ও ভজন। মৌখিক শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার বিড়ম্বনা মাত্র। খৃষ্টান ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ—"Faith Cometh by hearing and hearing by the words of God". "Faith without deeds is dead" etc....। গীতার মুখ্য উপদেশ যোগ। যোগ শব্দের মৌলিক অর্থ সংযোগ বা মিলন। অপরার্থ সমাধি, ধ্যান, সঙ্গতি, যুক্তি ও উপায়। এস্থলে শ্রীভগবানের সহিত ভক্ত সাধকের মিলনের সাধারণ ত্রিবিধ উপায় কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানই গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সপ্তশত শ্লোক, এজন্য ইহার নাম সপ্তশতী। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান প্রত্যেক যোগ ছয়টী করিয়া অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার প্রথম ছয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়—ভক্তি ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়—জ্ঞানযোগ। প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে—কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগত্রয়ের এরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিতে পাই, কিন্তু গীতা, যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, তেমনি ইহাতে ঐ গতানুগতিকতার প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রথম কর্ম্ম, মধ্যে ভক্তি ও অন্তে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যাত হওয়ায়, কর্ম্মজ্ঞানক্রোড়ীকৃত ভক্তির মাহাত্ম্যই বিঘোষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্ম বা জ্ঞান যদি ভক্তি বর্জ্জিত হয়, উহা অলবণ ঘৃতাক্ত ব্যঞ্জনতুল্য। মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিতরত্ন নীলকণ্ঠ মোক্ষপর্ব্বের সার সঙ্কলনে বুঝাইয়াছেন,—

"কর্ম্মণা ভগবদ্ভক্তির্ভক্ত্যেশ্বর কৃপা তয়া।
জ্ঞানং তেন বিমুক্তিশ্চ মোক্ষপর্ব্বার্থ সংগ্রহঃ॥"

মূলতঃ সর্ব্ববিরোধের সমন্বয়ভূমি শ্রীভগবান্ মায়া কিঙ্কর ভ্রান্ত জীবের জ্ঞানভক্তির ভেদমূলক অলীক দ্বন্দ্বের নিরাকরণার্থেই যেন গীতায় এই অপূর্ব্ব ভঙ্গীর অবতারণা করিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের তুল্যকক্ষ গ্রন্থ শ্রীমদ্দেবী ভাগবতেও জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাই। "ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্" ফলতঃ জ্ঞান চক্ষু স্থানীয় ও ভক্তি আলোক স্বরূপ। বস্তুস্বরূপ দর্শনে উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন। উপলব্ধি বর্জ্জিত সেবা বা সেবা বর্জ্জিত উপলব্ধি, অন্ধের বস্তু দর্শন কিংবা অন্ধকারে চক্ষুষ্মানের বস্তু দর্শনার্থ পণ্ডশ্রমমাত্র। দার্শনিক শিরোমণি "শব্দ-শক্তি প্রকাশিকা"কার সিদ্ধান্তমুখে বুঝাইয়াছেন,—"গৌরবনৃত্বারাধ্যত্বাবগাহী জ্ঞানপ্রভেদো যেয়ং ভক্তিরিত্যুচ্যতে।" এখন গীতার মূল কথা যোগের প্রসঙ্গ। স্মৃতিকার দক্ষের সম্মত যোগের সাধারণ সংক্ষিপ্ত ও সহজ অর্থটী এই,—

"বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে॥"

অর্থাৎ, নিরাকার মন চিন্তার সহযোগে চিন্তনীয় ঘটপটাদি আকারে অনুক্ষণ আকারিত হইতেছে। বৈরাগ্য ও অভ্যাস বলে উহার এ সকল বৃত্তিজ্ঞান নিরোধ করিয়া জীবাত্মায় পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই মুখ্য যোগ। ইহারই সুবিস্তৃত পদ্ধতির মনোহর ও সুন্দর বিবরণ গ্রন্থই শ্রীগীতা। বারান্তরে এই যোগ সম্বন্ধে যথামতি আলোচনার বাসনা রহিল ইতি।

বার্ত্তাবাহক বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্

এখন বিবেকানন্দের পূর্ব্বোক্ত প্রথম সিদ্ধান্তের পোষকতায় তদীয় "The Freedom of the Soul" শীর্ষক বক্তৃতার কতিপয় ছত্রের অনুবাদ প্রদান করিব। তিনি বলিয়াছেন :—"মুক্তি বা মুক্ত-স্বভাব, সত্তা, এবং জ্ঞান, এই সমস্তই আত্মা হইতে অভিন্ন। সৎ-চিৎ-আনন্দ—অর্থাৎ অনন্ত নির্ব্বিশেষ সত্তা, জ্ঞান, আত্মারই স্বরূপ, আত্মারই স্বভাব, তার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব। এই বিশ্ব-চরাচরে যাহা কিছু প্রকাশমান সমস্তই সেই আত্মা হইতে অভিব্যক্ত;—এমন কি, মৃত্যুও সেই সৎ-স্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তি বিশেষ। * * * বৈদান্তিক নির্ভীকভাবে বলিয়াছেন যে, এ জীবনে যাহা কিছু আনন্দ আমরা উপভোগ করি, এমন কি অতি ঘৃণিত ইন্দ্রিয়জ সুখ পর্য্যন্ত সমস্তই, আত্মার স্বরূপভূত সেই একমাত্র ব্রহ্মানন্দেরই বাহ্য বিকাশ মাত্র।

"এইটি বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান ভাব বলিয়া মনে হয়; এবং আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিবেচনায়, এইটি সমস্ত ধর্ম্মেরই মত। আমি এমন কোনও ধর্ম্মের কথা অবগত নই যাহাতে এই মতটি গৃহীত হয় নাই। এই সার্ব্বভৌমিক ভাবটি সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৃষ্টানগণের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের কথা ধরুন। এই গ্রন্থে আদি মানব আদমকে (Adam) রূপকের ভাষায় পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং পরে আদম্ অন্যায় কর্ম্মের ফলে পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হন। অতএব বাইবেলে বর্ণিত আদমের রূপক হইতে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে উক্ত গ্রন্থের লেখক বিশ্বাস করিতেন যে আদিম মানবের প্রকৃতি পূর্ণ, পাপশূন্য ছিল; এবং আমাদের পাপবোধ ও দুর্ব্বলতা, সেই স্বরূপতঃ শুদ্ধ-পবিত্র মানব-প্রকৃতির উপর আরোপিত বাহ্যাবরণ—উপাধি মাত্র। আর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরবর্ত্তী ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের, তাহার আদিম পবিত্র স্বভাব পুনর্ব্বার লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, শুধু সম্ভাবনা কেন, সে নিশ্চয়ই তার আদিম পবিত্রতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই বাইবেলের প্রাচীন ও নব্যসংহিতার (Old and New Testaments) ইতিহাস। সেইরূপ মুসলমানগণও আদিম-মানব আদমের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, এবং তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, হজরত মহম্মদের প্রদর্শিত পথে মানুষ আবার তার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব পুনরুদ্ধার করিবে। সেইরূপ, বৌদ্ধগণ "নির্ব্বাণে" বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের 'নির্ব্বাণ' এই সুখ-দুঃখ পূর্ণ দ্বৈত জগতের অতীত অবস্থা-বিশেষ। বৌদ্ধগণের এই নির্ব্বাণ এবং বৈদান্তিকের ব্রহ্ম ঠিক একই অবস্থা। মানুষ যে নির্ব্বাণ-রূপ পরমপদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাহা সে পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে,—এই বিশ্বাসের উপরই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক ধর্ম্ম প্রণালীতে এই মতবাদ ও বিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে :—"যাহা আমাদের নাই তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না, এই বিশ্বে আমরা কাহারও নিকট কিছুর জন্য ঋণী নহি, আমরা শুধু আমাদের স্ব-স্ব জন্ম-প্রাপ্ত স্বত্বাধিকার মাত্র দাবি করিতেছি। আমাদের জনৈক বৈদান্তিক দার্শনিক "স্বরাজ্য-সিদ্ধি" নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা নিজের স্বরাজ্যচ্যুত হইয়াছি, আমাদের তাহাই আবার অধিকার করিতে হইবে। মায়াবাদীরা বলেন যে, এই স্বরাজ্য-চ্যুতির ধারণাটা ভ্রমমাত্র, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। অন্যান্য ধর্ম্মমতের সঙ্গে মায়াবাদীর এইমাত্র প্রভেদ।"

৫। বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম-সমন্বয়ের মূল প্রেরণা কি?

যে সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বসমন্বয়কারী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অদৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শ বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন—ইহার জন্য তিনি কাঁহার নিকট এবং কি পরিমাণে ঋণী আর ইহার জন্য তাঁহার নিজেরই বা কৃতিত্ব কি,—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। তাই এই সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান আবশ্যক মনে করি। এবিষয়ে স্বামিজী নিজে কি বলিয়াছেন তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রণিধান যোগ্য। তিনি একখানা পত্রে আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেনঃ—"He (Ramakrishna Paramahansa) was the embodiment of all the past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras"—আর এক পত্রে তিনি লিখেন—"His life was a search light of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought He was the living commentary to the Vedas and to their aim He had lived in one life the whole cycle of the national reli-

gious existence of India"—অর্থাৎ, রামকৃষ্ণদেব ভারতের সমগ্র অতীত আধ্যাত্মিক চিন্তারাশির জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ। শাস্ত্র সমূহের প্রকৃত অর্থ কি, কি প্রণালীতে ও কি উদ্দেশ্যে ইহারা রচিত হইয়াছিল তাই রামকৃষ্ণের জীবনের আলোক-সাহায্যেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহার জীবন এক অনন্ত শক্তিসম্পন্ন জ্যোতির্ম্মণ্ডল স্বরূপ, যাহার প্রখর আলোক-রশ্মি সমগ্র ভারতীয় অধ্যাত্ম তত্ত্ব রাশির উপর পতিত হইয়া তদন্তর্নিহিত রহস্যভেদ করিয়া দিয়াছে। তিনি বেদ ও বেদার্থের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। সমগ্র ভারতের যুগযুগান্তরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবন রামকৃষ্ণের এক জীবনে সংহত হইয়া পুনর্ব্বার সত্যভাবে অভিনীত হইয়াছে।"—শেষোক্ত পত্রে তিনি আরও বলিয়াছেন :—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and perfect, জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত চিকীর্ষা, উদারতার জমাট্। কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়?"

সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয় বিষয়ে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের নিকট কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন তাহা, "Vedanta in its Application to Indian Life" (ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য্যকারিতা) শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন :—

"আমাদের ভাষ্যকারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রুতির ভাষ্য-সকল আলোচনা করিতে গেলে আমরা আর এক বিষম সমস্যার উপনীত হই। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার অদ্বৈত ভাবের শ্রুতি বাক্যের বেশ সরল স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু যখনই দ্বৈতভাবের শ্রুতি-বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন তখন বাক্যটির অর্থ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তাহার ভিতর হইতে নানারূপ অসঙ্গত অদ্ভুত অর্থ বাহির করিয়াছেন। * * * দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও ঐরূপ, এমন কি তদপেক্ষা অধিকতর বিকৃতভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * * * এই সংস্কৃত ভাষা এত জটিল, বৈদিক সংস্কৃত এত প্রাচীন, সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্র এত পরিণত যে, একটি শব্দের অর্থ লইয়া যুগযুগান্তর ব্যাপী তর্ক চলিতে পারে। উপনিষদের অর্থ বুঝিবার পক্ষে এই সকল অন্তরায় রহিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি এমন এক ব্যক্তির সংসর্গে বাস করিয়াছি যিনি একাধারে অকপট দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন,—যিনি যুগপৎ পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানী ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সংসর্গের ফলেই আমার মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হয় যে, ভাষ্যকারগণের মতামত অন্ধভাবে অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে, প্রকৃষ্টতর প্রণালীতে উপনিষদ্ সকলের এবং অপরাপর শাস্ত্র-বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাই এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করিয়াছি তাহার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ঐ সকল শাস্ত্র বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। তাই এ সকলের বিকৃত ব্যাখ্যার কোন আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে, শ্রুতিবাক্যগুলি অতীব মনোহর; ইহাদের ভিতর আশ্চর্য্য জনক সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে, একটি তত্ত্ব অপরটির সোপানমাত্র। একটি কথা আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, সমস্ত উপনিষদেরই আরম্ভ দ্বৈতভাবে ও সগুণ ঈশ্বরোপাসনায়, এবং তাহাদের সমাপ্তি সুমহান্ অদ্বৈত ভাবের কবিত্বময়ী বর্ণনায়। (ক্রমশঃ)

গোমুখী-যাত্রা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যমুনোত্তরী

পরদিন 'হনুমান' চটি হইতে 'খরশালি' পৌঁছিতেই আমাদের অনেক বেলা হইয়া গেল। খরশালির চারি মাইল উপরে যমুনোত্তরী। হনুমান চটী 'খরশালির' সাড়ে আট মাইল নীচে। আমাদের যে তিনজন সঙ্গী 'হনুমান' চটি হইতে তিন মাইল আগাইয়া রাত্রে 'বন্দর' চটীতে ছিলেন তাহারা এতক্ষণে যমুনোত্তরী পৌঁছিয়াছিলেন। কারণ, তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন নাই।

খরশালির পর যমুনোত্তরীর রাস্তায় আর কোন লোকালয় নাই। খরশালিতে যমুনোত্তরী পাণ্ডাদের গ্রামটি বেশ বড়। বাড়ীগুলি সমস্ত আগাগোড়া কাঠের তৈয়ারী। মোটা মোটা দেবদারু কাঠ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কোন কারুকার্য্য আছে বলিয়া মনে হইল না। গ্রামের সম্মুখস্থ যমুনাজীর মন্দিরের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত উচ্চ চূড়া দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। শীতের ছয় মাস এই মন্দিরেই যমুনাজীর সেবা-পূজা হয়, কারণ তখন বিগ্রহ যমুনোত্তরী হইতে এখানে আনিয়া রাখা হয়। যাত্রীদের পথ গ্রামের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া তাহাদিগকে আর খরশালিতে প্রবেশ করিতে হয় না। অধিবাসীদিগকে বড়ই নিরীহ বলিয়া মনে হইল। কৃষিকার্য্যই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। তাহারা তত দরিদ্র না হইলেও বড়ই অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলির আশেপাশে আবর্জ্জনার ও বিষ্ঠার স্তূপ। তাহা হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল, যে নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। প্রকৃতির এই রম্যনিকেতনে মানুষের আবাসগুলি যে এত কদর্য্য হইতে পারে তাহা কখনও ভাবি নাই। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে আজন্ম বাস করিয়াও তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান বিকশিত না হইবার কারণ কি?

মনে হয়, দেশ ও কাল পাত্র বিশেষেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পাত্রের যোগ্যতার অভাবে উত্তম দেশ কালও ফলপ্রসূ হয় না। অধিকারী না হইলে অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যেও কেহ লাভবান্ হইতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে পাত্রই প্রধান। এই কারণে একই রকম শিক্ষা দীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক সত্ত্বেও ব্যক্তির ভিন্নতার জন্য ফল ভিন্ন হয়।

'খরশালির' প্রান্তভাগে যমুনোত্তরীর পথে যমুনাতীরে যাত্রীদের জন্য একটি পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। উহার নাম "জানকীমাইকী ধরমশালা"। সেখান হইতে যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত তিন মাইল বিকট চড়াই। দুরারোহ সঙ্কীর্ণ পথ বড় বড় পাথরের মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। চারিদিকে নিবিড় বন। সৌভাগ্যক্রমে এই বনে হিংস্রজন্তু বড় বিচরণ করে না। ভল্লুক কখন কখন দেখা যায়। কঠিন চড়ায়ের জন্য যাত্রীরা সাধারণতঃ 'খরশালি'তে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে চলিতে আরম্ভ করে। আমরা দুইজন 'হনুমান' চটী হইতে 'খরশালি' পর্য্যন্ত আসিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তথাপি, অপর সঙ্গিগণ চলিয়া যাওয়াতে বিশ্রাম না করিয়াই যমুনোত্তরীর চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন সময়। প্রখর রৌদ্রের তাপ। চড়াই করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে

লাগিল। পিপাসায় বারবার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। এদিকে জঠরাগ্নিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাতে এক কমণ্ডলু জল ছিল। গাছের ছায়ায় পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া সেই জল পান করিতে লাগিলাম এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলাম, চড়াই আর শেষ হয় না। অবশেষে পাহাড়ের মাথায় কাল পাথরের একটী ছোট মন্দির দূর হইতে দেখিতে পাইয়া মনে হইল এই বুঝি যমুনোত্তরী। আগ্রহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, লোকজন কেহ নাই। মন্দির মধ্যে কাল ভৈরবের মূর্ত্তি বিদ্যমান। এককোণে কেবল একজন পুরোহিত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। যাত্রিগণ কেহ কিছু দিলে তিনি গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাল্য ও সিন্দূর দিয়া থাকেন। আমরা সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়, আমাদের উপর তাঁহার নজর পড়িল না। "হ্যঁহাসে যমুনোত্তরী আউর কিত্‌নী দূর হ্যায়?" আমরা জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত বলিল, "করীব আধা মীল নীচে, জারা আগেসে মোড় কর সাম্‌নে দিখ্‌ পড়েগা।" এর পর আর চড়াই করিতে হইবে না জানিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। একটু উৎরাইর পর মোড় ফিরিতেই দূর হইতে অভীষ্ট স্থানের দর্শন পাইলাম। মন আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

যমুনোত্তরীতে পৌছিয়াই যমুনা দর্শন করিয়া পুনরায় সেই স্তব মনে পড়িল, —

"জয় যমুনে, জয় ভীতিনিবারিণি
সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্‌।"

দেখিলাম কৃষ্ণ-কায়া-কালিন্দী কালভুজঙ্গিনীর মত পর্ব্বতপৃষ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। যমুনোত্তরী যমুনার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, একটী অতি নিভৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। ইহার চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান। পর্ব্বতগাত্রে সুবিশাল অসংখ্য বৃক্ষ। অধিকাংশই বাজ্‌ গাছ। স্থানটীর পূর্ব্বপ্রান্ত পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন, ইহার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্‌ বেষ্টন করিয়া যমুনা মাতঙ্গ বিক্রমে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহিয়া যাইতেছে। ইহার পশ্চিম দিক্‌ ক্রমনিম্ন এবং দক্ষিণ দিক্‌ হস্তি শুণ্ডের মত ক্রমশঃ সরু। স্থানটী দেখিতে শঙ্খ পৃষ্ঠের ন্যায়। কালিন্দীর গম্ভীর নিনাদ তথায় নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ। তাহা হইতে নিরবচ্ছিন্ন অত্যুষ্ণ জলধারা দিবারাত্র উৎসারিত হইতেছে। প্রত্যেকটী উষ্ণ প্রস্রবণ কোন না কোন প্রাচীন ঋষির নামে অভিহিত। প্রস্রবণ সমূহের জল কয়েকটী কুণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে। কতক জল যমুনায় যাইয়াও পড়িতেছে। সর্ব্বপ্রথম কুণ্ডটীতে ফুটন্ত জল। উহার তাপমান দিবারাত্র সমান। সেই জলে আলু ফেলিয়া দিলে কতক্ষণ পরে সিদ্ধ হইয়া ভাসিয়া উঠে। যাত্রীরা কেহ কেহ চাল ডাল একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া ঐ কুণ্ডে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া আহার করে। নীচের দুইটী কুণ্ড বেশ বড়। উহাদের জল তত উষ্ণ নয়। যাত্রিগণ তথায় অবগাহন করিয়া থাকে। ঐ তপ্ত কুণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বেই যমুনার তুষার-নিঃসৃত সুশীতল জল প্রবাহ। যমুনোত্তরীর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৯৯০০ ফুট। তুষার শৃঙ্গের সন্নিকট হইলেও উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য তথায় শৈত্য অপেক্ষাকৃত কম অনুভব হয়। এই হেতু স্থানটি বাসের কিছু উপযোগী এবং নিভৃত বলিয়া তপস্যার অনুকূল। (ক্রমশঃ)

—সৎপ্রকাশানন্দ

খৃষ্টভক্ত সাধু ফ্রান্সিস্

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

এই পৃথিবীতে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি বহুজনের হিত ও সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই অমানুষিক দুঃখকষ্ট, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যকে বরণ করিতে হইয়াছে। কারণ দুঃখ, নির্য্যাতন ও দরিদ্রতার মধ্য দিয়াই মানুষের দিব্য ও অতিলৌকিক ভাবের বিকাশ হয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি, অহংশূন্যতা ও নিঃস্বার্থপরতা সকল ধর্ম্মের আদর্শ—আর প্রভু যীশুও এই আদর্শের কথাই প্রচার করিয়াছেন। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভো অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" তদুত্তরে যীশু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এখনও একটি অভাব আছে। বাড়ী যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর—তাহা হইলেই স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ সঞ্চয় করিবে। তারপর আসিয়া ক্রুশ্ গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ কর। যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন হারাইবে, সে উহা পাইবে।" অন্যত্র আবার যীশু বলিয়াছেন, "ধর্ম্মের জন্য যাহারা নিগৃহীত হয় তাহারা ধন্য। কারণ তাহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। যাহারা আমার জন্য সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদ ও দুঃখ সহ্য করিবে তাহারা ধন্য এই জন্য অতিশয় আনন্দ প্রকাশ কর, কারণ ভগবান্ এইজন্য তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন।" খৃষ্টের জন্য যে সকল মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ও অন্তরে স্বর্গরাজ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সাধু ফ্রান্সিস্ (St Francis of Assisi) অন্যতম। তিনি খৃষ্টের আদর্শের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন।

বহুপূর্ব্বে ইটালীর অন্তর্গত এসিসি সহরে পিটার বার্ণাডন্ নামে এক বণিক বাস করিতেন। বাণিজ্যব্যপদেশে তিনি সমগ্র ইটালী এমন কি সুদূর ফ্রান্সেও যাতায়াত করিতেন। ফরাসীদেশ ভ্রমণই তাঁহার নিকট বিশেষরূপে আনন্দদায়ক ছিল। তিনি ফরাসী ভাষা বলিতে পারিতেন এবং ফরাসীজাতির রীতিনীতি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একবার তিনি বাণিজ্য হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য ও বুকভরা আনন্দসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমজাত শিশুপুত্রের মুখ সন্দর্শন করিবামাত্রই শিশুর নাম রাখিলেন ফ্রান্সিস্ অর্থাৎ শিশু ফরাসী (Francis the little Frechman)। শিশুর মাতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্রের নাম রাখা হয় জন, কিন্তু পিতার ইচ্ছাই বলবতী হইল। এই নামকরণে পিটার বার্ণাডনের ফরাসী প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস তাঁহার ধনী পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন, কাজেই আশৈশব পিতার নিকট যাহা আব্দার করিতেন উহাই পাইতেন। বালক ফ্রান্সিস যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া অধিকাংশ সময়ই এসিসির সম্ভ্রান্ত তরুণদিগের সহিত বিলাস-ব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে কাটাইতেন। পুত্র ধনী যুবকদের সাহচর্য্যে থাকেন—ইহাতে পিতা বার্ণাড্ন অতিশয় গৌরব অনুভব করিতেন।

হঠাৎ বাইশ বৎসর বয়সের সময় ফ্রান্সিসের

জীবনে এক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি এক রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন পর আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু রোগ শান্তির পর জীবন তাঁহার নিকট নিরানন্দ ও বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে কি চান কিছুই বুঝিতে পারিতেন না; পুরাতন বন্ধুগণের সহিত যে সকল আমোদ-প্রমোদে আনন্দ অনুভব করিতেন সেই সকল তাঁহার নিকট তিক্ত ও বিরক্তিকর প্রতীয়মান হইত। ঈদৃশ মানসিক অবস্থায় কতিপয় পুরাতন বন্ধুর সহিত তিনি অশ্বারোহণে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু সৈন্যদলের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সঙ্গী-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর একদিন এসিসির এক ক্ষুদ্র অৰ্দ্ধ ভগ্ন গির্জ্জায় উপাসনা করিবার সময় ফ্রান্সিস্ এক বাণী শ্রবণ করিলেন। "ফ্রান্সিস্, আমার গির্জ্জা নির্ম্মাণ কর।" তিনি তখন গির্জ্জায় একাকী ছিলেন; ক্ষুদ্র ভগ্ন গির্জ্জাটি সংস্কার করিবার জন্য ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী শ্রবণ করিলেন বলিয়াই ফ্রান্সিসের প্রতীতি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং গির্জ্জার পুরোহিতকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত অর্থ অর্পণ করিলেন। তৎপর তাড়া-তাড়ি গৃহে ফিরিয়া পিতার বহুমূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা একটি অশ্ব সজ্জিত করিয়া পিতার অনুমতি ব্যতীতই বাজারে গমন করিলেন এবং তথায় যথোচিত উচ্চ মূল্যে অশ্ব ও দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও তৎসঙ্গে আমাকে গ্রহণ কর এবং তোমার গির্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ কর।"

পুরোহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এ কি? আমাকে যাহা দিতেছ এগুলি কি তোমার?"

ফ্রান্সিস্ পূর্ব্বে ইহা চিন্তা করেন নাই। তিনি সমস্ত জীবন নিরঙ্কুশভাবে আহার বিহার করিয়াছেন, কাজেই পুরোহিতের বাক্যে তাঁহার একটুকু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পুরো-হিতের প্রত্যর্পিত অর্থ কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিরাশ ও শঙ্কিতচিত্তে চলিয়া গেলেন। সম্প্রতি পিতা বার্ণাডন ফ্রান্সিসের চরিত্রে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিরক্ত ও হতবুদ্ধি হইয়াছেন; কাজেই এই ব্যাপারে পিতা কি বলিবেন ইহা চিন্তা করিয়া ফ্রান্সিস্ কিয়ৎ পরিমাণে বিব্রত হইলেন। কিছুকাল পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতাকে অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত দেখিয়া ফ্রান্সিস্ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পিতা বার্ণাডনের একান্ত সাধ ছিল যে পুত্র ফ্রান্সিস্ অদূর ভবিষ্যতে বাণিজ্য নিপুণ হইয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা চিরতরে বিনষ্ট হইল। পুত্রকে দেখিয়াই পিতা কঠোর তিরস্কার ও প্রহার করিয়া এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রাভিভূত তখন স্নেহশীলা জননী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে আসিয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্নেহাতিশয্যবশতঃ পুত্রবৎসলা জননী ফ্রান্সিস্কে কারাগার হইতে বাহির করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পিতার কঠোর শাসনের ভয়ে জননী পুত্রকে নিজের আশ্রয়ে রাখিতে সাহস করিলেন না।

অতিশয় বিমর্ষচিত্তে ফ্রান্সিস্ সেই ক্ষুদ্র ভগ্ন গির্জ্জায় পুরোহিতের নিকট ফিরিয়া গেলেন। সেখানে ক্রোধোদ্দীপ্ত পিতা বার্ণাডনও অপহৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য দাবী করিবার নিমিত্ত পুত্রের অনুসরণ করিলেন। দ্রব্যের মূল্য চাহিয়াই পিতা নিরস্ত হইলেন না; অধিকন্তু পুত্র ফ্রান্সিস্ যাহাতে এসিসি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং তাঁহার সুনামে আর কলঙ্ক লেপন না করে তজ্জন্য পিতা নিরতিশয় জেদ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস্ ইহা করিতে স্বীকৃত হইলেন

না, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে তথায় ভগবান্ তাঁহার জন্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এসিসির বিশপের (প্রধান পুরোহিত) উপর ফ্রান্সিসের বিচারের ভার অর্পিত হইল। বিচার শুনিবার নিমিত্ত সহরের সমস্ত লোক সমবেত হইল। বিচারক ক্রোধোদ্দীপ্ত পিতার নিকট পুত্রের যাবতীয় অপরাধ-কাহিনী শ্রবণ করিলেন এবং তৎপর ফ্রান্সিস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"তোমার পিতার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছ তৎসমস্তই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর। অসৎভাবে অর্জ্জিত কিছুই ভগবান্ গ্রহণ করিবেন না। যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার স্বকীয় নয়, উহা তুমি ভগবান্‌কে কখনও অর্পণ করিতে পার না।"

তৎপর ফ্রান্সিস্ জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কেবল পিতৃ-ধন নয়, যাহা কিছু তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি, এমন কি পরিধানের বস্ত্রও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি পিতার চরণে টাকার থলিটি নিক্ষেপ করিলেন এবং পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আপনারা সকলেই সাক্ষী থাকুন, এই ব্যক্তিকে আজ পর্য্যন্ত আমি পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি; কিন্তু এখন হইতে ভগবানের দাস ও সেবক ব্যতীত অন্য কিছু হইবার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি না। তাঁহার নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি, এমন কি পরিহিত বস্ত্রও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। অতঃপর কোনও ব্যক্তিকে আমি পিতা বলিয়া ডাকিব না। আমি কেবল স্বর্গস্থ পিতাকেই পিতা বলিয়া ডাকিব।"

বিশপ ফ্রান্সিসের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় বহির্ব্বাস দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পরিধানের নিমিত্ত অন্তর্ব্বাস (tunic) প্রদান করিলেন। ফ্রান্সিস্ উহা সন্ন্যাসিজনের পরিচ্ছদ জ্ঞানে সানন্দে পরিধান করিলেন।

ফ্রান্সিসের এক্ষণে গৃহ পরিজন কিছুই রহিল না। ভগবান্‌কে সেবা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যাকুল হইয়া তিনি একাকী সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এত নির্য্যাতন ও দারিদ্র্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাঁহার হৃদয় সরস ও আনন্দে ভরপুর ছিল। গান করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। নগরের বহির্ভাগে এক কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ে তিনি প্রথম উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে যখন তাঁহার সহায় সম্পদ প্রচুর ছিল তখন তিনি কুষ্ঠীদিগের নিকট অবহেলাক্রমে মুদ্রা ফেলিয়া দিতেন। কিন্তু এক্ষণে নিঃস্ব হইয়া পড়ায় আত্মবলিদান করা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই দিবার রহিল না। অতএব তিনি সেই নিরানন্দ চিকিৎসালয়ে কিছুকাল অবস্থান করিয়া হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

তৎপর তিনি ক্ষুদ্র ভগ্ন গির্জ্জাটি সংস্কার করিবার নিমিত্ত এসিসিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই নির্ম্মাণকার্য্যে তিনি শ্রমজীবিগণের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া পরম ধৈর্য্যের সহিত নিজ হস্তে প্রস্তরখণ্ড সমূহ বহন করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য করিতে করিতে তিনি প্রভুর নামকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিতেন। নাগরিকগণের নিকট হইতে প্রস্তরখণ্ড সকল ভিক্ষা করিয়া আনিতে তিনি বিন্দুমাত্রও লজ্জা অনুভব করিতেন না। যাঁহারা দয়া করিয়া প্রস্তর প্রদান করিতেন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেও তিনি বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহুলোক তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতে লাগিল। কালক্রমে ক্ষুদ্র গির্জ্জাটি পুনঃ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরোপাসনার উপযোগী স্থান হইল।

একদিন পুরোহিত যীশুর সুসমাচার (Gospel)

পাঠ করিতেছিলেন—উহা শ্রবণ করিতে করিতে ফ্রান্সিস্ স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক প্রেরণা লাভ করিলেন। পুরোহিতের মুখে এই সুসমাচার শ্রবণ করিয়াছিলেন: "স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, ভ্রমণের পাথেয়, পরিচ্ছদ, জুতা অথবা যষ্টি কিছুই সংগ্রহ করিও না। যাইতে যাইতে প্রচার করিয়া যাও, 'স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী'।" ইহা শুনিয়া ফ্রান্সিস্ বলিলেন, "আমি যাহা খুঁজিয়াছি এখানে উহাই পাইয়াছি।" তিনি রজ্জু দ্বারা তাঁহার অন্তর্ব্বাস (tunic) সংবদ্ধ করিয়া নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তাঁহার বাণী ছিল অগ্নিময়ী। দলে দলে লোক আসিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বার্নার্ড, পিটার, ও গাইলস্ নামে তিন ব্যক্তি অনতিবিলম্বে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং প্রত্যহই তাঁহার সহকর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফ্রান্সিসের আদেশে দুইজন করিয়া প্রচারক গ্রামদেশে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মাঠে কৃষক ও শ্রমজীবী-দিগের কার্য্যে সহায়তা করিতেন কিন্তু তজ্জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। পারিশ্রমিক স্বরূপ কেবল খাদ্য সানন্দে গ্রহণ করিতেন। অতি সামান্য আহারেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত থাকিতেন। মাঠের কাজ সমাপন করিয়া তাঁহারা মানবের প্রতি ভগবানের প্রেম সম্বন্ধে সুন্দর কাহিনী সমূহ বিবৃত করিতেন।

ফ্রান্সিসের শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিজের সুখভোগের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের প্রতি প্রথম আদেশ ছিল, "তোমার যাহা কিছু আছে বিক্রয় করিয়া দরিদ্রগণকে বিতরণ কর।" দরিদ্রতাকে বরণ করিয়াও তাঁহারা নিজদিগকে এতদূর সুখী মনে করিতেন যে পথ চলিতে চলিতেও তাঁহারা মনের আনন্দে গান গাহিতেন। তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হইত যে তাঁহারা কাঞ্চনাসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যীশুকেই তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশু দরিদ্রতাকে বরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন উৎসর্গ করিলেন। "পক্ষী ও দরবেশ কিছুই সঞ্চয় করে না"—এই কথা এতদ্দেশেও প্রচলিত আছে। যীশু বলিয়াছিলেন, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves donot break through nor steal for where your treasure is, there will your heart be also No man can serve two masters for either he will hate the one, and love the other, or else he will hold to the one, and despise the other Ye cannot serve God and mammon at the same time Therefore I say unto you Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly father feedeth them Are ye not much better than they? But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you" (St Matthew, 6) "অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করিও না কারণ উহা ঘুণ ও মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তস্কর চুরি করিয়া নেয়। স্বর্গীয় সম্পত্তি সঞ্চয় কর, উহা কখনও

ঘৃণ ও মবিচায় নষ্ট করে না এবং তস্কব অপহরণ করে না। কারণ যেখানে তোমাব বিষয় সম্পত্তি থাকে সেখানেই তোমাব মনটি আসক্ত থাকিবে। কেহই দুই প্রভুব সেবা কবিতে পাবে না; কারণ হয় তাহাব একজনকে ঘৃণা কবিয়া অপবকে ভালবাসিতে হইবে, নয় তাহাব একজকে ভাল বাসিয়া অপবকে অবহেলা কবিতে হইবে। তুমি ঈশ্বব ও কাঞ্চনদেবতা দুইজনকে একসঙ্গে সেবা কবিতে পাব না। অতএব আমি তোমাকে বলি, তোমাব জীবনেব জন্য—কি খাইবে, কি পান কবিবে, কি পবিধান কবিবে এই সকলেব জন্য ভাবিও না। খাওয়া পবা অপেক্ষা কি তোমাব জীবনেব মূল্য অধিকতব নয়? আকাশে যে সকল পক্ষী উড়িয়া বেড়ায়, উহাদেব প্রতি লক্ষ্য কব। উহারা বীজবপন কবে না, শস্য কর্তন কবে না অথবা শস্য গোলায় সঞ্চিত কবে না। তথাপি ঈশ্বব উহাদিগকে খাওয়াইয়া থাকেন। তোমবা কি এই সকল খেচব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব নও? প্রথমে স্বর্গবাজ্য ও ধর্মেব অনুসন্ধান কব; এই সকল জিনিষ পবে সবই তোমার আয়ত্বাধীন হইবে"। ফ্রান্সিস্ ও তদীয় শিষ্যগণ ব্রতী হইলেন।

ফ্রান্সিস্ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে সাধুতাই প্রকৃত সুখেব মূল। আব দবিদ্রেব পক্ষে সাধু ও সুখী হওয়া সহজসাধ্য। তাঁহাব সৎকার্য্য, উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদান প্রণালী সম্বন্ধে অনেক মনোবম উপাখ্যান আছে। তিনি যে কেবল নবনারী, বালক-বালিকাদিগকেই ভালবাসিতেন এমন নয়, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই ভালবাসিতেন। তাঁহাব ভালবাসা মূক জন্তুদিগের উপর এরূপ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তিনি এক সময়ে এক হিংস্র নেকড়ে বাঘকেও পুষিয়াছিলেন। এই দুর্দ্দান্ত জন্তুটি গ্রামবাসিগণের উপর বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিল।

তিনি পক্ষিগণকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন। উহাদিগকে তিনি "ক্ষুদ্র ভগিনী" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তিনি এক গণ্ডগ্রামে আসিয়া দেখিলেন তথায় বহুসংখ্যক বাবুই পক্ষীব বাস। সমবেত জনতাব নিকট ধর্ম্মকথা বলিবাব নিমিত্ত যখন তিনি কয়েকটি বৃক্ষেব নীচে দণ্ডায়মান হইলেন অমনি পক্ষিকুল এত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল যে তাঁহাব কথা বিন্দুমাত্রও শ্রুত হইল না। তিনি বক্তৃতা বন্ধ কবিয়া বৃক্ষস্থিত পক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। পক্ষীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ক্ষুদ্র ভগিনীগণ, এক্ষণে আমার কথা বলিবার সময়। চুপ কব, আমাব বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও শব্দ কবিও না।" আশ্চর্য্যেব বিষয়, ফ্রান্সিস্ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জনতাব নিকট ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন ততক্ষণ পক্ষিগণ কোনও শব্দ কবে নাই। বক্তৃতান্তে ফ্রান্সিস্ জনতাব ন্যায় পক্ষীদিগকেও আশীর্ব্বাদ কবিলেন, এবং তৎপব পক্ষিগণ দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া গেল। উহাদেব আচবণ দেখিয়া মনে হইল যেন উহারা বক্তৃতা ও আশীর্ব্বচনেব মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অপর এক দিবস বহুসংখ্যক পক্ষী এক ঝোপেব ভিতর দেখিয়া তাঁহাব অনুগামীদিগকে বলিলেন, "আমাব জন্য এখানে অপেক্ষা কর; আমি আমাব ক্ষুদ্র ভগিনীগণেব নিকট ধর্ম্ম প্রচার কবিব"। ফ্রান্সিসকে অভিনন্দিত কবিবাব জন্যই যেন পক্ষিগণ উড়িয়া আসিল। ফ্রান্সিস্ পক্ষিদিগের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষুদ্র ভগিনী পক্ষিগণ, তোমাদেব সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে ভালবাস ও প্রশংসা কর। তোমাদিগের প্রাণধারণের জন্য তিনি বায়ু, আহার্য্য ও জল দিয়াছেন, বাসা নির্ম্মাণের জন্য বৃক্ষ সৃষ্টি কবিয়াছেন এবং পালক দ্বাবা তোমাদিগের শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছেন। যিনি তোমাদিগকে এরূপ

ভালবাসেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন সেই পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন কর।"

তৎপর পক্ষিসকল গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া চক্ষু খুলিয়া এবং পক্ষ বিস্তার করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্যই যেন ফ্রান্সিসের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত; আর ফ্রান্সিস্ উহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেন এবং তাঁহার অন্তর্ব্বাসের অঞ্চল মৃদুভাবে পক্ষিগণের পালকসকল স্পর্শ করিয়া যাইত।

সাধু ফ্রান্সিস্ বলিতেন, "তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ পক্ষিগণের ন্যায়—পক্ষিগণের জগতে কোনকিছুর অধিকার নাই, কিন্তু তথাপি উহারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও নিরন্তর তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। ফ্রান্সিস্ বক্তৃতার পর সর্ব্বদাই গান গাহিতেন এবং পক্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "এক্ষণে তোমাদিগকে ধর্ম্মকথা ও গানের মূল্য দিতে হইবে, কিন্তু মূল্যস্বরূপ অর্থ দিতে পারিবে না। তোমাদের নিকট যাহা উপদেশ করিলাম তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করিতে সচেষ্ট হইলেই আমাদের পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইল বলিয়া বিবেচনা করিব"।

সাধু ফ্রান্সিস স্বয়ং ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত কখনও ইংলণ্ডে গমন করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার নয়জন অনুচরকে পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ইঁহারা (Friars) ফ্রায়ারস্ নামে অভিহিত হইতেন। ইটালীতে তাঁহারা "ক্ষুদ্র ভ্রাতা" (Lesser Brothers) বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কারণ সাধু ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "তোমরা যেখানেই ধর্ম্মপ্রচার কর, সর্ব্বত্রই নিম্নতম আসন গ্রহণ করিবে।" এই ফ্রায়ারগণ প্রথমে ইংলণ্ডের ডোবরে এবং তথা হইতে কেণ্টারবারী, লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে গমন করেন। তাঁহারা প্রথমে কেম্ব্রিজে একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র নগ্নপদে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান উপদেশ ছিল "Thrice blessed is Saint Poverty" অর্থাৎ দরিদ্রতা তিনবার জয়যুক্ত হউক।

ফ্রান্সিসের স্মৃতিরক্ষার্থ এসিসিতে যে বৃহৎ গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে সেই গির্জ্জার প্রাচীরে আজিও তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। এক চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে ফ্রান্সিস্ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিচ্ছদ জনতার সম্মুখে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন; আর এক চিত্রে, মুসলমানগণ সঙ্গে গমন করিলে ফ্রান্সিস্ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া হাটিয়া যাইবেন বলিয়া সুলতানকে আশ্বাস দিতেছেন; মুসলমানগণ ভয়ে নিরস্ত হইতেছে, কিন্তু ফ্রান্সিস্ তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে যেকোন অসমসাহসিক কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অন্য এক চিত্রে, ছয়পক্ষযুক্ত পরী ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টকে পক্ষে বহন করিয়া আনিতেছেন—এই স্বপ্ন ফ্রান্সিস্ পর্ব্বতপার্শ্বে দেখিতেছেন। ফ্রান্সিস্ পক্ষীদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া হস্তদ্বারা পক্ষিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর পক্ষিগণ তাঁহার আনন্দবার্ত্তা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক উড়িয়া যাইতে উদ্যত এই চিত্রপটখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খৃষ্টভক্ত সাধু ফ্রান্সিস্ জীবনের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও তিতিক্ষা, জলন্ত বিশ্বাস, সর্ব্বভূতে প্রেম, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও দারিদ্র্য দুঃখ বরণ চিরদিন সাধকদিগকে সাধনপথে প্রেরণা দিবে।

কালনৃত্য

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

স্বজনের বুকে নাচে মহাকাল
ভীম তাণ্ডবে মরণ-নাথ
বিজয়োল্লাসে কাঁপায়ে ভুবন
বিষাণে ফুকারি ভীষণ নাদ।
গরজি উঠিছে সপ্ত-সাগর
হরিতে নিখিল জীবের আয়ু
গগনে গগনে উল্কা ছুটিছে
শন্ শন্ বহে প্রলয় বায়ু।
ধূ ধূ চিতানলে গভীর মন্দ্রে
উঠিছে ভয়াল মরণ গান
বিশ্ব-চিত্ত কম্পিত শুনি
বিষাণে পিনাকী ধরিছে তান।
বৃষ গরজয় জাগে মহাভয়
লম্বিত গলে ভুজগ কুল
নাচে শঙ্কর কাঁপে চরাচর
ঊর্দ্ধে ঘুরিছে ধ্বংস শূল;
আপনা ভুলিয়া ত্রিলোক দলিয়া
শ্মশান বিহারী ভয়াল রোষে
বিশ্বজীবের জীবন হরিয়া
মরণ-মহিমা ভুবনে ঘোষে।
নর কঙ্কাল গড়াগড়ি যায়
বিকট অট্ট পিশাচ হাসে
শকুনী গৃধিনী শিবাদল ডাকে
শঙ্কিত লোক কাঁপিছে ত্রাসে,
শবের গন্ধে মহা আনন্দ
জাগায় ক্ষিপ্ত কালের চিতে
সংহার শুধু সংহার বাণী
গরজে রুদ্র কঠোর গীতে।
নর করোটিতে অমৃত ঢালি
সুরাপান করে মরণ-জয়ী
প্রণব মন্ত্রে প্রাণায়াম করে
নিঃশ্বাসে বহে মন্ত্রত্রয়ী;
তাথৈ তাথৈ মহাকাল নাচে
অজিন বসন লুটায় ভূমে
ভ্রুকুটী-ভঙ্গে ভীষণ রঙ্গে
প্রলয় অগ্নি গগন চুমে।

এ মহা অনল জ্বলে হুহু করি
অনাদি স্বজন শাবার সাথে
জনমের ঊষা ধীরে ধীরে আসি
মিশিছে গভীর মরণ রাতে।
জড় জঞ্জাল গ্রাস করে কাল
চিতার অনলে শ্মশান 'পরি
ওরে ভীরু তুই কোথায় লুকাবি—
ভঙ্গুর দেহে জীবন ধরি।
কালের ক্রুদ্ধ চরণ-ক্ষেপণে
দলিত মথিত অযুত শব
পশ্চাতে যারা পড়ে আছে তারা
হাহাকারে করে আর্ত্তরব।
বন্ধন হারা জীবনের ধারা
চলেছে গভীর গহন তলে
দেহীর প্রয়াণে দহন লাগে যে
মানব-হৃদয় কমল দলে;
শোন্ শোন্ ওরে অন্ধ মানব—
মৃত্যু বিষাণ বাজায় কাল
সময় থাকিতে আঁধার পরাণে
দিব্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল।
বাসনা কামনা জয় পরাজয়
মিছে অহমিকা রবে না আর
মরণ-রাগিনী পশিলে মরমে
ছুটিবে নয়নে সলিল ধার,
বহিয়া যে ছায়া চলে জীবকায়া
কালের চরণে সমাধি শেষ
জীবন নদীর কল্লোল গীতি—
মরণ-সাগরে রবে না লেশ;
প্রলয়ঙ্কর! ওগো শঙ্কর!
মরণ-দেবতা রুদ্র-রাজ!
যুগ যুগ ধরে ধরণীর পরে
স্বজনের শিরে হানিছ বাজ।
উন্মাদ ভোলা একি তব লীলা?
এই কি তোমার সত্যরূপ?
মরণ যজ্ঞে আহুতি দিতেছে
'বিশ্ব জীবের জীবন ধূপ!

ইঙ্গিত

ইঙ্গিত!—ইঙ্গিত!!—ইঙ্গিত!!!

শুধু ইঙ্গিত।

আকাশে ইঙ্গিত, বাতাসে ইঙ্গিত; জলে ইঙ্গিত, স্থলে ইঙ্গিত। লতায় পাতায় ইঙ্গিত, ফলে ফুলে ইঙ্গিত। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা একটা ইঙ্গিত সৃষ্টি-মুহূর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গেই চলে আস্‌চে, অথবা ইঙ্গিতের সহজ স্ফূর্ত্তির জন্যই সৃষ্টির পরিকল্পনা!

ইঙ্গিত চিরদিনই অস্পষ্ট, তাই তার নাম ইঙ্গিত। ইঙ্গিত ব্যক্ত হলেও অব্যক্ত। ব্যক্ত-অনুভূতির নিকট, সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট; আর অব্যক্ত —চর্ম্ম-চক্ষের নিকট স্থূল বুদ্ধির নিকট, মলিন স্পর্শের নিকট। দিবারাত্রির কলরোলের মধ্যে ইঙ্গিতের রোল নাই;—নীরব তার ভাষা, ছন্দ তার সূক্ষ্ম, গতি তার মন্থর।

অন্তর্মুখী যে মন, আত্মস্থ যে প্রাণ, দরদী যে অন্তঃকরণ,—তার নিকট একটা গোপন বার্ত্তা পৌঁছিয়ে দিতে চায়—এই ইঙ্গিত। এ কাজ তার আজকার নয়, সাময়িক নয়;—নিত্যকালের জন্য আর নিরন্তর।

কিন্তু এই ইঙ্গিত কার, আর কি সে বার্ত্তা?

* * *

চাহ ঊর্দ্ধে অগণিত-তারকা-খচিত চন্দ্র কিরণো-দ্ভাসিত নীলাকাশের দিকে। চাহ—অরুণাভায় রঞ্জিত প্রাচীর ভালে স্থাপিত জ্যোতির্গোলকের দিকে। চাহ—দিক্ চক্রবালে বিলীয়মান্ সান্ধ্য সূর্য্যের দিকে; আর চাহ, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তিটীর দিকে। কি ইঙ্গিত করে এই চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্র নিকর?—কাহার বার্ত্তা বহন করে এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী? ইহারা কি একটা অনন্ত জ্যোতিঃ-সমুদ্রের ইঙ্গিত করে না,—ইহারা কি এক পরম জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষের বার্ত্তা বহন করে না?

এই চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলী এবং যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরাণ পুরুষের অনন্ত কোটী জ্যোতিঃ রেখার কোটী অংশের একাংশে সমুদ্ভাসিত। ইহারা নিরন্তর ঘোষণা কর্‌চে—ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, তিনি অতুল্য জ্যোতির্ম্ময়।

তিনি যে অসীম—অনন্ত দিগন্তবিসারী আকাশ তার ইঙ্গিত কর্‌চে। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ ইঙ্গিত কর্‌চে—তিনি বিরাট হতেও বিরাট, মহৎ হইতেও মহান্; আর ক্ষুদ্র বালুকণা ইঙ্গিত কর্‌চে—তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অণু হতেও অণীয়ান্।

* * *

জগতের আদি কারণ যিনি—সেই সনাতন পরম পুরুষ, তিনি মহিমাময়। মহিমার তাঁর অন্ত নাই। বিচিত্র তাঁর ভাব, বিচিত্র তাঁর ভাষা। বৈচিত্র্যপূর্ণ তাই তাঁর সৃষ্টি। রূপ রস গন্ধ শব্দ আর স্পর্শ—যাহা লইয়া সৃষ্টি, তাদের ভিতর দিয়া অনন্তভাবময় বিশ্বদেবতা অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ কর্‌চেন। অনন্ত মহিমা—অনন্ত ভাব, অনন্ত ভঙ্গীতে প্রকট। যুগে যুগে—পলে পলে সৃষ্টির প্রতি স্তরে, প্রতি অংশে, বিন্দুতে বিন্দুতে, অণুতে পরমাণুতে এই প্রকাশ-লীলা চল্‌চে অনন্ত বিচিত্ররূপে।

* * *

ফুলের ভিতর দিয়া, যে সুষমা ফুটে উঠ্‌চে, সে সুষমা তাঁরই;—যে সুরভি বিকীর্ণ হচ্ছে, সেও

তাঁরই। সে সুষমা, সে সুরভি আবার কত বিচিত্র। একই ভাবের কত বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গী!

ফুল সুন্দর, ইন্দ্রধনু সুন্দর, রজত নীহার বিন্দু সুন্দর, আর সুন্দর—প্রভাত-কিরণোজ্জ্বল শ্যাম শস্যাচ্ছাদিত তরুবীথিশোভিত মুক্ত প্রান্তর। চন্দ্র তারকা সুন্দর আর সুন্দর তরুণ তপন। শিশুর সহাস্য সরল মুখকান্তি সুন্দর; আর সুন্দর—রমণীর পূর্ণ যৌবনদৃপ্ত সতীত্ব গর্ব্বোজ্জ্বল মাতৃত্বমহিমামণ্ডিত লাবণ্য। কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য—যার মধ্য দিয়া চিরসুন্দরের আত্মপ্রকাশ, ইহা কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ—কেমন বিচিত্র ভাবের দ্যোতক, কেমন বিচিত্র তৃপ্তির পরিবেষক।

যারা ফুল চিনেছে, চন্দ্রসূর্য্য ও তারকা চিনেছে, শিশুকে চিনেছে, আর চিনেছে নারীকে তাঁর স্বরূপে—মাতৃরূপে—দেবীমূর্ত্তিতে, তারা চির-সুন্দরকে চিনেছে, অনন্তভাবময়রূপে—সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের অনবদ্য অফুরন্ত উৎসরূপে।

* * * *

তিনি প্রেমময়। প্রেমময়রূপে তাঁর আত্ম-প্রকাশ—সহকার-সমাশ্রয়িনী লতিকার আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া, তরঙ্গচঞ্চলা লাস্যমুখরা তটিনীর স্নিগ্ধ বক্ষাবলম্বী বট তরুর চুম্বনের মধ্যদিয়া, সৌরকর স্পর্শ সুখাভিলাষিনী কমলিনীর আকুল আগ্রহের মধ্য দিয়া। আর আত্মপ্রকাশ কর্‌চেন—দাম্পত্য প্রণয়ের মধ্য দিয়া, মাতৃত্বের মধ্য দিয়া, প্রীতি-সখ্য ও স্নেহের মধ্য দিয়া। প্রেমময়রূপে তাঁর আত্ম-প্রকাশের চরম নিদর্শন ভক্তের তন্ময় আত্ম-বিস্মৃতিতে।

* * * *

তিনি মধুময়। শারদ প্রভাতের তরুণ তপনের হেমকান্তিতে, বাসন্তী নিশার শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায়, ইন্দ্রধনুর মনোহর বিচিত্র বর্ণে, বিহগের গীতি-সঙ্গীতে, কুসুমের মধুর গন্ধে ও সুন্দর বর্ণে, নির্ঝরিণীর মর্ম্মর ধ্বনিতে, তটিনীর ললিত গতিতে—এক কথায় জলে স্থলে নীলনভে তিনি আত্মপ্রকাশ কর্‌চেন মধুময়রূপে—আনন্দময়রূপে। সৃষ্টির সর্ব্বস্তরেই আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়া আনন্দময় বিশ্বদেবতা আত্মপ্রকাশ কর্‌চেন। তাই সারা সৃষ্টি ঘোষণা কর্‌চে—"রসো বৈ সঃ" "রসো বৈ সঃ"।

* * * *

তিনি করুণাময়। অকূল বারিধিবক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমানা বিপথগামিনী অসহায়া তরণীর দারুণ দুর্দ্দিনের বন্ধু—নিরাশায় আশা, ভীতি-কাতরতায় অভয় যে ধ্রুবতারা, তার মধ্য দিয়া করুণাময়-রূপে ভগবান আত্মপ্রকাশ করচেন। বিপুলায়ত ভীষণ মরুভূমির ঊষরবক্ষে শ্যাম স্নিগ্ধ সজল মরু-কাননের যে মধুর স্নেহ, তাহা তাঁহার অসীম করুণার অভিব্যক্তি। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত হতে থাকে, মাতৃ-হৃদয়ে যে ক্রমবর্দ্ধমান্ অস্ফুট স্নেহের সঞ্চার হতে থাকে—তাদের মধ্য দিয়া আমরা তাঁর অপার করুণার ইঙ্গিত পাই অতি সুস্পষ্টভাবে—অভ্রান্তরূপে। সৌম্য শান্ত পরদুঃখে বিগলিত, পরদুঃখাপনোদনে আত্মনিবেদিত আত্মভোলা যে চিত্ত, তারই মধ্য দিয়া করুণাময়ের কল্যাণমূর্ত্তির অধিক প্রকাশ। যেথায় ব্যথার তাপে চিত্ত বিগলিত, সেথায় তিনি করুণারূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তাই দুঃখ-শোকে, অনাহার হাহাকারের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাই আমরা তাঁর শিব-স্বরূপে—করুণার ঘনীভূত মূর্ত্তিরূপে।

* * * *

তিনি কেবল কোমল, মধুর, শান্তস্নিগ্ধ-ই নহেন:—বজ্রকঠোর, রুদ্র-ভীষণও তিনি। সব ভাবই তাঁতে আছে—তিনি যে ভাবময়!

বিশাল সাগরের বিপুল গর্জ্জনে আর ভয়ঙ্কর বজ্র-নিনাদে যে রুদ্র-বীণা বেজে উঠে, তাহা তাঁরই ভীষণত্বের ইঙ্গিত করে। কাল বৈশাখীর নৃত্য-লীলায় তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন রুদ্র মূর্ত্তিতে। মহামারীর হাহাকারে, দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদে, প্লাবনের ধ্বংসলীলায় তাঁর ভয়াল ভাব ফুটে উঠে। প্রলয়ঙ্কর ভীষণ আহবে, সন্ত্রস্ত বিশ্ব শুনে তাঁর বিপুল হুঙ্কার আর দেখে তাঁর তাণ্ডব নৃত্য—রুধির-লোলুপ চণ্ডমূর্ত্তি।

সৃষ্টির মধ্য দিয়া আনন্দরূপে আনন্দময়ের যে অভিব্যক্তি, ধ্বংসের মধ্যেও সেই একই অভিব্যক্তি। ভাব একই—লীলার আনন্দ, প্রকাশের যন্ত্র ও ভঙ্গী কেবল বিভিন্ন মাত্র।

সত্যের জন্য—ধর্ম্মের জন্য, ঐ যে বীর-হৃদয় মানব নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে অপূর্ব্ব নির্ভীকতায় উন্নত শিরে দণ্ডায়মান, আদর্শের জন্য ঐ যে মানব-শ্রেষ্ঠ উদ্যতফণ বিপদ অজগরের করাল কবলে অটল অচল—সহাস্য বদন, সতীধর্ম্মরক্ষার্থ ঐ যে গরীয়সী নারী শত প্রলোভনকে পদদলিত করে—শত বিভীষিকাকে তুচ্ছ করে অনিবার্য্য মৃত্যু-নির্য্যাতনকে বরণ করতে অকুণ্ঠিত চিত্ত ;—উঁহাদের ভিতর দিয়া যে শক্তি, সাহস, তেজ ও বীর্য্য ফুটে উঠ্‌ছে, তাহা তাঁরই বজ্রকঠোর ভাবের বিচিত্র মঙ্গলময় অভিব্যক্তি। কোমল মাতৃস্নেহের অন্তরে পরম সহিষ্ণুতারূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত। যে সুদৃঢ় সংযমে যোগীর জীবন নিয়ন্ত্রিত, সেই সংযমের প্রাণশক্তিরূপে আমরা তাঁকেই উপলব্ধি করি।

*　*　*　*

তিনি কোমল আর কঠোর, শান্ত-গম্ভীর আবার অশান্ত চঞ্চল। কোমলের পাশেই কঠোর, অসীম গাম্ভীর্য্যের পাশেই বিপুল চঞ্চলতা। মানব-নেত্রে আপাত প্রতিভাত সকল বিচিত্র ও বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব্ব মিলন—যেন হাত ধরাধরি করিয়া সকলে নৃত্য করিতেছে, চরম সখ্যে—পরম ঐক্যে।

এম্‌নি করিয়াই ভাবময় বিশ্বদেবতা কোন্ সুদূর বিস্মৃত মুহূর্ত্ত হতে প্রতি পলে অনুপলে নানা যন্ত্রের মধ্য দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে আপনাকে প্রচার করছেন জগতের নিকট—মানব মনের নিকট, তার কল্যাণের জন্য আর আপন লীলা বিলাসের নিমিত্ত।

—ওঁ তৎ সৎ ওঁ—

—শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

সংঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী—কার্য্যকরী সমিতির প্রথম অধিবেশন বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত কার্য্যসূচী ও বিবরণী তৈয়ারের নিমিত্ত সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ অনেককে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ২৬ জন মেম্বর লইয়া একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি, তাহা ছাড়া অনেক শাখা সমিতিও গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বমাসে প্রকাশিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত কবীন্দ্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, মিঃ এম, আর, জয়াকর (বোম্বাই), স্যার পি, সি, রায়, ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, অধ্যাপক স্যার রাধাকৃষ্ণন্ (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা স্যার এম, এন, রায় চৌধুরী (সন্তোষ), বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি এস, এন, গুহ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং স্যার হরিশঙ্কর পাল মহোদয়গণ ভাইস প্রেসিডেন্ট হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শতবার্ষিকী

সমিতির অফিস আলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি দ্বিতল কক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং অতঃপর ঐ স্থানেই শতবার্ষিকীর সভাসমিতি বসিবে।

রেঙ্গুনে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দের অভিনন্দন ও বক্তৃতা—শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ বিগত ১১ই নবেম্বরে রেঙ্গুনে যাত্রা করেন। ২৫শে নভেম্বর Theosophical Societyতে বেদান্ত সম্বন্ধে ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। ৫ই ডিসেম্বর তথাকার নাগরিকগণ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির তরফ হইতেও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়, তিনি তদুত্তরে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

স্বামী মধুসূদনানন্দের দেহত্যাগ—বিগত ২৮শে নবেম্বর পূজনীয় মধুসূদনানন্দ স্বামী (কবিরাজ মহারাজ) ৺কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অনেকদিন হইতেই রোগে ভুগিতেছিলেন, দেহত্যাগের পূর্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে শরীর ত্যাগের একটু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "শ্রীশ্রীঠাকুর, মাকে দেখতে পাচ্ছেন?" তিনি হাত নাড়িয়া জানাইয়াছিলেন "হাঁ দেখতে পাচ্ছি।"

প্রচার—বিগত ২৫শে ডিসেম্বর যশোহর জিলার অন্তঃপাতী গোবরাপুর গ্রামে অধ্যাপক শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামী বাসুদেবানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে উত্তরপাড়া সারস্বত সমাজে, সাহানগর শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষদে, বারুইপুরে এবং ঢাকুরিয়া ভাগবত সভায় "ভারতের মহাপুরুষগণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে স্বামী বাসুদেবানন্দ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্বামী অশোকানন্দের ভারতে প্রত্যাগমন—স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো (ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা) বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ তিন বছরের উপর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া বিগত ২৪শে ডিসেম্বর বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি দক্ষতার সহিত 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদনা করিয়াছেন। ওদেশেও তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কয়েকমাস এদেশে অবস্থানের পরে পুনরায় মার্কিনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমরা তাঁহার আগমনে তাঁহাকে সাদর 'অভিনন্দন' জানাইতেছি।

বিগত ১২ই পৌষ বেলুড় মঠে **পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের** উৎসবে প্রায় চারি সহস্র ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন এবং বৈকালে অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জ্জির সভাপতিত্বে অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা করেন।

১৬ই পৌষ পূজ্যপাদ **শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের** শুভ জন্মতিথি উৎসব বেলুড় মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয়বাবু, জ্ঞান গোসাঞি, দানীবাবু প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়কগণ উচ্চদরের সঙ্গীত গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অপরাহ্নে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী গিরিজানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা করেন।

১৩ই মাঘ রবিবার ইং ২৭শে জানুয়ারী পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি মহোৎসব।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—বিগত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ২৬শে বুধবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বৃহস্পতিবার টাউনহলে সম্মেলনের মূল অধিবেশনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্বোধনবাণী পাঠ করেন। সভাপতি স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে আমাদের দেশে বাঙ্গলা লিপির পরিবর্ত্তে Roman (রোমান) লিপির প্রবর্ত্তন করিয়া চালাইলে (অবশ্য তাহাতে উপযুক্ত অক্ষর বাড়াইয়া) সমস্ত ভারতবর্ষের ও পরে সমগ্র পৃথিবীর উপকার হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী ভাই-ভগিনী-গণকে সাদর সম্ভাষণ জানান। শুক্রবার সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বৃহত্তর বঙ্গ শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ বিদ্বদ্গণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শাখার উদ্বোধন-করেন এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য), রায়বাহাদুর নিশিকান্ত সেন (দর্শন), শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় (ইতিহাস), (বৃহত্তর বঙ্গ শাখায়) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে শাখা-সভাপতিরূপে তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। শনিবার শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পকলা বিভাগের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক ডক্টর সুবিমলচন্দ্র সরকার শিক্ষা-বিজ্ঞানশাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভার উদ্বোধন করেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয় এবং আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। মহিলাসভায় শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং লেডী অবলা বসু উদ্বোধন করেন। রবিবার ধনবিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে ডাঃ ভানুভূষণ দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ স্মৃতি-সভা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মূল সভার অধিবেশন হয়। পরিশেষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিদায় বাসরে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

ভারতীয় দর্শন মহাসভা—বিগত ২০শে হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ওয়ালটিয়ারে ভারতীয় দর্শন মহাসভার দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুবিশাল নীল জলধির তটে সুরম্য শৈলমালার উপবিস্থিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মাদ্রাজের গবর্ণর মহাসভার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার প্রিন্সিপাল মেকাঞ্জি এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ছিলেন এবং স্যার রাধাকৃষ্ণন্ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু দার্শনিক সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশেরও ৮।১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তত্ত্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন, মহাসভার এই চারিটি শাখায় পৃথক পৃথক গবেষণা-মূলক অনেক প্রবন্ধ পাঠ হয়। যুক্ত অধিবেশনে বিভিন্ন শাখায় সভাপতিগণের অভিভাষণ পঠিত হয়।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন—২৬শে ডিসেম্বর পাটনায় হুইলার সেনেট হাউসে বিহার ও উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী অনারেবল মিঃ এস, এ, আজিজ নিখিলভারত অর্থনৈতিক সম্মেলনের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের

অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ সি এন, ভকিল এই সম্মেলনের সভাপতি এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাননীয় বিচারপতি মিঃ খাজা নুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে কারখানায় প্রস্তুত পণ্য কুটীর শিল্প, খনিজ সম্পদ, কৃষিজ পণ্য, বন সম্পদ, সমবায় এবং পশু সম্পদ এই সাতটি বিভাগ আছে। সম্মেলনে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হয়। পরিশেষে সভাপতি একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনী (দশম বার্ষিক অধিবেশন)—এবার নয়াদিল্লীতে ২৭শে ডিসেম্বর এই সম্মেলনের সাধারণ সভায় অধ্যাপক দেওয়ান সিং শর্ম্মা (লাহোর), অধ্যাপক ভকিল (কোলাপুর), মিঃ বালিয়ারাম (লাহোর), অধ্যাপক পরাঞ্জপে (পুণা), মিঃ এস্, পি, চাটার্জ্জি (বাংলা), প্রিন্সিপাল শেষাদ্রি, (সভাপতি) রাও বাহাদুর ঠাকুর চৈন সিংহ প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহুপণ্ডিতগণ শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আলোচনা করেন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত লাইব্রেরী সম্মিলন, দিনাজপুরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য সভা, রাজসাহীতে নিখিল বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন (সভাপতি—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী), করাচীতে নিখিল ভারত নারী সম্মেলন (সভানেত্রী মিসেস্ রুক্মিণী), নিখিল ভারত প্রেস কর্ম্মচারী সম্মেলন (শ্রীযুক্ত ডি, কে, ডোলে—সভাপতি), বেকার যুব সম্মিলনী প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানে অনেক প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতার সিনেট হলে দ্বাবিংশ সভায় অধিবেশন। বিগত ২রা জানুয়ারী বুধবার ভারতের লাট বাহাদুর এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ জে, এইস্, হাটন্ সভাপতি ছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ করেন বিজ্ঞান সম্মত শিল্পের উদ্ভাবন এবং প্রচলন একান্ত প্রয়োজনীয়। গুটিপোকার চাষ এবং রেশমী সূতা তৈয়ারী আরম্ভ করিলে ভারত বোধ হয় রেশম উৎপাদনে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। অনেক বিজ্ঞানবিদ্ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা করেন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

২০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করণ—সম্প্রতি ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের আয়না (পরকলা) তৈয়ারী হইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমান কালীন বড় দূরবীক্ষণের ব্যাস ১০০ ইঞ্চি। উহাদ্বারা ১৫০,০০০,০০০ আলোকবর্ষস্থান পর্য্যবেক্ষণ করা যায় অর্থাৎ শেষ নীহারিকা হইতে আলো সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল গতিতে ১৫০,০০০,০০০ বৎসরে আমাদের পৃথিবীতে আসে। মাইলে লিখিলে সংখ্যাটি এত বড় হইবে যে ২০র পৃষ্ঠে বিশটি শূন্য বসাইতে হইবে। তাই আলোক-বর্ষই বৈজ্ঞানিকদের মাপ। স্যার জেমস্ জীনস্ বলেন "কত লক্ষ লক্ষ যুগ পূর্ব্ব হইতে আলোক সেই সব নক্ষত্র বিন্দু হইতে যাত্রা করিয়াছে, তারপর মাত্র ৩০০,০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে মানুষ এখানকার অধিবাসী হইয়াছে—আর সেদিন ৩০০ বছর পূর্ব্বে মানব দূরবীণে সেই আলোকস্পর্শ অনুভব করিয়াছে। নবপ্রস্তুত দূরবীণের দৃষ্টিপ্রসার হইবে পূর্ব্বতন বড় দূরবীণের দ্বিগুণ। পূর্ব্ববর্ত্তীটিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ২০,০০,০০০ নীহারিকা, আর এইটিতে ধরা পড়িবে ১৬০,০০,০০০ গুলি।

জাতিগঠনে স্বামী বিবেকানন্দ*

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর নিশাবসানে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে রবি যেদিন ভারতের পূর্ব্বদিগন্তে উদিত হইল সেদিন তাহার সর্ব্বাঙ্গে মেঘের আবরণ। সেই কৃষ্ণ মেঘস্তূপ বিদীর্ণ করিয়া তাহার রক্তিম আলোকচ্ছটা সেদিন পূর্ব্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে পারিল না।

সেই ঘনান্ধকারের সুযোগ লইয়া ভারতে দলে দলে আসিয়া পড়িল খৃষ্টান মিশনারী। হিন্দুর তখন সব হারাইবার দিন। মুসলমান যুগেও যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সভ্যতা ও শিক্ষার সংঘাতে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মিশনারীগণ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিলেন। সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই অধিকাংশ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইল। ফলে হিন্দু বালকেরা শিখিল তাহাদের ধর্ম্ম পৈশাচিকতাপূর্ণ, তাহাদের আচার ব্যবহার, তাহাদের রীতিনীতি, তাহাদের সমাজ গভীর পাপে কলঙ্কিত। মিশনারীদিগের গালাগালি প্রাচীন হিন্দুসমাজ স্তব্ধ হইয়া শুনিল, প্রতিবাদ করিবার সাহস, কিংবা সামর্থ্য তাহার ছিল না। এমন কি সর্ব্বপ্রকারে পাশ্চাত্যের অনুকরণই তখন গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্ম তখন কলঙ্কিত, সমাজ গলিত, দূষিত। সেই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের সংস্পর্শে সমস্ত জাতি তখন অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। কলিকাতার ধনিব্যক্তিগণ মদ্যপান ও অশ্লীল আমোদ প্রমোদেই লিপ্ত রহিলেন, এবং সমাজ রক্ষার ভার যাহাদের উপর, সেই ব্রাহ্মণগণ বড়লোকের উপাসনা এবং ধর্ম্মের বাহ্যাচার আড়ম্বরে প্রতিপালন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই মূর্চ্ছিত জড় হিন্দুসমাজকে প্রথমে আঘাত করিলেন রাজা রামমোহন। পাশ্চাত্যের জড়বাদের মোহ হইতে হিন্দুজাতিকে মুক্ত করিয়া বেদান্তকে কেন্দ্র করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব উদ্ধারের তিনিই প্রথম চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামমোহনের আদর্শের সহিত প্রভূত অনৈক্য সত্ত্বেও তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। অদম্য উৎসাহ এবং চেষ্টার ফলে এই প্রচার কার্য্যে তিনি কিছু পরিমাণে সাফল্যলাভ করিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদিগের ধর্ম্মপ্রচারের গতি পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গেল। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা অস্বীকার করিল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিনের মত হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া গেল।

১৮৫৯ সনে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতায় অনুরক্ত কেশবচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক অভিনব সমাজ গঠনে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এইখানে মহর্ষির সহিত তাঁহার মতভেদ হইল; ফলে ব্রাহ্মসমাজ

---

* বিগত বৎসর কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর উদ্যোগে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় এই প্রবন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

দ্বিধাবিভক্ত হইল। কেশবের নব-গঠিত সমাজ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে ক্রূরভাবে পরিহাস করিতে লাগিল, হিন্দুর জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের উপর বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রাচীন হিন্দুসমাজ ইহার প্রত্যুত্তরে মহাডম্বরে পয়সা দিয়া বক্তা আনয়ন করিয়া হরিভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের গালাগালি বর্ষণ এবং ধর্ম্মের অভিনয় করিয়া হিন্দু নেতৃবৃন্দের তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানের ফলে হিন্দুর সব যাইবার উপক্রম হইল—ধর্ম্ম গেল জাতি গেল—সাহিত্য গেল। এই সময় মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের ফলে কেশবচন্দ্রের মনে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অকস্মাৎ প্রবল অনুরাগ দেখা দিল। পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহ অপসৃত হইয়া তাহার মনে গভীর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ ইহা সহ্য করিলেন না—ব্রাহ্মসমাজ আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল।

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। এইরূপ বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতের ঘূর্ণিবাত্যায় পড়িয়া জাতি যখন তাহার আদর্শ নিরূপণ করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, নিজের ধর্ম্মকে সমর্থন করিয়া অন্য ধর্ম্মকে প্রাণপণে হেয় প্রতিপন্ন করাই যখন গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্য যখন জাতির চোখে মরীচিকার ন্যায় লোভনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, তখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ, সমস্ত অন্তর্দাহের সান্ত্বনাস্বরূপ জাতির অলস নিদ্রাজড়িত চক্ষের সম্মুখে সনাতন ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। উনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিঃহীন পাণ্ডুর রবি অস্তের পথে আসিয়া অকস্মাৎ নিবিড় কৃষ্ণ মেঘস্তূপ বিদীর্ণ করিয়া দীপ্ত জ্যোতিতে ভারত-আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। দুঃখ জর্জ্জর দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মৃতপ্রায় অজ্ঞান জীবকুলকে মৃতসঞ্জীবনী দান করিবার জন্য অতীত ভারতের ঋষিদিগের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠ আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইল—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ;
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-গুরু। ভারত সেইজন্য এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট সর্ব্বপ্রথমে ঋণী। ঠাকুর তাঁহার শিষ্যকে শুধু শিষ্যের ন্যায় স্নেহ করিতেন না, তাঁহার সহিত নরেন্দ্রের ছিল প্রাণের বন্ধন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াও যখন তিনি মহাসত্যের অনুসন্ধান পাইলেন না, ঠাকুরই তখন তাঁহাকে সে সন্ধান দিলেন; নিজের আধ্যাত্মিক মুক্তি কামনাই যখন তাঁহার জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে হইল—তখন ঠাকুরই তাঁহার প্রাণে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" কর্ম্ম করিবার অনুপ্রেরণা জাগাইয়া দিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "কোথায় কালে বটগাছের মত বর্দ্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর।"

এই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তিনি পরিপূর্ণ শান্তি পাইলেন না, ইহজগতের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেন। সেই সন্ধ্যায়ই তিনি প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনে তাঁহার অপেক্ষা

অপরের আবশ্যক বেশী। সেদিনই তিনি সর্ব্বপ্রথম বুঝিলেন যে ভাগ্যহীন জাতির "ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী"; তাহারা দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারে তাঁহারই পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। তিনি স্থির করিলেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা;
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"

এই সময় হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্র হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে তিনি চাহেন নাই, ত্রয়োত্রিংশ ভারতসন্তানের কল্যাণ সাধনের ভিতরে তিনি তাঁহার জীবন-দেবতার বংশীধ্বনি শুনিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন দুর্ভাগিনী ভারতমাতা লাঞ্ছিতা এবং রিক্তা হইলেও, তাঁহার শূন্যপ্রায় রাজকোষের এক অবজ্ঞাত কোণে সংস্কৃতভাষার অন্তরালে যে মহার্ঘ রত্ন রহিয়াছে, তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। উপনিষদ কিংবা বেদান্ত বুঝিবার জন্য তিনি কোন বিশেষ ভাষ্যকারকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করায়, স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছিলেন।

ভারতের উন্নতি সাধনই হইল তাহার মূলমন্ত্র। গৈরিকধারী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি দেখিলেন ভারতের সর্ব্বত্র জুড়িয়া রহিয়াছে বিরাট অন্নাভাব। তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী ক্ষুধার যাতনায় অস্থির, এই অন্নাভাবের ফলে কুসংস্কার, জড়তা, আত্ম-অবিশ্বাস, চিন্তার দৈন্য এবং ভীরুতা শত শাখাপ্রশাখা দ্বারা সমস্ত দেশকে জড়াইয়া ধরিয়া নিষ্পেষিত করিতেছিল। তিনি বুঝিলেন এই ভীষণ অন্নাভাব দূর করিতে না পারিলে রাষ্ট্রে সমাজে কিংবা ধর্ম্মে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। এই অর্থাভাব পূরণ করিবার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন কিন্তু অশেষ দুঃখের বোঝা বহিয়া সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি দেখিলেন দীনের জন্য প্রার্থনা করিয়া মৌখিক সহানুভূতি ভিন্ন বড় বেশী কিছু লাভ করিবার আশা বৃথা। তিনি বুঝিলেন হিন্দুস্থানে অর্থলাভ তাঁহার হইবে না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্রগণের প্রতিনিধি হইয়া পাশ্চাত্যদেশে গমন করিবেন। সেখানে মস্তিষ্কের বলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থে অস্থি কঙ্কাল সার ভারতবাসীর শুষ্ক অধরে অন্ন তুলিয়া ধরিবেন। পাশ্চাত্য দেশে গমনের তাঁহার এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি বুঝিলেন ধর্ম্মের বাহ্যাচারে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞান অশিক্ষিত জনসমাজ ধর্ম্মের প্রাণবস্তুর প্রতি অন্তর্দৃষ্টি দিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতীয় উন্নতির পথে ধর্ম্মই যে প্রথম এবং প্রধান সোপান তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। "ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র রাজনীতি চর্চ্চায়, যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্প সমৃদ্ধিতে নহে—কিন্তু কেবল ধর্ম্মে। ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, এবং জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ; আর ইহাই পৃথিবীর নিকট আমাদের একমাত্র দেয়" এ তাঁহারই বাণী। কিন্তু তিনি দেখিলেন হিন্দু যাহাকে ধর্ম্ম ভাবিয়া মহা উৎসাহে ভজনপূজন করিতেছে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্মের বিকৃত মৃতদেহ, এবং ইহারই উপর বর্ষিত হইতেছে পাশ্চাত্যের তীব্র পরিহাস। ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতার এত নিম্নস্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই, উপরন্তু পাশ্চাত্য-সভ্যতার আপাতমনোরম আকৃতিতে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার ধূলিরাশিতে আবৃত সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে ত্যাগ

করিয়া তাই তাহারা পাশ্চাত্যের দিকে নূতন আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এইবার তিনি বিদেশে ভারতের মহার্ঘ রত্নের গৌরব প্রচার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন সার্ব্বজনীন উদার ভাবসমূহ আধুনিক মনের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমণ্ডিত করিয়া প্রচার করিবেন, পাশ্চাত্যের ভৌতিক-সর্ব্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধে ভারতের "সব ধর্ম্ম মাঝে ত্যাগ ধর্ম্ম সার ভুবনে" পুণ্যবাণী শুনাইবেন, ভারত রাজকোষের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে প্রদান করিবেন এবং সর্ব্বোপরি "ধর্ম্মসকল ঈশ্বরোপলব্ধির বিভিন্ন উপায় মাত্র" রামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশবাণী প্রচার করিবেন। তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে গমনের ইহাই অন্যতম কারণ। বেদান্তের নিশান উড়াইয়া সাম্য মৈত্রীর গান গাহিয়া ভারতের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

আমেরিকা এবং ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। অপূর্ব্ব বক্তৃতা শক্তির প্রভাবে এবং সূক্ষ্ম তর্কবুদ্ধির সাহায্যে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য জগতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। পাশ্চাত্য জগত বিস্ময়ে ভারতের দিকে ফিরিয়া চাহিল, এতদিন পরে বুঝিল যে ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারেও এমন রত্ন আছে যাহা সে সাহস করিয়া সমগ্র জগতকে বিতরণ করিয়া ধন্য করিয়া দিতে পারে। হিন্দুজাতির উপরে তাহাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল, হিন্দুর সমাজ এবং ধর্ম্মকে তাহারা আর হীন বলিয়া ভাবিতে পারিল না।

এ বড় কম উপকার নয়। হিন্দু যখন তিলে তিলে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে—যখন সে নিরুপায় হইয়া ভাবিয়াছে তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এমন কি কোনদিন যে ছিল তাহাও যখন সে ভুলিতে বসিয়াছে, তখন কেবল এই মহাত্মার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ফলে তাহার অতীত গৌরব কাহিনী আবার তূর্য্যধ্বনিতে ঘোষিত হইয়া গেল; ভারত পুলকবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধর্ম্মের পদতলে সমস্ত বিশ্ব পুষ্পাঞ্জলি হস্তে দাঁড়াইয়াছে, মঙ্গলশঙ্খনিনাদে পাশ্চাত্য জগত আজ তাহার উদ্বোধন গাহিতেছে।

এইবার তিনি দেশে ফিরিয়া পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কি অসীম উৎসাহ, কি অদম্য কর্ম্মপ্রেরণা! তিনি বুঝিলেন ভারতের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ধনী ব্যক্তিকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে চলিবে না। সর্ব্বপ্রথম Mass (জনসাধারণ) কে জাগাইতে হইবে। ধর্ম্ম আমাদের মজ্জাগত, সকল সংস্কার ওর ভেতর দিয়েই আন্তে হবে, নইলে Mass (জনসাধারণ) তা' গ্রহণ করবে না।" কিন্তু ধর্ম্মকে গ্রহণ করিবার মত শক্তি Mass (জনসাধারণ) এর আছে কি না? দেশে তখন ঘোর অশান্তির দাবাগ্নি জ্বলিতেছে। পুরোহিতগণ ধর্ম্মের অজুহাতে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উপর পূর্ণ মাত্রায় অত্যাচার চালাইয়াছে। অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের আভিজাত্যের গর্ব্বে বিভোর, অধম দীন দরিদ্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার সময় অথবা ইচ্ছা তাহাদের নাই। যাহারা পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্ন যোগাইল, প্রাণের বিনিময়ে যাহারা বস্ত্র যোগাইল, সকল অভাব মিটাইল—তাহারা নিশ্চিন্ত আরামে সেই অধম সর্ব্বহারা জাতির মস্তকে দারিদ্র্য এবং অত্যাচারের দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া দিল। অশিক্ষিত উপেক্ষিত বঞ্চিত নরনারীর দুঃখে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর করুণার্দ্র হইল। অতীতের শাক্যকুমার গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তাঁহার প্রাণ অজ্ঞ মোহান্ধ উপেক্ষিত দেবঋষির বংশধরগণের নিমিত্ত আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুপ্লুত নয়নে তিনি ভারতসন্তানের দিকে চাহিলেন—তাঁহার কণ্ঠে জাগরণের গান বাজিয়া উঠিল—"যাহারা

সংস্কারক হইবে, দেশপ্রেমিক হইবে তাহাদিগকে বলি, অনুভব কর। তোমাদের কি সেই অনুভূতি আছে? তোমরা কি অনুভব কর দেবতা ও ঋষির কোটি কোটি বংশধর আজ জানোয়ারের সামিল হইয়া পড়িয়াছে!··দেশবাসীর দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে কি মনে হইয়াছে যে পাগল হইয়া যাইব?" Mass (জন)এর প্রতি অসীম করুণাবশতঃ তিনি কহিলেন—"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণকে শিখান হইয়াছে, তাহারা ছোট, তাহারা হীন, তাহারা অধম। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে তোমাদের কোন মূল্য নাই। জগৎ জুড়িয়া জনসাধারণ শুনিয়াছে তাহারা মানুষ নহে। শত শত বৎসর এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহারা সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে, সাহস হারাইয়া আজ তাহারা পশুর কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কর্ণে কেহ আত্মার কথা উচ্চারণ করেন নাই। তাহাদের নিকট ঘোষণা কর আত্মার বাণী, বল যাহারা সকলের নীচে তাহাদের মধ্যেও আত্মা আছে, সেই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। তাহাকে তরবারী বিদ্ধ, অগ্নি দগ্ধ, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। তিনি অমর, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। তিনি অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা"।

Mass (জনসাধারণ) কে উদ্দেশ করিয়া তিনি আবার কহিলেন "এরাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথরেরা কাজ বন্ধ করলে হা হুতাশ লেগে যায়, তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে সহর উজাড় হয়ে যায়। শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না, এদের তোরা ছোটলোক ভাবছিস্? আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস্?·· তাইতো বলি তোরা এই massএর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।"

"আর চামার, মুচি, মুদ্দফরাসদের ভিতর গিয়ে বল্ তোরাই জাতের প্রাণ—তোদের অনন্ত শক্তি রয়েছে—দুনিয়া ওলট পালট করতে পারিস্! একবার তোরা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়া দিকি জগতের তাক লেগে যাবে।"

দেশের এই দীন দরিদ্র তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণ জুড়িয়া বসিয়াছিল। তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে এই নিপীড়িত অধঃপতিত জাতির প্রতি তাঁহার অন্তরের করুণা-নির্ঝর বহিয়া গিয়াছিল।

"দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দেই তোর শাঁকবাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দেই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেই ··আহা! দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবনারে? যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে ·· তাদের সহানুভূতি করে তাদের সুখ দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নাই রে। ওই দেখনা হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে।··· ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে, এখনি যাই—"কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্" বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না।·· এরা দুনিয়াদারীর কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্যচক্ষে দেখছি এদের ও আমার ভিতরে একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল—বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত

সংস্কার না হলে, কোনও দেশ কোন কালে উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।"

কিন্তু কেবল অন্নাভাব দূর করিলেই একটা জাতি বড় হইতে পারে না। দৈহিক সুস্থতার সহিত তাহার চাই মনের স্বাস্থ্য। ভারতের বিরাট জাতি অজ্ঞানতার অন্ধ তিমিরের ভিতর মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে—তাহাদের সম্মুখে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা না জ্বালাইলে মৃত্যু হইতে জীবনের দিকে তাহারা পথ খুঁজিয়া পাইবে না। প্রাচীন কালে সমাজে সংস্কার বিষয়ে বিধি নির্দেশ করিয়া দিতেন ব্রাহ্মণ, সেই সংস্কার জনহিতকল্পে জনসমাজে প্রচলিত করিতেন ক্ষত্রিয়। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান নাই, ক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্বের তেজ নাই। অতএব সমাজে কোন স্থায়ী সংস্কারের প্রচলন করিলেও তাহাকে ধারণ করিবার মত শক্তি সমাজের নাই। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতিপয় বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। প্রথমে একদল তেজস্বী, বীর্য্যবান, আত্মনির্ভরশীল যুবককে এই শিক্ষা প্রচার কল্পে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহারা নগরে এবং গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচলন করিবে।

প্রাচ্যের শিক্ষা ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা ভোগ। প্রতীচ্যের শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ, প্রাচ্যের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং উপলব্ধি করা সহজ নয়। ভারতের এই বিরাট জাতি যাহাতে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে বিহ্বল না লইয়া প্রাচ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সেইদিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গূঢ় অভিপ্রায় তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে বলিলেন। চণ্ডালকে তাহার হীনশক্তি হইতে বাহির করিয়া ব্রাহ্মণত্বে আনয়ন করা, এবং নিম্নজাতীয়গণ যাহাতে উচ্চবর্ণের শিক্ষা, তেজ ও গৌরব লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করাই এই নব-শিক্ষিত যুবকদলের প্রধান কার্য্যপ্রণালী হইবে। তিনি কহিলেন "শিক্ষার অর্থ অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ সম্পাদন।" সুতরাং শিক্ষাদানের সময় ইহা ভুলিলে চলিবে না যে প্রত্যেক ছাত্রের অন্তরে অসীম শক্তি নিহিত, তাহাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। তাহাদের মধ্যে মৌলিক চিন্তা প্রবাহ উদ্রেকের চেষ্টা করিতে হইবে। বালকদের শিক্ষকেরা শেখান না, তাহাদের শিখিতে সাহায্য করেন। সুতরাং বালকেরা যাহাতে নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষার মণিময় গর্ভের কঠিন আবরণের ভিতরেই ভারতের গভীর চিন্তাসমূহ লুক্কায়িত, সুতরাং সুবিবেচনা সহকারে সংস্কৃত বিদ্যার বিস্তার করিতে হইবে। এই সংস্কৃত ভাষার সংস্পর্শে নিম্ন অশিক্ষিতজাতির যুগযুগান্তের কুসংস্কার নবরবির দপ্তকিরণে হিমকণিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে। যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বুদ্ধি উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তির সৃষ্টি হইতে পারে সে উপায়ের প্রবর্ত্তন ও নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। স্বধর্ম্মে অনুরাগ এবং অধর্ম্ম অথবা অসত্যের প্রতি বিরাগই ভারতীয় জাতির চিরদিনের বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান ভারতকে আবার সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে অতীতের ন্যায় আবার তাহারা সর্ব্বত্র বিশ্বাসভাজন হইতে পারে। মতের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও সকলের কর্ণে সাম্য এবং মৈত্রীর জয়গান শুনাইতে হইবে, একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া সমগ্র ভারত জুড়িয়া এক বিরাট 'হিয়া' জাগাইতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও দর্শন পাশ্চাত্যে প্রচার করিতে হইবে, এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতে ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার্থে শিক্ষিত যুবক প্রেরণ

করিতে হইবে। ইহার সহিত তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে একটা ঐতিহাসিক বোধ। অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে, আজ যে জাতি 'পশুর সামিল' হইয়াছে কতবড় প্রাচীন জাতির বংশধর ইহারা; কত কত সংস্কারের মধ্য দিয়া, যুগে যুগে কত শত মহাপুরুষকে বক্ষে করিয়া আজ তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ঐতিহাসিক বোধ প্রত্যেকের মধ্যে জাগরিত হইলে, প্রাণে নূতন উৎসাহ দেখা দিবে, নবোদ্যমে তাহাদের কণ্ঠে চলার গান উৎসারিত হইবে। ঐতিহাসিক বোধের সহিত ভারত জাতীয় বিশেষত্ব বোধও হারাইয়াছিল। প্রত্যেক জাতির যে একটা বিশেষত্ব আছে, যে বিশেষত্বহীনতা জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে ভীষণ বিঘ্ন, হিন্দু জাতি তাহা ভুলিয়াছিল। এমন কি শিক্ষিত সংস্কারকগণের শিক্ষাদীপ্ত অন্তরেও এই মহাসত্য উদ্ভাসিত হয় নাই। হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব কি তাহা জানিবার এবং জানিয়া আত্মরক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই তাহারা করে নাই। "নিজের দেশ বা নিজের জাতি বলিয়া একটা আন্তিক অভিমানও সংস্কার যুগের ছিল না"। তিনি বলিলেন এই কারণেই এতদিনের এত সংস্কার ভারতকে উন্নত না করিয়া অবনতির পথেই টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু উপরোক্ত ভাবে জনসমাজের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এক বিরাট জাতি গড়িয়া উঠিবে, সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিবার মত সম্পদ আছে বলিয়া সে জাতি গর্ব্ব করিতে পারিবে, বলিতে পারিবে—

"ভারত আজ জ্ঞানের রাজা
　ভারত নহে গো তুচ্ছ"

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলেই ধর্ম্মের প্রয়োজন। তিনি উপনিষদের অংশ বেদান্তকেই আদর্শ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতের সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে আলস্যের জড়িমা; শক্তিহীন, বীর্য্যহীন ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাদিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। 'উপনিষদ্ বলিতেছেন হে মানব, 'তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর!' মানব কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মানবের দুর্ব্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্ব্বলতার দ্বারা কি দুর্ব্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই অভীঃ 'ভয়শূন্য হও' এই বাক্য বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি অভীঃ—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।"

"আমাদের আবশ্যক শক্তি,—শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্ সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ। ইহার প্রত্যেক ছত্র আমায় শিখাইয়াছে—শক্তি।" স্বদেশবাসীর এই অসীম শক্তির উন্মেষ সাধনই তিনি তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতেন। "সংগ্রাম-শীলতাই জীবনের চিহ্ন, যে জাতির চেষ্টা নাই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই, সে জাতটা মরেছে, যেমন আমাদের জাত" এ তাঁহারই বাণী। যুবক দিগকে ডাকিয়া কহিতেন—'এই সত্যটা শেখ, আর গ্রামে গ্রামে নগরে প্রতি পল্লীর গৃহদ্বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্ "তোমার ভেতর অমিত বিক্রম রয়েছে, তাকে জাগাও। শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন টিকলোনা, তখন সেই ধর্ম্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়

তার চেষ্টা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।" তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশে এমন শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক যাহাতে প্রকৃত মানুষ গঠিত হয়। সেই কারণে তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষার আদর্শ পুনঃপ্রচার করিতে বলিলেন। যে দেশে ভীষ্ম দ্রোণাদির ন্যায় রথী, অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্য, ভরত লক্ষণের ন্যায় অনুজ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মশীল নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে দেশের লোক এখন কাপুরুষ নামে কলঙ্কিত। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ আজ স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা হারাইয়া গৃহবিবাদ এবং দ্বেষহিংসায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মের এই অবমাননা দেখিয়া দুঃখে অপমানে ভারতের বীর সত্যপ্রিয় সন্তানের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনি ত্যাগ এবং শক্তির মন্ত্র কহিলেন—

"হে ভারত, এই পরানুবাগ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহকারে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিওনা—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ·· বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে। তিনি বলিয়াছেন—"I want to preach a man-making religion" (ক্রমশঃ)

শ্রীবনলতা গুহ
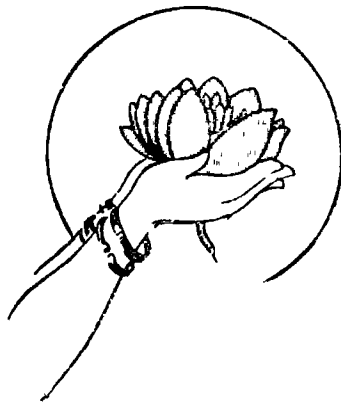
পুঁথি ও পত্র

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত Students Welfare Committeeর ১৯৩৩ সনের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইলাম। শারীর অনুশীলন, নৌকা চালন, ছায়াচিত্রে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার অন্তর্ভুক্ত Student's Infirmary তে হৃদয় ও কণ্ঠনালী প্রভৃতি রোগে পীড়িত প্রায় ৪০ জন ছাত্রকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা, ২ জনকে অর্থ সাহায্য এবং প্রায় শতাধিক ছাত্রকে চশমা ব্যবহারে সাহায্য করা হইয়াছে। ইঁহারা ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই বিবরণীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি বিষয় সাধারণের জানা উচিত বলিয়া উহা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। অদ্যাবধি ইঁহারা প্রায় ২৮,২৫৬ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন; আলোচ্য বর্ষে ২,৫৬০ জন ছাত্র আরও অধিক পরীক্ষিত হইয়াছে। যে সব রোগে ছাত্রেরা সাধারণতঃ ভোগে উহার নির্ঘণ্ট উঁহারা তৈয়ারী করিয়াছেন। উহা নিম্নে দেওয়া গেল—

রোগের নাম	শতকরা কলেজ ছাত্র	শতকরা স্কুল ছাত্র
অপুষ্টি	২৩ ৭৩	৩৩ ১০
দৃষ্টিহানি	৩৮ ০৫	৩১ ৮৯
কণ্ঠ রোগ	২৮ ৮০	৩৪ ২৪
চর্ম্ম রোগ	১২ ৪৬	৭'৪৪
হৃদ্‌রোগ	৩৭০	৩ ৮৭
প্লীহাবৃদ্ধি	৪'১৮	২'৪২
যকৃৎ বৃদ্ধি	'৪৮	'২৩
দাঁতে পোকা	১৬ ৪৯	১৯ ২৮
দাঁতে বক্ত পুঁজ	৩ ৮৬	৩'৪৯
ফুস ফুস রোগ	১ ৮৫	২ ৬৫
যক্ষ্মা	'০৮	'২৩

২। ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকার গণ—মহন্ত মহারাজ ১০৮ শ্রী স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য একটাকা। গ্রন্থকার এই পুস্তিকায় জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আচার্য্য শংকর, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব ও বিষ্ণুস্বামীর মতামতের ঐক্য এবং অনৈক্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম সূত্রের কয়েকটি বিভিন্ন সূত্র একত্র করিয়া তুলনা মূলক বিচারের দ্বারা নিম্বার্ক মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। মতের শ্রেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। সম্প্রদায় অনুরোধ বা নিকৃষ্ট বুদ্ধির নিকট জড়োপসনা প্রভৃতি নিকৃষ্ট তত্ত্বগুলিও এমন সত্য ও অকাট্য বলিয়া বোধ হয় যে কোনও উৎকৃষ্ট তত্ত্বই অস্ত্রোপচারের দ্বারাও তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করান যায় না। তথাপি আচার্য্য শংকর জগৎ "একেবারে অস্তিত্ব বিহীন" স্বীকার করেন নাই, কাজে কাজেই লেখকের প্রতিবাদ অর্থহীন; তিনি নিরঞ্জনা পারমার্থিক সত্তার পর ইহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির স্তুতি উপাসনায় তাঁহার ভাষ্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্ম পরিণাম দোষ

স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত কেন অসহনীয় হইয়া উঠিবে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর তাঁহার আনন্দলহরীর শক্তি তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য-ভূমিকার "অনির্ব্বচনীয়া" জগদম্বা ছাড়া আর কেহই নন। ভক্তিভাজন বাবাজী যদি এই গ্রন্থে, দ্বৈতাদি বিভিন্ন ঋষিদৃষ্ট বেদমতের মধ্যে "ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যা-দর্শনং কদলীগর্ভ ইবাসবাং নট ইব ক্ষণবেষং চিত্র-ভিত্তিরিব মিথ্যামনোরমম্" যে "ইদং" রূপ জগতের বর্ণনা সামবেদীয়া মৈত্রায়ণি ব্রাহ্মণ শ্রুতি করিয়াছেন, এবং এইরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের দ্রষ্টা ঋষি অষ্টাবক্র, বশিষ্ট, দত্তাত্রেয়, গৌড় পাদ প্রভৃতি দৃষ্টি-সৃষ্টি বাদী এবং অজাতবাদীদের জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিও, তাঁহার মতে অযৌক্তিক হইলেও, শংকরাদির মতামতের পাশা-পাশি বসাইতেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব স্বাধীন চিন্তা সহায়ে এক অখণ্ড সাধনার বিভিন্ন স্তরের ঐক্য-বিধানে আরও অধিক অগ্রসর করিয়া দিতেন সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ লেখকের ব্যক্তিগত মতামত বাদ দিয়া, এই পুস্তক সাহায্যে বাঙ্গালী ধর্ম্ম পিপাসুরা সে উপকৃতই হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩। <u>ব্রহ্মলাভের পন্থা</u>—দ্বিতীয় খণ্ড—হিন্দু ধর্ম্ম পথে—কুমার শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মূল্য দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধাই দু টাকা চার আনা। প্রাপ্তিস্থান, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই গ্রন্থে বালানন্দ স্বামী, হংসদেব অবধূত, শ্রুতানন্দ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং অন্যান্য অনেক সাধু মহাত্মার উপদেশ এবং মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহাদের শিষ্যদের বাণীও উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়—(১) গীতার কতিপয় মূল উপদেশ—নিষ্কাম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি, (২) পবিত্রতালাভের উপায়—স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি, ও পাতঞ্জলোক্ত যম নিয়মাদি শীল পালন; (৩) ধর্ম্মদ্বার সাধন চতুষ্টয়—বিবেক, বৈরাগ্য শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব; (৪) অন্নাদি কোষ বিচার, প্রভৃতি অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহজ সরল ভাষায় এই গ্রন্থে আছে।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি আমরা পাইয়াছি—(ক) খাট্টা ও গ্যাট্টা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্র সোম, বি-এ—সামাজিক প্রহসন। চমৎকার। (খ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীমতী সরসী বালা কোঙার। (গ) ভক্তি বিজ্ঞান—শ্রীমন্মহর্ষি যোগানন্দ হংস—ভক্তির স্বরূপ ও পরিণাম সম্বন্ধীয় গবেষণা। (ঘ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত উর্দ্দু অনুবাদ। (ঙ) জাতির কথা—শ্রীউপেন্দ্র নাথ পাঁড়ুই, মিত্র বাগান, ফ্রেঞ্চ চন্দননগর—এ গ্রন্থে মাহিষ্যেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন এবং রাণী রাসমণি ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আছে।

নমস্কার

হিন্দু সেদিন সিন্ধুরে করি' বিন্দুতে অবরুদ্ধ
ব্যর্থ প্রয়াসে আপনার মাঝে হইয়া উঠিল ক্ষুব্ধ ;
সংস্কারের জীর্ণ শাসনে শতবরষের গ্লানি
মত্ত মাতালে বাহিরের পথে সবলে আনিল টানি ;—
সেদিন তোমার জীবনের ডাকে স্তম্ভিত হ'ল চারিধার,—
জাতির জীবন মরণের সখা, লহ হৃদয়ের নমস্কার।

মরুভূর মাঝে স্নিগ্ধ সরস অমৃতের ধারা বাহি,
আসিলে নামিয়া নন্দন-ফুল-সুগন্ধে অবগাহি'।
তম্বুরে তব যে সুর বাজা'লে শুদ্ধ-উদার শান্ত,
অম্বর ভেদি' অদম্বরণ খুঁজিছে বিশ্ব প্রান্ত।
আত্মভোলা হে, খেয়ালী যুগের তুমি হে পূর্ণ যুগাবতার ;—
জাতির জীবন-সঙ্কটে লহ লক্ষ কোটীক নমস্কার।

ধর্ম্মের নামে দ্বন্দ্বের হীন, নির্ম্মম পরিহাস,
হিংসা কুটীল ক্রুর ভুজগের বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
দ্বিধা সঙ্কুল পঙ্কিল পথে আত্মবিরোধময়
ছুটে ছিল সবে,—মিলন শঙ্খে ঘটা'লে সমন্বয়।
কণ্টক ও পাঁকে সার্থক করি, ফুটিলে শুভ্র কমলসার,—
বিস্মিত ধরা,—সমন্বয়ী হে, লহ এ যুগের নমস্কার।

ভারত তীর্থে বিশ্বে করিলে যে মহামন্ত্র দান,
বন্ধন-তলে শুনিলে যে মহামুক্তির আহ্বান ;
'যত আছে মত সকলি ত পথ' সত্য যে—মহা সত্য যে'—
এই মহাবাণী ঘোষিছে বিশ্ব, শুনিল যে সার তথ্য সে।
ভারত-মানস-কমল নিঙাড়ি, উদিলে শ্রেষ্ঠ যুগাবতার,
হে ঋষি, পুণ্য ভারত পীঠে বিশ্বের লহ নমস্কার।

'বিবেক' সে বাণী বহিয়া জাগিল মুক্তির অগ্রদুত,
পলকে জগত পুলকে শুনিল,—অপূর্ব্ব, অদ্ভুত!
সাধন প্রভায় ভারত আজিকে মহামিলনের তীর্থ
জগতের মহাসঙ্গম পূত গাঙ্গেয় অভিষিক্ত।
পঞ্চবটীর সমাধি কুটীরে শান্তি দীপ্ত সুসমাচার
বহিয়া জাগিলে,—হে মহামানব, লহ মানবের নমস্কার।

স্বপ্নের মত সত্য যা' ছিল—ভারতের তপোবন,
তোমার মাঝারে পে'ল সে মূর্ত্তি হেরিল জগজ্জন।
বৈষ্ণব পেল সে মহানাম সেথা, শক্তি পেল সে পথ;
বিশ্বধর্ম্মে, প্রেম বন্ধনে চালা'লে তোমার রথ।
শত বিরোধের সমন্বয়ী হে, মিলন শ্রেষ্ঠ যুগাবতার,—
ভারতের ঋষি, জগতের গুরু, বিশ্বের লহ নমস্কার।

শ্রীকাঞ্জিলাল অমূল্যরতন ভট্টাচার্য্য

ফাল্গুন—১৩৪১

ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ, এই জাতির চারিদিকে আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। কোনও ব্যক্তি বা কোন জাতি অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদিগের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও।

—বিবেকানন্দ

প্রণাম মন্ত্রাঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

—বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীমাতৃ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

মহাবিদ্যা-রূপাং দেবীং পূর্ণজ্ঞানবতীং সতীম্।
রামকৃষ্ণপ্রিয়াং বন্দে শারদাং সারদামণিম্॥

শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজ্ঞায় বিবেক-দীপ-দীপ্তয়ে।
বিবেকানন্দ-পাদায় নরেন্দ্রায় নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

নমোঽস্তু ব্রহ্মরূপায় ব্রহ্মানন্দায় নন্দিনে।
নমো রাজাধিরাজায় সর্ব্ব-কল্যাণ-কারিণে॥

শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

প্রেম-প্রস্রবণং শান্তং মঠগানাঞ্চ মাতরম্।
প্রেমার্দ্রং প্রাণদং দেবং প্রেমানন্দং
নতোঽস্ম্যহম্॥

শ্রীশ্রীশিবানন্দ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

রামকৃষ্ণাঙ্গজায় জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপিণে।
শিবরূপায় শান্তায় শিবানন্দায় তে নমঃ॥

তারকায় নমস্তভ্যং শ্রীমহাপুরুষায় চ।
অজ্ঞান ধ্বান্ত নাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রণাম-মন্ত্রঃ

শ্রীসারদা-গত-প্রাণং প্রেম-প্রজ্ঞান-সারদম্।
স্বামিনং সারদানন্দং শরচ্চন্দ্রং নমাম্যহম্॥

শ্রীশ্রীসুবোধানন্দ-প্রণাম-মন্ত্রঃ

ফুল্লচিত্তায় ভক্তায় ভক্তজ্ঞান-বিবোধিনে।
সুবোধানন্দ-পাদায় সুবোধায় নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্তোত্রম্

রামকৃষ্ণ-ময় প্রাণং
জ্ঞান-ভক্তি-রসার্ণবং
নিত্যং সিদ্ধং মহাবুদ্ধং
বরেণ্যং ধ্যান-তৎপরম্।
অনন্ত-গুণ সম্পূর্ণং
শান্তং পরম-যোগিনং
ব্রহ্মানন্দং 'মহারাজং'
নমামি সঙ্ঘ-নায়কম॥
প্রাণারামো হি গোবিন্দো
ব্রহ্ম সত্যং ন চাপরম্।
ইতি সংঘোষিতং যেন
তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু-মণ্ডলে।
যেনাসীৎ রামকৃষ্ণস্য
প্রখ্যাতঃ পুত্রবানিতি
'রাখালং' বালকং তঞ্চ
ব্রহ্মানন্দং নমাম্যহম্॥
সদ্ভক্ত-জন-বাৎসল্য-
কারিণে ব্রহ্মবাদিনে
মায়া-মোহ-বিনাশায়
কমলে কৃষ্ণ-সঙ্গিনে।
নমোঽস্তু নিরহঙ্কায়
সদা-কল্যাণ রূপিণে
নমো রাজাধিরাজায়
সুধীরায় সুশীলিনে॥
নিরীহায় মঠেশায়
নমঃ প্রিয়ঙ্করায় চ
তপঃপ্রিয়ায় মান্যায়
প্রিয়ম্বদায় তে নমঃ।
নমোঽস্তু ব্রহ্মরূপায়
ব্রহ্মানন্দায় নন্দিনে
শংকরায় চ সর্ব্বেষাং
মনসা শিরসা নমঃ॥

ব্রহ্মচারী চিন্ময়চৈতন্য

কথা প্রসঙ্গে

(মানবের ইতিহাসে নবালোক)

বিগত ৩০শে জুলাই, সোমবার হতে, শনিবার ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত, লণ্ডন সহরে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের (Anthropologists) যে সম্মেলনি হয়ে গ্যাছে, সে সম্বন্ধে স্যার আরথার কিথ (Sir Aurther Keith) এসিয়া কাগজে যে বিবৃতি দিয়েছেন সংক্ষেপে আমরা এখানে তার আলোচনা করব।

প্রায় ৪২টি দেশের প্রতিনিধিরা সভায় যোগদান করেন, তাতে প্রায় সব গোষ্ঠী ও জাতির প্রতিরূপই উপস্থাপিত হয়েছিল। এই মহাসভার সভ্য সংখ্যা ছিল ১১৩৬। প্রবন্ধ ও বিষয়ের আধিক্য হেতু ১১টি কার্য্য-বিভাগ করা হয়; যেমন আমেরিকার গোষ্ঠী-তত্ত্ব (Raciology বা Ethnography)-বিভাগ, আফ্রিকার গোষ্ঠী-তত্ত্ব বিভাগ, এসিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠী-তত্ত্ব বিভাগ ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও অনেক বিভাগ ছিল, যেমন ধর্ম্ম, ভাষা, সমাজ, শিল্প ও মনস্তত্ত্বের জন্ম-কথা ইত্যাদি। সভাশেষে নির্ণীত হয় যে আগামী ১৯৩৮ সনে পুনরায় কপেনহ্যাগেনে এই মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হবে; তাতে সভাপতি হবেন অধ্যাপক টি টমসেন (T Thomsen) এবং বর্ত্তমান সভার সম্পাদক হচ্চেন অধ্যাপক জে, এল মায়ার্স (J. L. Myres) এবং সভাপতি লর্ড অন্‌স্লো (Lord Onslow)।

স্যার অরাল ষ্টেন দক্ষিণে সিংহল এবং উত্তরে পশ্চিম তুর্কীস্থান এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে কাশপিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত এই বিরাট প্রাচীন ভূখণ্ডের মানবেতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোক প্রদান করেছেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে হিন্দুকুশ, পামির অধিত্যকা এবং উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মানুষ ও ভাষার আলোচনা নিয়ে অতিবাহিত করেন। তিনি ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বুডাপেষ্টে জন্মগ্রহণ করেন। ভায়না এবং ক্রবিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, তিনি ২৬ বৎসর বয়সে লাহোরে অধ্যাপকরূপে আগমন করেন। ভারত সরকারের তরফ হতে যে ১৯০০-১, ১৯০৬-৮, ১৯১৩-১৫তে যে তিনটি অভিযান করা হয়, তাতে তিনি নেতারূপে গমন করেন এবং প্রত্যেকবারেই চীন-তুর্কী, অক্সাস্ নদীর উৎপত্তি স্থল, হিন্দুকুশ পর্ব্বত, পামির অধিত্যকা, কাশ্মীর, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান এবং পারস্য সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আনয়ন করেন।

১৯২৭ সনে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পরিদর্শন বিভাগ (Archaeological Survey of India) স্যার জন মারসেলের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের মাহেঞ্জোদারো এবং হারাপ্পা নিদর্শনের আবিষ্কার করেন। তাতে স্থির হয় যে এ প্রায় ২২০০ খৃঃ পূর্ব্বের ব্যাপার। তাতে ঐতিহাসিকেরা যে আর্য্যদের ভারতাক্রমণের কালনির্দ্দেশ এতদিন ধরে করেছিলেন, তা এর তুলনায় একেবারে অনেক আধুনিক হয়ে পড়ায়, মস্ত প্রশ্ন ওঠে এরা কারা? এই সিন্ধু-সভ্যতা ভারতের নিজস্ব না কোনও দূরাগত জাতির?—এসবের সমাধানের জন্য স্যার অরাল কার্য্যারম্ভ করেন।

১৯২৭ হতে ২৯শের মধ্যে তিনি সিন্ধু-উপত্যকা খাইবার গিরিসংকট এবং আরবসাগরের মধ্যবর্ত্তী ১২০০ মাইল প্রস্তরময় গিরি এবং ঋলসান উপত্যকাগুলি অনুসন্ধান করেন। সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত শুষ্কভূমি, কিন্তু তার মধ্যে এক একটা স্তূপ প্রায়

১০০ ফিট্ উঁচু এবং পরিধি প্রায় এক মাইল করে এবং তাতে প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের নগর ও গ্রামের নির্ভুল নিদর্শনই পাওয়া যায়। এই সকল টিপি খুঁড়ে যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গ্যাছে, স্যার অরাল তা থেকে অনুমান করেন যে এই বিস্মৃত-সভ্যতা বৈদিক সপ্তসিন্ধু-সভ্যতারই সমসাময়িক।

১৯৩২-৩৩ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর দ্বিতীয় অভিযানে দক্ষিণ পারস্যের দগ্ধ, প্রস্তরাকীর্ণ মারাকান উপত্যকার নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তার পরবর্ত্তী তৃতীয় অভিযান পারস্যের পশ্চিম সীমান্তে সুসা স্তূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সুসার ধ্বংস স্তূপ হতে সমস্ত ইরাকের প্রান্তর, যেখানে বাবৃ (Babylonians) জাতিরা তাদের নগর নির্ম্মাণ করেছিল, দেখা যায়। সুসা স্তূপ হতে সুসা প্রথমের রাজত্বকালের, ডি মরগান (De Morgan), যে চিত্রিত মৃৎপাত্রের আবিষ্কার করেন, তাই প্রাচীন সভ্যতার প্রথম নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু স্যার অরাল তাঁর তিনটি অভিযানেই প্রায় প্রত্যেক প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের এই স্তূপগুলি হতে একই রকমের এবং একই অতীতের চিত্রিত মৃৎপাত্র সমূহের সন্ধান পেয়েছেন। এই নিদর্শনগুলিই সপ্তসিন্ধু-প্রদেশ ও পারস্যের প্রাচীন সভ্যতার সংযোগ-সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। প্রাগৈতিহাসিক সপ্তসিন্ধু সভ্যতার সব মূর্ত্তি-নিদর্শনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে; সেই সব নিদর্শন, যেমন ককুদযুক্ত বৃষ, ষষ্ঠীদেবী প্রভৃতি মাহেঞ্জোদারো হতে আরম্ভ করে বিলুচীস্থানের মধ্য দিয়ে পারস্যের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইভাবে স্যার অরেল সিন্ধু হতে ইউফ্রেটিস্ পর্য্যন্ত একটা প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার শৃঙ্খল নির্দ্দেশ করেন।

কোথায় এবং কখন প্রথম সে সভ্যতার নবউষার জাগরণ ঘটে তা এখনও পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। তবে এটা ঠিক যে এর অবসান ঘটে আজ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে; আর এই অবসানের হেতু পৃথিবীর বক্ষে যে অনাবৃষ্টি-বন্ধনীরেখা (Drought-belt) বর্ত্তমান,—যার জন্য উত্তর আফ্রিকা, আরব্য এবং মধ্য এসিয়ার বহুস্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ঐ সব প্রাগ্ঐতিহাসিক নগরের ভাষাও কি ছিল, জানা যাবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না, ঐ সকল প্রদেশে প্রাপ্ত পদকে লেখ-মালার উদ্ধার না হচ্ছে। সিন্ধু-উপত্যকার পশ্চিমের বিলুচী-অপজাতিরা (tribes) এখনও দ্রাবিড়ী ভাষা বলে—স্যার অরেলের অনুমান সপ্তসিন্ধুর আদিম অধিবাসী হলো দ্রাবিড়ী। বর্ত্তমানে দ্রাবিড়ী ভাষা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বর্ত্তমান—প্রাগার্য্য ভারতে সপ্তসিন্ধু-প্রদেশে এই দ্রাবিড়ীরাই বোধহয় এক সময়ে আধিপত্য করত এবং তাদের সভ্যতা একসময় সিন্ধুর উপত্যকাকেও অতিক্রম করে পশ্চিমে গিয়েছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ মালওয়ান (M E. L Mallowan) একটি নিবন্ধে অরাল প্রদর্শিত নিদর্শনগুলিকে আরও অধিক সুশৃঙ্খলিত-ভাবে দেখিয়েছেন যে ইরাণ অধিত্যকায়, এসিয়া মাইনর হতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এক বিরাট প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এবিষয়টি মহাসভার প্রত্নশিল্প বিভাগে (Technology Section) প্রদত্ত হয়। সিরিয়া, উত্তর ইরাক্, পারস্য এবং বেলুচিস্থানের নানা জায়গায় একই প্রকার গঠন-প্রণালী, অতি প্রাচীন, সুদৃশ্য, কারুকার্য্যখচিত মৃৎপাত্র সকল পাওয়া গ্যাছে। মিঃ মালওয়ান এই পাত্রগুলি পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সেগুলি খৃঃ পূঃ ৪০০০ সহস্র বর্ষ (Four millennium B C.) সময়কার এবং সিরিয়া হতে ভারত পর্য্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে নানাভাবে আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রায় খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বেও মানব জাতি এক বিরাট সভ্যতার সুচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছিল।

এখন পুনরায় সেই প্রাচীন সমস্যার নতুন করে অভ্যুত্থান হয়েছে—*মানব সভ্যতার প্রথম সুপ্রভাত কোথায়?* স্যার গ্রাফটন্ (Graftan Elliot Smith) মহাসভার প্রত্নশারীরবিজ্ঞান বিভাগে (Anatomy and Physical Anthropology Section) যে অভিভাষণ দান করেন, তাতে বলেন যে স্যার অরাল ও মিঃ মালওয়ান সভ্যতার আদিমতা সম্বন্ধে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, তাতে এখনও অনেক মতদ্বৈধ আছে। তিনি ও অপর অনেকেই বলেন যে মানব সভ্যতার প্রথম উদ্ভবস্থল হচ্ছে মিশরের নীল নদীর উপত্যকায়। কিন্তু সে প্রমাণগুলি আরও অধিক অনিশ্চিত। অবশ্য প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সাহায্যে মিশর মানব-সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন সকল তার বক্ষে ধারণ করে আছে সত্য, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ার নিদর্শনগুলি যতই প্রত্নতাত্ত্বিকদের জ্ঞানারূঢ় হচ্ছে, ততই মিশর বা আফ্রিকার আদিম-সভ্যতার প্রথম-স্বত্ব তিরোহিত হচ্ছে। উর এবং কিশে যে প্রদর্শনী হয় তাতে প্রমাণিত হয় বাবু বা বাবিল ও সুমের সভ্যতা মিশরেরই সমসাময়িক। তারপর সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলি আদিম সভ্যতার কালনির্দ্দেশে এক যুগান্তর সৃষ্টি করল এবং অতঃপর ইরাণ অধিত্যকার নবাবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে এই অধিত্যকা-সভ্যতাই ধীরে রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম তুর্কীস্থান হয়ে চীন ও মঙ্গলদেশে গতিশীল হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে ইরাণ অধিত্যকাকে কেন্দ্র করে আদিম সভ্যতা ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, গ্রীস্ এবং চীনদেশে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ সম্বন্ধে স্যার গ্রাফটন আর একটু কথা বলেন যে সেকেলে জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের আর্য্যজাতি, আর্য্যরক্ত, আর্য্যচক্ষু, আর্য্যকেশ প্রভৃতি ধারণা, দীর্ঘ-করোটী যুগের (Dolichocephalic) অভিধান বা প্রশস্ত-করোটী যুগের (Brachycephalic) ব্যাকরণের মতই ভুল। একই মানবজাতির *ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর (Race)* ও ভাষার অভিব্যক্তি ঘটেচে।

মোক্ষমূলার বিশ্বাস করতেন যে প্রথম আর্য্যভাষাভাষীরা এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে, পশ্চিম তুর্কীর অক্ষু বা অক্সাস নদীর উত্তর করণ প্রবাহের তটভূমে বসবাস করতেন এবং সেখান হতেই তাঁরা ভারতবর্ষ, পারস্য এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। কোনও কোনও জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন যে আদিম সভ্যতা ইউরোপের বাল্টিক উপসাগরের তটভূমেই প্রথম বিকশিত। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোপারস্ (W. Koppers) মহাসভার নৃ-প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগে (Ethnographical Section) যে নিবন্ধ দান করেন, তাতে বলেন যে ইণ্ডো-জার্ম্মাণ নামক আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান পশ্চিম তুর্কী হতে মঙ্গলিয়ার আলতাই পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশ পর্য্যন্ত। ব্রেস্‌লু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ইক্‌ষ্টেড্ (E. Freiherr von Eickstedt) নৃ-প্রকৃতি বিজ্ঞান বিভাগে ভারতীয় গোষ্ঠীতত্ত্ব *(The Racial History of the People of India)* সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ দান করেন, তা অনেক তত্ত্ব-সম্ভারে পূর্ণ। তিনি বলেন, তুষার যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে "ইণ্ডো নিগ্রিড্" জাতির বাস ছিল। আমাদের বোধ হয় এ হলো ভূ-তত্ত্ববিদ (Geologists)-গণের নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ এবং শেষ তুষার-যুগ (Fourth and last Glacial Age)। এর কাল আনুমানিক ৫০,০০০ খৃঃ পূঃ। এ সময় কুঠার সদৃশ যন্ত্রপাতি (Goad sole shaped)

দেখা যায়। এ সময়কার মানুষকে তাঁরা Neanderthal men বলেন। দশাবতারের মধ্য দিয়ে যে মানুষের ক্রমবিকাশের দশটি অবস্থা হিন্দু শাস্ত্রে দেখান হয়েছে, এ কাল তারই পরশুরাম যুগ।* এরা হলো আফ্রিকার নিগ্রো এবং মালেশিয়ার নিগ্রয়ইড জাতির মাঝামাঝি। আমাষ্টার্ডামের অধ্যাপক ক্লিউগ (Kleiweg de Twaan) অনুসন্ধান করে বের করেছেন যে এই গোষ্ঠীই সমস্ত দ্বীপময়-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে।

"অধ্যাপক ইক্‌ষ্টেড্ বলেন, হিমালয়ের তুষার পুঞ্জ গলার পর হতে যখন বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলো, তখন ভারতে যে প্রথম বহির্মানবের বন্যা এলো, তার নাম হচ্ছে "ভেদ্দিদ" (বোধ হয় জঙ্গলের ভীলরা); দ্বিতীয় বন্যা হচ্ছে "মেলানিদ", যাদের বংশধর হচ্ছে সাঁওতাল এবং তামিল, তারপর তৃতীয় বন্যায় আসে "ইনদিদ্" গোষ্ঠি—এরা অপেক্ষাকৃত উন্নত, কৃষিবিদ্, বং কিছু ফরসা। চতুর্থ বন্যা প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের মধ্য দিয়ে আসে; এরা মঙ্গল-গোষ্ঠী এবং বর্ত্তমানে ছোট নাগপুরের মনখেমার ভাষাভাষী মুণ্ডা জাতিরাই এদের বংশধর।

অধ্যাপক ইক্‌ষ্টেডের মতে, ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হতে যেমন এক একটি গোষ্ঠী-বন্যা এসেছে, অমনি তারা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে নিজেদের উপযোগী বাসস্থান নির্ণয় অথবা সেখানে বর্ত্তমান জাতিদের বিতাড়িত করে বসবাস করেছে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করে তাদের সঙ্গে মিশিয়ে গ্যাছে অথবা অরণ্যে বা পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। আবার সিন্ধু-প্রদেশ হতে

* ওয়েলসের *Outlines of the History of the World*, নামক গ্রন্থে প্রাণের ক্রমবিকাশে যে বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে দশাবতারের সম্বন্ধ বেশ সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে প্রাণাবির্ভাবের সময় দুটি যুগ—১। ৮৭০ থেকে ৮০ নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে Azoic or Archaeozoic-যুগ—বোধহয় প্রাণ তখনও অঙ্কুরিত হয় নি। ২। ৬০০—৬০ নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে Proterozoic-যুগ—জীবন্ত শরীর তখনও দেখা দেয় নি—তখন মাত্র কীটাণু জিউলীর আঠার মত এবং সবুজ ছাতলার মত প্রাণী ছিল। তার পর ৩৬০—৩৬ নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে Palaeozoic-যুগকে শঙ্খ-যুগ বলা যেতে পারে। কারণ তখন শম্বুক সদৃশ সামুদ্রিক বৃশ্চিক ও ত্রিপক্ষ-জীবের উদ্ভব হয়েছে। ২৬০—২৬ নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে শেষ Palaeozoic-যুগকে মৎস্য-যুগ বলে, কারণ তখন মৎস্যাদি ও জলীয় বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। ১৪০—১৪ নিযুত পূর্ব্বে Mesozoic-যুগকে কূর্ম্ম-যুগ বলা যেতে পারে, কারণ এই স্তরে কূর্ম্মাদি সরীসৃপের সৃষ্টি হয়েছে। ৪০—৪ নিযুত বর্ষ পূর্ব্বে Cainozoic-যুগকে বরাহ যুগ বলা যায়। এই স্তরে স্তন্যপায়ী, তৃণ, ভূমি-বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। ৬—৫ লক্ষ খৃঃপূঃ Pliocene Periodএর শেষ এবং Pleistocene যুগের আরম্ভ—এ স্তরে প্রথম যন্ত্রপাতির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাই এ যুগকে নৃসিংহ বা নরপশু যুগ বলা যেতে পারে। ৫—১ লক্ষ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়তুষার বা Glacial-যুগ। এ সময়কার মানব Eoanthropus বলে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরিচিত। এরা অনভিব্যক্ত মানব বলে এদের বামন বলা যেতে পারে। প্রথম তুষার যুগে পাওয়া যায় Piltdown skull, rostro-carinate implements, দ্বিতীয় তুষার-যুগে অসমান কিন্তু অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি। একে Challean Ageও বলে। তৃতীয় তুষার যুগে Heidelberg jaw দেখতে পাওয়া যায়। ৫০ হাজার খৃঃ পূঃ চতুর্থ তুষার-যুগকে Monsterian-যুগ বলে। প্রথম কুঠার সদৃশ যন্ত্র দেখা যায় বলে একে পরশুরাম যুগ এবং ৩৫ হাজার খৃঃ পূঃ থেকে পরিপূর্ণ মানব শরীর দেখতে পাওয়া যায় বলে একে শ্রীরামযুগ বলা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা একে বলেন শেষ Palaeolithic Age ১৫—৩ হাজার খৃঃ পূর্ব্বের মধ্যে কৃষি-যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় বলে একে হলিরাম যুগ বলা যেতে পারে। ৩ হাজার খৃঃপূঃ হতে ঐতিহাসিক, আলোক বা বুদ্ধযুগের আরম্ভ।

ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত, পামির আধিত্যকা এবং অক্সাস নদীর উত্তর ভাগে এবং আরবের দক্ষিণ উপকূলে যে এক প্রশস্ত-করোটি (Brachycephalic) গোষ্ঠী অদ্যাপিও বর্ত্তমান, তারা বোধ হয় প্রায় ৪০০০ খৃঃ পূর্ব্বে ইরাণ অধিত্যকা হতে বাণিজ্য ব্যপদেশে ঐ সব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের কাল-নির্ণয় হলেই আর্য্যজাতিরও আদিমনিবাসের একটা কাল নির্ণয় সম্ভব। তাঁরা বলেন, 'আধুনিকেরা বহু কষ্টে পাণিনির কাল নির্ণয় এখনও করতে পারেন নি। মোক্ষমূলরের শেষ মত ৬ খৃঃ পূঃ, গোল্ডষ্টুকার ঐ; বেনফী ৩২০ খৃঃ পূঃ, ওয়েবেকট্ ৪র্থ খৃঃ পূঃ; লাসেন ৩২০ খৃঃ পূঃ; অন্যান্য ৪র্থ খৃঃ পূঃ। ইদানীংএর প্রাচ্য পণ্ডিতদের মত—তারানাথ ৫০০ খৃঃ পূঃ; রমেশচন্দ্র ৬ষ্ঠ খৃঃ পূঃ; ডাক্তার রামদাস সেন ৩৫০ খৃঃ পূঃ, রজনীকান্ত গুপ্ত ৮০০-৭০০ খৃঃ পূঃ, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ১০ম খৃঃ পূঃ। প্রাচীনদের মতে পাণিনি পরীক্ষিতের সময়কার। কারণ তাঁর সূত্রে পারাশর-ব্যাসের ভিক্ষু-সূত্র (বেদান্ত দর্শন), বাসুদেব, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, মহাভারত প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু জনমেজয়াদির উল্লেখ নেই। এরও বহু পূর্ব্বে অথর্ব্ব বা ব্যাস দ্বারা চারিবেদ সংগৃহীত হয়। যাস্ক আবার ব্যাসের পূর্ব্বে। বৃহদারণ্যকে যাস্কের নাম দেখা যায়, "আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চ আসুরায়ণঃ (২।৬।৩)। কাজেকাজেই পাশ্চাত্য মত ৫ম খৃঃ পূঃ ঠ্যাকে না। বাভ্রব্যাদি ক্রমকারগণ যাস্ক হতে প্রাচীন, পদকার শাকল্যাদি আবার তা হতে প্রাচীন। ঋক্-তন্ত্র প্রণেতা শাকটায়নাদি এদেরও পূর্ব্বে; তার পূর্ব্বে কল্প-সূত্রকার কাত্যায়নাদি; তার পূর্ব্বে অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থকার কুমুরবিন্দাদি ঋষিগণ; তার পূর্ব্বে প্রবাদ অবলম্বনে শ্লোকানুশ্লোক শাখাদি সংগ্রহ করে তদনুসারে ঋষিগণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি প্রকাশ করেন; তার পূর্ব্বে প্রবাদ অবলম্বনে শোকানুশ্লোক শাখা প্রকাশিত হয়। কাজে কাজেই প্রবাদ শ্রুতি তারও পূর্ব্বে; তারও পূর্ব্বে যজ্ঞাশ্রমের আরম্ভ হয়; তারও পূর্ব্বে নিশ্চিতই সূর্ক্ত-মণ্ডলাদি বিভাগ আরম্ভ হয়, তারও পূর্ব্বে ভিন্ন কালে ও স্থানে ভিন্ন ঋষিরা মন্ত্র সকল ক্রমে প্রকাশ করেন; সুতরাং বেদের কাল নির্ণয় অসম্ভব। কারণ কাল ব্যক্তি সাপেক্ষ। মন্ত্র-দ্রষ্টা অর্থ প্রণেতা ধরলেও, পূর্ব্বোক্ত দুরতিক্রমনীয় স্তরগুলি অধিরোহণ করে বক্তাকে ধরা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আধুনিকেরা বলেন যে বৈদিকযুগ যখন পণ্ডিতেরা দেড়হাজার দুহাজার বছর খৃঃ পূঃ বলতেন, তখন তার মধ্যে অতগুলি স্তরের বিকাশ সম্ভব ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-নিদর্শন প্রায় ৭০০০ খৃঃ পূঃ, কাজে কাজেই বেদ সম্বন্ধীয় উক্ত স্তরগুলির ক্রমবিকাশ সম্ভব।

মোক্ষমূলর সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে—(১) সূত্র-সাহিত্য ২০০-৬০০ খৃঃ পূঃ; (২) ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ৬০০ ৮০০ খৃঃ পূঃ; (৩) মন্ত্র-সাহিত্য ১০০০ ১২০০ খৃঃ পূঃ। কিন্তু উইলসন, হুইটনী এবং মুসো প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অত অল্প সময়ের ভেতর এক একটা অতবড় সাহিত্য হতে পারে না বলে ঐ মত প্রত্যাখ্যান করেন। হগ্ বৈদিককাল ১২০০-২৪০০ খৃঃ পূঃ ধরেছিলেন। জ্যাকোবি আরও অধিক উঠেন—৪০০০ খৃঃ পূঃ। লোকমান্য তিলক তাঁর Artic Home in the Vedas নামক গ্রন্থে আর্য্য-সভ্যতা চার ভাগে বিভক্ত করেন—(১) অদিতি-যুগ (Pre-Orion Period) ৬০০০ ৪০০০ খৃঃ পূঃ, (২) আদ্রাযুগ (Orion Period) ৪০০০-২৫০০ খৃঃ পূঃ (দীক্ষিত মতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ); (৩) কৃত্তিকা বা ব্রাহ্মণ-যুগ ২৫০০-১৪০০ খৃঃ পূঃ; এবং (৪) সূত্র-যুগ ১৪০০-৫০০ খৃঃ পূঃ।

অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর *Rig Vedic Culture* নামক গ্রন্থে বৈদিক সভ্যতার উদ্ভব কাল ১৫০০০-২০০০০ হাজারের ঊর্দ্ধকাল বলেন। উদ্বোধনে, ২৯ বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৪, তাঁর "বৈদিক-ভারত" নামক প্রবন্ধ দেখুন। স্বামী বিবেকানন্দের মত ৭০০০ খৃঃ পূঃ (*A study of Religon p 101*)

কেহ কেহ বলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনমেজয় পরীক্ষিতের নাম, ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭।৬) দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ ঘোরা নামক ঋষির শিষ্য, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধযাজীদের নাম-শ্রেণীর মধ্যে অর্জ্জুনের নামোল্লেখ থাকায়, ঐ সকল বেদাংশ নিশ্চিত ভারত-যুদ্ধের পর লিখিত। কিন্তু প্রাচীনেরা বলেন, 'তাঁরা পৃথক ব্যক্তি। ঋগ্বেদে ভোজ (৮।৬।৪।৫) এবং অর্জ্জুনীর (৪ম।২৬।১-৬) নাম আছে। কিন্তু এরা নিশ্চিত বৃত্তিকার ভোজ বা অভিমন্যু নন।

যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (৬।৫।৩) আর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর-পুত্র করেছেন। এ কোন গোষ্ঠী-বাচক শব্দ নয়। সায়ণ ঋগ্বেদ-ভাষ্যে (১।৫১।৮॥১।১০৩।৩॥ ১।১১৭।২১॥১।২৩০।৮॥৩।৩৪।৯॥৪।২৬।২॥৬।২২।১০॥৬।৩৩।৩)আর্য্য শব্দের অর্থ করেছেন √ঋ ধাতু হতে বিজ্ঞ-যজ্ঞানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞস্তোতা, বিজ্ঞ, অরণীয় বা সর্ব্বগন্তব্য, উত্তমবর্ণ, ত্রিবর্ণিক, মনু, কর্ম্মযুক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শ্রেষ্ঠ। এখানেও স্যার গ্রাফটনের মত আর্য্যগোষ্ঠী বলে কিছু পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'আর্য্য' শব্দের √অর্ অর্থ ভূমিকর্ষণ করেন। ল্যাটিন, গ্রীক্ এংগ্লোস্যাকসন, ইংরেজী, রুষ, আইরিশ, কর্নীশ, ওয়েলস্, নোর্স, লিথুয়েনিক প্রভৃতি ভাষায় এবং বৈদিক √ঋ ধাতুর অর্থ হল-কর্ষণ।

এখন এই প্রাচীন বেদ-বিশ্বাসী মনুষ্যদের প্রথম আবাস কোথায় ছিল? ২০শ শতাব্দীর নানা মত পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ১৯শ শতাব্দীর মত হচ্ছে উত্তর-মেরু (তিলক), স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া (জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ), মধ্য এশিয়া (ইংরাজ পণ্ডিতগণ) পাঞ্জাব হতে অরাল হ্রদ (অবিনাশচন্দ্র), মদ্র-মিডিয়া (কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ঋগ্বেদ পাঠে মাত্র নিম্নলিখিত নদী ও দেশের নাম পাই—রসা, অনিতভা, কুভা (কাবুল), সিন্ধু ও সরযূ (তক্ষশীলা) (৫।৫৩।৯); বীরপত্নী, অগ্রণী, কুলীশী, (১।১০৪।৪); জাহ্নবী (৩।৫৮।৬); দৃষদ্বতী, সরস্বতী (৩।২৪।৪); আশ্বলায়ন শাখায়, ১।৩।১০-১২॥২।৩০।৮॥২।৩১।১৬-১৮॥৬।৬১॥৭।৮৫। ১,২,৪-৬॥৭।৯৬।১-৩॥ ১০।১৭।৭ ৯ ঋক সকল পাঠে পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে বোধ হয়; গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রু, (Sutlej), পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্নী (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা, মরুদ্বৃধা (১০।৭৫।৫); আর্জ্জিকীয়া (বিপাড়্), উরুঞ্জিরা (বিপাশা), সুষোমা (তক্ষশীলার দক্ষিণে) (৯।৩।৫); তৃষ্টামা (চিত্রল), সুসর্ত্তু (সুবাস্তু), রসা, শ্বেতী, (অর্জুনী দেবা-ইস্মাইল খাঁ), কুভা (মহাভা:-অপগা, আধুনিক কাবুল), গোমতী (গোমল) এবং ক্রুমু (কুরম বর্ণু বা বুনারে); ঊর্ণাবতী (কৈলাসনিম্নে), হিরন্ময়ী, বাজিনীবতী, সীলমাবতী (উত্তরকুরু), এনী (দক্ষিণ বেলুচিস্থান) (১০।৭৫।৭-৮); ১০।১০৮।১ ঋকে সরমা কুকুরী রসা নদী পার হয়ে দেবতাদের গাভীর অনুসন্ধানে পণিঃদের নিকট গমন করেন; ১০।৭৫।৬ মন্ত্রে রসা সিন্ধু-সংগতা। জেন্দ্ অবস্তায় খোর-সানস্থ রংহা বোধ হয় ১০।১২১।৪ মন্ত্রের রসা; যমুনা-সংগতা অংশুমতী (৮।৯৬।১৩-১৫); ঘর্ঘরায় পশ্চিমে অশ্মন্বতী (১০।৫৩।৮); নিষদে শিফা (১।১০৪।১-৩); ৫।২৭।৬ ঋকের হরিয়ূপীয়া, যব্যাবতী আফগানিস্থানের হরিরুদ কি না? অক্ষা (Oxus) (১০।২৭।১৭); ওক্ষু, বক্ষু বা বক্ষু (Oxus) সীতা বা, সীয়া (১।১৭৪।৯), গৌরী (Jaxartes)(১।১৬৪।৪১); শর্য্যণাবৎ সরোবর (কুরুক্ষেত্রস্থ জঘনার্দ্ধে—শাট্যায়ন ও সায়ণ ১।৮৪।১৪); ইরিন্ ও মুঞ্জবান (কৈলাসের

নিকট) অথবা ইরাণ?—কাজেকাজেই ঋগ্বেদের কালেও আর্য্যেরা সিন্ধু-নদীর উভয় দিকের করদ নদীসকলের উপকূলস্থ প্রদেশে বাস করতেন, বেশ বোঝা যায়। অথর্ব্ববেদের ৫।১৪২।২২ সূক্তে পুরুষ জনপদ (পুরুষপুর বা পেশোয়ার) মহাবৃষ, মূজবৎ প্রদেশে বাহ্লিক (Bulk), মুজবান পর্ব্বত গান্ধার (Kandahar) পাশাপাশি দেখা যায়। ঋগ্বেদের ৭।১৮।১১ মন্ত্রে যমুনা, তৃৎসব, অজাস, শিগ্রব (চন্দ্রভাগার তটে), যক্ষব প্রভৃতি প্রদেশীয় সামন্ত রাজগণের উল্লেখ আছে। সত্বৎ রাজ্য বা চক্রপুরী (দক্ষিণ দেশ) (শতব্রা ১৩।৪।৫।২১), দৌষ্মন্তি ভরত তাঁর বংশধরগণ (ঐব্রাঃ ৮।৪।৯; বিদেঘ ও মাথব (শতব্রাঃ ১।৩।৩।১০ ১৯)। এ হতে কেহকেহ বলেন যে সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে বা সিন্ধু-উপত্যকায় এক সভ্যতা প্রথম সৃষ্টি হয় এবং সেখান হতেই ইরান, ইউরোপ এবং চীন দেশে সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে, এখন তারা ভুলে গ্যাছেন। পিকের (Peake), মত আমরা বিগত অগ্রহায়ণের উদ্বোধনের কথাপ্রসঙ্গের ৬০০পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি।

আধুনিকেরা বলেন যে আর্য্যেরা অন্যদেশ হতে ভারতে আগমন করেছেন তার প্রমাণ—ঋবে,১।৩০।৯ ঋকে আর্য্যদের পুরাতন আবাসের উল্লেখ আছে এবং শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণে (৭।৬) আছে, "পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক জানেন উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত ·· লোকেও উত্তর দিকে ভাষা শিখতে যায় · লোক ঐদিক হতেই আসে ইত্যাদি। ঋবে,৫।৬১।১ ঋকে আছে, "কে তোমরা দূরবর্ত্তী প্রদেশ হতে একে একে উপস্থিত হলে?" এবং আর্য্যেরা যে প্রথম শীতপ্রধানদেশে বাস করতেন তার প্রমাণ—"শত-হিম পোষণ করি" (ঋবে, ১।৬৪।১৪ ॥ ৫।৫৪।১৫ ॥ ৬।১০।৭)। পরে তাঁরা গ্রীষ্মপ্রধানদেশে আগমন করেন। তাতে প্রাচীনেরা বলেন যে ঋব, ১।৭২।৩ ॥ ১।৮৬।৬ ॥ ২।১২।১১ ॥ ৭।৬৬।১৬ ঋকে শরৎ ঋতু এবং ১০।৯০।৬ ॥ ১০।১৬১।৪ ঋকে গ্রীষ্ম ও বসন্তের উল্লেখ আছে। তারপর ১ম মণ্ডল হতে ১০ম মণ্ডলের স্থানগুলি যদি পর পর সাজান যায় তা হলে দেখতে পাওয়া যায়—১।৩।১২ ॥ ১।১১।৬,৪,১৪ ॥ ১।৮৪।৩ ॥ ১।১১২।১২ ॥ ১।১১৬ ১৯ ॥ ১।১৬৪।৪১ ঋক কালে আর্য্যেরা বাস করতেন সরস্বতী, সিন্ধু শর্য্যাণাবৎ, অঞ্জনী, কুলিশ, বীরপত্নী, শিফা, রসা, জাহ্নবী ও গৌরী নদীতটের উৎপত্তিস্থলে যা অত্যন্ত শীতপ্রধান কাশ্মীরী হিমালয়। সাংখ্যায়ণের উক্ত ৭।৬ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখেছেন, "কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তিত হয়ে থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শোনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্য লোকে উত্তর দিকে ভাষা শিখতে যায়।" তা ছাড়া জেন্দ অবস্তায় ঐর্যন্-ব এজো দেশে দশমাস শীত ও দুই-মাস গ্রীষ্ম লিখিত আছে। তারপর ঋবে, ৩,২৪।৪ ॥ ৪।৩।৩৩ মন্ত্রে "আপয়া ও শুতুদ্রী'র পরে, ৪,২১।৪ ॥ ৫।৬১।১৯ ঋকে সিন্ধু ও গোমতীর (গামল) উল্লেখ দেখা যায়। তারপর অস্মন্বতী তীরে এসে আর্য্যেরা বলছেন, "হে সখাগণ। ওঠ, উৎসাহ কর, নদী পার হও, যা কিছু অশান্তি ছিল সকলি এইখানে রেখে চল্‌লাম। এই নদী পার হয়ে উত্তম উত্তম অন্নের দিকে আমরা অগ্রসর হব।" তারপর ঋবে, ৭।১০০।৪ মন্ত্রে দেখা যায় বিষ্ণু কর্ত্তৃক চালিত হয়ে তাঁরা ক্রমেই পূর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছেন। বাহুগণ অগ্নির নেতৃত্বে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৪ ১।১০—১৭) দেখি। অতএব আর্য্যজাতির গতি যা আমরা ঋক্ সংহিতায় পাই তা শীতাধিক সরস্বতী এবং সিন্ধুর উৎপত্তি স্থান হতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে এবং সিন্ধুর উভয়কূলে এবং পরে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে সীতা বা সীরা, বংক্ষু বা চক্ষু বা ইক্ষু (অক্ষুস্ Pliny and Starbo), সিন্ধু ও ভাগীরথী কোন কোন দেশ দিয়ে প্রবাহিত তার উল্লেখ আমরা পাই। এতদৃষ্টে স্বামী বিবেকানন্দ

স-হিমাচল আর্য্যাবর্ত্তকেই প্রথম আর্য্যস্থান বলেন। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃঃ ২৮-৩০)।

প্রাগৈতিহাসিকযুগে এক বেদপরায়ণ মনুষ্য-জাতির এক অদ্ভুত সভ্যতার স্ফুরণ ঘটে। উঁহারা কালে দুই শাখায় বিভক্ত হন দেব ও অসুর। সিন্ধু উপত্যকাই দেবস্থান এবং ইরাণ অধিত্যকাই অসুরস্থান। বর্ত্তমান প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলিও সেই এক অখণ্ড সভ্যতারই পরিচয় দেয়।

অশ্রুর মহিমা

অশ্রু!—তুচ্ছ অশ্রু!!—তুমি সুন্দর। শরতের স্বচ্ছ নীহার বিন্দুর ন্যায় তুমি সুন্দর, নির্ম্মল আকাশে উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার মত মনোহর, রত্নাকর-গর্ভ-নিহিত মুক্তার ন্যায় তুমি নয়ন-রঞ্জন। নীহার বিন্দুর ন্যায়, সন্ধ্যা তারার ন্যায় তুমি শুধুই মানসমোহন নহ;—হৃদয়হরণ করিবার শক্তিও তোমার যথেষ্ট আছে।

অশ্রু!—ক্ষুদ্র অশ্রু!!—তুমি মহৎ। ক্ষুদ্র হইলেও তুমি মহৎ। সুমেরু সদৃশ দুর্ল্লঙ্ঘ্য কঠিন দুঃখকে গলাইয়া তুমি মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ শীতল পূতপ্রবাহে পরিণত কর। সৃষ্টি-মুহূর্ত্ত হইতে তুমি বিশ্বের দুঃখ দৈন্য—ব্যথা বেদনার দুর্ব্বহ ভার স্মিতমুখে বহন করিয়া আসিতেছ।

অশ্রু!—চির-দরদী অশ্রু!!—তুমি জ্বালার শান্তি, শোকের ক্লান্তি, নিরালম্বের অবলম্বন, দুঃখীর আকিঞ্চন; ক্ষতের প্রলেপ, সুধার নিষেক। যেথায় দুঃখ বেদনা, সেথায় তুমি শান্তিদায়িনি, তোমার শুভাশীর্ব্বাদ লইয়া মূর্ত্তিমতী করুণারূপে দেখা দাও। চিরকল্যাণি, সৃষ্টিযুগে দুঃখের সঙ্গেই তোমার উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে দুঃখ, সেখানেই তুমি। দুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, অথবা, দুঃখেরই বিগলিত মূর্ত্তি তুমি অশ্রু, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদরূপে চিরদিনই দীন দুঃখীর কল্যাণ করিয়া আসিতেছ। আতুর কাতর যারা, তারা তোমায় চায়। তোমার প্রসন্ন কল্যাণ দৃষ্টি এই ধরণীকে সরস রাখিয়াছে, অনেকটা বাসযোগ্য করিয়াছে।

অশ্রু!—মৃত্যুহীনা অশ্রু!!—তুমি ধ্বংসকে তুচ্ছ করিয়াছ। সৃষ্টির বুকে যতদিন ধ্বংস ভৈরব নৃত্য করিবে, গরল ছড়াইবে, চারিদিকে আগুন জ্বালাইবে, হাহাকারের কলরোল তুলিবে, ততদিন—ততদিন অশ্রু, তোমার বিরাম নাই, তোমাকে ততদিন অসহায় বিপন্ন সৃষ্টির মর্ম্মবেদনা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে স্রষ্টার চরণতলে।

অশ্রু!—ক্ষুদ্র অশ্রু!!—তুমি শক্তিমতী। লোকে তোমাকে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ—দুর্ব্বল বলে জানে আর অগ্রাহ্য করে, কিন্তু তুমি যে দুর্ব্বল নহ, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আপাত দৃষ্টিতে তুমি সামান্যা, কোমলা এবং দুর্ব্বলা অশ্রু, কিন্তু সময়ে তুমি যে প্রবলা কঠোরা হইতে পার, প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিতে পার, অব্যর্থ মৃত্যুশেল হানিতে পার, নগর-জনপদ উচ্ছেদ করিতে পার, তাহা ইতিহাস পুরাণে অভ্রান্ত অক্ষরে লেখা আছে—যুগে যুগে কাল তাহার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। যেদিন বিপন্না বৈদেহীর নয়নপ্রান্তে তুমি উদিত হইলে, সেদিন লঙ্কার বড় দুর্দ্দিন; আর যে মুহূর্ত্তে তুমি তাঁহার কাতর চক্ষুচ্যুত হইয়া ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইলে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই লঙ্কার

ভীষণ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। লাঞ্ছিতা দ্রুপদনন্দিনীর মর্ম্মবেদনার বিগলিত মূর্ত্তি তুমি কুরুক্ষেত্রে কালানল ছড়াইয়াছিলে। তুমি দুর্ব্বলা, কোমলা—নগণ্যা নহ তখন,—তখন তুমি বজ্রকঠোরা, প্রতিহিংসা পরায়ণা, অগ্নিস্রাবিণী জ্বালামুখী।

অশ্রু।—তুচ্ছ অশ্রু॥—তুমি বৃহৎ। তোমার আকার ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু তোমার লীলাক্ষেত্র ক্ষুদ্র নয়,—বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তোমার অবস্থিতি—সৃষ্টির প্রায় সকল স্তরেই তোমার স্পর্শ। সৃষ্টির বিশাল বক্ষে তোমার প্রভাবও দিগন্তবিসারী।

শত ধন্যা তুমি অশ্রু, জনম দুঃখিনী জনকনন্দিনীর চিরপবিত্র দিব্যমহিমামণ্ডিত দুঃখভারাক্রান্ত অনিন্দ্যসুন্দর নয়নকমল স্পর্শ করিয়া; আর ধন্যা হইয়াছিলে, শ্যামবিনোদিনী রাধারাণীর বিরহব্যথাতুর প্রেমসুন্দর আঁখিপ্রান্তে উদিত হইয়া ভক্তশিরোমণি ধ্রুবপ্রহ্লাদের এবং যুগে যুগে প্রেমিক মহাপুরুষগণের ভাগবত প্রেমের অভিব্যক্তিরূপেও তুমি ধন্যা—চির-ধন্যা। এইখানেই তোমার চরম সার্থকতা—এইখানেই তোমার মহিমার পরম বিকাশ। প্রেমে, করুণায়, নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মানবতার যে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, তারই ব্যঞ্জনারূপে তোমার চরম ও পরম সার্থকতা।

—শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর ও ঠাকুরাণী

শ্রীমনোরমা গুহ, এম-এ, বি-টি

তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ, সাত আট বছর বয়স, একদিন নৌকায় গঙ্গানদীর উপর দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম।* ঘুরে ঘুরে এখান সেখান দেখিতে লাগিলাম—পঞ্চবটী, নহবৎখানা প্রভৃতি সবই দেখিলাম। শুনিলাম এই পঞ্চবটীর পাদমূলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিদ্ধিলাভ করেন, এই ঘরে তিনি ঘুমাইতেন, এই ঘরে তাঁহার স্ত্রী বাস করিতেন—এইরূপ নানা কথা শুনিতে লাগিলাম। তখন মহাপুরুষের মাহাত্ম্য বুঝিবার বয়সও না, বুঝিও নাই কিছুই, এখনও যে সবই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না, তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধির প্রসার হয় তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। যাক্, বিদ্যাবুদ্ধিকে বাদ দিয়া সাধারণ মন বলিতে যা বুঝি তার কথাই বলি।—জায়গাটী বড় সুখপ্রদ, বড় শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেন এরূপ হইল? গ্রাম বলিতে বহু নির্জ্জন গ্রাম আছে, সেখানে ভয়ই আসে সকলের আগে, বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালী মন্দির—স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, কই একবারও মনের কোন নিভৃত কক্ষে আঘাত করে বলিয়া মনে পড়ে না ত? বহু গৈরিক পরিহিত, রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ কমণ্ডলুধারী বা কণ্ঠিধারী ছিন্নকন্থা পরিহিত বহু সাধু সন্ন্যাসী বা ফকিরকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কই সহসা মস্তক নত হওয়ার কোন লক্ষণই ত অনুভব করি নাই। তীর্থস্থানে বা পীঠস্থানে সর্ব্বত্রই এমন এক আবহাওয়া অনুভূত হয় যে কোনদিনই আমার এসব স্থান সম্পর্কে কোন আস্থা নাই। এত সব

* শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি দিবসে বরিশালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পঠিত।

বিরুদ্ধভাব সম্মিলন সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরকে আমি প্রীতির চক্ষে, প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছি।

কুলু কুলু নাদিনী ভাগীরথীর বক্ষে স্বর্গীয় বিভূতিমণ্ডিত সাধকের তপস্যার ঘনীভূত পুণ্যরাশিতে পরিপূরিত সিদ্ধস্থল পাপী তাপী সকলের উপরই তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষণকালের জন্যও মনকে সেই পবিত্রধামে উচ্চতর গ্রামে লইয়া যায়। এই পুঞ্জীভূত পুণ্যরাশির সম্পাদন কর্তা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আজ বিজ্ঞানের যুগ, বস্তুতন্ত্রই সর্বত্র তাহার স্থান করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। এসময় কী করিয়া ঠাকুরের আদর্শবাদের, ভক্তিতত্ত্বের একখানা আসন এই পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইয়াও ভগবদনুগ্রহে এমন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন যে গতানুগতিক কালের সহিত অভঙ্গভাবে চলিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রচুর ছিল। তাই যদি না হইত, তবে ঐ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকগণ তাঁহার পাদসংবাহন করিবার জন্য রাজধানীর প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইত কেন? তাঁহার বাণী বহন করিয়া একটি যুবক সুদূর আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো ধর্ম্মসভায় অজ্ঞাতকুলশীলভাবে জনমণ্ডলীকে স্তব্ধীভূত করিয়াছিলেন কী করিয়া? কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরের সেই আত্মভোলা ঠাকুরের মহামন্ত্রের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া অপরিচিত বৃহৎ জনসঙ্ঘকে চিরপরিচিত "ভ্রাতাভগ্নী" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ভারতীয় আদর্শমতবাদ প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন—যে মহামন্ত্রে পাশ্চাত্যদেশ পর্য্যন্ত জিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের যিনি সম্পূর্ণ ভাগীদার আমরা তাঁহাকে হয়ত অনেকে চিনি না, বা চিনিতে চেষ্টা করি না। আজ তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ, তৎস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার উৎসবে আমরা সমবেত হইয়াছি। তিনি আর কেহই নন, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী। গ্রাম্য ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া তিনি কিরূপ উচ্চাদর্শের ও উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন তাহাই আমাদের লক্ষণীয় বিষয়।

আমরা আমাদের দেশের গুরুপুরোহিতদের মুখে শুনি নারীজাতি নারায়ণ পূজার অধিকারিণী নহে, এমন কি তাহারা 'ওঁ' শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের বেদে অধিকার নাই অর্থাৎ তাঁহারা বেদপাঠ করিতে সমর্থা নহে। এ শুধু আমাদের দেশেরই কথা নহে, সুসভ্য আলোকপ্রাপ্ত পাশ্চাত্যদেশীয় পুরোহিতের মুখেও শুনা যায়, 'স্ত্রীলোক নরকের দ্বার স্বরূপ।" তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল সমস্ত পাপের বোঝা নারীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। পরের কথা ছাড়িয়া আমরা আমাদের নিজেদের ঘরের কথাই ভাবি—কী ব্রাহ্মণ, কী ব্রাহ্মণেতর নারী মাত্রেই বৈদিক মন্ত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিতা; কিন্তু ইহাই মজার কথা যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের মধ্যে পূজনীয়া গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখা আমাদের দেশীয়া কন্যাগণও আছেন। ইহা কি অদ্ভুত কথা নহে যে, যাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাহারা তাহা অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। অতএব ইহা বৈদিক শাস্ত্রানুমোদিত বিধিনিষেধ বলিয়া মনে হয় না, মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে পৌরাণিক ধর্ম্ম কতকগুলি নূতন নূতন বিধিনিষেধের গণ্ডি সৃজন করে, ইহা তাহারই একটি অঙ্গমাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় পত্নীকে স্ত্রী-শরীরী মনে না করিয়া একই আত্মার আধার, আশ্রয়স্থল বিবেচনা করিয়া বীজমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাই, একদিন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে যখন

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর উত্তরে বলিতে পারিয়াছিলেন,—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।" স্ত্রীপুরুষে সম্পূর্ণ অভেদ দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি ৺ষোড়শী-পূজা সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন। সকলের এ দৃষ্টি থাকে না সত্য! তবে যদি কেহ আংশিকভাবে 'মহাজনগতপথ' অনুসরণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই যথেষ্ট। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"পরমহংস একজনই হয়। সকলে কি আর পরমহংস হয়!"

ঠাকুর বিরাট পুরুষ! ঠাকুরাণী কি? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে বলিতে হয় ঠাকুরাণীও বিরাট। বিরাটের ছায়া ও কায়া দুই-ই বিরাট। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং নিজেই বলিয়াছেন যে, ঠাকুরাণী যদি সম্পূর্ণ কামলোভ বর্জ্জিতা না হইতেন তাহা হইলে ঠাকুর কতটা সংযমের বাঁধ রাখিতে পারিতেন, বলা যায় না। এরূপ মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল বলিয়াই আমরা এরূপ বিরাট স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছি।

আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই মতের ব্যত্যয় করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তখন প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহারা দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, অতি মহান ধর্ম্মোজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের মতে "ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" সাধারণ গৃহী ইহার সারবত্তা কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, জানি না। তবু তাঁহারা যদি এই দম্পতী যুগলকে আপনাদের মত সাধারণ নরনারীর পর্য্যায়ভুক্ত না করিয়া ঐশ্বরিক বিগ্রহরূপে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া যাইবে, আশা করা যায়। আকাশে লক্ষ্য রাখিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যেরূপ অন্ততঃ পক্ষে উন্নত বৃক্ষের মস্তকে আঘাত করে, সেইরূপ উন্নততর আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করিলে কতকটা আদর্শানুরূপ হইতে পারে, আশা করা যায়।

এই ক্রম অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ঠাকুরাণীর মধ্যে অনন্ত প্রেম ও অভেদ আত্মা বিরাজিত। তাঁহাদের বিবাহ এক রহস্যজনক ব্যাপার,—যেন পূর্ব্ব হইতেই সব ঠিকঠাক ছিল, জীবনও এক রহস্যজনক ব্যাপার—মানুষের বুদ্ধির অগম্য। মৃত্যুও তদনুরূপ,—ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ঠাকুরাণী যখন এয়োর চিহ্ন শাঁখা খুলিতে যান, তখন ঠাকুর নাকি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি কি মরেছি যে তুমি শাঁখা খুলছ।" তাই তিনি চিরকাল এয়োশ্রী ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বামীকে চিরকাল শ্রীভগবানের অবতাররূপে বিশ্বাস করিতেন ও সেইরূপেই স্বীয় প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যাবধিই শ্রীশ্রীমা ভগবানের সত্তা সর্ব্বত্র অনুভব করিতেন ও তাহাতেই তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। একবার মা দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে পথ হারাইয়া ফেলেন, সঙ্গিগণ আগে আগে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার প্রান্তর মধ্যে বলিষ্ঠ ও ভীষণ আকৃতির এক অপরিচিত পুরুষ ও তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া সরলা বালিকা বলিয়া বসিলেন—"বাবা আমি পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, সেখানেই যাচ্ছি।" ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকেও একই ভাবে

সম্বোধন করেন ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'তোমার জামাই' কথাটাতে মায়ের সহজ সরল বিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। এই পরম আত্মীয়ের ন্যায় কথায় কোন লোকই স্থির থাকিতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত স্বামিস্ত্রীও পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও আদরযত্ন সহকারে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। মায়ের এই মধুবাক্ষরা বাণী চিরকালই ভক্তবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। 'মা' 'বাবা' 'মা' 'বাবা' প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে সর্বদাই তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে একটু কিছু না খাইয়ে কখনই তাহাকে যাইতে দিতেন না। কেহ যদি বলিত 'যাই' তখনই যেন মাতৃ হৃদয়ে আঘাত লাগিত, অমনি সংশোধন করিয়া বলিতেন,—"যাই বলতে নেই, আসি।" কদাপি কাহাকেও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, যদি কোন সময় কঠোর বাক্য ব্যবহার করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি অস্থির ছিলেন। একদিন কোন এক সংসারিক কথায় বলিয়াছিলেন,—আমাকে বেশী জ্বালাবে না, কারণ আমি যদি চটে মটে কাউকে কিছু বলে ফেলি ত, কারো সাধ্য নেই যে আর রক্ষা করে। দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুঘরের অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপে বাস করিয়াও সকলের মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। মা যেন ঠিক ঘরের মা-টীই ছিলেন। সকল সন্তানের সাংসারিক অবস্থা, আয়ব্যয়ের সংবাদাদি ও আত্মিক উন্নতি-অবনতির সকল সংবাদই তিনি অবগত ছিলেন; শিষ্যগণও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট সব নিবেদন করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত। শিষ্য সম্প্রদায়ের তাঁহার প্রতি এত অগাধ ভক্তি বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা মনে করিতেন, যদি মা একবার তাহাদিগের উপর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। একদিন জনৈক শিষ্য বলিয়াছিল,—"মা, আমার ত শান্তি হয় না। মন সর্ব্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।" এই কথা শুনিয়া মা একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। এই সংবাদ অন্য একজন প্রবষ্ঠ শিষ্যের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তবে আর কি? সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।"

যিনি একবার অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় হস্তের নিদর্শন দেখিয়া তৃপ্ত হন ও ভগবানের আশীর্বাদে সর্ব্ববিষয়েই অগ্রগামী। তাই মা পৌরাণিক হইয়াও আধুনিক সংস্কৃতির পরিপন্থী ত ছিলেনই না বরং যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ব্যবস্থাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেন।—"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা তারা সব কেমন কাজ কর্ম্ম শিখেছে। আর আমাদের পোড়া দেশের লোকে কি আট হতে না হতেই বলে—পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিধায় আইন লইয়া গত দুই বৎসর দেশময় হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল, বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মা এই কুপ্রথার উপর কীরূপ বিরক্ত ছিলেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের ভিতর কেমন সুন্দর আধুনিকতার আলোক-রশ্মি দেখা দিয়াছে মাতাঠাকুরাণীর ব্যবহারে! তিনি অগস্ত্য-যাত্রাও মানিতেন আবার স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতীও ছিলেন, পরদেশীয়া ক্রিশ্চিয়ান কন্যাকে নিজ কন্যাজ্ঞানে কোলে টানিয়া আশ্বস্ত করিতে একবারও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি

নিজেকে পরের পায়ে বলি না দিয়া, পরকে নিজের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল পরের জন্য—Socialism এর চূড়ান্ত নিদর্শন। এইরূপ আদর্শবাদ আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশেই সম্ভব। আমাদের দেশের কন্যাগণ যেন নকল মেমসাহেবের আদর্শ অবলম্বনে বিরত হইয়া দেশীয় মহিয়সী মহিলাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশীয়া মা হইয়া বসেন। মাতৃহৃদয়ের স্নেহসম্ভার লইয়া ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিতা হউন। নিজেকে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদর্শে গড়িয়া সকলের নিকট বিলাইয়া দিউন—সন্তানকে দেশের কাজের, দেশের কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন। অসংযমের বন্যায় হাবুডুবু না খাইয়া সংযমের বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলুন। তবেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তবেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তবেই দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে। একই বাণী স্বামী বিবেকানন্দের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—

"হে ভারত! ভুলিও না তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে—ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

যিনি এই ভারতীয় আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছেন, তিনি মাতৃপূজার পুষ্পাঞ্জলি দানের যোগ্য নহেন। সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত পরহিতার্থে উৎসর্গিত জীবনই মাতৃপূজার উপযুক্ত পূজক। পূজারিণীর যোগ্য জীবন আয়ত্ত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া আজ আমরা—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে॥" বলিয়া শ্রীশ্রীমাতার চরণে শরণ গ্রহণ করি।

—বাণী আগমনী—

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

নিকষ কালো আঁধার চিরি'—
জ্যো'স্না সোনার রথটি চ'ড়ে,
নীহারিকার ওড়্না টানি'—
নাম্‌লো কে আজ্ ধরার দোরে ?
ঝর্‌লো আজি হাসির ধারা,
আনন্দেরি' ঝর্ণা ভালো,
হঠাৎ কেন নিমেষ-মাঝে
জগৎ সারা আলোয় আলো ?
এই-এ মাঘে মঞ্জুরাগে --
বিহগ কেন বাজায় বাঁশী ?
ভাব্-সাগরের তুফান্-'পরে
উপ্‌ছে ওঠে স্বপন-রাশি ?
সবুজ পাতার আঁচল মেলি,—
জীর্ণ তরুর হৃদয় হাসে,
শিশির-ভেজা সুপ্ত কুঁড়ির
আবেশ ভরা মদির বাসে।
কখন্ চির মূকের কণ্ঠে
ঘুচিয়ে জমাট্ নীরবতা—
সুর সোহাগে উঠ্‌লো বেজে হিয়া খানার সকল কথা!
আজ্‌কে হেথা এই মাঘেতে বঙ্গ-নক বুকের-মাঝে;
ভ্রমর-নূপুর বাজিয়ে মধুর নাম্‌ছে বাণী মায়ের সাজে।
আস্‌ছে মা-যে শান্তি-বেশে বিশ্ব-বাণীর সাজটি নিয়ে,
বিশ্ব-হিয়ায় জাগিয়ে সাড়া বীণার সুরে স্বপন দিয়ে।
আয়রে সেবক প্রাসাদবাসী। চক্ষু মনের বিবাদ হ'বে,
ঘর-বাহিরের বিকট কালো কোন্ নিমেষে ছেদন ক'রে।
মন-মিলনের এই তো তিথি মায়ের হেথা—চরণ তটে;
মর্ম-কোষে ভরিয়ে সুধা আয়রে ওরে আয় নিকটে।
দ্বন্দ্ব যত রইবে নারে—রইবে নারে সন্দ আর;
ভিতরে যা' বন্ধ আছে, বাইরে হ'বে মুক্তি তা'র।
কুসুম যাহা কোরক ছিল, ফুট্‌বে তাহা গন্ধ ল'য়ে,
পাষাণ-চাপা প্রস্রবণ ছুট্‌বে আজি' অন্ধ হ'য়ে।
আয়রে আয় মায়ের পায়—
মিলন এই ভুঁয়ের মাঝ,
সব বিলিয়ে করি কেবল
পরাণখানা রিক্ত আজ॥

বার্ত্তাবাহক বিবেকানন্দ

(সমাপ্ত)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল

অতএব এক্ষণে সেই ব্যক্তির জীবনের আলোকে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীর বিবাদের কোনও প্রয়োজন নাই, জাতীয় জীবনে প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট স্থান আছে ;—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, উভয় মত ও সাধনাই জাতীয় ধর্ম্মজীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ,—একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্বই অসম্ভব, একটি অন্যটির পরিপূর্ণতা ; একটি যেন গৃহ, অপরটি গৃহচ্ছাদ, একটি মূল, অন্যটি ফল স্বরূপ।"

[মূল ইংরাজীর অনুবাদ]।

"The Sages of India" (ভারতবর্ষীয় মহাপুরুষগণ) নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্যদেব প্রভৃতির প্রদত্ত ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করিয়া রামকৃষ্ণের যুগোপযোগী সর্ব্বসমন্বয় কারিণী আধ্যাত্মিক-প্রতিভার মাহাত্ম্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতার উপসংহার ভাগের অক্ষম অনুবাদ আমরা পাঠককে উপহার দিব :—"তাঁহাদের মধ্যে একজনের (শঙ্করের) আশ্চর্য্য মনীষা ছিল, অপরের (চৈতন্য দেবের) ছিল বিশাল হৃদয়। কিন্তু সময় আসিল, যখন এমন এক ব্যক্তির জন্মগ্রহণ করা প্রয়োজন যাঁহার মধ্যে সেই মানসিক উৎকর্ষ এবং হৃদয়বত্তা, উভয়টিই পূর্ণরূপে সম্মিলিত হয়, যিনি একদেহে শঙ্করাচার্য্যের অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তা এবং চৈতন্যের অতি বিস্ময়কর, অসীম প্রীতি ও করুণা ধারণ করিবেন ;—যিনি দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে একই পরমাত্মা, একই ঈশ্বর অনুপ্রাণিত করিতেছেন ;—যিনি দেখিবেন, প্রত্যেক জীবের ভিতর একই পরমেশ্বর বিদ্যমান ; যাঁহার হৃদয় ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাহিরের সমস্ত দরিদ্র, দুর্ব্বল, পতিত, পদদলিত জনসাধারণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিবে ; এবং যিনি সেই সঙ্গে প্রোজ্জ্বল মানস-প্রতিভাবলে মহদুদার তত্ত্ব সকলের উদ্ভাবন দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ এবং হৃদয়-মাহাত্ম্যের সামঞ্জস্যমূলক এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-সমন্বয়, এক সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতঃ ভারতবর্ষে তথা ভারতেতর দেশসমূহে বিদ্যমান, পরস্পর বিবদমান ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পাদপীঠমূলে বহু বৎসর বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার পরম সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। * * তিনি এক অদ্ভুত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি নিরক্ষর ছিলেন অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ যুবকগণ তাঁহাকে অনন্যসাধারণ মনীষা সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন * * তিনি ভারতীয় ঋষি-সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ বিকাশ-স্বরূপ,—বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ঋষি ও আচার্য্য, যাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বর্ত্তমান জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। ঐ ব্যক্তির ভিতর দিয়া ঐশী শক্তির অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই—দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় বাংলার সুদূর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত ছিলেন, অথচ আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি

সত্য সত্যই তাঁহার পূজা করিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে আরও বহু সহস্র লোক তাঁহার পূজা করিবে। * * ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি আমি একটি সত্য বাক্যও আপনাদিগকে বলিয়া থাকি, তবে জানিবেন তাহা আমি রামকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহা সত্য নহে, ভ্রান্ত, এবং মানব-জাতির কল্যাণ প্রদ নয়, তাহা হইলে সে-সমস্তই আমার নিজের কথা, ঐ সকলের জন্ম আমিই দায়ী।"

অতএব ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণের বাণী মাত্র প্রচার করিয়াছেন এবং ঐ বাণীর সঙ্গে তাঁহার নিজের কোন কল্পনার ভেঁজাল মিশ্রিত করিয়া তার বিশুদ্ধিতা নষ্ট করেন নাই। কিন্তু "রামকৃষ্ণের বাণী" বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? রামকৃষ্ণের বাণীর তাৎপর্য্য কি, তাঁহার সংক্ষিপ্ত গ্রাম্য ভাষা আবরণের ভিতরে নিহিত ভাব ও চিন্তা সকলের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা বিবেকানন্দ ব্যতীত পরমহংস দেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না, ইহার দৃষ্টান্ত ("শিবজ্ঞানে জীব সেবা" কথার প্রসঙ্গে) আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। বস্তুতঃ, মহাপুরুষ ছাড়া ঋষিকুল-শিরোমণি রামকৃষ্ণের জীবন, কর্ম্ম ও বাক্যের নিগূঢ় অর্থ কে বুঝিবে? সক্রেটিশের জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যার জন্ম যেমন দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ প্লেটো জন্মগ্রহণ করেন, রামকৃষ্ণের যুগবাণীর ভাষ্যকাররূপে তেমনি বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন। তাই রামকৃষ্ণকে বুঝিয়া তাঁহার মহতী বাণীর অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়া, ঐ বাণীর বর্ত্তমান যুগোপযোগী ভাষা পরিচ্ছদ উদ্‌ভাবিত করিয়া সমগ্র জগতে বিস্তার করা-রূপ দুরূহ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া বিবেকানন্দ যে কতদূর কৃতিত্ব, অধ্যবসায়, মনীষা, ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভুলিলে আমরা বিবেকানন্দের প্রকৃত মহত্বের ভগ্নাংশেরও ধারণা করিতে পারিব না। বিবেকানন্দের মহত্ত্ব শুধু তাঁহার গুরুকৃপালব্ধ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নহে,—তাঁহার অপরোক্ষ অদ্বৈত বিজ্ঞানে নহে। কারণ, রামকৃষ্ণই বলিয়াছিলেন, —"নিজের প্রাণ নাশ করিতে একটি ক্ষুদ্র ছুরিকার আঘাতই যথেষ্ট, কিন্তু বহুসংখ্যক সৈন্যকে বিনাশ করিয়া বীর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে হইলে ঐজন্য সাধনা চাই, অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ এবং তৎ প্রয়োগ নৈপুণ্য চাই। অর্থাৎ শুধু নিজের আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু বহুসংখ্যক নরনারীর চিত্তমালিন্য দূর করিয়া তাহাদের ভিতরে ধর্ম্মভাবের জাগরণ দ্বারা তাহাদের মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন বহু আয়াস ও সাধনা সাপেক্ষ। রামকৃষ্ণের বাণীবাহক সমগ্র জগতের ধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্য শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দকে তাই দেহ মন আত্মার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মদান রূপ জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। ইহার আভাস আমরা পূর্ব্বে কতকটা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐজন্য,—রামকৃষ্ণের বাণী সনাতন ভারতবর্ষের অমৃত বার্ত্তা প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য বিবেকানন্দকে দিবা রাত্রির প্রতিমুহূর্ত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইয়াছে—ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান ও সংখ্যাহীন শাস্ত্রের মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতর হইতে প্রকৃত রত্নের খনি উদ্‌ঘাটিত করিতে হইয়াছে;—আবার, পাশ্চাত্যদেশীয় বহু শাখা বিভক্ত সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম্মতত্ত্বের মহার্ণবের মণি-মুক্তা আহরণ করতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যা ও সাধনার সাদৃশ্য ও বৈষম্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে। বিবেকানন্দের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনার কথা স্মরণ করিয়াই মনস্বী রঁলা (Romain Rolland) তৎ-প্রণীত স্বামিজীর জীবনী গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"His super-

powerful body and too vast brain were the predestined battle-field for all the shocks of his storm-tossed soul The present and the past, East and the West, dream and action struggled for supremacy He knew and could achieve too much to be able to establish harmony by renouncing one part of his nature, or one part of the truth The synthesis of his great opposing forces took year of struggle, consuming his courage and his very life Battle and life for him were synonymous." অর্থাৎ :—"বিধাতার পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারেই যেন, বিবেকানন্দের অন্তরাত্মার ভিতর পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব, চিন্তা ও আদর্শসমূহের সংঘর্ষ জনিত যে তুমুল ঝড় বহিয়াছিল তাহারই ঘাত প্রতিঘাত প্রতিফলিত হইয়া স্বামিজীর অতি বলিষ্ঠ দেহ এবং সুবিশাল মস্তিষ্ককে ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার ভিতর বর্ত্তমান ও অতীত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, ধ্যান-প্রবণতা ও কর্ম্ম-বৃত্তির মধ্যে প্রাধান্য লাভের জন্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। স্বীয় প্রকৃতির অথবা সত্যের একাংশ বর্জ্জন করিয়া নিজের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইত, কিন্তু তাঁহার অসীম জ্ঞানবত্তা এবং অসামান্য আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের দরুন বিবেকানন্দ ঐরূপ একদেশী, আংশিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহার পরস্পর-বিরোধী বহু বিচিত্র শক্তিনিচয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বমীমাংসা করিয়া পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুবর্ষ ব্যাপী সংগ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং এই কার্য্যে তাঁহাকে সমস্ত বল-বীর্য্য, সমস্ত জীবনী-শক্তি পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে হইয়াছিল। জীবন এবং সংগ্রাম তাঁহার পক্ষে একার্থবোধক ছিল।"

এইরূপ জীবন-ব্যাপী সাধনা ও ত্যাগের ফলে বিবেকানন্দ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন্ত ধর্ম্ম-সমন্বয় উদ্ভাবিত করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভব-রোগহর মহৌষধী বিতরণ করিয়াছেন, তাহা, ভগিনী নিবেদিতার মতে, তিনটি বস্তুর অপূর্ব্ব রাসায়নিক মিশ্রণের ফল :—যথা, (১) সমস্ত জগতের বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞতা ; (২) স্বীয় গুরুর জীবনের অমৃত স্পর্শ ; (৩) মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য-জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে ঐ তিনটির মধ্যে সনাতন ভারতের সমস্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যার জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ, সর্ব্ব ধর্ম্মস্বরূপ রামকৃষ্ণের জীবনের ধ্রুবালোকই প্রধান। এই আলোকের প্রভায়ই বিবেকানন্দ সমস্ত ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের, সমস্ত ভারতীয় জীবনের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পারিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সমন্বয় বাণী প্রচারচ্ছলে যে সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে যে সমগ্র দৃষ্টির, যে বিশ্বগ্রাহিণী প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই কথাই আর একভাবে, ভগ্নি নিবেদিতা ব্যক্ত করিয়াছেন :—Of the Swami's address before the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak it was of The religious ideas of the Hindus but when he ended, Hinduism had been created." "স্বামিজীর ধর্ম্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এই বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি হিন্দুগণের ধর্ম্ম তত্ত্বই মাত্র ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বক্তৃতার উপসংহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সমগ্র হিন্দুধর্ম্মকে নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন।"

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের নিকট ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ কি পরিমাণে ঋণী।

বিবেকানন্দের জগতের নিকট ধর্ম্মপ্রচারের পরিকল্পনা ও আদর্শ কত বৃহৎ ও মহৎ ছিল তাহা, "The Work Before Us" ("আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য") শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—'কালচক্রের বিবর্ত্তনে পুনরায় আর এক কল্প (Cycle) আবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রচণ্ড-শক্তি আজ সমস্ত জগতের সমস্ত অংশকে এক শাসন-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছে। রোমকদের ন্যায় ইংরাজ জাতির বর্ত্ম সমূহ স্থলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহে নাই,—তাহা অপার সমুদ্রের বারি-রাশি আবর্ত্তিত করিয়া দিগ্বিদিকে প্রসারিত হইয়াছে। আবার বৈদ্যুতিক শক্তি নবীন বার্ত্তাবহরূপে ইংরাজ সাম্রাজ্যের ঐ সংযোজন-ক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে। এই সকল অবস্থার আনুকূল্যের সুযোগে ভারতবর্ষ আবার নবজীবনে জাগ্রত হইয়া জগতের উন্নতি ও সভ্যতার পরিপুষ্টির জন্য আপনার আধ্যাত্মিক সম্পদ্ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল কারণ-পরম্পরার ফলেই যেন প্রকৃতি (বা কাল-শক্তি) বাধ্য করিয়া আমাকে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিল। অবস্থার আনুকূল্য সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে ;—আবার ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জগদ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময় আসিয়াছে। * * * আমি একজন আদর্শ-প্রিয় ভাব-প্রবণ ব্যক্তি ,—হিন্দুজাতি সমগ্র বিশ্বকে জয় করুক, ইহাই আমার আদর্শ। জগতে অনেক শক্তিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা হিন্দু জাতিও পূর্ব্বে জগজ্জয়ী হইয়াছি। ভারত-সম্রাট্ সুমহান্ ধর্ম্মাশোক ভারতবর্ষের জগদ্বিজয়কে "আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মের জয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার ভারতবর্ষকে জগজ্জয় করিতে হইবে ;—ইহাই আমার জীবনের স্বপ্ন , এবং আমি কামনা করি, প্রত্যেকেরই ইহাই জীবনের স্বপ্ন হউক এবং যে পর্য্যন্ত না তাহা জীবনে সফল হইয়াছে সে পর্য্যন্ত তোমরা কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হইবে না।" [মূল ইংরাজীর অনুবাদ]

যে হিন্দুধর্ম্ম নানা ঐতিহাসিক কারণে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সুদীর্ঘকাল সুপ্ত, নির্জীব-প্রায় হইয়াছিল, অথবা পর্ব্বতগুহায় ধ্যান-নিবিষ্ট যোগীর অন্তরে আশ্রয় লইয়াছিল, অথবা শাস্ত্রের শুষ্ক পত্রপুটে নিবদ্ধ হইয়াছিল,—তাহাকে বিবেকানন্দ তাঁর ঐ দিব্য স্বপ্নের স্পর্শে সঞ্জীবিত, সক্রিয়, প্রাণপ্রদ, সর্ব্ববিজয়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন ; রামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণী প্রচার দ্বারা বিশ্ব-জয় করিবার ইহাই তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্র হইয়াছিল। তাই অদ্বৈত-বেদান্তের "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ-নিনাদ সহকারে ঐ ধর্ম্মাস্ত্রের প্রয়োগে, হিংসা-দ্বেষ-নাস্তিকতা রূপী যে ভীষণ দানব পাশ্চাত্য দেশের বক্ষের উপর শোণিত-লীলায় তাণ্ডবনৃত্য করিতেছিল,—তাহাকে সংহার করিয়া বিশ্ব-বিজয়ী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর মধ্যভাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা

১৬ই মাঘ, ১৩৩২ শনিবার

মহাপুরুষজী—মেয়েটি খুব ভক্তিমতী, কালী মহারাজের শিষ্যা, কালকে খাওয়াতে খাওয়াতে বার বার বলতে লাগল, 'বাবা আপনারা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' সে দিন যখন এখানে এসেছিল, ঐ কথা বলেছিল। তাতে আমি বলেছিলাম, "কেন তোমার ত মা, ভাই ইত্যাদি সব রয়েছে।" তাতে-ও বলতে লাগল ঐ কথা। এতে বোঝা যাচ্ছে ওর ভাব ঠিক ঠিক। স্বামী মরে গেছে, একটি মেয়ে হয়েছিল সেও মরে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ ঠাকুর যাকে দয়া করেন তার ঐরকমই হয়। চাবুক না খেলে জীবজন্তুরা পর্য্যন্ত নড়ে না।

ম—গোলাপমার ঠিক এরূপ হয়েছিল।

মহাপুরুষজী—হাঁ একটি মাত্র মেয়ে তাও মরে গেল। ও ঠিক যেন পাগলি হয়ে গেল। শ্মশানের গঙ্গাধারে খালি বসে থাকত। তারপর বুঝি যোগীনমা ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরকে দেখে সব ঠাণ্ডা। এত বড় শোক, ঠাকুর তার জায়গা দিয়ে বসলেন। ঐতেই এঁকে ভগবান বলে। এ আর কেউ পারে না। মানুষের মন ভাঙতে বদলাতে তিনি এসেছিলেন। এত একটা Instance (উদাহরণ), আরও কত হয়েছে।

২১শে মাঘ প্রাতঃকাল

মহাপুরুষজী—হাঁ—জানলা খুলে দাও। সূর্য্যকে দেখি। (জানলা খোলা হলে) জবাকুসুম-সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণোতোঽস্মি দিবাকরম্। সূর্য্য হচ্ছেন বিষ্ণু। এঁর কৃপায় পৃথিবীর গাছ প্রাণী সব হচ্ছে।

ম—দেহটা পর্য্যন্ত সূর্য্য থেকে হয়েছে। আমরা যা দেখতে পাই তাত সূর্য্যের দেহ।

মহাপুরুষজী—হাঁ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় হচ্ছে সূর্য্য রশ্মি। বেদে গরুৎ মানে সূর্য্য রশ্মি—তার ওপর বসে আছেন। তাই তাঁর আর এক নাম গরুত্মান। স্বামিজী বেদের এ জায়গাটা (ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ৪৬ মন্ত্র) খুব ভাল বাসতেন। রশ্মি ত অগ্নি। অগ্নি হচ্ছেন শিব।

ম—লোকে অগ্নিকে তো ব্রহ্মা বলে?

মহাপুরুষজী—বেদে শিব ও অগ্নি এক—শিব, কালাগ্নি রুদ্র, অনেক অগ্নি Concentrated (ঘনীভূত) হয়ে সূর্য্য গড়েছে। তাই শিব আদি দেব মহেশ্বর—বিশ্বস্তর অগ্নি। তিনিই বিষ্ণু, আলাদা manifestation (প্রকাশ)।

ম—আজ্ঞে বিজ্ঞানেও ঐ রকম বলে। এক energy ভিন্ন ভিন্ন manifestation, ভিন্ন ভিন্ন নাম নিচ্ছে—যেমন Heat, light, electricity (উত্তাপ, আলোক ও বিদ্যুৎ)।

মহাপুরুষজী—ভিন্ন ভিন্ন manifestation মানে, এক সত্তারই নাম ও রূপ বদলাচ্ছে। সেই এক energyই Heat, light, electricity ও আর সব—মূল এক।

(জনৈক সাধু মহাপুরুষজীর দেহের অসুখ, কবে কেমন ভালছিলেন ইত্যাদি তাঁর দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। মহাপুরুষজী প্রথম ২।১টা জবাব দিচ্ছেন। তাঁর দেহের আলোচনা খানিকটা গড়াতে যেন একটু বিরক্ত হয়ে)—

মহাপুরুষজী—ও একরকম আছে। কে এত মন দেয়। আসল জিনিষে খেয়াল থাকলেই হল। আমার বাবা অত দেহটেহ ভাবনা আসে না। আসল জিনিষে খেয়াল থাকলেই হল। বিশ্বাস,

প্রেম,ভক্তি। বিশ্বাস থাকলে তিনিই এই শরীরটা খারাপ হতে দেন না। লোভ টোভ গুলো, যাতে খানিকটা খেয়ে ফেল্লাম, এ সব গুলো প্রায়ই হতে দেন না। আবার তিনি ঐ সব দিলে বুঝতে হবে শরীরটা শীঘ্র শীঘ্র যাবে।

আমিত যথাসাধ্য সাবধানে থাকি। থাই খুব সাবধানে। শরীরটাত ঢাকা ঢুকী দিয়া রাখি। না ভাল থাকে যাক। শরীরের স্বধর্ম্ম ত আছেই —হাগছে মুতছে, রোগে ভুগছে।—

হাঁ, তবে এ বুড়ো শরীর ৭০।৭১ বছর বয়স হলো। তিনি কৃপা করে যেমন রাখেন। কৃপা! কৃপা! কৃপা!

মহাপুরুষজী—অ—এখানে থাকুক না। কোথা যাবে তপস্যা করতে। পাশের ঐ বাড়ীটায় তপস্যা করুক্ না। একটু কাজ করুক্ ও ধ্যান ভজন করুক্। কাজ না করে শুধু তপস্যা কিছু নয়, কিছু নয়। শুষ্ক মেরে যাবে— শিব লিঙ্গ হবে।

মা কত কাজ করে গেছেন। মায়ের ভাইরা কত কষ্ট দিয়েছে। তিনি সব অম্লান বদনে সয়ে কাজ করে গেছেন। ঠাকুরকে দেখ না। স্বামিজী কি করলেন। আদর্শ ঠিক রাখতে হবে। কি একটা শঙ্কর বল্লে, কি একটা বুদ্ধ বল্লে ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। ঠাকুরের কাছে ও সব কি? ঠাকুরের ব্রেন কত বড়। এক ব্রেণে কত ভাব খেলছে—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পুরুষ, নারী। অবতার কি?—অবতারের জন্মদাতা! সেই মা রামকৃষ্ণ রূপে জগৎকে তুলবার জন্য এসেছেন। তাঁর কিছু কি নিজের জন্য দরকার? এত ত্যাগ তপস্যা ভক্তদের সঙ্গে লীলা। সেই ভগবানই ত বলেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

—যদি 'আমি কাজ না করি, নিজের জন্য তপস্যা করাও স্বার্থপরতা। নিজের মুক্তি হল ব্যস্। দশের মুক্তির পথ করে নিজের মুক্তি করা হচ্ছে এযুগের আদর্শ। স্বামিজীর বই খুব পড়বে স্বামিজীর বইয়ে এই সব আছে।

২২শে মাঘ
১৩৩২ প্রাতঃকাল

বিপিন কুটীরের সাম্নে দিয়ে কয়েকদিন যাবৎ অনবরত যাত্রী বাবা বৈদ্যনাথ দর্শনে যাচ্ছে। মুখে 'বল বম্ আগড় বম্ ধ্বনি'—এইরূপ ধ্বনি শ্রবণ করে মহাপুরুষজী বলে উঠলেন।

মহাপুরুষজী—কি বিশ্বাস, কি আন্তরিকতা। কত কষ্ট করে পায়ে হেঁটে বাবা বৈদ্যনাথ দর্শনে যাচ্ছে। যে সময় 'বল বম্' বলে, সে সময় Divinity (ঈশ্বরীয় ভাব) জেগে উঠ্ছে।

ম—মহারাজ, এঁদের মধ্যে কেমন সরল বিশ্বাস, শিক্ষিতদের তেমন হয় না।

মহাপুরুষজী—হ্যাঁ, কেন হয় না। হাঁ, যে রকম শিক্ষা পায় তাতে হয় না। তীর্থ মাহাত্ম্য বিবরণ ছেলেদের শোনান উচিৎ। তোমাদের এখানে চালিও ত (বিদ্যাপীঠে)। এ রকম কোন বই আছে?

(—বাবু দুটা বইএর নাম বললেন।) গ্রন্থকার ও publisher জেনে বলতো আমি এখানে কিনে পাঠিয়ে দেব।

ম—হ্যাঁ মহারাজ, ঠাকুর এসে যে এখানে গরীবদের খাইয়েছিলেন সে কোন জায়গা?

মহাপুরুষজী—তা জানি না বাপু—আমরা যখন যাচ্ছি, তার বোধ হয় ১৫।২০ বছর আগে এখানে এসেছিলেন।

ম—আপনারাও তো ৩০।৩৫ বছর আগে এখানে এসেছিলেন।

মহাপুরুষজী—না বোধ হয় আরও বেশী। ঠাকুর দেহ রেখেছেন ১৮৮৬ তে না? তার ২।১ বছর আগে বলরাম বাবুদের পরিবারের সঙ্গে এসেছিলাম। রামবাবু, মেয়েরা, রাখাল মহারাজ ইত্যাদি। তখন আমি বেশীক্ষণ এই বৈদ্যনাথে থাকি নি। পাঁচ মিনিট বৈদ্যনাথ দর্শন করেই, এখন যেখানে যোশিডী ষ্টেশন আছে—ঐ বৈদ্যনাথ ষ্টেশন ছিল, তখন এই ব্রাঞ্চলাইন হয় নি, যোশিডীতে চলে যাই। একখানা মাত্র কাপড়—পথে বৃষ্টি নামে, পথে একটা ভাঙ্গা মন্দির ছিল, তার মধ্যে যাই। আর সকলে এখানে রইলেন।

স্বামী সারদানন্দের বৈশিষ্ট্য

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁর বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ মানবের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন—

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাৎ বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটীসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা
লভ্যতে॥

জীবগণের মধ্যে নর জন্ম দুর্লভ, মানব মধ্যে পুরুষ; পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র মধ্যে বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, তাহার মধ্যে বেদের মর্ম্ম-বেত্তা দুর্লভ। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত আছেন। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতম, যিনি একাত্ম ভাবে অধিষ্ঠিত। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলে; পরন্তু শত কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনা তাদৃশী মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

নিজ বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত পরানুকরণপর, বিদেশীর উপেক্ষাস্থল, দুর্ভিক্ষ মহামারীর ক্রীড়াভূমি, ম্যালেরিয়া বিসূচিকার প্রধান কেন্দ্র ভারতে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকি, কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনী, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, রামদাস, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষ-প্রসবিনী ভারতে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অজাতশত্রু, পুরু, পৃথ্বিরাজ, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদার রায় শিবাজী প্রভৃতি বীর প্রসবিনী ভারতে—মৈত্রী, গার্গী, দেবহূতি, অদিতি, সীতা, সাবিত্রী, লীলাবতী, মীরাবাই, অহল্যাবাই, লক্ষ্মীবাই, রাণী ভবানী প্রসবিনী—এই দুঃখিনী ভারত মাতার ক্রোড়ে দ্বিসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে, পৌষ শুক্লাষষ্ঠীতে এমন এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁর জীবনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ঐ শ্লোকটীর সম্যক্ সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম ছিল শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি সন ১২৭২ সালে (ইং ১৮৬৬) হুগলি জেলার অন্তর্গত মামকুল গ্রামে গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। ইনি বাল্যে যখন এল্‌বার্ট স্কুলে পড়িতেন সেই সময় হইতে খুব মিশুক, বিনয়ী, সরল, পরমতসহিষ্ণু ও হৃদিবান্ ছিলেন। স্কুলে

অধ্যয়ন কালে কতকগুলি বন্ধু মিলে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শরৎ-শশী ও অন্যান্য সকলে মিলে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত শরৎ ও শশী-ই পরবর্ত্তিকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সারদানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত হন। ঐ দিন-ই ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন লাভ করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দ যখন সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পড়িতেন সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম ত্যাগ, অমানুষিক প্রেম, সর্ব্বদা মার নামে উন্মত্ততা মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হওয়া প্রভৃতি অলৌকিক ভাবের বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকেই জীবনের আদর্শ ভাবিয়া নিয়মিত ভাবে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ম্যাডিকেল কলেজে পড়িতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন গলরোগাক্রান্ত হইয়া কাশীপুরে মতিলাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি ঠাকুরের সেবক মধ্যে অন্যতম হন। যাঁহারা সেই দেব চরিত চাক্ষুষ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—গম্ভীর অচল অটল সুমেরুবৎ অকম্প হলে-ও, সতত দয়া ক্ষমারূপ নির্ঝরিণীতে কত ত্রিতাপ দগ্ধ ঊষর ভূমি-সদৃশ হৃদয়, সুরম্য সুশীতল শ্যামল নিবিড় নিস্তব্ধ ফুল ফল সুশোভিত উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবস্থায় বলেছিলেন "এদের যীশু খৃষ্টের দলে দেখেছি।" সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একদিন কথা-প্রসঙ্গে শরৎ মহারাজকে বলেছিলেন মহারাজ! সেণ্ট পিটারের সহিত আপনার বহু বিষয়ের সাদৃশ্য আছে। শরত মহারাজ তদুত্তরে বলেছিলেন, "হতেও পারে, যখন আমি রোমে পোপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন সেখানের চার্চ্চে পিটারের মূর্ত্তি দেখে কিছুক্ষণ বেহুঁস হয়ে ছিলাম।"

কঠিন গিরিবক্ষ বিদীর্ণ করে যখন অতি সুমধুর সুশীতল স্নেহরাশি আত্মপ্রকাশ কোরে বিরাটের সন্ধানে অজানা-পথের যাত্রি হয়, তখন তার জন্মদাতা পাহাড় হতে ক্ষুদ্র বালুকণা পর্য্যন্ত যেমন তাহাকে তাহাদের নিজের সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখবার জন্য তার মহান্ পথে বাধা দিতে চায়, কিন্তু সেই স্বাধীন-মুক্তিকামী, নিরভিমানী, নিম্ন হতে নিম্নগামী নদ যেমন জীব-কল্যাণ কামনায় শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে স্বীয় গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলে যায় সেইরূপ এই মহাপুরুষও শঠতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বহু বাধা-সঙ্কুল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ স্বভাব সুলভ করুণায় আত্মহারা হয়েও, পরের দুঃখে কাতর হয়ে, পরকে আপন করিবার জন্য যেন তিনিও কি এক অজানা পথের সন্ধানে ছুটিলেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি নিজেকে ভুলে পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য সতত প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতেন; এমন 'হৃদিবান্ নিস্বার্থ প্রেমিক' জগতে খুব অল্পই আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যখনই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রলয়বাত্যা, অগ্নির প্রচণ্ড লীলা প্রভৃতি আধি-দৈবিক দুঃখ আসিয়া দুঃখিনী ভারত মাতার দুঃখ দুর্দ্দশা সর্ব্বাধিক বৰ্দ্ধিত করিয়াছে, তখনই নিরন্ন নরনারীর কাতর ক্রন্দনে "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি"বৎ কঠোর কোমল স্বামী সারদানন্দের হৃদয় তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান করাইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"-রূপ শ্রেষ্ঠ প্রতীক অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধির নব-বিধান স্বামী সারদানন্দই সশ্রদ্ধভাবে উহা জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর হইতে স্বামী সারদানন্দ কখনও পরিব্রাজকবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কখনও বরাহনগর মঠে

গুরুভাইদের সহিত একত্র বাস করিতেন; বরাহনগর মঠে থাকাকালীন এঁরা কিভাবে ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ ও কিরূপ কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা আপনারা অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে পাঠ করিয়াছেন। এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করিবার পর বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন তিনি নিজেকে ঐ কাজের অনুপযুক্ত ভাবিয়া বলিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, আমার মত মূর্খ লোক সেখানে গিয়া কি করিবে? কিন্তু স্বামিজীর একান্ত অনুরোধে তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। ঐদেশে যাইয়া তিনি বক্তৃতাদি দিতে ইতস্ততঃ করিয়া স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার সেবা করিতে আসিয়াছি, বক্তৃতা দিতে আসি নাই।" স্বামিজীও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না তিনি, তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "প্রচার কার্য্যই আমার সেবা।" স্বামী সারদানন্দ তখন নিরুত্তর হইয়া স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তাঁহার দেবোপম জীবন, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, অদ্ভুত বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যবাসী বহু নরনারী ধন্য হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দজী বেদান্ত দুন্দুভির বিজয়-নিনাদ সমগ্র পাশ্চাত্যদেশবাসীকে শ্রবণ করাইয়া যখন তাঁহার সেই দুঃখিনী ভারতমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের গৃহি-ভক্ত এবং সন্ন্যাসী গুরুভাইদিগকে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনা করিলেন, তখন এদেশের কাজের জন্য স্বামী সারদানন্দের মত বৈরাগ্যবান, স্থির ধীর বিনয়ী, পরমতসহিষ্ণু, গম্ভীর ও দূরদর্শী লোকের আবশ্যক ভাবিয়া তাঁহাকে ঐদেশ হইতে আনাইলেন এবং মঠ-মিশনের সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ের কার্য্য ধারা দেখিয়া আমরা অনুমান করি স্বামী সারদানন্দ যেন স্বামী বিবেকানন্দের হাতের যন্ত্র, যখন যেভাবে চালাইতেছেন সেইভাবেই চলিয়াছেন। স্বামিজী মঠ মিশনের নিয়মাবলীতে লিখিয়াছেন, "আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়, অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" স্বামিজীর লিখিত নিয়মাবলীর নিয়মগুলি স্বামী সারদানন্দের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ মঠ-মিশনরূপ যে বৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দের আ-প্রাণ চেষ্টায় ও যত্নে তাহা বর্দ্ধিষ্ঠ নয়নাভিরাম পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়াছে। তাই তপস্বী তুরীয়ানন্দ স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "*স্বামিজীর পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্য যদি কেহ খাটিয়া থাকে তবে সে শরৎ মহারাজ।*" ১৯২২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ পরমধামে গমন করিলে সঙ্ঘের সকলে তাঁহাকে মঠ মিশনের প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী আমাকে সেক্রেটারী করে গিয়েছেন আমি তাই থাকব।" ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যতদিন তিনি স্বশরীরে ছিলেন, ততদিন স্বামী বিবেকানন্দের আদেশানুযায়ী সেক্রেটারীই ছিলেন। স্বামিজীর প্রতি বাক্যে এরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা স্বামী সারদানন্দের জীবনে যেমন প্রকট, এমন খুব কমই দেখা যায়। স্বামিজী চাইতেন, "আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী" তা স্বামী সারদানন্দের জীবনে সমস্তগুলিরই সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দজী একদিন নানারূপ অযথা গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেও ক্রুদ্ধ হইলেন না দেখিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "শালা যেন বেলে মাছের রক্ত, কিছুতেই গরম হয় না।" তিনি কিরূপ বলিষ্ঠ ছিলেন যাঁহারা তাঁকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। স্বামী

শিবানন্দজীর মুখে শুনিয়াছি, "আমাদের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে স্বামিজীর পরেই শরৎ। নিরঞ্জন খুব হুড়ুম দুড়ুম করত কিছু কায়দাও জানত বটে কিন্তু শরতের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠত না।" তিনি কিরূপ মেধাবী ছিলেন তাহার পরিচয় যাঁরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন কিম্বা তাঁহার লেখা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ভারতে শক্তিপূজা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতা কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন।

অন্তঃসার শূন্য আপাত মনোরম পাশ্চাত্য শিক্ষাযুগে, যে যুগে প্রকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ, প্রমাণ মধ্যেই গণ্য নহে, যেইযুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই নব প্রবর্ত্তিত ভাব ধারার উপর স্বামী সারদানন্দের কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাহার আভাষ তাঁহার লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে। "দেখিতেছ না ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে ঐ কার্য্য কত দ্রুতপদ সঞ্চারে অগ্রসর হইতেছে? দেখিতেছ না কিরূপে গুরুগতপ্রাণ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে ঠাকুরের ভাব প্রবেশ লাভ করিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই চিন্তা জগতে কি যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইবে ততই এই অমোঘ ভাবরাশি সকল জাতির ভিতর, সকল কর্ম্মের ভিতর, সকল সমাজের ভিতর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত যুগান্তর আনিয়া উপস্থিত করিবে। কাহার সাধ্য ইহার গতিরোধ করে? অদৃষ্ট পূর্ব্ব তপস্যা ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক তেজোদীপ্ত এভাব রাশির সীমা, কে উল্লঙ্ঘন করিবে? যে সকল যন্ত্র সহায়ে উহা বর্ত্তমানে প্রসারিত হইতেছে কালে হয়ত সে সকল ভগ্ন হইবে, কোথা হইতে উহা প্রথম উত্থিত হইল তাহাও হয়ত বহুকাল পরে অনেকে ধরিতে বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু এ অনন্ত মহিমোজ্জ্বল জ্ঞানময় ঠাকুরের স্নিগ্ধোজ্জ্বদীপ্ত ভাবরাশি হৃদয়ে যত্নে পোষণ করিয়া তাহারই ছাঁচে জীবন গঠিত করিয়া পৃথিবীর সকলকেই একদিন ধন্য হইতে হইবে নিশ্চয়ই।"

আজীবন মাতৃভাবের সাধক স্বামী সারদানন্দ ব্রহ্মোপলব্ধি প্রথম মাতৃভাবেই করিয়াছিলেন; তারপর "মা-ই দেখিয়ে দিয়েছিলেন তুমি আমাতেই অবস্থিত।" তাঁর নিজের ডায়রীতে (ইং ১৯২৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী) তিনি লিখিয়া গিয়েছেন "You are in me" মাতৃজাতির উপর স্বামী সারদানন্দের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার লেখা ভারতের শক্তিপূজার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। "অস্বাভাবিক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্ব্বর। তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই না হইয়াছে? একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূ-জগতে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের আদর্শ স্থানীয়া দিব্য নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় অনুল্লঙ্ঘনীয়া শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা। তাঁহাদের পদরজেঃ কেবল ভারত নহে কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্বকালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন। ভারতের ধূলি সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধারা, চৈতন্য-ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্ম্মপ্রাণা অহল্যাবাই বা চিতোরের বীররমণীকুলের দেবারাধ্য-পাদস্পর্শে পবিত্রিতা। ভাব দেখি, ভারতের বায়ু যাহা প্রতি নিঃশ্বাসে তোমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাহাদের পবিত্রতায় ওতঃপ্রোত ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে—দেখিবে—তোমার জগন্মাতা নারীকুলের উপর বিশেষতঃ ভারতের নারীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমার

কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমায় পরিণত করিবে।

জানিনা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারত ভারতীর নিকট আচার্য্য স্বামী সারদানন্দের এই ভাব ও ভাষা কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে; তবে দৃঢ়তার সহিত একথা বলিতে পারি স্বামী সারদানন্দ নিজ জীবনে মাতৃ-জাতীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভগ্নিজ্ঞানে ভালবাসা, কন্যা জ্ঞানে স্নেহ ও করুণা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অদর্শনের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্ত্রী-ভক্তদের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পূরণ করিবার জন্য সারদার বরপুত্র স্বামী সারদানন্দ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। মেয়ে ভক্তদের নানাবিধ সাংসারিক কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনিয়াও তিনি কোন দিনই অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের পর সমস্ত বৈকাল প্রায় তাঁহার ঐ এক কাজে কাটিয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানায় আমাদের অনেকদিন, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সমস্ত বৈকাল এমনি কাটিয়াছে। উপরে গিয়া যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, "এখন কি নীচে যাবেন?" তাতে তিনি গম্ভীর হইয়া বলিতেন, "এখন এঁদের সঙ্গে কথা বলছি!" মাতৃপূজক স্বামী সারদানন্দজী মার দেহত্যাগের পর বলিয়াছিলেন, "পার্থ সারথি শ্রীকৃষ্ণ চলে যাবার পর অর্জ্জুন যেমন গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি, আমারও অবস্থা আজ তাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননীর দেহ ত্যাগের পর হইতে অক্লান্ত কর্ম্মী স্বামী সারদানন্দের কর্ম্মে বিরাগ ও ধ্যান জপে ডুবিয়া যাওয়ার ভাব আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সকাল হইতে ধ্যান জপ করিতে বসিতেন বেলা ১১টা ১১॥ টা পর্য্যন্ত। গোলাপ মা যোগীন মার দেহ ত্যাগের পর তিনি বলিয়াছিলেন, "মা এঁদের ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন এখন আমি সম্পূর্ণ ভার মুক্ত।" তিনি যেমন মুখে বলিতেন, "আমি মার বাড়ীর দারোয়ান" কাজেও ঠিক তাই করিতেন। ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর টাকা প্রায় সমস্তই তিনি মার সেবার জন্য মার মন্দির জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিতেন। শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা রাধুর পাছে কষ্ট হয় সে জন্য তাহার জন্য যৎসামান্য টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামী যোগানন্দ মার সেবা করিতেন। ১৯০০ সনে তাঁহার দেহত্যাগের পর হইতে স্বামী সারদানন্দ মার সেবাধিকার পাইয়াছিলেন এবং এমন যোগ্যতার সহিত উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে মা এক সময় বলিয়াছিলেন, "শরৎ না হলে কে আমার দায় পোয়াবে।" মা তাই বলিতেন, "শরতের যত বড় ছাতি তত বড় হৃদয়।" আমরা দেখি মার সংক্রান্ত জয়রামবাটী বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা পর্য্যন্ত যেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। ধন্য মাতৃভক্ত সাধক! আর আমরাও ধন্য, কারণ সেই দেব দুর্ল্লভ চরিত্র চক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহার মধুময় বাণী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছি। এইরূপ মাতৃভক্ত সাধকের মুখেই শোভা পায়—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

হে ভারত! সর্ব্বত্র আমরা নিত্যই ঐ স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকি? কিন্তু হায় আমরা কয়জন কতক্ষণ দেবী বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া ঐরূপ যথাযথ সম্মান দিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে উদ্যম করিয়া থাকি? শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ প্রকাশের আধার-স্বরূপিনী স্ত্রীমূর্ত্তিকে হীন বুদ্ধিতে কলুষিত নয়নে দেখিয়া কে না দিনের ভিতর শতবার সহস্রবার তাঁহার অবমাননা করিয়া থাকে? হায় ভারত ঐরূপ পশুবুদ্ধিতে স্ত্রীশরীরের অবমাননা

করা এবং শিবজ্ঞানে জীব সেবা করিতে ভুলিয়াই তোমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। কবে জগদম্বা আবার কৃপা করিয়া তোমার এ পশুবুদ্ধি দূর করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

স্বামী সারদানন্দ অপরের দুঃখ কিরূপ অনুভব করিতেন, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইলে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ অনুভব করিতে পারিবেন। এক সময় একটী যক্ষ্মা রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁহার বাড়ী হইতে তাঁহার দুঃখ জানাইয়া একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। সেই চিঠি খানি পাইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরদিন দুপুরবেলা যে সময় উদ্বোধনের সকলে বিশ্রাম করিতেছেন সেই সময় একা নিঃশব্দে উদ্বোধন হইতে বাহির হইয়া, কোথায় যাইতেছেন তাই দেখিয়া তাঁহার সেবক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলেন, তিনি যেখানে সেই যক্ষ্মা রোগী সেখানে গিয়া হাজির। ঐ রোগী তো এতদূর আশা করে নাই; হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দর্শন পাইয়া রোগীর শত বৃশ্চিক দংশনবৎ রোগ যাতনা ক্ষণেকের তরে তিরোহিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, রোগী হৃদয়ের আবেগাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া শরৎ মহারাজ বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবেন এমন সময় ভক্তের বিশেষ ইচ্ছা মহারাজকে কিছু খাওয়ায়। অন্য কিছুই ছিল না, শেষে নিজের জন্য যে কমলা নেবু ছিল তাহাই ছাড়াইয়া দিলেন এবং শরৎ মহারাজও নিঃসংকোচে উহা ভক্ষণ করিয়া আসিলেন। না খাইলে পাছে রোগীর প্রাণে আঘাত লাগে তাই বিনা বিচারে যক্ষ্মা রোগীর ছাড়ান কমলা খাইয়া আসিলেন। উদ্বোধনের অন্যান্য সাধুগণ জানিলে পাছে যক্ষ্মা রোগীর নিকট যাইতে নিষেধ করেন, তাই তিনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুপুর বেলা নিঃশব্দে রওনা হইয়াছিলেন।

আর একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব। '১৯২৪ সালে গরমের দিন মঠের একজন সাধুর হাঁপানি হয়েছে। অনেকদিন ধরে নানা রকম চিকিৎসা চলেছে অথচ কিছু উপকার হচ্ছে না খুব কষ্ট পাচ্ছেন। রোগা জ্ঞান মহারাজের ঘরের একটী খাটে শুয়ে আছেন। শরৎ মহারাজ উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে গিয়েছেন। চন্দন গাছের নিকট যেখানে এখন বাঁশের বেড়া রয়েছে ঐ বেড়াটী পার হয়ে শরৎ মহারাজ ঠাকুর মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত হাঁপানি রোগীটী জ্ঞান মহারাজের ঘর থেকে বাহির হয়ে শরৎ মহারাজের পায়ে ধরে প্রণাম করলেন ও রোগ যন্ত্রণায় কথা বলতে না পেরে কাঁদতে লাগলেন। রোগীর এই অবস্থা দেখে শরৎ মহারাজের প্রাণে খুব লাগল; তিনি রোগীর নাম ধরে বল্লেন, "কোন চিন্তা নাই শীঘ্রই সেরে যাবে" এই বলে মাথায় বার কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্য তার পরেই রোগ যন্ত্রণা কম হয়ে গেল ও শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেলেন। তিনি কাশীধামে থাকা কালে কোন বিশেষ সাধুর কথার মীমাংসায় বলেছিলেন,—ঠাকুর যদি অনন্ত-শক্তি-মান হন, তবে কি তাঁর সন্তানদের একটু শক্তিও থাকবে না?'

তাঁর সত্য নিষ্ঠা সম্বন্ধে একটী ঘটনার কথা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শাস্ত্রে দেখি,"উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে, প্রচলতি যদি মেরু, শীততাং যাতি বহ্নিঃ। বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াং, ন ভবতি পুনরুক্তং ভাষিতং সজ্জনানাম্॥" এই বাক্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বামী সারদানন্দের জীবনের একটি ঘটনায় দেখি। 'মঠের একজন সাধু একদিন সকালে উদ্বোধন হতে বেলুড়ে আসবেন শুনে শরৎ মহারাজ তাঁর নিকট বলে দিলেন, "বাবুরামদাকে বলে দিও যে আমি আজ বৈকালে মঠে যাব।" তিনিও বেলুড় মঠে এসে বাবুরাম মহারাজকে বল্লেন। তখনকার দিনে এখনকার

মত নানাবিধ যান বাহন ছিল না। একমাত্র উপায় গঙ্গার জোয়ারের সঙ্গে গয়নার নৌকা; অথবা পায়ে হেঁটে বাগবাজার হইতে আহিরীটোলা সালকে খেয়া পার হয়ে, সালকে হতে হেঁটে বেলুড়ে যাওয়া। বলে তো পাঠালেন, কিন্তু বৈকালে ভীষণ কাল বৈশাখীর মেঘ, জল, ঝড় হওয়ায় যথা সময় তাঁর বেলুড় মঠে আর যাওয়া সম্ভব হল না; বৃষ্টি যখন থামল, প্রকৃতি যখন শান্ত হলো তখন মঠে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গার জোয়ার, সে কাহারও অপেক্ষা করে না। কাজেই এখন আর দ্বিতীয় পন্থা আহেরীটোলা সালকের খেয়া পার ব্যতীত অন্য উপায় নেই। সত্যরক্ষার জন্য এই সামান্য ক্লেশ তিনি অবাধে বরণ করে নিলেন। বেলুড় মঠে গিয়ে যখন পৌছিলেন, তখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ নৈশাহারের পর বসে আছেন; তিনি শরত মহারাজকে ঐ সময় ঐ ভাবে যেতে দেখে একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ এমন সময় যে, বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?" শরৎ মহারাজ বল্লেন, "বিশেষ কোন কাজ নাই, তবে, সকালে বলে পাঠিয়েছিলাম তাই এলাম।" এই কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, "যেমি গুরু তেমি চেলা। ঠাকুরেরও যদি একবার কোন কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত তো তাই করা চাই। যদি বলে ফেলতেন যে শৌচে যাব তাহলে শৌচের বেগ না হলেও ঝাঁউতলায় গাড়ু নিয়ে শৌচে যেতেন। এমনি সত্যের আঁট ছিল।" এক্ষেত্রে শরত মহারাজও ঐ দিনে অত কষ্ট করে ঐ রাত্রে না গিয়ে পর দিন গঙ্গার জোয়ারের সময় গয়নার নৌকায় স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সকালে বলে পাঠিয়েছিলেন বলে অত কষ্ট করে ঐ দিনেই মঠে গেলেন।'

—পূর্ণাত্মানন্দ

জাতি গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিনি ভাঙিতে ভালবাসিতেন না, ভালবাসিতেন গড়িতে। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও শাস্ত্র প্রথানুযায়ী মূর্ত্তি পূজা ও দেবদেবীর আরাধনায় যে নিহিত সত্য আছে, তিনি পাইয়াছিলেন তাহার সন্ধান। ধর্ম্মকে ইচ্ছামত কাটিয়া ছাটিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ করিয়া স্বীয় মতানুযায়ী অভিনব ধর্ম্ম গঠনে তিনি কোনদিন প্রয়াস পান নাই, তাই তিনি বলিতেন—"I have come to fulfil, not to destroy."

জনসাধারণকে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেই একটা জাতির সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি লাভ হয় না। ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে সমাজ। সুতরাং এই কুসংস্কারান্ধ সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি কি করিয়াছেন তাহা না জানিতে পারিলে এই অধঃপতিত জনসমুদ্রকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে তাঁহার কতখানি শক্তি নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিবনা। অন্যান্য দেশের বিধিবদ্ধ দলের সহিত

ভারতের অবারিত দানের তুলনা করিয়া তিনি বলেন—"ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্যদেশের দরিদ্রকে আইনানুসারে গরীবখানায় (Poor house) যাইতে বাধ্য করা হয়; মানুষ কিন্তু আহার অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে, সুতরাং সে গরীবখানায় না গিয়া সমাজের শত্রু চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়।" সুতরাং তিনি কহিলেন, "দরিদ্র, যতদিন থাকিবে, দারিদ্রকে সাহায্য দানের আবশ্যকও ততদিন থাকিবে, এবং এ বিষয়ে ভারতের সমাজ এতদিন যাহা করিয়া আসিয়াছে সভ্য পাশ্চাত্য জগৎ অপেক্ষা তাহাই সমাজের কল্যাণের পক্ষে শ্রেয়ঃ সন্দেহ নাই।"

তিনি চিরদিন ভাঙনের বিরোধী ছিলেন। সমাজ সংস্কারেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। তাঁহার পূর্ব্বের সংস্কারকগণ ভাঙনের মন্ত্রেই সমস্ত শক্তিক্ষয় করিয়াছিল—গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য তাই তাঁহাদের আর ছিল না। তাই তিনি কহিলেন যে সকল ক্ষুদ্র কুসংস্কার সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশাইয়া আছে সেই সমুদয় সমাজ দেহ হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল বিরাট কুসংস্কার বিষাক্ত কীটের ন্যায় সমাজের দেহ জীর্ণ দূষিত করিয়া তুলিতেছে—তাহাদিগকে দূর করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপনয়নে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক জন্মতিথিতে তিনি ব্রাহ্মণেতর কয়েকজন ভক্তকে উপনয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্র দান করিলেন। সমাজকে আঘাত দিবার জন্যে সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ইহা করেন নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "বহুদিন প্রসুপ্ত হিন্দুজাতিকে একটা আত্মসম্বিৎ দান করা।" তিনি ভারতের ক্ষুদ্র শাখা উপশাখায় বিভক্ত হিন্দুজাতিকে একত্রীভূত করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী চারিবর্ণে পবিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে তিনি জীবিত থাকিতেই বাঙ্গালীর কয়েকটী প্রবল জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা বর্ণাশ্রমের গূঢ় আদর্শে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত না হইলেও প্রশংসনীয়। নিজেকে বুঝিবার, নিজেকে জানিবার সমাজ-জীবনে যথাযোগ্য স্থান ও দায়িত্বগ্রহণ করিবার চেষ্টায় এই যে আত্ম-চেতনা বহুবর্ষ পরে মানবকে উদ্বেলিত করিল, তাহার ফল শুভ ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না। মানুষের ভিতর এই প্রাণই এতদিন প্রসুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল। সেদিন সোনার কাঠির স্পর্শে একবার যখন তাহার সুপ্তি জড়িমা টুটিল—তখন আপনিই সে অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইবে, এ গতি রোধ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য স্বামিজী প্রথমে একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিলেন। নিরুপায় হিন্দুজাতির পণপ্রথার ভীষণ নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইলে বৈদেশিক ভাব হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে ভারতের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, সুতরাং শুধু আত্মরক্ষা করিলে চলিবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও অপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যের চিন্তাস্রোতে পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেদান্তপ্রচারের নিমিত্ত নিখুঁত চরিত্রবান যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহাতে হিন্দু জাতির আত্ম গৌরবজ্ঞান জন্মিবে। অত্যধিক বিবাহ

নিবারণ করিতে হইবে। তিনি বলিতেন, ভারতের ভিক্ষুকও বিবাহ করিয়া আরও দশজন ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ব্যগ্র। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অবিবাহিতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন। জাতিভেদের ভীষণ নিষ্ঠুরতা আভিজাত্য গর্ব্বে স্ফীত স্বার্থোদ্ধত জাতির কোটী কোটী অস্পৃশ্য নরনারীর প্রতি ঘৃণা এবং অবহেলা সমস্ত সমাজকে নিবিড় অন্ধকারের দিকে চালনা করিতেছিল। অজ্ঞান ভারতবাসী তাহা বুঝে না—

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে
বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে
পশ্চাতে টানিছে"

স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানোদীপ্ত নয়নে এ সত্য আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, সঙ্কীর্ণচেতা বৃথাগর্ব্বোদ্ধত ব্রাহ্মণগণের ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী অজ্ঞ গুরুকুলের অন্যায় অনধিকারচর্চ্চা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে—ধর্ম্মচিন্তায় প্রত্যেকে স্বাধীন—ইহাই হউক সমাজের মূলমন্ত্র। "সকলকে বুঝাগে ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমানাধিকার—আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।" কতকগুলি অর্থহীন বহিরাচারের আসারতা প্রতিপাদন করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে ঐ কুসংস্কারগুলি যতদিন সমাজদেহে অবস্থান করিবে ততদিন জাতির উন্নতির আশা করা অসম্ভব। হিন্দুর সমাজ অন্ধ, যাহা যথার্থ পাপ, যথা—ব্যভিচার, সুরাপান পরদারগমন ইত্যাদি, সমাজ নিশ্চিন্ত মনে এই সকলকে নিষ্পাপ বলিয়া মানিয়া লইতেছে, কিন্তু আহারাদির সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অনৈক্য ঘটিলেই সমাজ তাহা ঘোরতর সর্ব্বনাশ বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। তিনি বলিলেন, "সকলের ভোগ সমান হওয়া উচিত। "বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। যেমন কোন ব্যক্তি যতই গুণবান বা ধনবান হউক না কেন, বংশগত জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ—করিতে পারে না, সুতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু অংশভাগী হইয়া থাকে।"

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে ভারতে জাতিভেদ চরম হইয়া উঠিয়াছে—ইহাতে দেশের মঙ্গল যেটুকু হওয়ার আশা আছে—অমঙ্গল হইতেছে তাহার শতগুণ বেশী। "বড় দুঃখের বিষয় এদেশের লোক এখন না হিন্দু, না বেদান্তবাদী, না কিছু। তাহারা কেবল ছুঁৎমার্গের অনুসরণ করে। এ ভাবটা দূর করতে হবে। উপনিষদের মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার কর, জ্ঞানের আলো জ্বালাও আর সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর কর।" কহিলেন, "আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন কর, আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের যে পাষাণ প্রাকার বর্ত্তমান, তাহাকে ধুলায় লুটাইয়া দাও। ধনী দরিদ্রের মধ্যে এই যে বৈষম্য—উচ্চজাতি এবং নীচের মধ্যে এই যে অস্পৃশ্যতার ব্যবধান, ইহাই সমগ্র ভারতকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করিবার পথে প্রবল বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" তাই তিনি সকলের কর্ণে বিরাট ঐক্যের মন্ত্র গাহিলেন সকলের প্রাণের প্রেমের তন্ত্রীতে আঘাত দিলেন—"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।"

সর্ব্বহারা দুঃখিনী ভারতমাতার পদপ্রান্তে অর্ঘ্যের ডালি আজ শূন্য। কবে তাহার সকল সন্তান ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া একত্রে তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি দিবে—দুর্ভাগিনী আজ তাহারই পথ পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন।—

স্বামিজীর গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ অমানিশার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বাজিয়া উঠিল—

"এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘটে হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ—নীরে
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর—তীরে॥"

যে মহানিদ্রায় ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, সেই সুপ্তি জড়িমা হইতে ইহাকে মুক্ত করিতে হইলে চাই অদম্য উৎসাহ ও অসীম কর্ম্মানুরাগ। পুরাতনের মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নতুনের উদ্বোধন গাহিয়াছে চিরদিন দেশের যুবকগণ। 'উষার দুয়ারে আঘাত হানিয়া রাঙ্গা প্রভাত' আনিয়াছে যৌবনের শক্তি বীর্য্যের পূজারীবৃন্দ। ভারতের উদ্ধার কল্পে স্বামিজীও তাই চাহিলেন বীর্য্যশালী নিঃস্বার্থ কর্ম্মঠ মৃত্যু ভয় হীন সংসারের নাগ পাশ মুক্ত একদল অবিবাহিত যুবক। বক্ষে অসীম প্রেম এবং কর্ম্মপ্রেরণা লইয়া তিনি ভারতের যুবকদিগকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় আহ্বান করিলেন—"চাই আদর্শ জীবন। জাতি ও সমাজ রক্ষা করিতে, দেশের বংশধর দিগকে রক্ষা করিতে, কতকগুলি নিঃস্বার্থ অবিবাহিত জীবনের প্রয়োজন। যাঁহারা বিলাসিতা ও নীচতার উদ্দণ্ড কপটতাগুলিকে পদ-দলিত করিয়া পৌরুষ কঠিন জীবন যাপন করিবেন ·· যাঁহারা আত্মজীবন গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও চরিত্রগঠন করিতে উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করিবেন। আমরা বাঙ্গলার বক্ষে মানুষ গঠনকারী এই নবযুগের কর্ম্মিগণের সুমহান প্রয়াস প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। এখনও কি সময় হয় নাই······আমি চাই এমন লোক যাহাদের পেশী সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে। আর যাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য—মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য্য—ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাহাদের সবগুণ, সব শক্তি আছে, কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহনামক কথিত পশুত্বের বেদীর সামনে হত্যা না করা হইত।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমাধির পরে তিনি বিরাট রামকৃষ্ণ সংঘের নেতা হইয়াছিলেন। এইসংঘের ভিতরই তিনি প্রথম তাঁহার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে গমনের পূর্ব্বেই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূল-বৈশিষ্ট্য, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং ভবিষ্যতে যে বিরাট কর্ম্মের আহ্বান আসিবে তজ্জন্য তাহাদিগকে ধৈর্য্য সেবা শিক্ষাদ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রস্তুত করিতে ছিলেন। বহুদেশ ভ্রমণের ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংঘব্যতীত কোন বৃহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া তিনি ভারতের অবস্থা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আপনার উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষাদান করিবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইহার উদ্দেশ্য হইল "শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের হিতার্থে যে সকল সত্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এবং নিজ জীবনে যাহা প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচার করা এবং জন-নারায়ণকে তাঁহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক

মঙ্গলের জন্য ঐ সকল তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা। জগতের সকল ধর্ম্মমতকে এক অখণ্ড সনাতনধর্ম্মের রূপান্তরজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই হইল ইহার ব্রত। সাধারণ লোকের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত করা, শিল্প ও শ্রমজীবিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করা, বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন করাই হইল উহার কার্য্যপ্রণালী। ভারতের বিভিন্নস্থানে আচার্য্যব্রতের কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাহারা দেশবিদেশে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন, ভারতের বাহিরের প্রদেশে ব্রতধারী প্রেরণ ও সেই সকল বিদেশীয় আশ্রমের সহিত ভারতীয় আশ্রম সকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপনও ইহার কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত হইল।

গুরুভ্রাতাদিগকে তিনি সর্ব্বত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। "হিন্দুজাতি অনাদিকাল হইতে জড়ের পরিবর্ত্তে চৈতন্যকে, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগকেই শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অতএব যতদিন হিন্দু-জাতির মনের ভাব এইরূপ চলিবে—আর আমরা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি চিরকালের জন্য এইভাবে চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নরনারীর "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" সর্ব্বত্যাগ করার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার আশা করিতে পারেন?" গুরু ভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—

"শোন বৎসগণ! শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন—জগতের কল্যাণ কামনায়—দেহ বিসর্জ্জন করে গেছেন। আমি—তুমি—প্রত্যেককেই জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করতে হবে। বিশ্বাস কর আমাদের হৃদয়মোচিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হতে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্ম্মবীরগণ উদ্ভূত হয়ে জগৎ আলোড়িত করে দেবে।" "প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগি-পুরুষের প্রয়োজন যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বালসন্ন্যাসীকে এইভাবে তৈরী করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে সকলকে তাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলবে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিসে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান্‌সত্যগুলি সোজা কোথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে।"

তাঁহার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে অন্নদান করিয়াছে এবং অক্লান্ত ভাবে সেবা করিয়াছে। কলিকাতার ভীষণ প্লেগের সময় মৃত্যুউৎসবের উদ্দণ্ড লীলা যখন সহরময় চলিয়াছে, তখন নির্ভীক সেবকবৃন্দ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অসহায় প্লেগরোগগ্রস্ত নরনারীকে রোগযন্ত্রণা ঘুচাইতে চেষ্টা করিয়াছে, রোগগ্রস্ত সম্বলহীন তীর্থযাত্রিগণের সেবা করিয়াছে। রাজপথ ও গঙ্গার ঘাট হইতে রুগ্ন নরনারীকে বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া তাহাদের সাধ্যমত ঔষধপথ্যদানে নীরোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শনই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিয়া অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্বামিজী যে সেবাধর্ম্মের মঙ্গলময়ী প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন—আজ তাহারই অনুকরণে ভারতের স্থানে স্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য-আদর্শে-দীক্ষিত ঋষিগণের দ্বারা ভারতের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সেই জন্যই

তিনি অন্ততঃ একসহস্র শক্তিমান চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী প্রচারক গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সন্ন্যাসী আচার্য্য-কুলের অবনতির সহিত ভারতের দুর্দ্দশার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ভারতের উদ্বোধনকল্পে, জাতির চালকরূপে যে একদল আচার্য্যের প্রয়োজন, তাহাদের প্রত্যেককেই প্রথমে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। তিনি কহিতেন, "ধর্ম্ম যদি থাকে, তবে ধর্ম্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক – ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্ম্মের বিশেষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ তিনি ধর্ম্মকেই তার মূল লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈনিক-স্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় থাকিবে, ততদিন কোন্ ধর্ম্মের বিনাশাশঙ্কা ?"

নবযুগের উদ্বোধন গাহিতে তিনি সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া তুলিলেন; তাহাদিগকে তিনি কহিলেন, "সাধারণ লোক ভালবাসে বাঁচিতে, সন্ন্যাসীদের ভালবাসিতে হইবে মৃত্যুকে। তাহাদের অন্তরকে এমনই বজ্রসম দৃঢ় করিতে হইবে যে পরকল্যাণের কামনায় আত্মবিসর্জ্জন দিবার আহ্বান যেদিন আসিবে, সেদিন যেন তাহারা বিহ্বল না হইয়া পড়ে। তিনি কহিলেন, "গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করারূপ প্রাচীন আদর্শের আজ আর প্রয়োজন নাই। মন্দিরকোণে সুখের উপাসনায় মধ্যে ডুবিয়া না থাকিলে যদি মুক্তিলাভ না হয়, তবে রহিল তোদের মুক্তি, রহিল তোদের ধ্যান।"

"ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।"

"মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধনপরে
বাঁধা সবার কাছে
রাখরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

জগতের লোককে এমনিই ভালবাসিয়াছিলেন, এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই অসীম প্রেমের বলেই তিনি একটা মৃতপ্রায় জাতিকে দিলেন প্রাণ। ভীরুতা স্বধর্ম্মেনিষ্ঠাহীনতা, পাশ্চাত্যের অন্ধঅনুকরণপ্রিয়তা এবং যুগযুগান্তের কুসংস্কারের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, অজ্ঞানতার অন্ধকারের ভিতর দিয়া যে জাতি সত্য ভ্রমে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করিয়াছিল, সেই ধ্বংসোন্মুখ দুর্ভাগা জাতির সম্মুখে ধ্রুবতারার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া তাহার রথের গতি মৃত্যুর দিক হইতে জীবনের দিকে, অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার অঙ্গে ত্যাগের ভস্ম, চক্ষে শক্তির দীপ্ত জ্যোতিঃ, হস্তে প্রেমের মোহন মুরলী। সেই মুরলীতে তিনি দিলেন সুর—গোকুলের 'কালা'র হাতে বাজিল বাঁশী—যে সুরে সেদিন যেমন যমুনা উজান বহিয়াছিল, আজ ভাগীরথীর জলে সেই একই রূপ আন্দোলন জাগিল, সেই 'বাঁশী'র সুরে সেদিন যেমন গোকুলের মুগ্ধ নরনারী সকল কর্ম্ম ভুলিয়াছিল, আজও দুঃখী ভারতবাসী প্রেমের সুরে তেমনি মুগ্ধ হইয়া বংশীবাদককে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার অঙ্গে সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের বিভূতি—সেই ভস্ম হইতে তিনি ভারতবাসীকে দিলেন ত্যাগের মন্ত্র, ললাটে আঁকিয়া দিলেন শক্তির দীপ্ত তিলক। দুর্য্যোগের ঘনান্ধকার দেখিয়া পাছে তাহারা ভয় পায়, তাই তাহাদের অন্তরে জাগাইয়া দিলেন উলঙ্গিনী শ্যামার মরণনৃত্য।

ললাটে শক্তির তিলক অঙ্কিত করিয়া, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত শতশত নরনারী প্রেমের সুরে এক হইয়া ভয়হীন অন্তরে নিশার অন্ধকার পার হইয়া দীপ্ত নয়নে বিংশ শতাব্দীর নবোদিত অরুণের প্রতি সহাস্যাননে চাহিল—

"নতুন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ্।"

শ্রীবনলতা গুহ

গোমুখী যাত্রা

(শেষ)

৪। যমুনোত্তরী

আজ আমাদের যাত্রার অষ্টম দিবস। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সংক্রান্তি কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। আমাদেব সঙ্গিত্রয় অনেকক্ষণ পূর্ব্বে পৌছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমবাও আর বিলম্ব না করিয়া স্নানেব উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যমুনায় অবতরণ কবে কাব সাধ্য। অবগাহন অসম্ভব দেখিয়া আমবা কমণ্ডলু ভরিয়া যমুনাব জল মাথায় ঢালিতে ঢালিতে বাব বাব উচ্চাবণ করিতে লাগিলাম।—

"ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা।"

তৎপরে তপ্ত কুণ্ডে অবগাহন কবিলাম। আট দিনের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত গ্লানি যেন তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। দেহে নূতন বলেব সঞ্চাব হইল। মনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। স্নানান্তে মন্দিরে যাইয়া যমুনাজী ও গঙ্গাজীকে দর্শন কবিলাম। গঙ্গাজীর মূর্ত্তি শ্বেত প্রস্তরের। যমুনাজীব মূর্ত্তি কৃষ্ণ-প্রস্তবের। বিগ্রহের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যাহাব দ্বারা তাহাদিকে গঙ্গা বা যমুনাজীব মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মন্দির অক্ষয়তৃতীয়া হইতে দীপাম্বিতা পর্য্যন্ত ৬ মাস খোলা থাকে। তিনজন পুবোহিত আছেন; এক একজন পর্য্যায়ক্রমে দুইমাস করিয়া যমুনাজীর সেবাদি কবিয়া থাকেন। পুরোহিতের বাড়ী 'খরশালী' গ্রামে। সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া যায়। সেবা পূজাদি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হয় বলিয়া মনে হইল না। এখানে রান্নাভোগের কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ মেওয়া, মিছরি ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং আয়তনে নাতিক্ষুদ্র। পুবাতন জীর্ণ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা তৈয়ার হইয়াছে। এখানে কোন পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না।

যমুনোত্তবী সমস্ত ভাবতবাসী হিন্দুর তীর্থ। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রাজপুতনা, সংযুক্তপ্রদেশ, নেপাল ও বঙ্গদেশ—সকল প্রদেশের যাত্রিগণকেই সেইদিন উপস্থিত দেখিতে পাইলাম। সমবেত যাত্রীর সংখ্যা শতাধিক হইবে। ইতিমধ্যে অনেকে স্নানাহার সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়াছেন। উপস্থিত যাত্রীদেব মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব— সকল সম্প্রদায়েব লোকই রহিয়াছেন। সাধুদেব মধ্যেও দশনামী, বৈষ্ণব, উদাসী ও যোগিগণকে দেখিতে পাওয়া গেল। সেই বিদ্যার্থী ও সন্ন্যাসী যাত্রিদলের সহিত এখানে পুনরায় দেখা হইল। তাহাবা আজ পূর্ব্বাহ্নে আসিয়াছেন। উত্তবাখণ্ডেব চাবিধাম দেখিবেন বলিয়া তাহারা আজই অপরাহ্নে নামিয়া গেলেন। যাত্রিগণ প্রত্যেকে আপনভাবে আপন কাজে ব্যস্ত। তাই এত লোক-সমাগম সত্ত্বেও স্থানটির গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কাণপুব হইতে জনৈক শেঠ সপরিবারে বহু লোকজন সহ আসিয়াছেন। তিনি পুরী ও হালুয়া তৈয়ার করাইয়া সমাগত সাধুগণকে ভোজন করাইলেন। সেই গুজরাটী যাত্রিদলও আজ এখানে উপস্থিত। তাহারা সাধুদিগকে 'হালুয়ার' ভাণ্ডারা দিলেন। আমরাও ভাগ পাইলাম।

যমুনোত্তরীতে একটী বেশ বড় দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। আমেদাবাদ নিবাসী জনৈক শেঠের সদাশয়তায় উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ধর্ম্মশালা সংলগ্ন একটী ছোট দোকান আছে। তথায় চাল, ডাল, আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়, কিন্তু বড় দুর্ম্মূল্য। যাত্রীদের রান্না-খাওয়ার জন্য একটী বড় চালা ঘরও আছে। ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ তিনটী উষ্ণ-প্রস্রবণের চারিধার প্রস্তরে বাঁধাইয়া একটী চত্বর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আহারাদির পর সাধুগণ তথায় বসিয়া শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কোন কোন গৃহস্থ ভক্তও আসিয়া যোগদান করিলেন। একজন গেরুয়াধারী যুবক সাধু কবীরের দোঁহাবলী এমন ভাবের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন যে চারিদিক হইতে লোক জড় হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। সাধুটিকে বেশ প্রেমিক ও ত্যাগী বলিয়া মনে হইল। তাহার সঙ্গে একটী সূতী কম্বল, একটী তম্বরু, একটী মৃগচর্ম্ম, খানকয়েক বই, দুখানা বহির্ব্বাস ও কৌপীন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। একজন দশনামী সন্ন্যাসী অতি নিবিষ্টমনে গীতাপাঠ করিতেছিলেন। তিনি তিনরাত্রি যমুনোত্তরীতে বাস করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কয়েকজন গৃহস্থ ভক্ত—মেয়ে ও পুরুষ, তাঁহার নিকট গীতা ব্যাখ্যা শুনিতে আসিলেন। তিনি স্বল্প কথায় তাহাদিগকে বিদায় দিয়া পুনরায় গীতাপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ইত্যবসরে জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী নিকটে আসিয়া খুব আড়ম্বরপূর্ব্বক গীতাব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। কোন কোন সাধুকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একান্তে বসিয়া ধ্যান ভজন করিতে দেখা গেল।

যমুনোত্তরীর প্রায় ১ মাইল উপরে ত্রিবেণী-সঙ্গম। সেখান হইতে যমুনার উদ্ভবস্থান অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই। যাত্রীদের পথ যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত আসিয়াই শেষ হইয়াছে। স্থানটী অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া যাত্রিগণের মধ্যে বিরল কেহ সেখানে যাইয়া থাকে। যমুনোত্তরী দর্শন করিয়াই সাধারণতঃ তাহারা নামিয়া যায়। এত নিকটে আসিয়া যমুনার উৎপত্তিস্থল দর্শন না করিয়া ফিরিতে আমাদের মন চাহিল না। পরদিন প্রাতে একজন পাহাড়ী পথ-প্রদর্শকরূপে আমাদের সঙ্গী হইতে রাজী হইল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ত্রিবেণী রওনা হইলাম। পথ-প্রদর্শকসহ আমরা ছয়জন। আরো দুইজন সাধু আমাদের অনুগামী হইলেন। প্রথমেই যমুনোত্তরীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ যমুনা পার হইতে হইল। যমুনা তীরে রাশিকৃত বরফ চিরসঞ্চিত হইয়া আছে। শুভ্র তুষারস্তূপের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো পাথর মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। বরফের উপরে বড় বড় পাথর ডিঙ্গাইয়া আমরা অনেক নীচে জলের ধারে উপস্থিত হইলাম। যমুনার পরিসর এখানে ৫।৬ হাত মাত্র হইবে। গভীরতা ২।৩ হাতের বেশী নয়। কিন্তু জলের এমন প্রচণ্ড বেগ যে কাহার সাধ্য তাহাতে পদস্থাপন করিতে পারে! উন্মাদিনীর মত যমুনা শিলা সমূহ অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রস্তর সমূহে প্রতিহত হইয়া জলরাশি আবর্ত্তিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। হস্তী পর্য্যন্ত সেই প্রবাহে পতিত হইলে শিলা-রাশির ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এদিকে যমুনার সদ্যঃ-তুষার বিগলিত জল : সকাল-বেলার ঠাণ্ডায় পায়ে লাগিবামাত্র শরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। যাহা হউক জুতা হাতে নিয়া লাঠি ভর করিয়া অসীম সাহসে জল নিমগ্ন ও অর্দ্ধমগ্ন প্রস্তর সমূহে একে একে পদক্ষেপ করিয়া অতি সন্তর্পণে যমুনা অতিক্রম করিলাম। ঠাণ্ডা

জল পায়ে লাগিয়া পা অবশ হইবার উপক্রম হইল। ইতিমধ্যে আমাদের অনুগামী একজন সাধু বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। যমুনা পার হইয়া বরফের উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে একটী স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, যে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যমুনা প্রবাহিত হইতেছে, উহারা যেন পরস্পর মিলিত হইয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহাদের শিখরদেশস্থিত চির হিমানীপ্রবাহ হইতে তিনটী জলধারা নির্গত হইয়া প্রপাতাকারে নামিয়া আসিতেছে। সর্ব্ব পশ্চিমের ধারাটী মূল যমুনা। পূর্ব্বদিকের ধারাটী গঙ্গা এবং মধ্যেরটী সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রিধারার সঙ্গমস্থল বলিয়া ঐ স্থানটী ত্রিবেণী নামে পরিচিত। সূর্য্যোত্তাপে বিগলিত তুষাররাশি হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই কি পুরাণে যমুনাকে কালিন্দী বা সূর্য্যকন্যা বলা হইয়াছে?

কলিন্দ শব্দের অর্থ সূর্য্য, অতএব কালিন্দী শব্দে সূর্য্যতনয়া বুঝায়। আমরা ত্রিবেণীর জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিশি ভরিয়া, সঙ্গে লইয়া আসিলাম।

যে পর্ব্বতশ্রেণী হইতে যমুনার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ 'বাঁদরপুচ্ছ' নামে পরিচিত। প্রবাদ এই যে হনুমান লঙ্কাদাহের পর এই পর্ব্বতোপরিস্থ তুষারশৃঙ্গবেষ্টিত একটী হ্রদে জলন্ত লাঙ্গুল নিমজ্জিত করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। সেই হ্রদের জলই আজ পর্য্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণরূপে পর্ব্বতের পাদদেশে নিঃসৃত হইতেছে। বরাহ পুরাণমতে ভাগীরথী এবং অলকানন্দার উৎপত্তি স্থলও এই 'বাঁদর পুচ্ছ' পর্ব্বত। রামায়ণে ইহা কলিন্দগিরি ও যমুনা পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কলিন্দদেশ বলিতে বর্ত্তমান গাড়োয়াল প্রদেশ ও সাহারাণপুর জেলা বুঝাইয়া থাকে।

—সৎপ্রকাশানন্দ

পুঁথি ও পত্র

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত—শ্রীপুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য, এম-এ প্রণীত—মূল্য দেড়টাকা মাত্র—প্রাপ্তিস্থান শ্রীহট্ট লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট। গ্রন্থখানি যে বিশেষ উপাদেয় এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে সংক্ষেপে আচার্য্যপাদের জীবনী, দর্শন ও সাধন প্রণালী সুচিন্তিত হইয়াছে। তবে যে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের বলিবার আছে, তাহা অতি সংক্ষেপে এই—(১) সন্তদাস বাবাজীর মতে আচার্য্য নিম্বার্ক শ্রীশংকরের পূর্ব্বে—ইহা অতি দুর্ব্বল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য শঙ্করের জীবিত কাল ৬৮৬—৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। আচার্য্য রামানুজের জীবিতকাল, ১০১৭-১১৩৭ খৃঃ অঃ এবং আচার্য্য নিম্বার্কের জীবিতকাল ইহার কিছু পূর্ব্বে—লেখকের এই মতই আমাদের ঠিক বলিয়া বোধ হয়। আবার দেবাচার্য্যের ভাষ্যের অনুযায়ী রামানুজের পূর্ব্বে মধ্বকে ধরা যায় না, কারণ মধ্বের জীবিতকাল ১১৯৯ হইতে ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্য। (২) বিদ্যারণ্য ও সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে নিম্বার্ক মত না থাকার হেতু—উহা উপবর্ষ সম্প্রদায় ভুক্ত—দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়বাদী এবং শংকর বিচারে পরাজিত ভাস্করের মতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া। ভাস্করাচার্য্য অদ্বৈ

শতাব্দীর নন পবন্তু শংকরের সমসাময়িক। রামানুজ যেমন শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য্য, শংকব বিচারে পরাজিত প্রথম নীলকণ্ঠেব ভাষ্যকে উজ্জীবিত কবেন, নিম্বার্ক সেইরূপ লুপ্তপ্রায় দ্বৈতাদ্বৈত ভাস্কর মতকে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। (৩) শংকরাচার্য্য বৈদিক সাহিত্যের দর্শন ও সাধন পদ্ধতি নির্ণয় কবিতে গিয়াই বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া কর্ম্মকেই ধর্ম্মের প্রথম সোপান বলিয়াছেন, তাঁহার বিষয় পৌবাণিক সাহিত্য হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ভক্তিব প্রাধান্য বেদান্ত দর্শনে বা বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতি ভাষ্যে দেখাইতেন। ভক্তিপ্রধান গোপালতাপন্যাদি শ্রুতি বোধহয় তখনও অপ্রকাশিত ছিল। পবন্তু বিষ্ণু পুবাণাদি অবলম্বনে তাঁহাব ভক্তিপর স্তুতি আজিও ভাবতেব একপ্রান্ত হইতে অপবপ্রান্তে প্রবাহিত। (৪) নিম্বার্ক মতে বাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব আধ্যাত্মিক—রাধাব নব শবীবে আবির্ভাব সম্বন্ধে মত অস্পষ্ট—ইহা শ্রী সম্প্রদায়েব দাম্পত্য বা গৌড়িয়া মতের পবকীয়া সম্বন্ধও নহে। তথাপি রাধার নবশবীবে অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীবামকৃষ্ণের অনুভব সিদ্ধ। (৫) শ্রীকৃষ্ণেব ঐতিহাসিকতা প্রমাণেব জন্য ঋগ্বেদেব সূক্তগুলি উদ্ধৃত না করিলেও চলিত, কাবণ উহাবা সেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্নার্থক। ঋগ্বেদে ধনবাচী 'বাধা' শব্দও অনেক আছে। (৬) শ্বেতাশ্বতব, মহাভারত এবং ভগবতের কপিল ঈশ্বব মানিয়াছেন এবং একাত্মবাদী, পরন্তু সাংখ্য-কাবিকাব কপিল ঈশ্বর মানেন নাই এবং বহুপুরুষ এবং এক-প্রকৃতিবাদী। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ মহাভারতের কপিলেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

ইহারসম্পূর্ণ বিচাব একখানি গ্রন্থ সাপেক্ষ, সেই জন্য মাত্র কয়েকটী চিন্তা কবিবাব বিষয় এখানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

ধর্ম্মপদট্ঠ কথা—শ্রীশীলালঙ্কার স্থবির কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত। মূল্য পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান বৌদ্ধ মিশন, ১৫৮ আপার ফাইরি ষ্ট্রীট, পোঃ কণ্ডাগ্রে, রেঙ্গুন, বর্ম্মা। বৌদ্ধ বেদের নাম ত্রিপিটক—ইহা ত্রিশিক্ষার অন্তর্গত। প্রথম বিনয়পিটক—শীলশিক্ষাব প্রাধান্য বিধায়, ইহাকে অধিশীল শিক্ষা বলে। দ্বিতীয় সূত্র-পিটক—চিত্তবৃত্তিব নিবোধ শিক্ষার প্রধান্য বিধায়, ইহাকে অধিচিত্তশীক্ষা বলে। তৃতীয় অভিধর্ম্মপিটক—প্রকৃষ্টজ্ঞান শিক্ষার প্রাধান্য বিধায়, ইহাকে অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা বলে। বিনয় পিটক—২ বিভঙ্গ, ২ খন্ধক ও ১ পবিবাব ভেদে ৫ খণ্ড। সূত্র পিটক ৫ নিকায়ে বিভক্ত। অভিধর্ম্ম পিটক ৭ প্রকবণে বিভক্ত। বৌদ্ধ গীতা "ধম্মপদ" গ্রন্থখানি সূত্রপিটকেব অন্তর্গত ক্ষুদ্রক-নিকায়েব দ্বিতীয় অংশ। ইহাতে ৪২৩টি গাথায় শ্রীবুদ্ধেব অমূল্য উপদেশ সংগৃহীত। ইহাতে যমক, অপ্পমাদ, চিত্ত, পুপ্ফ, বাল, পণ্ডিত, অবহন্ত, সহস্স, পাপ, দণ্ড, জবা, অত্ত, লোক, বুদ্ধ, সুখ, পিয়, কোধ, মল, ধম্মট্ঠ, মগ্গ, পকিণ্নক, নিবয়, নাগ, তণ্হা, ভিক্খু ও ব্রাহ্মণ নামক ২৬টি বর্গ আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ "ধর্ম্মপদার্থ কথা,"—উক্ত বর্গগুলি শ্রীবুদ্ধ কখন ও কাহাকে লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাবই উপাখ্যান সংগ্রহ। কথাগুলি সকল অবতারেব কথামৃতেব ন্যায় সহজ ও সবল। এই ধর্ম্মপদার্থ-কথা ধর্ম্মপদোক্ত শ্রীবুদ্ধ বাণীকে উপাখ্যানেব সহিত আবও সবস করিয়াছে। ইহা প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি (মহা-মেলনী) কারক অর্হৎ মহাকশ্যপ স্থবির প্রমুখ প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব বর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকাবা, ইতিপূর্ব্বে ইঁহার অনূদিত "উদান" ও "অজাতশত্রু" সম্বন্ধে অবগত হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ "ধর্ম্মপদার্থকথা"ও লেখকের মাতৃভাষায় এক অপূর্ব্ব দান জানিবেন।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্র—প্রকাশক, স্বামী অপূর্ব্বানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড়-

মঠ, হাওড়া। মূল্য বার আনা। পুস্তক খানি ১১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে মোট ৬৫খানি পত্র আছে। শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলা সহচর, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) সহস্র সহস্র নরনারীর আশ্রয়দাতা ও গুরু স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাঁহার প্রিয়তম গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক মহাপুরুষ নামেই অভিহিত হইতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ মধ্যে সবাই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়াই ডাকিতেন। আজ তিনি বহু ভক্তের হৃদয়াকাশে প্রখর অথচ স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতেছেন বলিয়াই, তাঁহার অমূল্য বাণী ও উপদেশাবলী সকলের নিকটই আদরনীয় হইবে। এই পুস্তকে যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার সকলই মহাপুরুজীর স্বহস্তে লিখিত; প্রথম পত্রখানি ১৮৯১ খৃঃ অব্দের অর্থাৎ ইহা তাঁহার কঠোর তপস্যা কালীন। শেষ পত্রখানি ১৯২৬ খৃঃ অব্দের। নিজ জীবনে চরম সত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তিনি আনন্দে ভরপুর ছিলেন এবং সেই সত্য যাহাতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানব উপলব্ধি করিতে পারে, সেই জন্য সকলকে উৎসাহ দান করিয়া পত্রগুলি লিখিত হইয়াছে—এই ভাবই যেন প্রত্যেক ছত্রে বিদ্যমান। নিজে পূর্ণজ্ঞানী হইয়াও সমস্ত অভিমান হজম করিয়া স্বীয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রভৃতির প্রতি তিনি কি প্রকার শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাহাও অধিকাংশ পত্রে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। কাহাকেও নিরাশ করা যেন তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল এবং সকলকেই স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া তিনি অগ্রসর হইতে উৎসাহ দিতেন। এই প্রসঙ্গে ৪২নং পত্রে লিখিয়াছেন, "তাঁর ফুলবাগানে নানাবিধ ফুল, কোনটী নিকৃষ্ট নয় সবই উৎকৃষ্ট। গোলাপ গোলাপই, বেল বেলই, জুঁই জুঁইই, জবা জবাই, সকলেই নিজে নিজে ভাল।" জ্ঞান ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ এই মহাপুরুষের পত্রগুলি পাঠ করিয়া ত্যাগী, সাধক, প্রবর্ত্তক, গৃহী সকলের প্রাণেই আনন্দের ও আশার সঞ্চার হইবে। অদ্ভুত গুরু ভক্ত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শ্রীপদধূলি ধারণ করা যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিংবা যাঁহাদের সেই সৌভাগ্যও হয় নাই, তাঁহাদের সকলেই এই পুস্তকখানি পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নাই। পুস্তকের বাঁধাই ও ছাপা চমৎকার হইয়াছে।

দোলা
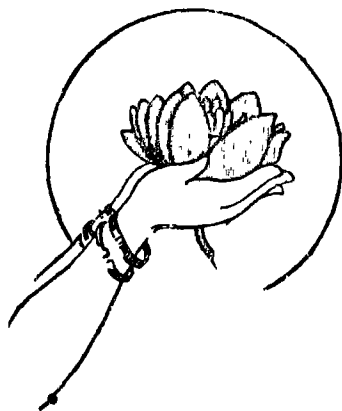
ধরুন ! সংসারটা একটা দোল্‌না। মা আমাদের দোল দিচ্ছেন নিয়ত—জন্ম ও মৃত্যু—এপাশ আর ওপাশ। "ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও বাম হাত হতে ডানে।" সেই রকম। একবার মা জীবন-রূপ দোলনা দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন, আবার মৃত্যুরূপ দোলনা দিয়ে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—আবার পাঠাচ্ছেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত দেহের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের আত্মা ঠিক একই ভাবে আছেন। ইহার কোন কালেই বিনাশ নাই।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা ২।২৩

শস্ত্রের ছেদন শক্তি, অগ্নির দাহিকা শক্তি, অপের ক্লিষ্ট করিবার শক্তি, বায়ুর শোষক শক্তি ইহার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

কোন মন্দির ভগ্ন হইলে যেমন সেই মন্দিরের দেবমূর্ত্তি অন্য কোন নব নির্ম্মিত মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ আত্মার দেহ-মন্দির জীর্ণ হইয়া পড়িলে উহা পুনরায় কোন এক নূতন দেহকে আশ্রয় করে—ইহাই আমাদের শাশ্বত বিশ্বাস। এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না কেননা ইহা লোকচক্ষুর গোচরীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি এই সত্য-বাক্য আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি? এমন বহু বিষয় আছে যাহা আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাই না। মহাকবি সেক্‌সপিয়র বলিয়াছেন "There are more things between Heaven and Earth than are dreamt in youı Philosophy." লোষ্ট্রাঘাত জনিত বেদনা আমরা স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও তাহার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আত্মা শাশ্বত ও নিত্য, কেবল দেহেরই পরিবর্ত্তন হয়—আর্য্য ঋষিগণের এই সিদ্ধান্তও সেইরূপ অনুভবনীয় বিচার তর্কের বিষয়ীভূত্ নহে।

দেহের পরিবর্ত্তনকেই মৃত্যু বলা হয়। ইহা পুনর্জীবনের সূচনা বই আর কিছুই নয়। তবুও আমরা জন্ম হইলে হাসি আর মৃত্যু হইলে কাঁদি। কেন? পৃথিবীতে সূতিকা গৃহ ও শ্মশানের চিতা শয্যার অভিনব দুইটি দৃশ্য।—প্রথমটি যেমন আনন্দদায়ক দ্বিতীয়টি সেইরূপ বিষাদপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদুটির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে ইহা নিশ্চিত। তবে আমরা মহামায়ার মোহে আবদ্ধ বলিয়াই বুঝিতে পারি না—

"মহামায়া প্রভাবেন সংসারঃ স্থিতি-কারিণঃ।"

চণ্ডী, ১।৫৩

জন্ম হইলে আমরা হাসি কারণ আমাদের মনে হয় এই নবজাত শিশু যে আজ ভূমিষ্ঠ হইল সে পরে পৃথিবীর এবং নিজ বংশের কতই না কল্যাণ করিবে। সেটা ঠিক। সকল জীবের মধ্যে মনুষ্যই যখন শ্রেষ্ঠ তখন তাহারা ছাড়া আর পৃথিবীর কল্যাণ কোন্ জীব করিবে? কিন্তু এইটুকু আমরা তলাইয়া বুঝি না যে মায়ের অনুগ্রহ ছাড়া আমরা এক পাও চলিতে পারি না—কারণ আমাদের জীবনের ঠিক নাই। আর মৃত্যু হইলে কাঁদি যেহেতু আমরা বুঝিতে পারি না যে এই সমস্ত পরিজন ও বন্ধুবর্গ ছাড়িয়া কোন্ অজানা-দেশের ডাকে চলিয়া যাইতেছি যেখান হইতে কোন দেহী কোনদিন ফিরে নাই। কিন্তু এই সমস্ত হাসি কান্না যে কতই অসার তা বোধ হয় মা বুঝিয়া অলক্ষ্যে হাসেন। আমরা বুঝিতে না পারিলেও

তিনি ত বোঝেন যে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

মা তো বিশ্বজননী। তাঁহার কাছে সব সন্তানই সমান। তিনি ত কেবল একজনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিতে পারেন না। আর এই সব হাসি কান্না ক্ষণিকের বলিয়াই বোধ হয়, তিনি ততটা গরজ করেন না। কিন্তু প্রকৃতই যদি আমাদের প্রাণের ক্ষুধা লাগে তবে কি তিনি গরজ না করিয়া থাকিতে পারেন? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই এই সব দেখিতে পাওয়া যায়। মা হয় ত অন্য কাজ করিবেন—ছোট ছেলেটিকে খাওয়াইয়া দোল্ দিয়া তিনি অন্য কাজে গেলেন; ইতি মধ্যে ছেলে যদি কান্না সুরু করে তবে মা মনে করেন, ও কিছু নয় শুধু চোখের কান্না—আরও যদি কাঁদে অমনি মা খেল্‌না দিয়া ভুলাইয়া যান। কিন্তু সেই ছেলের যদি প্রকৃত ক্ষুধা পায় তবে তাহাকে যত রকম খেলনাই দেওয়া যাক্ না কেন, সে কিছুতেই প্রবোধ মানিতে পারে না। অগত্যা সমস্ত কাজ ফেলিয়া মাকে ছুটিতে হয়—তাহাকে খাওয়াইতে। বিশ্বজননীর ব্যাপারও ঠিক সেই রকম তিনি আমাদের সংসারে পাঠাইলেন পিতা মাতা ও অন্যান্য মায়ারূপ খেল্‌না দিয়া, তাই পাইয়াই আমরা ভুলিয়া থাকি। মাও বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন।

কখনও যদি তাঁর জন্য আমরা কাঁদিয়া উঠি তিনি আরও খেল্‌না দিয়া আমাদের ভুলাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতই যদি আমাদের প্রাণের ক্ষুধা লাগে তবে কি আমরা খেল্‌না পাইয়া ভুলিয়া থাকিতে পারি! আর মাও কি তখন আমাদের না খাওয়াইয়া থাকিতে পারেন? যেমন—বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, হজরত মোহাম্মদ ও যীশুখৃষ্ট—ইঁহাদিগকেও তো মা প্রথমে এইরূপ খেল্‌না দিয়া ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পারিয়াছিলেন কি? ইঁহাদের তখন প্রকৃতই প্রাণের ক্ষুধা লাগিয়াছিল বলিয়াই তিনি পারেন নাই।

আমরা বিশ্বজননীর সন্তান। মা আমাদের কতদিন জন্মমৃত্যুর এই দোলা আর মায়ার খেল্‌না দিয়া ভুলাইয়া রাখিবেন? আমাদেরও একদিন প্রাণের ক্ষুধা জাগিবেই জাগিবে। সেদিন আমরা নিশ্চিত এই জন্মমৃত্যু দোলার তত্ত্ব ও আমাদের পার্থিব হাসি কান্নার অসারতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কঠ-উপনিষদ্ ১।৩।১৪

কুমার শ্রীভৈরবলাল রায়
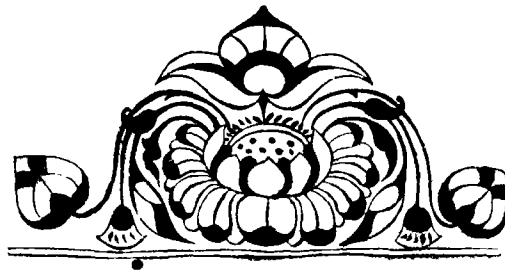
শ্রীম—সমীপে

৪ঠা আগষ্ট ১৯৩১

মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৭টার সময়

চারতলার ছাদে তুলসী কানন হইতে শ্রীমর নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি উত্তরাস্য আমি তাঁর বাম দিকে। আমার বাম পার্শ্বে একজন ভদ্রলোক চণ্ডী কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁর পরিধানে কোট পেণ্টলুন ওকালতী করেন,—নাম অশ্বিনীবাবু।

উপস্থিত—৮মায়ের দেশের অমূল্যবাবু, টালার অমূল্যবাবু, পূর্ণেন্দু, বেলেঘাটার শুকলালবাবু, অমৃতবাবু ও আরও ভক্তবৃন্দ।

শ্রীম—(সাধুর প্রতি) (অশ্বিনীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি চণ্ডীপাঠ ও প্রচার করেন। আহা! এঁকে দেখলে কেবল চণ্ডীর কথা মনে পড়ে। সাধু, যাকে দেখলে তাঁকে মনে পড়ে, তিনি কি কম লোক। সাধু, সাদা কাপড় পড়লেই বা।

সাধু—এঁর নাম কি?

শ্রীম—নারায়ণ! ইনি নারায়ণ। নামরূপ বাদ দাওনা। (অত্যন্ত ভাবের সহিত সাধুকে) তুমি সাধু, (নিজেকে দেখাইয়া) আর এই বুড়োদের নামরূপ বাদ দিয়ে কেবল সেই নারায়ণকে দেখা উচিৎ।

সাধু মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিকইত এই নামরূপ নিয়েইত যত গোল। যত স্বার্থ জাগতিকতা, এতে। সর্ব্বভূতে সেই নামরূপাতীত শ্রীভগবানকে, চৈতন্য স্বরূপকে দেখিতে পারিলেইত শান্তি।

তারপর গতকল্য শ্রীমর জন্মতিথিদিনে উৎসবের কথা। সাধু ভক্তদের কোন ত্রুটি হলো কিনা—গৃহস্থ ভক্তদের কে অভ্যর্থনা করলে—সেই সব কথা হলো।

শ্রীম—অমৃতবাবুকে আপনি, receive অভ্যর্থনা করেছিলেন ত?

অমৃত—আপনি আমাকে যা যা বলেছিলেন,—আমি তা—শী—মহারাজকে বলেছিলাম, তিনি বোধ হয়, তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীম—আমিত আপনাকেই receive করতে বললাম।

অমৃত—আমি উপরে receive করেছিলাম।

শ্রীম—নীচে Gateএ আপনি ছিলেন?

অমৃত—আপনিত আমাকে নীচে যেতে বলেন নি।

শ্রীম—আমি আপনাকে receive করতে বললাম,—তা যদি নীচে যেতে নাই বলে থাকি? Receive কি উপরে থেকে করে? Gateএ গিয়ে দাঁড়াতে হয়। দেখুনত গিরীশ বাবুর ছেলে দানীবাবু এলেন আমার সঙ্গে দেখা হলো না; নীচে থেকে ফিরে গেছেন। ওঁরা পুরাতন ভক্ত—কি ভাব নিয়ে আসে।

শুক—আমি সর্ব্বদা ঐ সদর দরজার ধারে বসেছিলাম কাকেও প্রসাদ না নিয়ে যেতে দিই নি। এমনকি খগেনবাবু চলে যাচ্ছিল তাকে ধরে প্রসাদ দিয়ে দিলাম।

শ্রীম—বসিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন ত? বসিয়ে খাওয়াতে হয়, প্রসাদ কি না! আচ্ছা আপনি কি গিরীশবাবুর ছেলেকে দেখেছিলেন? তিনি চোখে ভাল দেখতে পাননা। মোটা শরীর। আপনি কি তাঁকে দেখেছিলেন।

শুক—দেখেছিলাম বৈ কি?

শ্রীম—তাঁর সঙ্গে ঐ বাবুটির—অবিনাশবাবুর কি কিছু কথা হলো?

শুক—আমিত তাঁকে চিনি না। তবে

আপনারা যেমন বলছেন,—আর ঐ যে বললেন গিরীশ বাবুর জীবনী লেখক অবিনাশবাবু তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আর তাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হল—মনে হয় যে তিনি গিরীশবাবুর ছেলেই হবেন। তিনি নীচে বসে রইলেন।

শ্রীম—আচ্ছা অবিনাশবাবু যখন উপরে এলেন তখন তিনি তো দানীবাবুকে তুলে দিয়ে এলেন? কারণ তিনি যে চোখে ভাল দেখতে পাননা। তাকে গাড়ীতে তুলে দিতে কেউ নিশ্চয়ই গিয়েছিল। কে গেলেন?

শুক—না আমি তা কিছু দেখিনাই। তবে তিনি বলেছিলেন, আমার ২।৩ জন লোক পরে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা হলো। তাই দেখলাম। আমি যদি দানীবাবু বলে জানতাম, তাহলে সব জানতে পারতাম। তবে সকলকেই receive করেছি।

শ্রীম—না জানলে কি আর receive করা যায়? আমরা লাট দরবারে Convocation এ নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তা আমাদিগকে সব gate থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। আবার আসবার সময় gate এ পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। ওরা এসব বেশ জানে। আবার আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কোন লাইনে যাবে—। ওদের political (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য আছে—তাই ঐরূপ জিজ্ঞাসা—। কিন্তু কি ভদ্র।

৭ই আগষ্ট, শুক্রবার

আজ বিকাল ৬টার সময় শ্রীমর নিকট গিয়া দেখিলাম তিনি চারতলার ছাদে বেঞ্চে বসিয়া আছেন; পূর্ব্বাস্য, সহাস্য বদনে আমাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"এসো এসো"। আজ মনটা বড় খারাপ। সাধুদর্শন করিয়া যদি একটু শান্তি হয়—এই বাসনায় যাওয়া—আর টান অল্প একটুত আছেই।

শ্রীম—সী—মঃ কে আর্জ এঁরা তুলে দিয়ে এলেন। তাঁর ইচ্ছা এবার নির্জ্জনে ভগবানের চিন্তা নিয়ে থাকেন। নড়চড় আর করতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছাটা একজন সাথে থাকেন। তা আমি বললাম ঠাকুরের কথা, তিনি বলতেন,—"সাধু একা তাঁর নাম করবে, সেবাদি যা প্রয়োজন হবে তিনিই জোটাবেন,—সে জন্য সাধুর ভাবতে হবে না—আগুন জ্বাললে বাদলে পোকা এসে হাজির হয়—প্রাণ দেয় পর্য্যন্ত। তিনি হৃদয়ে এলে সকলেই তাঁকে ভালবাসে,—তখন আবার বলতে হয়—'আমার কিছু চাই না—আপনারা নিয়ে যান। ঠাকুর বলতেন, আমায় দেবার জন্য তখন তখন সব কতো জিনিষ আস্‌তো। আমি বলতাম—আমি মাকে চাই, ওসব তোমরা নিয়ে যাও।" টান চাই; কাঁদাকাটি চাই—**আজকাল সব সাধু দেখি—কাঁদাকাটি নাই, অথচ বৈরাগ্য।** তা সী—মঃ বল্লেন, তাই ঠিক, তিনি ধরে নিলেন; তাই সেবক টেবক সঙ্গে নিলেন না। (সাধুর প্রতি) কেমন? ঠাকুরের কথা কি রকম?

সাধু মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল।

শ্রীম—যদি সেবক দরকার হলো—তবে বাবুদের মত দেশ-ভ্রমণ হয়ে দাঁড়াবে। একজন চাকর রাখলেই হল। এই ধর—যদি আমি যাই, সঙ্গে একজন চাকর যাবে। কিন্তু সাধু ভগবানের জন্য তীর্থে যাচ্ছেন। তিনি সব দেখ্‌বেন। তাঁর ওরকম নয়। সাধু কি কম জিনিষ।

এমন সময় শ্রীম'র পরিচিত এক বৃদ্ধ সাধু একগাছি যষ্টি হস্তে আসিয়া উপস্থিত। তিনি বৃন্দাবনে পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন এবং ৺পুরীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি উদ্বোধনে গিয়া শরৎ মহারাজের কিরূপ ভালবাসা পেয়েছিলেন, তাহা শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীম সাধুসেবা করিবার জন্য

গতকল্য অধ্যাত্ম রামায়ণের যে অংশ (চিত্রকূটে রামের অবস্থান) পাঠ হইয়াছিল—তাহা পাঠ করিতে স—কে বলিলেন।

শ্রীম—(বৃদ্ধ সাধুটির প্রতি) কাল সী—মঃ কে অধ্যাত্ম রামায়ণ শোনান হয়েছিল। তাতে বাল্মিকি মুনি রামচন্দ্রকে বল্‌ছেন যে তুমি সকলের আবাসস্থল এবং তুমি সকলেতে বাস করিতেছ। সেইখানটা বেশ, সেইটা পড়িয়ে একবার শোনাও তো। এস গো ? (স—র প্রতি) responsibility (দায়িত্ব) নিতে চায় না। স—বেশ ভক্তির সহিত উহা পাঠ করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের নিকট বিদায় লইয়া যখন ভরদ্বাজ আশ্রমে যান তৎপূর্ব্বে ধূলায় পত্রোপরি শুইয়া আছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—ইনি রাজভোগে লালিত এখন ধূলায় শায়িত—যেমন যেমন জীব কর্ম্মকরে—তেমন তেমন ফল পায়। তাই এই দশা।—

বাঃ বাঃ। কেমন কথা।

শ্রীম—লক্ষ্মণ ছেলে মানুষ কিনা—তাই ওরূপ বলছেন। শ্রীরামকে সাধারণের মত মনে কচ্ছেন। জানেন না যে গীতায় যেমন বলেছেন "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা···

সাধুটি—হাঁ, তা জীবের মত করে বলছেন, শিক্ষার জন্য।

শ্রীম—তা নয় ঠাকুর বলতেন—পরমহংসদেব বা অবতারের কর্ম্মহেতু পাপ স্পর্শ করে না, জীবের করে। রামায়ণে যখন রামচন্দ্র বাল্মিকিকে একটি ভালবাসস্থান ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন, বাল্মিকি বলিলেন,—সাধারণভাবে হে রাম ! তুমি সর্ব্বভূতে রয়েছ এবং তোমাতে সর্ব্বভূত। আর বিশেষভাবে তুমি ভক্তদের হৃদয়ে বাস কর—যারা বিগতস্পৃহ, জপপরায়ণ, ধ্যানপরায়ণ, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, সদা সন্তুষ্ট—যাঁরা ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণ করেছেন,—অর্থাৎ সাধুর লক্ষণ বলিতেছেন—। সাধুর হৃদয়ে রামচন্দ্র বাসকরেন—তা গেরুয়া নাপরলেও হয়।

তারপর সাধুটিকে মিষ্টমুখ করাতে চাহিলে, তিনি আর একদিন হবে,—বলে কাজহেতু উঠিতেছিলেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গী বলিলেন, স—একটি গান শুনায়ে সাধু সেবা করুন না।

স—গান গাহিলেনঃ—

সবদুঃখ দূর হইল তোমারে হেরি
একি অপার করুণা তব।
প্রাণ হইল শীতল, বিমল সুধায়।
সব হেরি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই
চন্দ্র সূর্য্য তারকা, জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা তোমাসম, আর কেহ নাই,
প্রেমসিন্ধু উথলয়ে হেরিলে তোমায়।
থাক সঙ্গে অহরহ জীবনকর সনাথ
রাখ প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে।

সাধুটি—বেশ ছেলেটি, পরম ভাগবত।

শ্রীম—এদিকে বি-এ পড়ছিলেন।

বৃদ্ধসাধু—তারপর এই দশা। আজকাল ভক্তি হওয়াও লোকচক্ষে খারাপ। সাধনার পরিণামে দুটি জিনিষ হয়। ১ম—সকলের মধ্যে সেই ভগবানকে দেখা ও তাতে প্রেম। আর ২য়—হৃদয় খুব উদার হয় কার্পণ্য থাকে না। "কার্পণ্য দোষাপহতো স্বভাবঃ · "

শ্রীম—হাঁ।

শ্রীম তখন আমাকে অন্য দুজন ভক্তকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। আমি পূর্ব্ববৎ বাল্মিকি-রামচন্দ্র সংবাদ পড়িলাম ; শ্রীম মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া দিতে লাগিলেন। পরে বাল্মিকির পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত পাঠ সমাপনান্তে আমি বিদায় লইব—এমন সময় তিনি বলিলেন,—

শ্রীম—দেখ, সাধুসঙ্গে বাল্মিকির চৈতন্য হলো ; সব পাপ ধৌত হয়ে গেল। এটা কেমন বলোতো ? মনে রাখবে—"ঠাকুর বলতেন, তোমাদের রোগ লেগে

আছে। সাধুসঙ্গ—করবে। আবার সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুসঙ্গে সব পাপ ধুয়ে যায়, কেমন?

সাধু—হাঁ।

শ্রীম—কাজে ফাঁকী দেওয়া, একি ভাল? আবার কোন কাজ ফেলে রাখতে নেই। কাজ না সারলে আমার স্বস্তি হয় না। (সাধুর প্রতি) আচ্ছা, সী—মহারাজ এই যে নির্জ্জনে একজায়গায়—ধ্যানে জীবন কাটবার সংকল্প করেছেন—এটি কেমন? আহা! এ সদ্ ইচ্ছা কয়জনের হয়!

২২শে আগষ্ট, শনিবার।

স্থান:—৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

বিকাল ৬-১৫ মিনিট।

উপস্থিত:—চোরবাগানের ধীরেন, উল্টাডিঙ্গির চন্দ্রবাবু, শুকলালবাবু প্রভৃতি এবং আরও কয়েকটি অপরিচিত ভক্ত।

স্নেহ-সম্ভাষণান্তর শ্রীম কহিলেন—শরীর কেমন আছে?

সাধু—এখন ভাল আছি।

একটি অপরিচিত ভদ্রলোক—মশাই, গিরীশবাবু ঠাকুরের নিকট গেলেন, কিন্তু তাঁর কি আর হলো? জগাই মাধাইকে চৈতন্যদেব উদ্ধার করে সাধু করে দিলেন, কিন্তু এঁর তো তেমন কিছু দেখলুম না।

শ্রীম—আপনি তাঁর সব জানেন?

ভদ্রলোক—কিছু কিছু জানি, একই পাড়ায় থাকি।

শ্রীম—আপনি তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন?

ভদ্রলোক—(ইতস্ততঃ করিয়া) কাছে কাছেই বাড়ী অনেক কথাই শুনেছি।

শ্রী—আপনি তাঁর নিকট যাননি, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কোন খবর রাখেন নি, বুঝলাম।

ভদ্রলোক—হাঁ।

শ্রীম—গিরীশবাবু, বলতেন,—এত পাপ করেছিলাম বলে কাকেও আর ঘৃণাকরতে পারিনা।" আপনি ঐ থিয়েটারের কথা তো বলছেন? তা যাদের সঙ্গে এতদিন ব্যবহার করে এসেছেন, তাদের ফেলেন কি করে? তাদের সাথে মিশতেন সত্য, কিন্তু তখন সে মানুষ আর নয়। পরমহংসদেব বলেছিলেন "গিরীশের বিশ্বাস আঁকেড়ে পাওয়া যায় না।" একবার গিরীশবাবু দুর্গা পূজা করেন, মাতা ঠাকুরাণীকে নিয়েছেন—আবার থিয়েটারের এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা সব এসেছেন। তাদের কি আর ত্যাগ করতে পারেন? তারা সব গঙ্গা স্নান করে ৺মায়ের পূজার যোগাড় করছেন যেমন বাড়ীর মেয়েরা তেমনই। তাদের বাধা দেবে কে—তারা আপনার। তাদেরও তিনি তাঁর ভাব থেকে বঞ্চিত করলেন না—ঘৃণা করলেন না। তোমার আমার কাছে ভালমন্দ। ঈশ্বরের কাছে সব সমান তিনিই যে ঐ সব হয়েছেন। তাঁর যে সবাই আপনার।—কাকে ফেলবেন।

একটু পরে শ্রীম একটি ছোট বইর পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছেন—আর বলিতেছেন—এতে চার যোগের কথা রয়েছে (১) রাজযোগ—কি না আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন, (২) জ্ঞানযোগ *কি না—ব্রহ্মসত্য জগৎ মায়া মিথ্যা, (৩) ভক্তিযোগ* কিনা ভক্তের ভগবানের প্রতি ভালবাসা এবং (৪) কর্ম্মযোগ কি না—নিষ্কামভাবে ফল না চেয়ে কর্ম্মকরা। বেশ সব কথা—বলিয়া উহা ভদ্রলোকটির হাতে দিলেন, পরে বলিলেন,—জ্ঞানী যাকে ব্রহ্ম বলেচেন, তাঁকেই ভক্ত ভগবান বলছেন, যোগী তাঁকে আত্মা বা পরমাত্মা বলেছেন, যেমন জলকে কেউ water কেউ পাণি বলে, কিন্তু সেই একই জল। তিনি এক, উপাসকেরা যার যেমন ভাব সেই নাম দিয়েছেন। তিনি অনন্ত, তাঁকে যে যতটুকু বুঝেছে সে সেইরূপ নাম দিয়েছে।

মজুমদার—'আমি আত্মা'—যে বলে সেটা কি?

শ্রীম—ঈশ্বরই আত্মা, তিনিই পরমাত্মা। যোগীরা ঈশ্বরকে আত্মা নাম দিয়েছেন,—'আমি'টা ভ্রম। ওসব বড় বড় কথা বেশ বলা যায়। আত্মা কি তা কে বলবে? (সাধুর প্রতি) আচ্ছা! আত্মা কিসে লভ্য?—উপনিষদে কি আছে?

সাধু—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' প্রভৃতি। মুণ্ডক উপনিষদ, ৩।২।৩।

শ্রীম—না না ওটা নয়—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' অর্থাৎ বলহীন যে, সে আত্মাকে লাভ কর্‌তে পারে না। বল কি জান?—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের উপর প্রভুত্ব—ইহাই বল—জিতেন্দ্রিয় না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

শ্রীম—(বেলুড় মঠের বি—মঃ এর প্রতি) কেমন? শিব রাম দাদা তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন? খবর জান?

বি—মঃ—হাঁ, গত বুধবার দিন দুপুর বেলায় গিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হয় নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন আছ?

সাধু—আমি ঐ দিন মঠে ছিলাম। আমি প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর কথা শুনেছিলাম! দেখলাম পূর্ব্বের ভাব বদলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, হরি সংকীর্ত্তন ভজন প্রভৃতি সবসময় করছিলেন, আর মাঝে মাঝে বলছিলেন, "ঠাকুর! দুঃখ দিয়ে করলে দুঃখ দূর, কোথায় প্রভু আমার··· প্রভৃতি।" চোখদিয়ে জল পড়ছিল মাঝে মাঝে উচ্চ হরিধ্বনি করছিলেন,—আর যখন মঠের ফটকে ঢুকছিলেন তখন "দাদা, দাদা" করিয়া চীৎকার করছিলেন,—খুব করুণ সুর। মাঝে মাঝে কালী কীর্ত্তনও করছিলেন। সবসময় ঐ ভাব। প্রসাদ দেওয়া হলো—কিন্তু অনেক বলার পর নিজে খুব সামান্য গ্রহণ করলেন—সকলকেই দিলেন। একজনকে দুবার দিলেন,—একটু খাও—একটু খাও বলে—বিনয় করে বলছিলেন। মহাপুরুষ মঃ কে দেখতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন,—তাই সেবকেরা তাঁকে সিঁড়ি হতে নামিয়ে আনলেন—তিনি তাতেই সন্তুষ্ট।

শ্রীম—সঙ্গে কেউ ছিলেন?

বিমঃ—রামলালদার ছেলে, জামাই প্রভৃতি।

সাধু—হাঁটবার সময় টলছিলেন,—একজন সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীম—তা—শুনলাম রামলালদা খুব ভাবিত নন। তাই বুঝলাম—খুব Serious অসুখ কিছু শিবরামদার নয়। কে পূজা করছেন দক্ষিণেশ্বরে?—

বি—মঃ—এবার ওঁদের পালা—ওঁর ছেলে পূজা করছেন—।

শ্রীম—একজন বলেছিল যে—আমার—রোগটা ভালকর—কিন্তু দেখো যেন আমার ভগবানের নামজপকরারূপ রোগটা ভাল কোরো না।

২৪শে আগষ্ট, সোমবার।

সন্ধ্যা ৬½ টার সময়।

উপস্থিত—ধীরেন, হিমাংশু, অমৃতবাবু অমূল্য-বাবু বলাইবাবু প্রভৃতি এবং একজন অপরিচিত নবাগত। ধীরেনকে শ্রীম অতি স্নেহের ও করুণার চক্ষে দেখেন, সর্ব্বদা ভাবেন যাতে তার মঙ্গল হয়।

শ্রীম—তোমায় তখন কি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলাম?

ধীরেন—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'।

শ্রীম—হাঁ! তাইতো দেখনা তুমি ভগবানকে তুষ্ট করেছ, তাঁকে ডাকছো, তাঁর কথা শুনছো বলে, সকলে এখন তোমাকে ভালবাসছেন।

আজ শ্রীম ধীরেনের প্রতি কি ভালবাসাটা না দেখালেন তাঁর চোখমুখদিয়ে তা ফুটে বেরুচ্ছিল। তাকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবার জন্য কি উৎসাহ ও শিক্ষা এবং তার শরীর মন ভাল যাতে থাকে তার জন্য কি যত্ন! আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা হচ্ছে যে সকলকে ভালবাসতে, সেবা করতে হয়। নতুবা সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—ঈশ্বরের পথে

বাধা পড়ে। আবার ভগবানের চিন্তা, তাঁর কথা শ্রবণ —তাঁকে কাতর ভাবে ডাকা প্রভৃতি করলে সকলের ভালবাসা পাওয়া যায়। সর্ব্বোপরি শ্রীমর কি নিঃস্বার্থ প্রেম আজ প্রত্যক্ষ করলাম।

শ্রীম—তুমি যে এখানে এস, তাদের কি বলো, আর কোথায় কোথায় যাও ?

ধীরেন—ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টিয়ানদের ওখানে, রামকৃষ্ণ মিশনে যাই।

শ্রীম—আর কোথায় ?

ধীঃ—গৌড়ীয় মঠে। ওরা সব বৈষ্ণবভক্ত, এক মামাত ভাই ব্রাহ্ম সমাজে যাই শুনে খুসী, আবার বলে খৃষ্টিয়ানদের—ওখানে যাস্ কেন ? আমি তোকে ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।

শ্রীম—তাদের কাছে ওকথা বলবে কেন। যে যেমনটা ভালবাসে তাদের কাছে সেই বিষয় বলবে, না হলে চটে যাবে (হাস্য)। আর বলবে সংস্কৃত কলেজে যাই। বলবে আমার গুরু রামকৃষ্ণ তিনি সকলধর্ম্ম সত্য বলে মেনেছিলেন তাই আমার কাছেও সকল ধর্ম্মই সত্য। মামার ছেলেদের সঙ্গে গৌড়ীয় মঠেও যাবে। বেশতো। তাঁদের কথাও শুনবে। দেখ তুমি সকলকে সেবা করবে ভাববে "এর ভিতর নারায়ণ আছেন—তাঁর সেবা করছি।"—A slender line of demarcation পড়ে রয়েছে। ওপারে ঈশ্বর এপারে সংসার। যদি ঈশ্বর বুদ্ধি না হয়—বন্ধন মহাবিপদ ভাবে— তিনি যেন আমার ছেলে আমার বন্ধু আমার ভাই ইত্যাদি সর্ব্বভূতে রয়েছেন—ভাবলে আর কোন বন্ধন নাই—মুক্তি। এই বলিয়া গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করলেন।

—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন।"
(ধীরেনকে) বল দেখি ধীরেন—
"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"

মুখস্থ কর, বলিয়া ৩।৪বার অতি করুণার সহিত আবৃত্তি ও প্রতিবার তাহাকে বলাইয়া শিখাইতে লাগিলেন। তাহার পর অন্য কথা আরম্ভ হইল।

নবাগত ভদ্রলোক—মহাশয় আপনি যে কথামৃত লিখেছেন—তা ডাইরী থেকে ?

শ্রীম—হঁা ডাইরী থেকে, তবে তিনিই লিখিয়েছেন।

ভদ্রলোক—আপনি কি তাঁর সামনে বসে টুকে নিতেন ?

শ্রীম—না না বাড়ী এসে।

ভদ্রলোক—তা হলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা তো, আর আপনার বৈষয়িক কাজকর্ম্মত ছিল।

শ্রীম—হঁা, তখন স্কুলছিল বৈষয়িক কাজকর্ম্ম খুব ছিল, ভুলে যাবার খুব সম্ভাবনা ছিল। তিনিই স্মৃতিরূপে তখন হৃদয়ে ছিলেন এবং তিনি স্মৃতি হয়ে তখন লিখিয়ে ছিলেন এখন কি পারি ? চণ্ডীতে আছে না ? "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।"

ভদ্রলোক—হঁা।

শ্রীম—সন্ধ্যারপর অমৃত বাবুকে বলিলেন— "হে— মহারাজের কি হলো,—তাঁর টাকা পাঠানোর ?

অমৃত—হঁা, পাঠাতে হবে।

শ্রীম—আর পুরীর শ—ব্রহ্মচারীর ? বলাই বাবু কোথায় ? আপনি বলাইবাবুকে আজই দেবেন কেমন ? যখন বাড়ী যাবেন, তখন ঠাকুরবাড়ী হয়ে যাবেন।

অমৃত—আজ নয়, কাল দেবো। এই রাতেই !

শ্রীম—না আজই দেবেন, আমার টাকাটা নিয়ে নিন। আমি কাজ একটুও ফেলে রাখতে পারি না। দিলে বাঁচি। কেমন ধীরেন। কোন কাজ তখন তখনই করা উচিত। কখনো ফেলে রাখবে না।

সঙ্গীত

দেশ—একতালা *

ইহা ঝিঁঝিট জাতীয় রাগিণী। ঠাট বা অবয়ব:—সা, রে, গা, মা, পা ধা, নি, ণি; বাদী রেখাব এবং সম্বাদী পঞ্চম। আরোহণ নিয়ম:—সা, রে, মা পা, না র্সা, অবরোহণ নিয়ম:—র্সা ণা ধা পা, মা গা, রা গা সা, পকড় বা রাগ পরিচায়ক বিশেষ স্বরবিন্যাস:—রে, মা পা, ণা ধা পা, ধা মা গা রা, মা গা রা গা সা, মা পা না র্সা॥ দেশ ও সুরট সমপ্রকৃতিক রাগিণী। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে, যথা:—দেশের আরোহণে গা ও ধা বাদ দিতে হয় (সা রে, মা পা, নি র্সা); কিন্তু সুরটে,—সা রে, পা মা গা মা পা, নি সা, হয়, এবং দেশের অবরোহণে 'গা রে সা,' না হইয়া 'মা গা রে গা সা,' হইয়া নামে; এবং অবরোহণ কালে, 'পা, মা গা মা রে সা'—হইয়া নামে, বাকী সমস্তই একরূপ।

প্রভু। কতবার তোমারে বুঝিতে চাই
ডুবে পড়ি কেন আঁধারে,
ক্ষণে ক্ষণে কেন পরাণ আমার
ভ'রে উঠে হাহাকারে?
আমি আঁখি বুজে তোমা বৃথা খুঁজে মরি,
ব্যাকুল আবেগে কত নিশি ভরি,
দেহ প্রাণ মন উঠে যে কাঁদিয়া
হতাশে, বেদনা ভারে।
এ কি ঘোর আঁধারে রেখেছ আবরি
কবে যাবে, যাবে তা' কেটে;
মোরে বেদনা দিতেছ তবু সঁপিয়াছি
গোপন। প্রেমে তোমার মেতে,
হৃদয় আমার যে হ'য়ে আছে কালো
আর রেখনা আঁধারে, জ্বাল তব আলো,
পরাণে আমার যত কলোরব
শান্তিরসে ডুবায়ে॥

কথা—শ্রীসুরথচন্দ্র সেন, এম-এ; †সুর ও স্বরলিপি—স্বামী দুর্গেশানন্দ।

"+ ৩ ॥"
* অন্তরা গাহিবার পূর্ব্বে স্থায়ীর রা -া মা। ররা মমা, পর্য্যন্ত গাহিয়া অন্তরা আরম্ভ করিতে হইবে।
আঁ • ধা রে • • •
সঞ্চারী শেষ করিয়াই আভোগ গাহিতে হইবে।

† দিনাজপুর সারদেশ্বরী বিদ্যামন্দিরে বালক বালিকাদিগকে গান শিখাইবার পূর্ব্বে স্বামী দুর্গেশানন্দজী গানে যে সকল স্বরলিপি তাহাদের note বহিতে লিখিয়া দেন, উক্ত গানের স্বরলিপি খানি স্বামিজীর অনুমতি-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত করা হইল।

স্বরলিপি

স্থায়ী—

মা -া II { া পণা নর্সা । নর্সঃরঃ ণা ধপা । -া পণা ধা । পমা গা রা I
প্র ভু { কত বা • • • ব্ তোমা রে • • বুঝ তে চা • • ই

[মপা ধণা ধা]

I া রপা মগা । রগা সন্া সা । রা -া মা । ররা মমা পপা } I
ডুবে প • ডি • বে • ন তাঁ • ধা রে • • • • • }

I { া পনা না । র্সা র্সণা ধপা । -া ণধা পা । ধা মা গা I
{ ক্ষণে ক্ষ ণে বেন • • • পরা ণ • আ মা

I র মপা মা । গা রা গা । সরা গা রা । সা -া -া } II
র ভ'রে উ ঠে হা হা কা • • • রে • • }

অন্তরা ও আভোগ—

মা II { -া মা পা । না -া -া । র্সা -া -া । -া -া -া I
আমি { • আঁখি বু জে তো মা • বৃথা খুঁ জে মরি •
ওগো { • হৃদ য় আ মা র • হ'যে আ ছে কালো •

I া র্রর্মা র্গা । র্রর্গা র্সা না । -া নর্সা. র্রা । র্সণ -া ধপা } I
ব্যাকু ল আ • বে গে • কত নি শি • ভরি }
রেখ না আঁ • ধা রে • আল ত ব • আলো }

০ ১ + ৩
I (ा পনা না । র্সা র্সণ ধপা । -া ণধা পা । ধা ম গা I

১ দেহ প্রা ণ মন • • • উঠে যে • কাঁদি য়া
২ পরা ণে • আমা • র • যত ক লো র ব

০ ১ + ৩
I রা মপ মা । গা রা গা । সরা ঋা বা । সা -া -া } II I

হ তা শে বে দ না ভা • • • রে • •
শা ন্ তি র সে তু বা • • • রে • • }

সঞ্চারী—

০ ১ + ৩
II -া সরা মা । -া -া গরা । রা -া মা । পা -া -া I

• একি ঘো র আঁধা রে • • রেখে ছ • আব রি

০ ১ + ৩
I -া পণা -া । ধা পা -া । মা মগা রা । মা পা -া I

• কবে যা বে • • • যাবে তা • কে টে

০ ১ + ৩
I { -া পনা না । র্সা সণা ধপা । -া ণধা পা ।.(ধা মা গা) } I
{ • বেদ না দি তেছ • • • তবু সঁ (পি যাছি মোরে) }

৩ ০ ১ +
I ধা মা গরা I রা মপা মা । গা ঋা গা । সরা গা রা I

পি য়া ছি • • সক লি, প্রে মে তোর মে • • •

৩
I সা -া -া I

তে • • •

সংঘ ও বার্ত্তা

১। **শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর** বিগত ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের, দ্বিতীয় ডেপুটী একসিকিউটিভ অফিসারের কক্ষে পাবলিসিটি সাব কমিটি এবং ফাইনান্স সাব কমিটির একত্রে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল এবং মিঃ বি, কে, বোস, অ্যাড্ভোকেট, শৈলপতি চ্যাটার্জ্জি, ডেপুটি চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা করপোরেসন; স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, এইচ, পি, ভৌমিক ইলেকট্রিক্যাল ইন্জিনিয়ার ইন্ চিফ্, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ; রায়সাহেব এইচ, মুখার্জ্জি, চিফ্ অ্যাপ্রেসার, কাসটমস্; স্বামী বাসুদেবানন্দ, বি, সি, রায়, বি-এস-সি, এ-এম্, এ-আই-ই-ই; অধ্যাপক জে, সি, ব্যানার্জ্জি, অনিল রায় (ফরোয়ার্ড), অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ; জে, সি, দাস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ডাঃ এস্, সি, রায়, (নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স), এস্, সি, রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স; কে, সি, নিয়োগী, একস্-এম-এল্-এ, এস, এম, চক্রবর্ত্তী, সেক্রেটারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ; টি, সি, রায়, সলিসিটার; স্বামী বিমুক্তানন্দ; এ, এন্, মুখার্জ্জি; জে, এম, দত্ত, কবিরাজ অনাথনাথ রায়, জে, সি, দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে বিগত ২৫শে নবেম্বরের সাধারণ সভায় শত বার্ষিকী উপলক্ষে যে বিষয়গুলি সম্পাদনের নিমিত্ত স্থিরীকৃত হয়, তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত স্থায়ী বিষয়গুলি পূর্ব্ব সম্পাদ্য বিষয়গুলির সহিত যুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা একসিকিউটিভ্ কমিটির নিকট আলোচনার নিমিত্ত দিয়াছেন—জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সার্ব্বজনীন আনুশীলনিক প্রতিষ্ঠান, ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনে সেবাকার্য্যের জন্য একটি স্থায়ী ফণ্ড। সকল বিষয়গুলি একত্রে সম্পাদনের জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা দরকার।

২। **শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ** মহারাজ, বিগত ১৮ই জানুয়ারী, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের নবনির্ম্মিত হাসপাতাল গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

৩। **সান্ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতি**—বিগত অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি হইয়াছে—বেদান্তে সৃষ্টি-তত্ত্ব, বেদান্তের সপ্তভূমি, অদৃশ্য জগৎ, মন স্থির, অক্ষর ও ক্ষর, দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা, যোগের উপায়, সহজানুভূতির অনুশীলন, যোগীর জীবন ও দেহত্যাগ, অবচেতন ভূমির উপর আধিপত্য, রহস্য প্রতীক ওঁ, দীক্ষা রহস্য, ঈশ্বরানুভূতি, কর্ম্মকৌশল, বেদান্তের আদর্শ ও প্রয়োগ, অমৃতত্বের প্রমাণ, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, বিশ্বাস কর এবং অপরকেও বিশ্বাস করিতে দাও, ভক্তি ও সাযুজ্য, মানবের সত্য প্রকৃতি, ঈশ্বর, আত্মা ও ধর্ম্ম, অমৃতত্বের প্রমাণ, পূর্ণতা লাভ কর, ভক্তি যোগ, বার্ত্তাবাহক যীশু, প্রয়োগিক বেদান্ত।

৪। **স্বামী বাসুদেবানন্দ** বিগত ৪ঠা জানুয়ারী আসানসোল গমন করেন ও নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ছায়াচিত্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভারতের মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বার্ণপুর ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন—সভাপতি, এইচ, কে, দাসগুপ্ত জমিনদারী ম্যানেজার; রাণীগঞ্জ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট—সভাপতি ডাঃ জে, সি, রায়, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান; চেলীডাঙ্গা অফিসার্স্ কোয়াটার। এখানে উপস্থিত ছিলেন, মিঃ এন্,

জি, চ্যাটার্জ্জি, ইন্‌সপেক্টর অব মাইনস্‌; ডাঃ এল্‌, সেন, চিফ স্যানিটারী অফিসার, মাইনস্‌ বোর্ড অব হেলথ্‌; এম, এস, মুখার্জ্জি, জেনারেল ম্যানেজার অব মার্টিন কোং, কোল ডিপার্টমেণ্ট; এন্‌, সি ঘোষ, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব ট্র্যান্‌স্পোর্টেসন, ই,আই, আর, আই, বি, নাগ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; এইচ্‌, ভট্টাচার্য্য, ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডবলিউ, ডি, পি, কে, ঘোষ পাবলিক প্রসিকিউটার, এস্‌ এন, ঘোষ, সব রেজিষ্ট্রার; জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এ্যাড্‌-ভোকেট, ম্যান্‌ডালে ইত্যাদি। নিয়ামৎপুর—সভাপতি, ডাঃ অমূল্যরতন আচার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে চন্দননগরে ছায়াচিত্রে উত্তমানন্দ লাইব্রেরীতে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিহর শেঠ, নারায়ণ প্রসাদ, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ দাস, ডাঃ আশুতোষ দত্ত, ডাঃ যোগেশ্বর শ্রীমানী।

৫। বিগত ১লা জানুয়ারী ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেন্‌জেয়া গ্রামে, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়ের ভবনে **শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব** সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার 'অখিলবাবুর দল' সারাদিন কীর্ত্তন করেন, স্বামী গোপেশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং প্রায় ৬০০।৭০০ শত ভক্ত প্রসাদ পান।

৬। **ফরিদপুর রামকৃষ্ণ সমিতির ১৩শ বর্ষের কার্য্যবিবরণী**—১৯৩৪ সনে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এই আশ্রমে (১) নিম্নজাতিদের জন্য একটি প্রাইমারী স্কুল আছে, ইহার ছাত্র সংখ্যা ৫৯; (২) মহাকালী পাঠশালা—মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়—ছাত্রী সংখ্যা ৫৬; (৩) একটি ক্ষুদ্র ছাত্রাবাসও আছে; (৪) এখান হইতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের ইন্‌জেকসন দেওয়া হয় এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ও আছে—১৯৩৩ সনে রোগী সংখ্যা ৩১৬৮; (৫) অবৈতনিক পাঠাগার; (৬) আশ্রমে প্রতি রবিবার ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হয়; এবং (৭) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ২১০টি বন্যাপীড়িত পরিবারকে এই আশ্রম হইতে সাহায্য দান করা হয়।

৭। সম্প্রতি মহীশূরের চন্দ্রাবল্লী উপত্যকায় **খৃঃ পূঃ ৪০০০ হাজার বৎসরের ধাতব নিদর্শন** পাওয়া গিয়াছে, কাজেকাজেই ভারতীয় সভ্যতার আদিমতা খৃঃ পূঃ ৬০০০ হাজার বৎসরকেও অতিক্রম করিতে পারে।

৮। **কি প্রকারে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে**—ফিলিপাইনবাসিগণ তাহাদের সভ্যতা, রীতিনীতি ও কৃষ্টির দ্বারা প্রাচ্যদেশের জাতিগত ও কৃষ্টিগত জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং এইজন্য স্বাভাবিকভাবে অল্পে অল্পে ভারতীয়দের সহিত ভারতীয় সভ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিল। বিশাল বাণিজ্যের দ্বারা এবং ক্রমে ক্রমে ফিলিপাইনে ভারতবাসিগণ অধিক সংখ্যায় আসিয়া বাস করায় যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কদ্বারা উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে অধিকতরভাবে ভারতবাসীর সহিত ও ভারতের আচার ব্যবহারের সহিত এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহাদের ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। মুসলমানদের আগমনে এই সম্পর্কে যে বাধা আরম্ভ হয় তাহা স্পেনীয়দের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তাহার ফলে তথাকার অধিবাসিগণ ও ভারতীয়গণ ক্রমেই ভারতের সহিত সম্পর্কের কথা ভুলিতে থাকে। বর্ত্তমানে এই প্রাচীন রক্তের সম্পর্ক ও তাহা পুনরায় বর্দ্ধিত করার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে।

এইরূপে ইন্দো চীন (হিন্দু চীন) সুমাত্রা ও পূর্ব্বজাভায় হিন্দু সভ্যতার তিনটি কেন্দ্র ছিল। ইহা তথাকার নিকটস্থ দ্বীপসমূহে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে নিজ প্রভাব বিস্তার করিত।

দক্ষিণ ফিলিপাইনে ইন্দো চীন হইতে হিন্দুধর্ম্ম প্রসার লাভ করে। ইহা সুমাত্রায় বৌদ্ধদিগের আগমনের বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ফিলিপাইনেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব উত্তর বোর্ণিওতেও পৌছাইয়াছিল। উত্তর মালায়ে ত্রনি সহর হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজনীয় কেন্দ্র ছিল, তথা হইতেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অন্যান্য দ্বীপে ও স্থানে প্রসারিত হইয়াছিল।

(জৈষ্ঠ, সঞ্জীবনী)

৯। বিগত ২৭শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে, বেলুড় মঠে যথারীতি বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হয়। প্রাতে স্বামী বিমুক্তানন্দ সর্ব্বসাধারণের নিকট উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে সান্‌ফ্রান্‌সিসকো কেন্দ্রের স্বামী অশোকানন্দের ছাত্র মিঃ ক্লিফ্‌টন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। অতঃপর ৫০০০ হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় স্বামিজীর মন্দিরের সম্মুখে এক বিরাট জনসভায় কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণের পর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক ইতিহাসের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীরূপ অদ্ভুত দান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর স্বামী বাসুদেবানন্দ, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অদ্ভুত সমন্বয়কারী অ-পূর্ব্ব বেদান্ত, কিভাবে স্বামিজী তাঁর শ্রীগুরুর নিকট প্রাপ্ত হন, তার বিবৃতি করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা সমাপ্ত করিলে, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট এক বিবৃতি দান করেন।

শতবার্ষিকীর করণীয়

(১) এই উৎসব ভারত এবং ভারতেতর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আশ্রম সমূহে এবং বিশেষ বিশেষ সহরে, পল্লীতে আগামী ১৯৩৬ সনের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৭ সনের জন্মতিথিতে পরিসমাপ্ত হইবে। (২) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ সমস্ত জগৎকে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত বাণী প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইবে। (৩) শতবার্ষিক-স্মৃতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্যদের এবং মিশনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র সমূহের ছবি সম্বলিত আর একখানি পুস্তক বাহির হইবে। (৪) বিশেষ বিশেষ স্মৃতি-পদক প্রদত্ত হইবে। (৫) বিভিন্ন সভার অধিবেশন যথা—(ক) বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সম্মিলন, (খ) সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, মিশনের সভ্য ও বন্ধুবর্গের সম্মিলন, (গ) ৺বারাণসী বা প্রয়াগে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসিগণের সভা, (ঘ) কলিকাতায় অথবা বেলুড় মঠে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের মহাসভা, (ঙ) স্ত্রীভক্ত ও মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষিনী-দের সম্মেলনী, (চ) ভারতের এবং ভারত-বহির্ভূত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমিতিতে, লাইব্রেরীতে এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার আয়োজন, (ছ) কলা ও পণ্যশিল্প প্রদর্শনী, (জ) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-স্থান কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান জয়রামবাটী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে তীর্থযাত্রা, (ঝ) কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং গমনাগমনের ব্যবস্থা, (ঞ) প্রবন্ধ এবং গবেষণামূলক তত্ত্ব প্রতিযোগিতা, (ট) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি অস্থায়ী সেবাকার্য্যের নিমিত্ত একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, (ঠ) জনশিক্ষাকল্পে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্পকলার মধ্য দিয়া সমস্ত

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সহিত শুভেচ্ছা ও ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত একটি কৃষ্টি-ভবন প্রতিষ্ঠা।

এতন্নিমিত্ত যে সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে যাঁহারা সভ্য হইয়া এই কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদ্বীপবাসী তাহাদের নিমিত্ত যে চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে তাহা কমপক্ষে (minimum) ৫৲ পাঁচ টাকা এবং ছাত্রদের জন্য ৩৲ (minimum fee) এবং অপর দেশসমূহের ব্যক্তি দিগের জন্য ১ পাউণ্ড বা ৫ ডলার।

এই কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত অন্ততঃপক্ষে দশলক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমাদের সহৃদয় দেশবাসী—যাঁহারা বাঙ্গলায় এই বিশ্বযজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে চাহেন তাঁহাদের সাধ্যমত যাহা কিছু দান, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানা সকলে প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতাসহকারে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

১। অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী, বেলুড় মঠ পোঃ, জিঃ হাওড়া।

২। মিঃ জে, সি, দাস, অবৈঃ কোষাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী একাউণ্ট, বেঙ্গল সেন্ট্রাল্ ব্যাঙ্ক, ৮৬ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী একাউণ্ট, দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৪। ম্যানেজার, অদ্বৈতাশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন কলিকাতা।

৫। ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

পুঃ—যাঁহারা বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ সেণ্টিনারী কমিটি, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, আলবার্ট হল, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

১০। আগামী ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা এবং পরবর্ত্তী রবিবার ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ বেলুড় মঠে মহোৎসব।

১১। আলবার্টহলে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সভা—বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী এলবার্ট হলে জষ্টিস্ মিঃ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকদের পক্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এতদুপলক্ষে কি কি করণীয় তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, স্বামী বাসুদেবানন্দ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবত স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই মহাগৌরবময় বিশ্বগুরু-পূজায় সকলকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতে আবাহন করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শতবার্ষিকী-কমিটিতে সভ্য হইবার জন্য চাঁদা ও তৎপরিবর্ত্তে সুবিধালাভের কথা বলেন। পরিশেষে সুবিজ্ঞ বিচারাধিপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় বলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক দিক থেকে বলেছেন আমিও আমার প্রাণে যে দিকটা ভাল লেগেছে তাই বলবো। টেনিসন্ লিখেছেন—'বিবেক বিচার যেখানে থ মেরে যায় বিশ্বাসই সেখানে একমাত্র অবলম্বন এবং এই বিশ্বাসই আমাদিগকে ভগবানের সন্নিধানে লইয়া যায়।' বিচার করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন "আমি ঈশ্বর-দর্শন করেছি, ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়।" আপনারাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দর্শন বিশ্বাস করিতে পারেন অথবা স্বীয় সাধন ভজন দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সকলেই সারাদিনের কাজে ভগবানকে ভুলে থাকি, বিশেষতঃ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাঁকে মনেই পড়ে না। তাই কুন্তী প্রার্থনা করেছিলেন 'হে ভগবান আমায় দুঃখ দিও, কারণ দুঃখের সময়ই তোমাকে মনে পড়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখি তাহার নিরভিমানিতা (humility)। এই নিরভিমানিতা সম্পূর্ণ আয়ত্ব হইয়াছে কিনা এই জন্য তিনি প্রথমে (ঝাড়ুদারদের মত), রাস্তা পরিষ্কার পরে নিজের পায়খানা ছাপ এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে গোপনে চাকর-বাকরদের পায়খানা পরিষ্কার করে তিনি যে কারুর চেয়ে বড় নন, সকলের চেয়ে ছোট এই নিরভিমানিতা সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করেন। তার শতবার্ষিকী উৎসবে যিনি যাহা পারেন দান করিয়া কৃতার্থ হউন।"

১২। **স্বামী বিবেকানন্দের ত্রিসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উৎসব**—বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন; সমস্ত হলটি শ্রোতৃ-মণ্ডলীদ্বারা একেবারে ভরপুর হইয়াছিল। শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘড়াই বি-এ উদ্বোধন সঙ্গীত করেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু সোসাইটির রিপোর্ট পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় উচ্চদরের সঙ্গীত আলাপনের নিমিত্ত বঙ্কিমবাবুকে পদক পুরস্কার দেন। "ঐক্য-সংস্থাপক বিবেকানন্দ" নামে সোসাইটির প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় লেখক ও লেখিকা শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডালিমকুমার গুহ, প্রহ্লাদচন্দ্র হালদার ও শ্রীমতী ননী দে-কে সভাপতি পদক বিতরণ করেন। "ভেনাস সঙ্গীত সম্মিলনী" সকলকে মনোহর বাদ্য শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক এ, রহিম, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও শ্রীযুক্তা উমাশশী দেবী স্বামিজীর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং ভারতের কল্যাণকল্পে তাঁহার দান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামিজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন—"যে মহাত্মার স্মৃতিপূজা—সম্পন্ন করিতে আজ আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অনন্যসাধারণ জীবনের কথা আজ পর্য্যন্ত বহুবার, বহুপ্রকারে, বহু যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সুসমালোচিত হইয়াছে।

তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লইয়া আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, তাঁহার গুরুভ্রাতা ও প্রিয়শিষ্যদের সহিত বহুবার, বহুস্থানে কথোপকথন করিয়া নিজেকে বহুবার ধন্য মনে করিয়াছি।

মহীয়সী রমণী Miss Noble, ভগিনী নিবেদিতা বিরচিত "The master as I saw him" অপূর্ব্ব পুস্তকখানি বহুদিন মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, নরেন্দ্র, নরেন্দ্রই ছিলেন, এবং বিবেকে তাঁহার আনন্দ না হইলে, সেই সদানন্দ পুরুষের পাদপীঠতলে উপবেশন করিয়া, তিনি সেই পরমানন্দময় পুরুষ-প্রধানের সন্ধান কেমন করিয়া পাইবেন?

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে পারি, যাহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার উপকার সংসাধিত হইবে, এ সামর্থ্য আমার নাই।

তিনি ব্রহ্মবিৎ পুরুষপ্রবর ছিলেন, যিনি ব্রহ্ম-পদার্থকে অন্তরের অন্তরতম-প্রদেশে উপলব্ধি করিয়া বলিতে পারিতেন,—

"ত্বমাদি দেবঃপুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্—
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।"

সুতরাং সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তুচ্ছাদপিতুচ্ছ আমি,—আমি কোন-কিছু বলিবারই অধিকারী নহি। তবে আমি বাঙ্গালী, আমি হিন্দু, এবং সিদ্ধবংশে জন্মলাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমি আসিয়াছি, আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া, আপনাদের একজন হইয়া, সেই যতীন্দ্রযোগীন্দ্রের শ্রীচরণোদ্দেশে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতে, এবং বসুধাবাঞ্ছিত তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, মস্তকে ধারণ করতঃ অবশিষ্ট জীবনকে শান্তিময়, মধুময়, সার্থকতা-পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে আমি আজ আপনাদের দয়ায় আপনাদের মধ্যে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

বর্ত্তমান সভ্য-জগতের পরম গুরুস্থানীয় যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব আপনাদের অনেকের গুরু, এবং অনেকের পরম গুরু। সে হিসাবে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আধ্যাত্মিক জগতের ধ্রুব-তারা, অনন্তশক্তির আধার, শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ আপনাদের কাহারও কাহারও গুরুভ্রাতা, এবং অনেকেরই শ্রীগুরু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-ভক্ত-চরণ রেণু প্রার্থী আমি, আমি আসিয়াছি আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে; কোন-কিছুই কহিতে বা শুনাইতে আসি নাই।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণ-সেবক অতিমানব, মহাপুরুষদ্বয়—এই সভাস্থ সকলের মস্তকে তাঁহাদের অভয়াশীষ বর্ষণ করুণ; দীন আমি, সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারী আশীষধারায় স্নান করিয়া, পরম শান্তিতে জীবনযাপন করি, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।"

অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান-উপলক্ষে এবার কলিকাতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় দশ লক্ষ যাত্রী আগমন করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া নিজেদিগকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছেন। বেলুড় মঠেও ছয় সাত হাজার ভক্ত গঙ্গাস্নান ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন বহুসহস্র টাকা যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য ব্যয় করেন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সমিতি অপূর্ব্ব উৎসাহে খুব সুশৃঙ্খলভাবে সকল বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন। স্বল্পাধিক ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে সেবাধর্ম্ম প্রচার করেন সমস্ত বাঙ্গালীজাতি তাহা কেমন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছে তাহা এই একদিনের সেবাকার্য্য দেখিলেই সহজে অনুমিত হয়। 'ধর্ম্মই যে এ জাতির প্রাণ' স্বামিজীর একথাও এই স্নানযাত্রা দেখিলে সত্য বলিয়া প্রাণেপ্রাণে বোধ হয়।

মৌন

স্বপনেতে ভ্রমি পাইয়াছি তারে,
বাসিয়াছি তারে ভালো
গোপনে থাকিয়া দীপ্তি ছড়ায়ে
করেছে সে হৃদি-আলো।
প্রেমে ভরা মোর এ হৃদয়তল
তারি সন্ধানে ঘুরেছি কেবল
করুণ কাতর আঁখি ছল ছল
বাস্তবে তারে খুঁজে
পাইনি, বেদনা জানাব কাহারে
সে কি মোর ব্যথা বুঝে?

সারা নিশিভোর কাঁদিয়াছি আমি
আঁখি নির্ঝর জলে,
তবু কী তাহার পাবো নাকি দেখা
মরত রাজ্য তলে?
আকাশশী চাঁদ মেঘে ম্রিয়মান
ব্যর্থ তাহার যৌবন-গান
লাঞ্ছিত তাই, গুঞ্জিত প্রাণ
মৌন মুখের ভাষা,
নীরব অশ্রু তারি লাগি ঝরে
বিফল সকল আশা।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চৈত্র—১৩৪১

তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না।—তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার?—আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি?—এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু, তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না, তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমায় ফাঁসী দিতে হইবে এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার তারতম্য উঠিয়া যাইবে। —বিবেকানন্দ

উদ্বোধন

তোমারে আহ্বান করি বজ্রদীর্ণ জীবনের মহাকাশ তলে
হে আমার প্রিয়তম! এতকাল প্রেমপূজা ছলে
ভাসায়েছি যত দিন, যত নিশি নয়নের জলে
তাহারে ফিরায়ে লব—ভস্ম করি' উদ্দাম অনলে
তোমারে মাখায়ে দিব অঙ্গে অঙ্গে ধ্বংসের আভায়—
শ্মশানে নাচিবে ক্ষেপা দিগম্বর মোর শ্যামরায়।
বাঁশী যদি ব্যর্থ হয়, বিষ যদি বিদ্ধ হ'য়ে রয়—
প্রেমের সৌরভ ছাপি' দুর্দ্দান্ত শীতের বায়ু বয়!
যে কুঞ্জে জ্বলেছে দীপ, হাঁকে সেথা আঁধার—প্রলয়!
তোমার প্রেমের পাশে করাল মহিমা জেগে রয়!
—এস তবে ভাঙ মত্ত পথভোলা ভৈরবের বেশে
নভাঙ্গণে তোল নৃত্য ঝটিকা উড়ায়ে দিয়ে কেশে—
বিজলীর তালভঙ্গে ছুঁড়ে দাও ক্ষিপ্ত বিষধর—
পিঙ্গল জটার দোলে, রোলে যেন করকা-ঝর্ঝর!
নিভৃতে ফুটেছে ফুল, রূপে গন্ধে কেঁপেছে শিশিরে—
সে কেন প্রাণের বাসে দৃপ্তচক্ষে চাবে না ফিরিয়ে
উষার আনন্দ স্বপ্নে! মরুভূমি হয় যার ঘর
অহার জীর্ণ-তীর্থে প্রেমময় আজ দিগম্বর।

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

অধ্যাপক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

খাওয়া দাওয়া সরবরাহ করিয়া এবং কাঁসি বাজাইয়াই যদি মানুষের দিন কাটিত, জীবনযাত্রা ব্যাপার যে তাহার পক্ষে জীবজগতের অপর প্রাণি-সাধারণের মত অনেক দিক হইতেই সহজ এবং সুসাধ্য হইত—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার কোথাও এমন একটা কিছু আছে যাহা তাহাকে সময়ে অসময়ে চমক্ লাগাইয়া দেয়; পথ চলিতে চলিতে সে থম্‌কাইয়া থামিয়া পড়ে; খাওয়া দাওয়া এবং কাঁসি বাজান তখনকার মত সে ভুলিয়া যায়; সে সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার আত্মা প্রাণ "খাঁচাছাড়া" হইয়া থাকে।

বয়স হইলে সে, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন, খাওয়া দাওয়া এবং কাঁসিবাজান ব্যাপারে এমনই নিবিষ্ট হইয়া পড়ি যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন স্বস্থ বালককালের ঐরূপ আকস্মিক অনুভূতিগুলির স্মৃতিসকলও আমরা একরকম ভুলিয়া যাই। নহিলে ইংরাজ ঋষিকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় আমরা সকলেই বলিতে পারিতাম :—

There was a time when meadow, grove
and stream,
The earth and every common sight
To me did seem
Apparell'd in celestial light
The glory and the freshness of a dream.

কিন্তু এমন মানুষও নাই যাহার মনে কোনও না কোনও সময়ে কবির এই প্রসঙ্গে আক্ষেপোক্তির সাড়া জাগে নাই :—

Heaven lies about us in our infancy
Shades of the prison-house begins to
close
Upon the growing Boy.
But he beholds the light and whence
it flows,
He sees it in his joy ,
The Youth who daily farther from the
east
Must travel, still is Nature's priest.
And by the vision splendid
Is on his way attended ,
At length the Man perceives it die
away
And fade into the light of common day.

কিন্তু বালকের এই মুগ্ধভাব সংসারের সহস্র চাপে পিষ্ট হইয়াও একেবারে নির্ম্মূল হইবার সামগ্রী নয়, কবিও উপসংহারে তাহাই দেখাইয়াছেন। এই থম্‌কিয়া থামিয়া পড়া এবং অবাক হওয়ার প্রবৃত্তি বয়সকালে অল্পবিস্তর আড়ষ্ট হইয়া পড়ায় উহার পুনরুদ্দীপনা একটু জোর আঘাতের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ বাড়িটা বেশ একটু সজোরে লাগিলেই তবে উহা আবার জাগিয়া উঠে।

ছেলেবেলায় যে বালক পথিক অমাবস্যার নিস্তব্ধ রাত্রে গাছে গাছে লক্ষ লক্ষ জোনাকির সম্মেলনী এবং ক্রীড়া দেখিয়া কি করিবে এবং কি কাহাকে বলিবে খুঁজিয়া পায় নাই, বয়সকালে সে এই ঘটনা স্মরণ করিয়া সহজে মনকে বুঝাইতে পারিল যে ক্ষুদ্র কীটগুলির এই দেওয়ালী লীলা ঐ খাওয়াদাওয়া এবং কাঁসিবাজান ব্যাপারেরই প্রকারান্তর মাত্র এবং উহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বুঝাইল : "তুমি, পথিক, তখন অপরিণত বুদ্ধি ছিলে; বুদ্ধি তোমার তখনও

তেমন পাকে নাই; তাই ঐ আলোর খেলার ভিতরে একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কিছু আছে ধরিয়া বসিয়াছিলে। ভাবিয়া দেখ, এই সামান্ত গাছগুলাই তখন তোমার চক্ষে অভ্রভেদী বলিয়া মনে হইত কি না? এখন সেগুলা আরও কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অথচ এখন চোখ বুলাইয়াই উহারা কোন্‌টা কফুট লম্বা, এবং চওড়া কত, আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিতে পার। তখন তোমার মনের মাপ কাটিটারই কোনও ঠিক্‌ঠিকানা ছিল না, তাই সবকিছুকেই একটা কতবড় কিনা ব্যাপার ভাবিয়া বসিতে। এখন জ্ঞান হইয়াছে, আক্কেল পাইয়াছ; এখন আর ওরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনার অবসর কোথায়?"

এই হিসাব মোকাবিলার অল্পদিন পরেই কিন্তু এই বয়োলব্ধজ্ঞানালোকপ্রদীপ্তমনোভাবসম্পন্ন পথিক তুষারমৌলিস্থিরনিশ্চল কাঞ্চনজঙ্ঘার সুমেরু শৃঙ্গ দেখিয়া তাহার সমস্ত জ্ঞানসূত্রের থাঁই হারাইয়া ফেলিল। পরে ভূবিদ্যা ইত্যাদির ফর্ম্মুলা আওড়াইয়া এ ধাক্কাও সে কোন রকমে সাম্‌লাইল।

ইহার পরেও কিন্তু সৌরজগৎ নক্ষত্রমণ্ডলী, ছায়াপথ এবং নীহারিকাগণের বিরাট রহস্য করতলগত করিতে তাহাকে বড় কম বেগ পাইতে হইল না। সে মাথা ঠিক করিয়া লইল এই এই ভাবিয়া, যে যদি এগুলাও মনুষ্যবিশেষেরই সৃষ্ট যন্ত্র এবং গণিতবিদ্যার কাছে, সাপুড়ের হাতে সাপের মত, একে একে ধরা দিতে থাকিল, তবে ইহারাও সকলেই, মানুষের মনের আয়ত্ত, এবং দেখিতে বড় হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সসীম ক্ষুদ্র পদার্থ বা ক্ষুদ্রপদার্থের সমষ্টি।

এই বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্তটী কিন্তু পথিকের ঐ চকিতোত্থিত সমস্যা সকলের এককালীন নিরসন না করিয়া বরং উহাদিগকে এমন একটা অভিনব আকৃতি দিল যে তাহাতে তাহার মনকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

ঐ মানুষের মন!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি বা সসীম এবং মানুষের করতলস্থ হইয়া গেল, ঐ মন—উহাই যে আবার বিরাট হইয়া, ঐ মনেরই সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে অভিভূত করিল। কোথায় কোন্ মাপকাটি তোমার আছে যাহাদ্বারা, পথিক, তুমি ঐ দুরতিক্রম্য এবং দুর্দ্দান্ত মানুষের মনকে মাপিবে, ওজন করিবে, বুঝিবে এবং উহাকে মুষ্টিগত করিয়া লইয়া তোমার সেই জ্ঞানের ঝুলিতে তুলিয়া ধরিবে, এবং ঝোলাটি লাঠিতে ঝুলাইয়া আবার নিশ্চিন্ত মনে পথ বাহিতে থাকিবে?

ঐ মানুষের মন যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ এবং দর্শনাদি কোনও বিদ্যারই, বা সমুদয়বিদ্যা সমুচ্চয়েরও ফর্ম্মুলাদ্বারা ধৃত এবং পর্য্যাপ্ত হইতে চাহে না। বুদ্ধ, সক্রেটীস্, খৃষ্ট, চৈতন্য, কালিদাস, ইস্‌কাইলাস্, সফোক্লিস্, চণ্ডীদাস, শেক্সপীয়ার, ডান্টে, গেটে, মিল্‌টন—ইঁহাদের মনের মাপ কোন্ মাপকাঠি দিয়া তুমি ধরিবে? ইঁহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর তোমার নিজের মনকেও যে সময়ে অসময়ে তোমার জ্ঞানের এবং বিদ্যার মাপকাটি দিয়া মাপজোক করিতে পার না।

কি আশ্চর্য্য, যত দিন যাইতেছে, আজন্ম বালকত্ব পরিহার ব্রতী এই পথিক যেন নূতন করিয়া আবার তাহার শৈশবের সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভুক্ মুগ্ধ চৈতন্যেই ফিরিয়া যাইতে বসিয়াছে!

যেটুকু বা ইহার বাকি ছিল তাহাও বুঝি হইয়া গেল—পথ চলিতে চলিতে যেদিন সে পরিচয় পাইল পরমজ্ঞানী এবং পরম বালক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মহিমান্বিত বিরাট পুরুষত্বের।

এই জ্ঞান, সাধনা এবং পবিত্রতার সুমেরু শিখরের রশ্মি যে পথ দিয়া যে কোনও মনকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই স্তম্ভিত এবং ধন্য করিয়াছে; আজীবন সঞ্চিত জ্ঞান এবং বিদ্যার মন্ত্র ও ফর্মুলা পরম্পরাদ্বারা নানা দিক হইতে নানা উপায়ে এই বিরাট সত্তাকে বুঝিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াও পথিক ইহার মাহাত্ম্যের কোনও রকমের হিসাব নিকাশ বা কোনও কিছুই কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কত মুখেই শুনিয়াছি, কত রচনায়ই না দেখিয়াছি, পরমহংসদেব ছিলেন "নিরক্ষর"! যদি রামকৃষ্ণদেবই হইলেন নিরক্ষর, তবে "অক্ষর" স্থান পায় কোথায়?

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, এতবড় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মেধাবীর পরিচয় আর কোথাও পাও বা না পাও। শেক্সপীয়ারকে inspired idiot বলিয়া নির্দেশ করিতে কোনও কোনও মনীষী পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই। পরমহংসদেবকে "নিরক্ষর" বলিয়া আত্ম-প্রসাদ বোধ করা ইহা অপেক্ষাও ভুলপনেয় দুর্গ্রহ।

পুঁথি বা শিক্ষক হইতে লভ্য বিদ্যা—তা যেমনই হউক—রামকৃষ্ণ ইঙ্গিত মাত্রেই আয়ত্ত করিতেন; এবং ইহা পারিতেন শুধু শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়াই নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরম পরিণতি এবং বিকাশ তাঁহার অপরিমেয় মেধা ও মনীষা এবং তাঁহার অনন্য সাধারণ শুদ্ধ ঐকান্তিক সাধনার সংযোগের ফল। তাঁহার মত "নিরক্ষর" হওয়া এই সকল এবং আরও বহুবিধ ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ সংযোজনা এবং ক্রিয়া-সাপেক্ষ।

পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য আজ বিশ্ববিশ্রুত। ভারতবর্ষে অনেকেই তাঁহার অবতারত্বও পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে তর্কযুক্তি উঠিলেই গীতার পরস্পর সন্নিহিত দুইটী শ্লোক লেখকের মনে আসিয়া পড়ে:—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

প্রথম শ্লোকের বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ এবং ঊর্জিতসত্ত্বের উদ্দীপনার সহায়তা ব্যতিরেকে মনুষ্য সাধারণের মনে দ্বিতীয় শ্লোকের বিষয়ীভূত সর্ব্বভূতে ঈশ্বরোপলব্ধির ছায়াপাত মাত্রও সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত প্রকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ এবং ঊর্জিত সত্তার তাড়না মানুষের মন আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও হইতে কখনও পাইয়াছে কিনা সন্দেহ—। মাত্র সমুদ্রবর্ণনা করিয়াই মহাকবির মনে হইয়াছিল:—

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥

সমুদ্র দেখিয়া লেখকের মনে তদ্রূপ উদ্দীপনা আর হয় না। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রের পরিচয় পাওয়ার ফলে তাহার মনের ঐপ্রকারেরই ঘোর এতদিন পরে আজও সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্য একদিন 'সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী। নবদ্বারে ইত্যাদি।' 'ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং ইত্যাদি'। 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ইত্যাদি' পড়াইতে পড়াইতে বলিতেছেন,—'বশী' শব্দ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রিয়েরা বশে থাকিলেই প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণ সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়বশ করাই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যখন সকল ইন্দ্রিয় বশীকৃত, তখনই 'নৈবকুর্ব্বন্ ন কারয়ন্' ইতি বোধ—তখনই 'নকর্তৃত্বং' ইত্যাদির উপলব্ধির বিষয় হয়। বশী, প্রভু, বিভু—পর পর শ্লোক দেখ। উহারা একই অর্থ বোধক। এসকল কথা বোঝান যায় না—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' ভিতর ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়! বাহিরের পুড়ুনি জ্বলুনি দেখ কেন? ভিতরে যে বরফ হইয়া রহিয়াছে।

অন্য একদিন 'তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভারতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনং' —শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

'আদৌ' অর্থাৎ আক্রমণের প্রারম্ভেই কামাদির চিন্তা উদিত হইবা মাত্রই—অর্থাৎ কর্ম্মকৃত হইবার পূর্ব্বেই। অনেকেরই কর্ম্মকৃত হইবার পরে হুঁস্ হয়। তোমাদের মনে বাসনার অনল জাগ্রা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা নিভিয়া যাওয়া চাই।

'জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনং'—এম্নি কামের প্রভাব যে সামান্য জ্ঞানের কি কথা, অনুভূতিজনিত আত্মপ্রত্যয় বা বিজ্ঞানকেও পরাভূত করিয়া ফেলে।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক পাঠ কালে 'আদৌ' শব্দের উপর বিশেষ জোর দিয়া পড়িয়া, হরিমহারাজ, ঐ শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন।

স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ পড়াইতে গিয়া বলিলেন, —কি চমৎকার, এরূপ হতে ইচ্ছা করে না?

মহামায়ার প্রভাব বুঝাইবার কালে তিনি অনেক সময় রাবানীর উপমা দিতেন। মাছ বেশ আনন্দে ভাসিয়া আসিয়া রাবানীতে প্রবেশ করিল। একটু বুদ্ধি করিয়া ঘুরিয়া গেলেই হয়—কিন্তু তা হইবে না—সে হতবুদ্ধি হইয়া রাবানীর মধ্যেই এদিক্ ওদিক্ করিতে করিতে ধরা পড়িয়া যায়! ইহা বলিয়াই গাহিতেন,—

এম্নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জান্তে পারে॥
বিল করে' ঘুনী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাওয়া আসার পথ খোলা, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে, কাটলে সে তা কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী আপনার নালে আপনি মরে॥

এই প্রসঙ্গে একদিন আর একটি উদাহরণ দিতেছেন,—'পাখী ধরবার একরকম কল এদেশে আছে। এক গাছা দড়ি মাটির সহিত সমান্তরাল করিয়া বিস্তৃত রাখে। দড়ির নীচে খাবার রাখিয়া দেয়। পাখী ঐ দড়ির উপর পড়িবামাত্র উল্টাইয়া যায় এবং কি জানি কেন, উল্টাইয়া গিয়াই, ঐ দড়ি অতিশয় জোরে কামড়াইয়া রাখে। দড়ি ছাড়িয়া দিলেই সে মুক্ত—কিন্তু তা করে না। তখন ব্যাধ আসিয়া ধরে। দেখ, অজ্ঞানের কত প্রভাব! 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'

দৈব ও পুরুষকারের কথা বলিতে গিয়া একদিন কহিলেন,—হিন্দী মহাভারতে আছে—একদিন জনমেজয়ের নিকট ব্যাসদেব আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাস প্রমুখ মহাজ্ঞানী-দের বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইল?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলেই ত দেশ নির্ব্বীর্য্য ও বীরশূন্য হইয়া গেল।' ব্যাস তখন তখন উত্তর না দিয়া, রাজাকে কয়েকটি কার্য্য করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, বৎসরান্তে তাঁহাকে স্মরণ করিলে পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর ব্যাস-বর্ণিত সুন্দর সুন্দর অশ্ব সকল আসিল। তাঁহার উক্তি ও নিষেধ ভুলিয়া রাজা ঘোড়া কিনিলেন—অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলেন এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া, বৎসরান্তে ব্যাসদেবকে স্মরণ করায় তিনি আসিলেন। রাজা বুঝিলেন, সবই ভুলিয়া গিয়াছিলেন! দেখ মহামায়ার কুহক। 'কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যসি অবশোঽপি তৎ।' অতএব, 'তমেব শরণং গচ্ছ, সর্ব্বভাবেন ভারত!'

গীতা পাঠ করিতে অত্যন্ত উৎসাহিত করিতেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। গীতা পাঠ করিয়া তুমি স্বাভীষ্ট লাভ কর। সৎসঙ্গ অতীব দুর্লভ, ইহাই ত বিশেষ কষ্টের কথা। 'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে' ইত্যাদি শ্রীভগবান্ বলিয়াই রাখিয়াছেন। ভোগেই সকলের চিত্ত ধাবিত হয়; সংসার ছাড়িতে কে চায়? মতলব, সব সুখভোগ, দুঃখ না হয়। কিন্তু এটা মনে আসে না যে দুঃখ সংভিন্ন সুখ কখনই সম্ভবে না। মহামায়ার এমনি মায়া কিছুতেই চৈতন্য হতে দেয় না। তুমি গীতার ধ্যান অভ্যাস করিও। যাহা পড়িবে, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিবে, উঠ্‌তে, বস্‌তে, খেতে, শুতে, সর্ব্বদাই। তাহ'লে গীতার মর্ম্ম হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হবে, তাহাতেই শান্তি পাবে। সেবা করিলে মেওয়া মিলিবে ইহা অতি ঠিক অবিসম্বাদী সত্য। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে গুণাতীতের লক্ষণ, তাহার উপায় ইত্যাদি বেশ পরিষ্কার ভাবেই বিবৃত আছে। 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥' ইহার কারণও দিয়াছেন—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥' অতএব এই চতুর্দ্দশ অধ্যায় উত্তমরূপে অভ্যাস ও ধারণা করিতে পারিলে আর কিছুই আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তাহাই বিভিন্ন প্রকারে বলিতেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়েও 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং' ইত্যাদি অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আবার ঐ উভয় লক্ষণাক্রান্ত ভক্তের কথাই উত্তমরূপে বর্ণনা হইয়াছে। আপনার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্যই এই সকল লক্ষণ ভগবান্ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন জানিবে।

'অথ স্বামসুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীং' ইহা হইতে ভবরোগের শান্তি হয় নিশ্চয়। তিলক প্রণীত গীতারহস্য আমি পড়িয়াছি। বাংলায় নয়। হিন্দীতে মাধব সাপ্রে অনুবাদ করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা। যাহা হউক খুব পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

'গীতা ভবদ্বেষিনী', গীতা ভগবানের হৃদয়। গীতার তুলনা নাই। যাহারা বোঝে না তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাঁহার দোষ দর্শনে মহা অপরাধ।

'অধিকারি-বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ'—এই হচ্চে সিদ্ধান্ত। গীতার অনুশীলন বা সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল বিষয় সম্যক্ অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরাশান্তি লাভ হয়।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

ইহা পাঠ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি খুব উৎসাহ সহকারে বলিতেন—

উৎসেকং উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈক বিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ॥

হরি মহারাজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া তিনি প্রায়শঃই উপযুক্ত শ্লোক বলিয়া বোদ্ধব্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেন এবং উহার সহায়ে তত্ত্ব বিশদ করিয়া প্রকাশ করিতেন। যেমন, যখন বুঝাইতেছেন যে ইষ্ট হইতে মন ভ্রষ্ট হইলে ক্রমশঃ কত নিম্নে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, তখন নিম্নলিখিত শ্লোক বলিতেছেন:—

লক্ষ্যচ্যুতং চেৎ যদি চিত্তমীষৎ
বহির্মুখং সৎ নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুত কেলিকন্দুকঃ
সোপান পংক্তৌ পতিতং যথা তথা॥
—বিবেক চূড়ামণি।

অর্থাৎ "মন বহির্মুখ হইয়া ক্রমশঃ নামিতে নামিতে শেষে চরম পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসতর্ক হওয়ায় হস্ত হইতে খেলার বল (কেলিকন্দুকঃ) কোন সোপান শ্রেণীর উপর পড়িলে, উহা লাফাইতে লাফাইতে একেবারে নীচে পড়িয়া যায়—ঠনন্নং—ঠননং—ঠননং—ঠঃ অর্থাৎ পতনের শেষ জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়।" আবৃত্তি করিয়া শেষে বৈরাগ্যের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

হরিমহারাজ অনেক সময়, অজ্ঞানাবৃত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত দিবার কালে নিম্নের গানটি গাহিতেন:—'মন গরীবের কি দোষ আছে, ইত্যাদি। সে যে মহামায়ার হাতের পুতুল মাত্র।

হরিমহারাজের শরীরে বহুবার অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি ঐ সময় ক্লোরোফর্ম্ম করিতে দিতেন না। কি করিয়া অস্ত্রোপচারের অসহনীয় কষ্ট তিনি সহ্য করিতেন—আদৌ কষ্টই বোধ করিতেন না, না কষ্ট সহ্য করিতেন? এই কথা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে গীতায় 'যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥' শ্লোকটি জান? গুরুণা দুঃখেন অর্থাৎ শস্ত্র পাতাদি-জনিত-দুঃখেন।

ভালমন্দ আমাদের মনের সৃষ্টি। তাঁর একান্ত শরণ লইতে পারিলে উভয় হইতেই নিষ্কৃতি হয়। 'শুভাশুভ ফলৈরেব মোক্ষ্যসে কর্ম্ম বন্ধনৈঃ'—এই ইঙ্গিত করিতেছেন।

তামসী ধৃতির কথায় বলিতেছেন,—'অনুতাপ ও গ্লানির প্রথম প্রয়োজন থাকিতে পারে কিন্তু অধিক হইলে, উহা লইয়া পড়িয়া থাকিলে কিছু লাভ নাই—বিশেষ ক্ষতি। সুতরাং উহা ত্যাজ্য। ইহা তামসী ধৃতি। 'যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং'—ইত্যাদি।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেই (?) হরি-মহারাজ, প্রবল বৈরাগ্যের প্রভাবে একবস্ত্র ও একখানি লেপের ওয়াড় উত্তরীয় স্বরূপ লইয়া আসাম অঞ্চলে শিলং (?) পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসেন এবং ফিরিয়াই অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। একবার পূজনীয় লাটু মহারাজের সহিত অনেক ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়েন। লাটু মহারাজ সেখানেই রহিলেন। হরিমহারাজ একাকী চলিলেন। চিত্রকূটে গিয়া 'লু' লাগায় এক আমবাগিচার মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। রাখাল বালকেরা তাঁহাকে আমপোড়ার সরবৎ পান করাইয়া এবং আমের শাঁস গায় মাখাইয়া সুস্থ করে। ঐ সময়ে একজন শেঠ গরুর গাড়ীতে যাইতেছিল। তিনি উঁহাকে নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। হরি

মহারাজের মুখে শুনিয়াছি তিনি খুব কঠোর করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণকালে, কোন্ জায়গা উঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন,—গোদাবরী তীরে যখন ছিলাম, তখনই সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছিল। অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন,—একবার ভুবনেশ্বর খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার সেখানে গেলে তত ভাল লাগে নাই। শ্রীশ্রীমহারাজ নাকি ভুবনেশ্বরকে 'গুপ্তকাশী' বলিতেন। হরিমহারাজ বলিয়াছিলেন,—'সেখানে কিছু না থাকিলে কি আর মহারাজ, অমনি মঠ করিয়াছেন? ভ্রমণ-কালীন ইতিবৃত্ত বলিতে বলিতে তিনি কহিয়া-ছিলেন,—'পাহাড় পর্ব্বতে বেড়াইলে 'কালের প্রভাব' খুব লক্ষ্য হয়। কালের প্রভাবে বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল মহাকায় ধারণপূর্ব্বক আকাশে মাথা উঠাইয়া দণ্ডায়মান! কোন কোন বৃক্ষ পতনোম্মুখ, কাহারও বা পত্রসকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে পর্ব্বত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ইত্যাদি। জান না, গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকন্ সমাহর্ত্তুমিহপ্রবৃত্তঃ' —ইত্যাদি। Eternal time—Eternal space! দেশকাল ও নিমিত্তই মায়া—তাহাদের অতীত যিনি, তিনিই অব্যয়! উঁহাদের প্রভাবেই 'দেহে নিবধ্নন্তি দেহিনমব্যয়ং।"

চতুর্দ্দিকে বিলাসিতার ভাব এবং নিষ্কিঞ্চন ভাবের অভাব দৃষ্টে একদিন বলিতেছেন—তোমায় সত্যি বল্‌ছি, জীবনে একদিন ভিন্ন, একটা পয়সাও কাহারও নিকট চাহি নাই। একবার একজনের বাড়ী হইতে বিদায় কালীন, তিনি অর্থের আবশ্যকতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিলাম (তিনিই পয়সাকড়ি রাখিতেন) একটা টাকা হইলে গাড়ী ভাড়া কুলাইয়া যায়; তাই উক্ত ভদ্রলোকের নিকট একটি টাকা চাহিয়াছিলাম। সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ আজকাল কিছু করিতে চাহিতেছে না। আমি ত পলাইয়া পলাইয়াই বেড়াইয়াছি—অবশেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায়, লোকমুখে অবগত হইয়া কল্যাণ (স্বামী কল্যাণানন্দ) আশ্রমে লইয়া আসিল। তারপর ত আর উঠিতেই পারিলাম না। কি বলিব, নিজেরা পরের উপর নির্ভর করিয়াছি, ছেলেরা কুশিক্ষা পাইতেছে।

পূজনীয় বুড়োবাবার নিকট শুনিয়াছি, হরিমহারাজ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভার্থ দীর্ঘকাল 'করপাত্র' হইয়া (অর্থাৎ দুই হাত জোড় করিয়া যে স্থান হয় তাহাতেই ভিক্ষান্ন খাইতেন এবং আহারান্তে ঐ স্থানেই জলপান করিতেন) কাল কাটাইয়াছেন।

ঠাকুরের প্রসঙ্গে একদিন হরিমহারাজ বলিয়াছিলেন,—মাষ্টার মহাশয়কে একখানা কাপড় আনিতে বলিয়াছিলেন—উনি এক জোড়া আনিলেন। ঠাকুর জিদ্ করিয়া এবং একটু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক একখানা ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এখানে ও সব সঞ্চয় টঞ্চয় হবে না।" যৎটুকু দরকার তদতিরিক্ত কিছুই লইবে না। একজনকে লক্ষ্য করা চাই—ধ্রুবতারা ঠিক রাখ—নতুবা কোথায় এই প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষার অবসান হইবে?

শেষ জীবনে কাশী অবস্থান কালে, একটি ভক্ত খুব পীড়াপীড়ি করিয়া হরিমহারাজের জন্য একটা বড় কোট তৈয়ারী করিয়া দিলেন। মহারাজের একটি কোট পূর্ব্বেই ছিল। তিনি, ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন, এজন্য কিছুক্ষণ খুঁতখুঁতি প্রকাশ

করিলেন এবং ঐ কোট না লওয়াই উচিত ছিল ইহা বলিলেন।

সেবা লওয়া সম্বন্ধেও হরিমহারাজ বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। কাশী অবস্থান কালে দ্বিপ্রহরে গরমের সময় পাখা টানিতে গিয়া ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা গিয়াছিল। প্রথমটা আপত্তি করিতেন, পীড়াপীড়ি করিলে গালি দিতেন। অবশ্য সেবকের আন্তরিকতা অনুযায়ী এই ভাবের ব্যতিক্রমও হইত, ইহাও লক্ষ্য করা যাইত। কাশীতে প্রবাসী এক বৃদ্ধা দেশ হইতে অতি অল্প অর্থ পাইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে চুষি পিঠা হরিমহারাজের জন্য তৈয়ার করিয়া আনিতেন। মহারাজ তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানিতেন এবং পুনরায় ঐরূপ করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও ফল হইত না দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—কি ভক্তি! বৃদ্ধা বলিয়াছে, "পিঠাগুলি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তৈয়ার করিতে থাকি!" আমি আর এখন নিষেধ করি না। যা করে করুক্।

অর্থদ্বারা হরি মহারাজের সেবা করাও বেশ কঠিন ছিল। 'কোথা হইতে তাঁহার ভরণ-পোষণ হয়' ইহা সেবকেরা বলিতে চাহিতেন না এবং অতিরিক্ত অর্থের আবশ্যকতা নাই ইহাই বলিতেন।

যাঁহারা সেবা করিতেন তাঁহাদের প্রতি হরি মহারাজের আশ্চর্য্য যত্ন ছিল। একদিন দুপহরে তাঁহার ঘরে বসিয়া আছি। জনৈক সেবক সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন,—তোমরা কেন আমার কাছছাড়া হও? তোমরা আমার সেবা করিতেছ, তোমাদের প্রতি আমারও ত কর্ত্তব্য আছে? সর্ব্বদা নিকটে না পেলে কি করে সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব?

শেষ জীবনে হরিমহারাজ খুব দেশের খবর রাখিতেন। নিত্যই সংবাদপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতেন এবং দেশ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর Young India পত্রিকা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। একাধিকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি,—গান্ধী যোগযুক্ত হইয়া লিখিতেছেন। উনি যাহা বলিতেছেন তাহা নির্ভুল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী কাশীতে আগমন পূর্ব্বক, Central Hindu College এ, ছাত্র ও অধ্যাপকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক এক বক্তৃতা দেন। যতদূর স্মরণ হয়, ভোর ৬টায় ঐ বক্তৃতা হয়। হরিমহারাজ উহা শুনিবার জন্য যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদপুরের কুলী ধর্ম্মঘটের সময় শুনিয়াছি হরিমহারাজ কুলিদের দুর্দ্দশার অবস্থার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত করুণ স্বরে পুনঃপুনঃ 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শ্রোতার মনে তখনকার মত বেদনার ভাব জাগিয়াছিল। বস্তুতঃ জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টায় তিনি কতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছিলেন। মিশনের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্তার নিকট শুনিয়াছি পূজনীয় হরিমহারাজই তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষার ভাব ক্রমশঃ মিশনকে গ্রহণ করিতে হইবে ইহা তাঁহার অভিমত ছিল।

হরিমহারাজ মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত সাধু হইলেও তাঁহার মধ্যে সকল কাজেই খুব আঁট ছিল। তাঁহার সকল কাজকর্ম্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে—কোনরূপ এলোমেলো বা গোলমেলে ভাব কখনও তাঁহার মধ্যে দেখি নাই। সবই যেন স্পষ্ট, ঝাপ্‌সা ভাব কোন ব্যবহারেই ছিল না। যাহা কিছু বলিবেন, লুকোচুরি নাই—আড়ম্বর নাই—একেবারে স্পষ্ট কথা—যেন খাপখোলা

তলোয়ার। ঢিলেমি তাঁহার ধাতে ছিল না। অপরের উপর ঠেস্ দেওয়া, অন্যকে কিছুমাত্র কষ্ট দেওয়া, নিয়ম বিহীনতা কদাপি তাঁহাতে দেখা যাইত না। সম্পূর্ণ নিজের উপব নির্ভর করিবার অভ্যাস তাঁহার মজ্জাগত ছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলার কথা হইতেছিল। হরিমহারাজ তখন মায়াবতীতে। তিনিও সেখানে গিয়াছেন। তিনি বলেন, —আমরা তখন নিজেদের সকল কাজকর্ম নিজেরাই করিয়া লইতাম। আমাদের ঐরূপ ব্যবহারদৃষ্টে - উনি খুব সুখ্যাতি করিয়া বলিযাছিলেন, 'মহারাজ, আমাদেব পক্ষে ঐরূপ কবা আর সম্ভবপব নয়। বাল্যকালে এমন অভ্যাস কবাইয়া দিয়াছে যে তাহা এখন পরিত্যাগ করা অসম্ভব। খপবের কাগজ পড়িতেছি হাত থেকে একখণ্ড কাগজ নীচে পড়িয়' গিয়াছে—উহা কুড়াইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় মা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ও কি করিতেছ, বেয়ারাকে ডাক্‌ছ না কেন?' ঐ মহিলাটি অবিবাহিত ছিলেন। বিবাহের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'কেন ওপথে চলিতে চাহেন? কত সন্তানের মা আপনি হইয়াই রহিয়াছেন?'—কি জান, তব না দিয়া থাকা খুব কমলোকের পক্ষেই সম্ভবপর।

হরিমহারাজ স্বামিজীর কথা বলিতে খুব উৎসাহ বোধ কবিতেন। একদিন বলিতেছেন,— স্বামিজী তখন বোম্বাইয়ে এক ব্যারিষ্টারের বাড়ীতে। খুঁজিতে খুঁজিতে আমি ও মহারাজ সেখানে উপস্থিত। তামাক খাইতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া হুঁকো হাতে করিয়াই ছুটিয়া আসিলেন—মুখে একটি শ্লোক—

অহঙ্কারঃ সুবাপানং গৌরবং ঘোব-বৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখীভব॥

শ্লোকটি শুনিয়া আমাব নিশ্চয় ধারণা হইল যে স্বামিজী উক্ত দোষত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর নানা কথাব পব, আমাদের সঙ্গেই সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'ভাই, ধর্ম্মকর্ম্ম কতদূর কি হল জানিনা, কিন্তু বড্ড Feel কচ্ছি, সকলের জন্যই প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।' উহা শুনিয়া আমাদেব বুদ্ধদেবেব কথা মনে হইল। স্বামিজীর শবীব তখন সাবিয়াছে চেহারা অতি সুন্দর হইয়াছে।
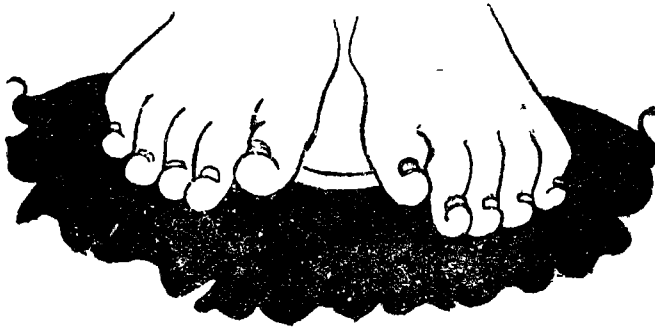
কথা প্রসঙ্গে

(সমাজের আদি কথা—বর্ণ ও যৌন শ্রম-বিভাগ)

সাধারণ লোকের সব সময় একলা চিন্তা করে সংসারের সকল সমস্যার সমাধান করে ওঠা অসম্ভব। মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবেই। মানুষ জন্মাবধি সাহায্য সাপেক্ষ বলেই সমাজ, গোষ্ঠী, জাতি, টাবু, টোটেমের সৃষ্টি হয়েচে। অধিকাংশ মানুষই সমাজ-শক্তির দ্বারাই গঠিত হয়—তবে মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় যে তাঁরা প্রচলিত সমাজ-কারা ভেঙে চুরমার করে কখন তার পরিধির বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ বা যা আছে তারই রকম ফের করে দেন। দেখা যায়, কোন অপরিচিত পশুশক্তি কোন সমাজের চিরাচরিত শৃঙ্খল ভেঙে, নিজেদের নিগড় তাদের পায়ে পরিয়ে দেয়, অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা ধর্ম্মের ক্রমবিকাশেও সমাজের বিপ্লব ঘটে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মানুষকে বাস করতে হয় একটা সামাজিক শৃঙ্খলাকে মেনে নিয়ে। এ পৃথিবী গ্রহে সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া শান্তিতে বাস করবার এখনও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় উপায় আবিষ্কৃত হয় নি। পরন্তু নিরপেক্ষ সমাজাদর্শ, অথবা মার্ক্সের ভাষায় "Ideal, logical superstructure" "of human communal life" কোনও "absolute truth" এর ওপর, অতীতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং ভবিষ্যতে হবে কিনা এখনও তার সঠিক নির্দ্দেশ আমরা করতে পারি না।

বাহ্য আবহাওয়ার ও দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও তাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন আহার, বিহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়, ঠিক তেমনি আবার মানুষের অজ্ঞানকৃত উৎপীড়ন ও জ্ঞানকৃত আবিষ্কারাদির সহিত আমাদের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থান করতে হয়। ধর্ম্মের ব্রতাচারণাদি আমরা অনেক সময় প্রচলিত বিধি হিসাবে মানি ও অনুষ্ঠান করি—সামাজিক বিধি নিষেধও সাধারণ জীবনে, শান্তিতে বাস করতে করতে, অনেকটা কাওয়াদের মত হয়ে পড়ে। কিন্তু ধর্ম্মের ব্রতাদির মূল বিশ্লেষণ করলে যেমন আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রাথমিক সূত্রগুলি পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি, প্রতি যুগে সামাজিক বিধি নিষেধের মূলেও তৎতৎকালীন আত্মরক্ষার উপযোগী তত্ত্বগুলি আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। তবে ধর্ম্মের প্রাথমিক সূত্রগুলি সার্ব্বজনীন, পরন্তু সামাজিক তত্ত্বগুলি আপেক্ষিক; কারণ উহা মাত্র তৎতৎ কালোপযোগী। অন্নবস্ত্র আচ্ছাদনের সমবিভাগের ওপর যে আজ সামাজিক আন্দোলন চলেচে, তার কারণ, মানুষের ঐ সকল অভাবের উপশমের উপকরণগুলি খুব কষ্টসাধ্য ও উপকরণের আকরগুলি কতকগুলি বিশিষ্ট লোকের আয়ত্তে আছে বলে; কিন্তু কাল যদি ঐ উপকরণগুলি বিজ্ঞান সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তির অতি সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রচণ্ড বিস্তার হেতু যে ভোগ বা "কাম-কাঞ্চন" বা "বিলাস"—স্বার্থ হেতু যে আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্যবসায়ীদের কলা, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে এত প্রপাগণ্ডা, যদি মানুষ অন্ততঃ পক্ষে, একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্যও বুদ্বুদের মত একটু ব্যাপকভাবে অস্বীকার কোরে

বসে, (কারণ রাজ-সন্ন্যাসাদি ব্যাপার যা একবার মনুষ্যেতিহাসে ঘটেচে, তা আবার ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়), তা হলেই মার্কস্ বা এন্‌জেল্‌সের "materialistic stratification"এর "economic basis" মানুষের পায়ের তলা থেকে সরে গিয়ে সামাজিক "absolute truth"টি "relative" হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ব-সৃষ্টির বিভিন্নতায়, দেহ ও আবেষ্টনীর বৈষম্যে যেমন মানুষের গঠনবৈচিত্র্য গড়ে ওঠে, তেমনি সে বৈচিত্র্যের আর একটি উপাদান সমাজকেও আমাদের উপেক্ষা করবার যো নেই। ব্যক্তিগত সুযোগ সাহায্যের জন্য সমাজ, আবার সমাজের জন্য অনেক সময় আমাদের অনেক ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ত্যাগ করতে হয়। এইরূপ উভয়ের সংঘর্ষে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে এবং প্রতি ব্যক্তির সহিত যে অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ তাও নির্ণীত হয়। একটু বিবেচনা করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, সমাজকে উপেক্ষা করে মানুষ কখনও ব্যক্তিগত নির্জ্জন-জীবন যাপন করে নি। মানুষের সঙ্গে তার সমাজও রয়েচে, কারণ মানুষ এমন অসহায়ভাবে জন্মায় ও দীর্ঘকাল তাকে সেই অবস্থায় থাকতে হয় এবং পশুদের সঙ্গে তুলনায় দৈহিক শক্তি ও গতি তার এত ক্ষীণ যে তাকে অতি বন্যস্তর হতেই দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েচে। সময় সময় সাধারণ মানুষকে যে নির্জ্জন বাস করতে দেখা যায়, তার তলে থাকে—পরাজয়, উৎপীড়ন, অপমান বা বিতাড়ন। কিন্তু খুব উচ্চস্তরের মানবে যে নির্জ্জনপ্রিয়তা দেখা যায়, তার হেতু কোনও উচ্চ-তত্ত্ব আবিষ্কার সংকল্পে গভীর মনঃসংযোগ। কিন্তু সত্যলাভের পর তাঁরাও সেই আদর্শকে, বহুর ভেতর বাস্তব রূপে উপলব্ধি করবার জন্য সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যেক-বুদ্ধেরা জগতের অনিত্যতা দর্শন করে জগদ্বিমুখ হয়ে নিত্য অবস্থান করবার জন্য সমাজ পরিত্যাগ করেন। ভগবান কিন্তু সমাজে আবির্ভূত হয়ে ভক্ত নিয়ে থাকেন। এই ভক্ত নিয়ে থাকাই হচ্চে, লোকচক্ষুর অগোচরে যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেন, তারই বহুর মধ্যে উপলব্ধি ;—যাকে সাদা কথায় বলে নিজ আবিষ্কার দ্বারা লোক কল্যাণ সাধন।

যিনি যত বড়ই হোন তাঁর শৈশব জীবন সমাজকে অপেক্ষা করবেই, কাজেকাজেই সমাজের দাবীও তাঁর ওপর আছে। ডারউইন বহুদিন পূর্ব্বে একটা বিষয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে দুর্ব্বল প্রাণী কখনও একলা থাকতে পারে না। মানুষকেও দুর্ব্বল জন্তু জাতির মধ্যেই আমরা ফেলতে বাধ্য ; কারণ তার একলা আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই, মাত্র প্রকৃতির কোনও কোনও ব্যাপারের সঙ্গে সে কিছু-কাল যুজতে পারে। কাজেকাজেই এই গ্রহে তাকে বাস করতে হলে, তাকে নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হবেই। আদিম মানুষের অসহায় অবস্থাটা আমরা বেশ পরিকল্পনা করতে পারি, যদি একবার প্রাচীন অরণ্যেবাসী কৃষ্টিজাত-অস্ত্র-শস্ত্রহীন মনুষ্যজাতির বিষয় আমরা চিন্তা করি। পিঁপড়ে, মশা থেকে আরম্ভ করে অতিকায় হস্তী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে জীবন প্রতিযোগিতায় সে অসম্পূর্ণ-উপকরণ। তার গায়ে বড় রোম নেই যে সে শীত, মশা, মাছির হাত থেকে রক্ষা পাবে, চামড়া শক্ত নয় যে বিশাক্ত কীট দংশন সে উপেক্ষা করবে, হরিণের মত গতি নেই যে বলবান শত্রুর কাছ থেকে ছুটে পালাবে, বনমানুষের মত বল নেই যে লড়াই করবে, বাঘের মত তার দাঁত নখও পরাক্রান্ত নয়, শ্রবণ শক্তি তেমন তীক্ষ্ণ নয় যে আগে থেকেই সাবধান হবে, বিড়াল প্রভৃতি রাত্রেও দেখতে পায়, কিন্তু সে রাত্রে অন্ধ—সে জলে ডুবে থাকতে পারে না,

গাছও তার পক্ষে খুব অসুবিধাজনক।* কাজেই তাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে, অনেক কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র ও সংযোগ সম্পন্ন একটা গোষ্ঠীর প্রয়োজন।

একটা বুদ্ধিমান শিশু জন্মাল, কিন্তু অবস্থাচক্রে পড়ে তার কোনও বিকাশই হলো না; কিন্তু একটা সাধারণ স্তরের শিশুও যদি বাইরের সুযোগ সুবিধা পায় তা হলে সেও কতকটা আত্মবিকাশে কৃতকার্য্য হতে পারে। তা বলে মানবাত্মার প্রথম বিকাশে যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আমরা তার অস্বীকার করছি না—মানব জীবনের প্রথম স্তরে ব্যক্তি ও সমাজের সহযোগিতাতেই মানুষ গড়ে ওঠে, ব্যক্তিত্বহীন জীবন "সাধুর কমণ্ডলুর মত চারধাম করে আসে, কিন্তু যে কে সেই থাকে"—যন্ত্রের মত সদসতের মধ্য দিয়ে চলেচে, কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন। একটা পরমাণুর মত, ব্যক্তিত্বই হচ্চে জীব-কেন্দ্রিন্, যাকে অবলম্বন করে তার গতি ও সঙ্গে সঙ্গে কত ধনী ও ঋণী বিদ্যুতিনরূপ বাহ্য নেতি-অভিজ্ঞতার গতাগতির ভেতর দিয়ে তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক স্বভাবের স্ফুরণ ঘটচে। কাজে কাজেই মানব প্রকৃতির প্রথম স্তরে বাহির বা সমাজকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রথম, ক্ষুধা-শীতোষ্ণ-ব্যাধি-নিবৃত্ত্যুপকরণ ও ভাষা—এই দুটো হলো জীবন-যাত্রার প্রধান সম্বল—এ দুটোই জীবনের প্রাক্‌কালে পেতে হয় আমাদের বাহিরের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। তারপর একটা নির্দ্দিষ্ট অসহায় অবস্থা অতিক্রান্ত হলে, ব্যক্তি ও সমাজের সমবায় সম্বন্ধ উপস্থিত হয়—যার ফল-স্বরূপে শ্রম-বিভাগ হেতু গুণকর্ম্ম বা সামর্থ্যানুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি। এক একটি বর্ণ হলো এক একটি Group. এই গ্রুপ্ বা গণ্ডির মধ্যেও আবার প্রতিখণ্ড-কর্ত্তব্যে সমবায় জ্ঞান না থাকলে কোন সমষ্টি ফলই পাওয়া যায় না। আবার প্রত্যেক Group-Consciousnessই সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধিত হয়ে একটা Conscious Nation গঠিত হয়। যাঁরা আবার সর্ব্বভূতে নিজ আত্মার স্ফুরণ উপলব্ধি হেতু সকল জাতীয়তা বোধ অতিক্রম করে ব্যক্তি ও জাতির সকল গণ্ডি মুছে ফেলতে পেরেচেন, তাঁরাই হলেন বিশ্বমানব—World-Man. কিন্তু সমস্ত জাতীয় সভ্যতাই এই শ্রম-বিভাগ ও সমবায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একটা Conscious Nationই জাতীয় স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত আক্রমণ ও অবহারের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। ভারতবর্ষে এই গুণকর্ম্মানুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগ ধ্বংস হওয়ায় বর্ত্তমানে তার জাতীয়-জীবন সন্দেহ-জনক হয়ে পড়েচে। বুদ্ধদেবের আগমনের সহিত ব্রাহ্মণ-বর্ণানুশীলন অতিমাত্রা বৃদ্ধিতে, ভারতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ উৎসাদিত হওয়ায় তাঁর শাসন ও সম্পদ অবলীলাক্রমে অপরের হস্তগত হয়।

কিন্তু জাতি বা গোষ্ঠীর ভেতর শ্রমবিভাগের পূর্ব্বেও মানুষের আদিম ইতিহাসে আর একটা বিভাগ তার দরকার হয়েছিল তার গৃহে—নর ও নারীর শ্রম-বিভাগ। প্রকৃতির নিয়মে

* How ridiculously ill-equipped for the purposes of physical existence the species "man," and in particular that variety of the species known as "civilised man," is. He cannot keep himself worm without covering himself with the skins of other animals, he is the prey of innumerable diseases, his body is ill protected and unnecessarily complicated, and his young are completely helpless over an abnormally long period He is exceptionally destructive, he is dangerous both to his own kind and to other species and alone among living creatures, he kills members both of his own and of other species, whom he does not require for purposes of sustenance.—The Future of Life p. 24 —C.E.M. Joad.

নর সবল, নারী দুর্ব্বল। তাই গৃহের ভার নারীর, বাইরে আহার সংস্থান ও আত্মরক্ষার ভার নরের। তা ছাড়া গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের জন্য নারীকে বহুকাল থাকতে হয় পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে। মুক শিশুপালন যে কি কঠিন ব্যাপার তা আধুনিক সভ্যযুগেও আমরা বেশ বুঝতে পারি। মা-কে দিনরাত্রি শিশুর দিকে নজর রাখতে হয়, তখন আহার সংস্থান বা অপরাপর কাজ-কর্ম্ম একরকম নারীর অসম্ভব হয়ে পড়ে; তবে শিশু একটু বড় হলে পিঠে কাপড়ে বেঁধে পার্ব্বত্য প্রদেশীয়া নারীদের কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু সেটা গৌণ—মুখ্য পরিশ্রমের কাজ এবং আত্মরক্ষার ভারটা পুরুষের হাতেই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে।

মানুষের গোষ্ঠিবদ্ধ ভাব এবং শ্রমবিভাগ—মানুষের বাহিরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাষার ক্রমবিকাশের সহিত এসে পড়েছে—যার ফল বিবাহ, বর্ণ এবং ধর্ম্ম বা বিধি-নিষেধ এবং সদসৎ সম্বন্ধে যার স্থাপিতমান 'ব্যক্তির গোষ্ঠীর প্রতি কীরূপ মনোভাব'; এই তত্ত্ব এবং সমষ্টির প্রতি তার দানের পরিধির ওপর ব্যক্তির উচ্চস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক সময় আবার কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির শক্তি-ক্ষুধা সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়, পক্ষান্তরে প্রতি ব্যক্তি তার স্ব স্ব শ্রম অস্বীকার করলেও একই দুর্যোগ ঘটে। কোথায়ও বা একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি অপরের গুরু শ্রমের ওপর নিজেদের ভোগ-বিলাস বিস্তার করায় সমাজে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

এইরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েচে আমাদের দেশের নর ও নারীর শ্রমবিভাগ নিয়ে। নর চেয়েছিল নারীর অশিক্ষা ও শারীরিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে একটা ক্রীতদাসীতে পরিণত করতে—অন্যায়ের সাজাগুলো নিজেদের বেলায় রেখেছিল বেপরোয়া মকুফ্ করে। কিন্তু শিক্ষা ও যন্ত্রপাতির প্রগতির সহিত নারী-প্রগতিও আরম্ভ হলো এবং নারী তার স্বাধিকার ও শ্রমকে অস্বীকার করতে বসায় সমাজও ধ্বংসমুখী হয়ে উঠেচে। এটা হলো নারীর প্রতি অতিরিক্ত শাসন, সংযম, অপমান ও উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া। এতে নর ও নারীর স্বাভাবিক সম্বন্ধটি নষ্ট হয়ে যে ঝড়-বাদলের সৃষ্টি হবে তাতে বোধহয় সকল গৃহের চালই যাবে উড়ে। তাই তুফানের আগে সকল গৃহীরই সামাল হওয়া দরকার।

খুব দূর অতীতের একটা সময়ে, যখন সমাজ ছিল মাতৃতন্ত্র (Matriarchate) মাতাই ছিলেন গৃহের মালীক, আত্মীয়-স্বজন গোষ্ঠীবর্গ সকলেই তাঁকে সম্মান কোরত—কারণ মা গর্ভধারিণী, সন্তান-সন্ততী তাঁর দেহের অঙ্গ—শুধু তাই নয়, তিনি পালয়ত্রী। কিন্তু বহু গোষ্ঠীর বৃদ্ধির সহিত বিবাদেরও ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে লাগলো এবং যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নর যেমন নিজের স্বত্ব, স্বামিত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপন করতে লাগলো, নারী দুর্ব্বল বলে আত্মরক্ষার জন্য ঠিক তেমনি নরকে সম্মান দিয়ে নিজের কর্তৃত্বের আসনে বসাতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তাতে শান্তি যে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হলো, তা নয়, প্রভুত্ব নিয়ে অনেক সময়ই উভয়ের বিবাদ এখনও পর্য্যন্ত চলে আসচে এবং নরও নারীর উপর নিজের স্বামিত্ব বজায় রাখবার জন্য অনেক আইনকানুনও পরবর্ত্তী কালে নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী সৃষ্টিও করলে। ধীরে ধীরে নারীর আত্মহত্যার ওপর গৃহ ও শিশু সম্বন্ধে ভাবনাহীন নর জ্ঞানরাজ্যে খুব অগ্রসর হতে লাগলো এবং সমান্তরালভাবে শিক্ষাভাবে নারীর বুদ্ধিবৃত্তি হীন হতে হীনতর হয়ে Lesser Man বলে পরিচিত হয়ে পড়লো। পুরাণে, বাইবেলে, কোরাণে, হোমারের "ইলিয়াড" (Iliad) হতে আরম্ভ করে চলতি গল্পগাছা, উপমা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ পর্য্যন্ত, এমন কি

সভ্যযুগের Strindberg, Moebius, Schopenhauer পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নারী মানবের নিম্নস্তর বলে প্রমাণিত হয়েচে। লাটিন ভাষায় একটা প্রবাদই আছে,"Woman is the confusion of man." তা ছাড়া বিদ্যালয়াদি বুদ্ধির প্রায় সকল বিভাগেই দেখা যায় নারী নর অপেক্ষা হীন।

কিন্তু কেন?—এ প্রশ্ন কেউ করে না। নরকেও যদি শিশুকাল হতে শুনতে হতো যে সে নারী হতে নিকৃষ্ট এবং তাকে গৃহগণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে দাসীব্রত নিয়ে কাটাতে হবে, তবে তারও বুদ্ধিবৃত্তির অননুশীলন বশতঃ Lesser Woman বলে পরিচিত হতে হোত। অবশ্য আমরা এখানে পাল্লা-পাল্লীর কথা বলচি না—আমরা বলচি নারীর গৃহস্থালীর কর্ত্তব্যটা পুরুষের গবেষণাগার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। স্বামিজীর ভাষায়, জাতীয়পক্ষীর নারীও নরের ন্যায় একটি পক্ষ। কেউ যদি কারও গণ্ডি অতিক্রম করে, তা হলেই শ্রম-বিভাগ ধ্বংস হয়ে জাতিও ধ্বংস হবে। প্রচণ্ড অগ্নির রক্ত আলোয় রঞ্জিত হয়ে মানুষ যখন "মেসিনগানের" গঠনোন্মাদনায় বিভোর, তখন সে নারীর ধাত্রী-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, খাদ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, শিল্প, সেবা-বিজ্ঞান—অহংএর পশুগর্ব্বে এবং দোকানদারীর প্রেক্ষায়, নিকৃষ্ট বলে মনে করে। নর সদাই খোঁজে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের ব্যবহারিক মূল্য, তাই তার দৃষ্টি সদাই নারীর ব্যবহারের উপাদান সৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। নর দেখে কে কত বলবান, দেখে না কে তার বলোপাদান খাদ্য যোগায়,—দেখে কোন বৈজ্ঞানিক কি আবিষ্কার করলে, দেখে না সে প্রতিভার জনয়ত্রী কে? আবার নর করে উপার্জ্জন, নারী করে ব্যবহার—নারীর সৌন্দর্য্য বোধে শিল্পের উৎপত্তি। এমনি করে এই দ্বৈত-শ্রম সমবায়ে এ সমাজদেহের গঠন হয়েচে।

কিন্তু নারীর প্রতি অচ্ছিন্ন হেতু, নারীর ভেতর শিক্ষার বিস্তারের সহিত, নরের সহিত প্রতিযোগিতার একটা বিষম ভাব তার উপস্থিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এঁরা "The boy girl," "la garcoune," "mannish" বলে পরিচিত, আমাদের দেশে এর প্রতিশব্দ "মেয়ে-মদ্দা"; এঁরা যেমন কার্য্যক্ষম, তেমনি এঁদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, যে কোনও প্রতিযোগিতায় এঁরা নামতে প্রস্তুত; ছাত্রী অবস্থায় ভ্রাতাকেও পরাজয়ের আনন্দ খুব,—পুরুষোচিত খেলাধূলার দিকে খুব ঝোঁক; বিবাহাদি মোটেই পছন্দ করেন না, যদি বা হলো তবে তাঁরা স্বামীকে ট্যাকে গুঁজে রাখতে চান এবং গৃহস্থালী ব্যাপারে একেবারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। কোনও কোনও ডাক্তার বলেন যে এইরূপ পুরুষ ভাবাপন্ন নারীর শরীরে পুরুষোচিত কোনরূপ রাসায়নিক তরল নিঃসৃত হয়। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, দারিদ্র্যের তাড়নায় নারী পুরুষোচিত কর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; অথবা সৎপাত্রের অভাবে বা স্বামীর অত্যাচারে নারী নরের ন্যায় স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষম হতে চায়। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অবিচারের চাপে নারীর হৃদয় সংকোচের মাত্রা অতিক্রম করায়, বায়ুর তুষার ভাবের মত, তাই আজ অতি-বিস্তারশীল হয়ে পড়তে চাইছে। যদি চাপ শিথিল না হয়, তাহলে এই স্ফীতি সমাজ যন্ত্রকে একেবারে চুরমার করে দেবে।

আর এক প্রকারের ব্যক্তিত্বহীন নারী আছেন, তাঁদের ধৈর্য্য, আজ্ঞাবহতা, উপযোগ্যতা, নম্রতা অসীম। এই মেরুদণ্ড বিহীন জীবন যে কোনও জমিতে রোপণ করা চলে, কিন্তু এর বৃদ্ধি বড় অল্প। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থাচক্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে, এঁরা অতি অল্প বয়সেই একটা রুগ্ন যন্ত্রে পরিণতা হন। অবচেতন ভূমিতে নিরন্তর ইচ্ছার অপূর্ত্তি হেতু যন্ত্রণা ভোগ,—কিন্তু সর্ব্বদাই আবেষ্টনীর সহিত আপোষ। অশিক্ষিতের পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-পরের নাস্তিকতা, বর্ব্বরের রূঢ়তা সবই স্বীকার

করে নিতে নিতে, অতি অল্প কালের মধ্যেই এঁদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পড়ে। এঁরা শিক্ষিত হলেও, ব্যক্তিত্বহীন-অতিমাত্র-বশ্যতা ও নম্রতার আদর্শ এঁদের অন্তর রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বালিয়ে দিয়ে, প্রথম দলের গুপ্ত সভ্য করে নেয়।

তৃতীয় শ্রেণীর অশিক্ষিতারা 'জন্ম থেকে নর বড়, নারী ছোট' এই অভ্যাস ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়ে, সংসারে প্রবেশ করেন। জীবনে কোনও উচ্চ আদর্শ নেই, কারণ অশিক্ষিত, যদি বা থাকে তা নরের জন্য। এঁরা গর্ভধারণ ও দাসী-বৃত্তিতে বেশ তৃপ্ত; নিজেদের 'দুর্ব্বল' 'ছোট' বলতে বলতে একেবারে একটা জ্যান্ত লেগেছে পরিণত হয়ে পড়াতে বেশ খুশী। এই সব গর্ভধারিণীরা মাতৃত্ব-হীন বলে সন্তান পালনে অসমর্থা। ছেলেপুলে যেই একটু সবল হয় আর অমনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তারা নিজের খেয়ালে চলে, ফলে শাসনের জন্য ক্রমাগত পুরুষের সাহায্য দরকার হয়। এরূপ নারী যে সমাজে যত অধিক, জাতীয় পক্ষীর এক পক্ষ ততই দুর্ব্বল হয়ে পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যের শ্রম-বিভাগের পূর্ব্বে, গৃহে নর ও নারীর শ্রম-বিভাগ প্রয়োজন। নর ও নারী কেহ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়—ব্যবহার ও বৃত্তিতেই উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নির্ভর করে। প্রকৃতিই নর ও নারীর শ্রম-বিভাগ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন—তার কোন বিভাগই নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নয়—প্রত্যেকটিই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রাণধারা রক্ষাকল্পে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে একটিতে কর্ত্তব্যচ্যুত হলেই আমাদের জীবন সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

নারী বিদ্রোহের হেতু তার অসম্মান। এখন নরকে যদি জীবনের অর্দ্ধেক শান্তি উপার্জ্জন করতে হয়, তাহলে গৃহে, সমাজে এবং জাতীয় জীবনে নারীর যোগ্যতানুযায়ী স্থান, সম্মান, সুবিধা, ভদ্রতা, নিরপেক্ষ বিধি-নিষেধ, শিক্ষা প্রভৃতি সকল সুযোগ দান করে জাতীয় প্রগতির বলাধান করুন। শিশু ও গৃহ নারীর—যুবক ও জাতি নরের। কেউ কাকেও উপেক্ষা করলেই অপরটি অচল হয়ে পড়বে।

স্বামিজী এক জায়গায় দেশবাসীকে বলেছেন, "এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবা ভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। ওদেশে মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালায়, আফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারী করে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় প্রভৃতি দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পাইয়াও তোমরা ইহাদের উন্নতি করিতে পারিলে না! ইহাদের ভিতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করিলে না! ঠিক ঠিক শিক্ষা পাইলে ইহারা আদর্শ স্ত্রীলোক হইতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে

নমি তব পদাম্বুজে হে মহান্! জলধি সমান
কূল নাই, সীমা নাই, চারিদিকে অনন্ত প্রসার।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যে পথে যে হোক আগুয়ান
চির-স্থির-স্নিগ্ধজ্যোতি হোমানল-শিখার সমান
পথভ্রান্ত মূঢ়জনে তুমি সেথা দেখাইছ পথ।
যেন শিবজটা বাহি, দর্পোদ্ধত শৈল শত ভাঙ্গি
অবতীর্ণা ধরাধামে জীবভাগ্যে পুণ্যা ভাগীরথী,
যাহে অবগাহি নিত্য পাপীনর মুক্ত অবহেলে,
তীরে বসি প্রাতঃ সন্ধ্যা ইষ্টপদ ধ্যায়ে ভক্তযোগী,
বণিক অর্থের আশে পণ্যে ভরি তরী শত শত,
দেশ দেশান্তরে ধায় স্রোত পথ বাহি অবিরত।
হে সরল! হে মহারহস্যময় অতীব গভীর।
তুমি শুধু কর নাই রাগহীন সন্ন্যাসী সৃজন।
জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তব কথা করিয়া কজ্জন
প্রতিবারে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে দিল অনুতাপানল।
জ্ঞানী তুমি নিস্তরঙ্গ জলনিধি চন্দ্রিমা প্লাবিত—
কিন্তু প্রেমোন্মাদ জনে তোমা হ'তে কে কোথা
আপন?

বুকে তব যত্ন করি জিয়াইলে কালান্ত অনল
পুড়ে দিল ছাই করি পুঞ্জীভূত জড়তা মলিন
মানস সরসে তব জন্ম নিল কিন্তু অন্যদিকে
সৌম্য বেশ চারু মূর্ত্তি আত্মভোলা প্রেম স্রোতধার
কত রূপ কত নদ তোমা বুকে লইয়া জনম।

প্রেম-পুণ্য পূত জলে তাপদগ্ধ প্লাবিল ধরণী
বিস্ময়ে অবাক তাই নমি নমি স্তোমি শতবার!
বক্ষাশীল শ্রেষ্ঠ তুমি দৃঢ়কণ্ঠে করিলে প্রচার
'যত মত তত পথ'—যত ধর্ম্ম সত্যেরি প্রকাশ।
জগতে অগণ্য ধর্ম্ম, সব ধর্ম্মে করিলে বরণ
কিন্তু তার ভেঙে দিলে ছোট ছোট অগণ্য প্রাচীর
মাথা তুলে বায়ু পথ রুধে ছিল যারা এতকাল।
আধি-ব্যাধি দৈন্য ভরা ধরিত্রীর মলিন ধূলায়
ত্রিদিব আসিল নামি লয়ে তার সকল সম্পদ।
যে দিন কহিলে তুমি দীন নহে হীন কোন মতে—
বুভুক্ষিত, নিপীড়িত নবরূপে মূর্ত্ত ভগবান্!
বুদ্ধরূপে কৃপাবর্ষী, খৃষ্টরূপে নিজ রক্ত দিলে
ন্যায়াধীশ রামচন্দ্র, কৃষ্ণরূপে জ্ঞান কর্ম্মময়
চৈতন্যেতে প্রেম লয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়াছ কাঁদিয়া।
একাধারে 'রাম-কৃষ্ণ' খৃষ্ট-বুদ্ধ গৌর শিরোমণি
কোটি সূর্য্যপ্রভা সম মোহ ঘোর গেলে বিনাশিয়া।
সংসার চক্রের পাকে আজো তবু ওঠে হলাহল,
আশার কুহকে পরি আজো প্রাণ তপ্ত মরুস্থল;
কিম্বা মায়া? অজ্ঞেয় অজেয় এই খেলা নিদারুণ
সম্বর সম্বর নাথ! ক্ষত পদ রক্ত ঝরে আজ
শান্তিময় পা দুখানি, দীন জন মাগিছে আশ্রয়॥

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা

কাশীধাম, ২০।১।২১

শ্রীশ্রীমহারাজ। (রা—মহারাজকে) খুব কর, বুঝলি রা—, কর। একটু সময়ও যেন নষ্ট না হয়। ঠাকুর একটি দিন গেলে মার কাছে, কেঁদে বলতেন, 'মা এই একদিন গেল, কিছুই হলো না' তোরা খুব ব্যাকুল হ—খুব তন্ময় হয়ে যা।

জি—মঃ। মহারাজ কৃপা কি Conditional (কোন কিছু সাপেক্ষ)?

শরৎ মহারাজ। হাওয়া ত বইছেই, যে পাল তোলে, সেই পাবে।

শ্রীশ্রীমহারাজ। ঠাকুর বলতেন, "গরম থামাবার জন্ম পাখা করে, কিন্তু যাই হাওয়া আপনি বইতে আরম্ভ করে, তখন পাখা বন্ধ করে দেয়।"

একজন। ঠিক ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্চে, না hallucination (ভ্রান্তি), কি করে বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীমহারাজ। ঠিক ঠিক দর্শনে খুব স্থায়ী আনন্দ হয়। নিজের মনই বুঝিয়ে দেয়।

রা—মঃ। আমি ভাবি, ব্যাকুলতা ও ভালবাসা থাকলেই আর সব ঠিক হয়ে যায়। হরি মহারাজও এই কথা সেদিন বলছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বইতে পড়লুম, তিনি বলচেন, "যে কোনও রূপে মনটা স্থির হলেই, আর সব ক্রমে ক্রমে আসে।" তিনি সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের ওপর খুব জোর দিয়েছেন।

শরৎ মহারাজ। হাঁ, আর সরলতা চাই। ঠাকুরের কথায়, "মন মুখ এক করা।"

তে—মঃ। মহারাজ পূজায় মুদ্রা প্রভৃতির কী দরকার?

শ্রীশ্রীমহারাজ। নানা রকম evil influence (অসৎ প্রভাব) আসে। কখনও কখনও দেখবে, এই বেশ মন আছে, মনে হয় এই ধ্যান করিগে, বেশ ধ্যান হবে, কিন্তু বসতেই হয়ত ৫ মিনিটের মধ্যেই নানা দুশ্চিন্তা এসে মন খারাপ করে দিলে। আমারই এক সময় মনে একটা মলিন ভাব এসেছিল। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হতেই, দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন, বল্লেন, "তোর ভেতরে একটা মলিনতা এসেছে দেখছি।" এই বলেই মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় করে বকলেন, অমনি ৫ মিনিটের মধ্যে সব দুর্ভাব কেটে গেল। মন উঁচুতে উঠলে এ সব evil influence সেখানে যেতেই পারে না।

কাশী, ৩।২।২১

প্রশ্ন উঠিয়াছে, পূজা কী?

শ্রীশ্রীমহারাজ। পূজায় বাহ্য ও মানস দুই include (অন্তর্ভুক্ত) করে। তবে বাহ্য পূজায় উপকরণ দরকার করে, তা তোমাদের পক্ষে সকল সময় সংগ্রহ করা কঠিন। মানস পূজাই সুবিধা। মনে মনে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে মানস জপ ধ্যান করবে। মানস জপে জিহ্বাও নড়বে না। সাধারণ জপে মন্ত্র উচ্চারণ করে করতে হয়।

ধ্যানকালে মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় ভাবতে হয়। যেন তাঁর জ্যোতিতে সব আলো। Immaterial (অজড়)—চৈতন্ত স্বরূপ ভাববে। পরে ওই নিরাকার ধ্যানে সহজে পরিণত হয়। তারপর জ্ঞান চক্ষু ফুটলে সহজে সব দেখা যায়—সে আর এক জগৎ—এ জগৎ যেন তার ছায়া। এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। উদি (বামুন) যখন কলকাতায় এলো, বল্লে, 'ভুবনেশ্বর গ্রামটা কিছুই নয়।' তারপর মন লয় হয়, তারপর সমাধি, তারপর নির্ব্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে হয়

মুখে কিছু বলা যায় না। সেখানে দেখা নেই শোনা নেই—অনন্ত! অনন্ত!! এ সবই অবস্থার কথা। তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে হয়। এটা কিছু নয় মনে হয়। "দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্।" সেই অবস্থায় গিয়ে কেউ কেউ শরীরটাকে মস্ত বাধা মনে করে সমাধিতে ছেড়ে দেন। যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া। ঠাকুর বেশ একটা দৃষ্টান্ত দিতেন—দশটি সরায় জল আছে, তাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে; এক একটা করে সরা ভাঙতে ভাঙতে শেষে একটা সরা রইল। সেটাও ভেঙে দিতে যা রইল তাই রইল। 'সত্য সূর্য্য রইল' তখন আর এ কথাও বলা চলে না।

ল—মঃ। মহারাজ, ধ্যানের সময় যদি তাঁকে সর্ব্বব্যাপী ভাবা যায়—সেটাও ত ধ্যান?

শ্রীশ্রীমহারাজ। ওটা ত করতেই হবে। তবে একটু পরে। সেই ইষ্টকে জলে স্থলে পাতায় পাতায়, আকাশে নক্ষত্রে, পাহাড়ে পর্ব্বতে—সর্ব্বত্র অনুভব হয়।

ল—মঃ। আচ্ছা মহারাজ, এ সব তত্ত্ব জানতে হলে গুরুসেবার দরকার শাস্ত্রে বলে।

শ্রীশ্রীমহারাজ। হাঁ, ওটা প্রথম অবস্থায় বটে। তারপর মনই গুরু হয়। গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নেই; ভাবতে হয় তাঁর দেহটা মন্দির, তাঁর ভেতর ভগবানই রয়েছেন। এইভাবে গুরু সেবা করতে করতে গুরুতে প্রেমাভক্তি হয়। এই গুরুর প্রতি প্রেমাভক্তিই পরে আবার ভগবানের দি'ক দেওয়া যায়। গুরুমূর্ত্তি সহস্রারে ধ্যান করে পরে আবার ইষ্টের মধ্যে গুরুকে লয় করতে হয়। ঠাকুর বেশ বলতেন, "গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন—ঐ তোমার ইষ্ট; তারপর গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান।" বাস্তবিক গুরু ত ইষ্ট ছাড়া নন। কত তত্ত্ব আছে ল—, মুখে আর তোমায় কি বলব! লেগে পড়। ভজন করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন কত কি-সব বোঝা যায়।

ল—ম। আচ্ছা মহারাজ, বোধ হয় সেই আনন্দের একটু আভাস পেলে লোকে এগিয়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীমহারাজ। উঃ আনন্দ কি বলছ! সেখানে আনন্দ নিরানন্দ কিছু নেই; সুখ দুঃখ কিছু নেই, ভাব অভাব নেই। আনন্দ ত সাধন অবস্থার কথা। নৌকাখান যতক্ষণ destination এ (গন্তব্যে) পৌঁছুই নি, ততক্ষণ অনুকূল বাতাস দরকার—পৌঁছে গেলে আর বাতাস টাতাস দরকার নেই। আনন্দ ঐ অনুকূল বাতাসের মত help (সাহায্য) করে। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা লয় হয়। শাস্ত্রে শুধু এই পর্য্যন্ত বলেছে, কিন্তু কি জানো—তারপর যা আছে তা আর বলতে পারা যায় না। সাধন করলে সে সব নিজের অনুভব হয়—স্বয়ং বেদ্য। সেই ভূমা বস্তু—যেখানে কোন অভাব নেই, কোন ভয় নেই, শুধু ভাবলেই মনটা উঁচু হয়ে যায়—কি মজার জিনিষ। কেউ কেউ নিত্যলীলা দুটোই দেখেন।

ল—মঃ। মহারাজ, নিত্যে পৌঁছে তারপর ত লীলা?

শ্রীশ্রীমহারাজ। তার কিছু মানে নেই—দুই বটে। রাসলীলা যখন হচ্ছিল, তখন এক সখি আর এক সখিকে বলছিল, "সখি, বেদান্ত-সিদ্ধান্তঃ নৃত্যতি।" বেদান্ত সিদ্ধান্ত কিনা পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে, নিত্য লীলা দুইয়েরই পার।

কাশী, ৫।২।২১

প্র—মঃ। মহারাজ, ধ্যান ভজন কচ্চি, কিন্তু ওদিকে একটা taste (আস্বাদ) পাচ্চি না, যেন জোর করে কচ্চি, এর উপায় কি?

শ্রীশ্রীমহারাজ। সে কি প্রথম হয়? প্রথম হয় না, তার জন্য খুব struggle (চেষ্টা) করতে

হয়। যা তোমার energy (শক্তি) আছে সব ঐদিকে দাও। আর কোনও দিকে দেখবে না— আর কোনও দিকে শক্তি direct (চালিত) করো না। সমস্ত এদিকে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও—কখনও satisfied (সন্তুষ্ট) হয়ো না। একটা অশান্তি create (সৃষ্টি) করতে চেষ্টা কর, 'কি হচ্ছে আমার, কিছুই হচ্ছে না।' রোজ রাতে শোবার আগে চিন্তা করে দেখ কতটা ভাল কাজে গেল; কতটা মন্দ কাজে গেল, কতটা তাঁর চিন্তা ধ্যান ভজন করে কাটল, কতটা তমোগুণের কাজে কাটল।

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মনকে strong (শক্ত) কর—যেমন বড়লোকের বাড়ীতে দারোয়ান থাকে। তার কাজ চোর ও গরু তাড়িয়ে দেওয়া। সেই রকম মন হচ্ছে দারোয়ান। মন যত strong হবে তত ভাল। বেদ মনকে দুষ্টাশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুষ্টাশ্ব বিপথে নিয়ে যায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে, সেই ঠিক পথে যায়।

স্বামী শিবানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

চিলকাপিটা, আলমোরা, ইউ, পি

১।১০।১৫

প্রিয় সুরেন,—

তোমার পত্রখানি যথাসময়েই পেয়েছি এবং আশুর কথা এবং তোমার ভগ্নিটির কথা শুনিয়া বড়ই চিন্তিত থাকিলাম। আশু তিন মাস থেকে ভুগছে শুনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। বসিরহাট প্রভৃতি স্থান বড়ই malarious—বিশেষ শ্রাবণ মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত। যা হোক শুভ কাজ কর্ত্তে গেলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তবে কার্য্য সিদ্ধি হয়। প্রভুর কৃপায় নৈশ কাজটা যদি বন্ধ না হয়ে যায়, তবেই বড় আনন্দ। যা হোক আশুর শরীর শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অনেক দিন হয়ে গেল আমার বোধ হয় Allopathic পূর্ব্ব হতেই হওয়া উচিত ছিল। প্রভুর ইচ্ছা যা হবার হয়েছে, এখন বোধ হয় চিকিৎসা পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। আবার আমাদের শীঘ্র খবরটা দিও এবং ভগ্নিটিও কেমন থাকে লিখিও।

তুমি কাঞ্জিকে চিঠি দিয়াছিলে তার জবাবও আমি পেয়েছি। বাবুরাম মহারাজেরও এক পত্র কাল পেয়েছি।

তিনিই জীবনের সর্ব্বস্বধন এবং অনিত্য জগতের মধ্যে নিত্য ধন—এ ধারণা তোমাদের নিশ্চয়ই হবে প্রভুর কৃপায়—কারণ তোমরা প্রভুর ত্যাগী এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের কৃপা পেয়েছ এবং তাঁদের সঙ্গ করিতে অবসর পেয়েছ এবং তাঁরাও তোমাদের বড়ই ভালবাসেন। তার ফলে তোমাদের যে ও ধারণা হবে তার আর বিচিত্র কি? প্রার্থনা করি তাঁতে তোমাদের অচল অটল সুমেরুবৎ ভক্তি বিশ্বাস প্রীতি হউক।

আজকাল বিবেকানন্দ সোসাইটী কোথায় স্থাপিত? মাঝে মাঝে মিটিং ইত্যাদি হয় কি?

শরৎ, কালিপদ, কটিমামা কাঙ্গিলাল সকলে ভাল আছে শুনিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। তাহাদের সকলকে আমাদের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ দিও এবং তুমিও আশু ও বাড়ীর সকলকে দিও। এখানকার সংবাদ এক প্রকার প্রভুর ইচ্ছায় একটু ভাল। Frank প্রায় দুই মাস হইল আমাদের সঙ্গেই আছে। তার শরীরটা তত ভাল নয়, liverটি বড় খারাপ হয়েছে। তার কারণ দেশী রকমের আহার অনেক দিন থেকে কচ্চে, পয়সাকড়িও বড় বেশী হাতে নাই।

এখানে শীতের আরম্ভ দেখা দিয়াছে। ৺পূজাও আগত প্রায়। মঠে কিরূপ পূজাদি হইবে? এবার তো বড়ই দুর্ব্বৎসর, দেশের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয়—প্রভুর যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। দয়া করুন আর কি বলিব। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ শরৎ মিত্রের মনটা বেশ ভাল আছে তো?

তুরস্কের উন্নতিকল্পে মেয়েদের দান*

জগৎ-সভায় তুরস্ক আজ তার স্থান করে নিয়েছে। এতবড় পরিবর্ত্তন তার জীবনে খুব কমই এসেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় তুরস্কের উন্নতি আকস্মিক কিন্তু বস্তুতঃ উহা বহুযুগের সাধনার ফল। সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭) প্রথম সংস্কার আরম্ভ করেন; তারপরে দ্বিতীয় মাহমুদ। ক্রমশঃ আরও অনেকে তুরস্কের ওপর দিয়ে আপনাদের সংস্কার রথ টেনে নিয়ে যান এবং ইদানীন্তনকালে অভ্যুদয় হয়েছে গাজি মুস্তাফা কামাল পাশার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত থাকায় এ পর্য্যন্ত তুরস্ককে বহু ঝড়-ঝাপ্‌টা পোহাতে হয়েছে। বিগত মহাসমরের ধাক্কাও তার বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে। ১৯২২ সনের ১লা নবেম্বর তুরস্কের মহতী জাতীয় সমিতি আংগোরা অধিবেশনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, "অজ্ঞতা ও সম্রাটগণের অত্যাচারের ফলে যে সকল দুঃখ-দৈন্য তুর্কীগণের ভাগ্যে উপস্থিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে শত শত বৎসর সংগ্রাম করে এবং তার বিদেশী শত্রু ও স্বদেশী সম্রাটগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের যথার্থ অধিকারী তুরস্কজাতি আজ স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে"; এই দিন পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় তার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হোলো। এখন হতেই তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোলো—গাজি মুস্তাফা কামাল পাশা হলেন তার সভাপতি। এক্ষণে সমস্ত ক্ষমতা তুর্কীজাতির হাতে। অষ্টাদশ বর্ষাধিক বয়ঃক্রম হলে সকল পুরুষই ভোট দিতে পারে। ক্রমে মেয়েদেরও স্থানীয় নির্ব্বাচনে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে. তুর্কীদের স্বাভাবিক অধিকারের মধ্যে 'ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং বিচারে চিন্তার কথাবলায় লেখায় ছাপানয় ভ্রমণে শ্রমে নিজস্ব সম্পত্তিতে সভা-

* The New Orient পুস্তক, বিশেষভাবে খালাম্ হালিদে এদিবের প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

সমিতিতে ও সমবায়ে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। কোনও সুবিধাভোগীর কোনও প্রকার সুবিধা গ্রহণ নিষেধ; জীবন ধনসম্পত্তি, সম্মান এবং গৃহের কিঞ্চিৎ ক্ষতিও কারুর করার সাধ্য নেই; কোনও রকম অত্যাচার, শারীরিক শাস্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি আত্মসাৎ করা নিষিদ্ধ; কেউ তার ধর্ম, সম্প্রদায়, পূজাপদ্ধতি অথবা দার্শনিক মতবাদের জন্য ধর্ষিত হবে না, এ সকল বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কোনও ধর্মকৃত্য ব্রতপারণাদি সর্বসাধারণের শান্তি বা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করতে পারবে না।' শিক্ষা বেতনবিহীন, তবে রাষ্ট্র এর তত্ত্বাবধান করবে। প্রাথমিক শিক্ষা সকলকেই গ্রহণ করতে হবে, অনেক গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে।

পুরুষের টুপি এবং মেয়েদের ঘোমটা তুলে দিয়ে তারা পাশ্চাত্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার আরম্ভ করছে, আরবী হরফের বদলে ল্যাটিন অক্ষর চালিয়েছে। অবশ্য তুরস্কের সকল প্রকার পরিবর্তনকেই ভাল বলা যায় না; মুসলমানী ধরণের টুপির পরিবর্তে যখন তারা সাহেবী হ্যাট ধরেছে তখন নিজেদের জাতীয় টুপির দোষ কি? তবে এটা ঠিক যে অনেক ভাল তারা করেছে এবং রুশিয়ার যুবকদের মস্কোতে সাধারণ সত্ত্ববাদী (communist) করবার জন্য যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তুরস্কের ছেলেদের তদপেক্ষা কোনও অংশে খারাপ শিক্ষা হচ্ছে না।

তুর্কীজাতি কৃষিজীবী এবং যুদ্ধপ্রিয়, সে সহস্র বৎসর পূর্বে পূর্ব হতে এক প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়ী জাতিরূপে আসে। কিন্তু যখন সে ইউরোপ এবং ইউরোপের মুখে অবস্থিত এশিয়াতে বাস আরম্ভ করে, তার প্রধান উপজীবিকারূপে সে কৃষিকেই গ্রহণ করে। এখানে উত্তম তামাক এবং ধান্য যবাদি উৎপন্ন হয়। নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমেরিকার পদ্ধতানুসারে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। তাদের কতকগুলি জল সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। কৃষকদের ওপর নির্দ্ধারিত কর কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। মসজিদ এবং রাষ্ট্র সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়েছে। শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হয়েছে এবং এতদুপলক্ষে আমেরিকার ডাক্তারগণ নিযুক্ত হয়েছেন। সামাজিক দিকে একটা ভাল কাজ তারা করেছে পুরুষদের বহু বিবাহ প্রথা তুলে দিয়ে। অবশ্য অন্যান্য দেশীয়েরা যেমন মনে করেন যে তুর্কীরা সকলেই অনেক বিবাহ করত, তা না; তবে কোরাণ এই কার্য্যের সমর্থন করেন এবং কেহ কেহ যাদের দুচারটি সংসার চালানোর ক্ষমতা ছিল, তারাই বহু বিবাহ করত।

শিল্পে তুরস্ক এখনও তত উন্নতি করতে পারে নি। র‍্যাগের ব্যবসায় যা জগতে তাদের মস্ত বড় লাভের জিনিষ ছিল, ১৯২৩ সনে গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে। বোনা বস্ত্রাদি এবং মিলের উৎপন্নজ সামগ্রীই এখন প্রধান পণ্য সামগ্রী। আনাটোলিয়ায় চিনির কল, তৈলের কল, সুতার কল ইত্যাদি হরেক রকমের কারখানা তৈরী হয়েছে। ১৯২৭ সনে প্রায় ৬৫,০০০ বিভিন্ন রকম জিনিষ উৎপাদনের কল চলছিল; সেগুলিতে প্রায় ২৫০,০০০ লোক খাটে। শিল্পের উন্নতিকল্পে নূতন নূতন আইন প্রবর্তন করে গবর্ণমেণ্ট শিল্পকার্য্যে আরও উদ্যম উদ্যোগ এনে দিচ্ছেন।

নূতন তুরস্ক কী চায়? তারা চায় সংস্কৃত ইস্‌লাম ধর্ম, পাশ্চাত্য ভাবরাশি এবং সকল তুর্কীরই তুরস্কের জন্য জাতীয়তা-বোধ। কামাল তার ১৯২৭ সনের বিখ্যাত ছয় দিনের বক্তৃতায় বলেছিলেন যে সভ্যসমাজে তুরস্ক যতটা উঠবার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, তাকে তিনি তত বড় করে গড়ে তুলবেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষাও ঐ দেশীয় ধরণেই দেওয়া হচ্ছে। ছেলে মেয়েরা একসঙ্গেই লেখাপড়া শিখছে, বয়স্কেরাও বাদ যাচ্ছে না ; ইংরাজী, জার্মান ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষনীয় করে আরবী পারসী তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি শিল্পে প্রতীচ্য নীতি ঢুকেছে কাজে কাজেই গ্রীকরা এবং আরমেনিয়ানরা তুরস্কের ব্যবসা বাণিজ্যে আর তত অধিকার বিস্তার করতে পাচ্ছে না।

এ নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য তুরস্কের এই নব জীবনের উন্মেষে মেয়েদের কী দান ? কয়েক শতাব্দী যাবৎই সামাজিক উপকার করা তুরস্ক-জাতির এক ব্রতরূপে চলে আসছে এবং এ ব্রত উদ্‌যাপনে মেয়েরা পুরুষদের সমান ধর্ম্মিনী। সপ্তদশ শতাব্দী হতেই দেখতে পাই মেয়েরা হোটেল, হাসপাতাল, উন্মাদ-নিরাময় গৃহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করছেন। তাঁরা পুরুষ মেয়ে সকলের জন্য প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ পরিচালন করছেন। তাঁরা রাস্তাঘাট, সেতু, ঝরণা, মসজিদ, অতিথিশালা নির্ম্মাণ করছেন। শিক্ষাগ্রহণে ও দানে তারা কখনও পশ্চাৎপদ হন নি, দশজনের উপকার, স্বাস্থ্যরক্ষা করান প্রভৃতিতে তাঁরা চিরদিন বিশেষ উদ্যোগী। এই সব সর্ব্বসাধারণের হিতকর কাজে শুধু যে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাই ব্রতী তা নয়, নির্ধন অপরিচিতা মেয়েরাও নিজেদের সাধ্যমত ছোট ছোট স্কুল, রাস্তায় জলের কল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেছেন ? যেখানে গণ্যমান্যা বিদুষী ভদ্র মহিলাগণ মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠা করছেন—যা আজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—সেখানে এই অজ্ঞাতনামা রমণীরা গরীবদের জন্য অনাথাশ্রম করেছেন বা তাহাদের শিক্ষার আংশিক ব্যয়ভার বহন করেছেন।

চিন্তা এবং সাহিত্য জগতে মেয়েদের দান কম নয়। তুরস্কের অনেক লেখক ইব্রাহিম এল মেভলেভি বলেন, "পঞ্চদশ শতাব্দী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশ জন লেখিকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রথম শ্রেণীর লেখিকা একথা বলা চলে না, তবে সাধারণ লেখকের চেয়ে তাঁরা কোনো অংশে কম নন।"

সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায় তুরস্কেরা উক্ত শতাব্দী সমূহে তাদের সমাজকে ইসলামীয় এবং প্রাচ্য ধারাতেই চালিয়ে নিতে চেয়েছিলো। ইসলাম আইনানুযায়ী ধনসম্পত্তির মেয়েরা পুরুষদের সমান অংশীদার ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পুরুষেরা মেয়েদের মাথা তুলতে বিশেষ দেয় নি। মোটের ওপর এ একটা ইসলাম সমাজ মেয়েদের পর্দ্দানশীন হয়ে থাকতেই হবে, সুতরাং মেয়েদের এ সমাজ বন্ধন অতিক্রম করে উঠতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে।

পাশ্চাত্য প্রভাব তুরস্কে প্রবেশ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অবশ্য একদল এই পাশ্চাত্য অনুকরণের বিরুদ্ধে দাড়ালেও অন্যদল একে সমাজের যথার্থ কল্যাণকর বিবেচনা করে সোৎসাহে গ্রহণ করে। তৃতীয় সেলিম ঐ পরবর্ত্তীদের দলের অগ্রণী। প্রতীচ্য রমণীদের শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি তুরস্ক মনকে পূর্ব্ব থেকেই অধিকার করে বসেছিল। তুরস্কের রাজদূত সৈয়দ আলি ফরাসীর রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "মেয়েরা এখানে স্বাধীন এবং খুব সম্মানিত, অতি নীচ জাতীয়া মেয়েকে দেখেও খুব মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।" তৃতীয় সেলিমই অন্তঃপুরে এ সকল নূতন আন্দোলন চালিয়ে সংস্কার করতে তার ভগ্নীর ওপর ভারার্পণ করেন। তিনিও মেয়েদের ভেতর এ নূতন নূতন ভাব ছড়াতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্ক সাহিত্য মেয়েদিগকে সমাজে উচ্চ স্থান এবং অধিকার দেওয়ার জন্য খুব আলোচনা করে। মেয়েদিগকে

কি কি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এটি অবশ্য তারা স্পষ্ট করে বলেন নি তবে মেয়েদের ছাড়া যে কোন জাতি জগতে জাগিতে পারে না একথা অনুভব করে তাদের উন্নতিকল্পে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তুরস্কের কোন কোন লেখক এই মত পোষণ করতেন, 'প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের এই নিজ নিজ অবনতির ও উন্নতির মূলে রয়েছে মেয়েদের প্রতি যথাক্রমে নির্য্যাতন ও শ্রদ্ধাপ্রদান।' প্রাচ্য জগৎ ও ইসলামীয়েরা যখন খৃষ্টিয়ানদের ন্যায় মেয়েদের যত্ন নেবে তখনই তাব নব জাগবণ আরম্ভ হবে। ওদেশের একজন বিখ্যাত কবি আব্দুল হক হামিদ বলেছিলেন যে একটা জাতিব উন্নতির পরিমাপ হচ্ছে মেয়েদের অবস্থা। শীঘ্রই এই ভাব কার্য্যকরী হোলো, মেয়েবাই যে জাতির অভ্যুত্থানে বিশেষ সহকাবিণী এটি অনুভব করে ভদ্রবংশীয়ারা তাঁদের মেয়েদিগকে প্রতীচ্য ভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ করলেন। তাঁরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে বিদুষী মেয়েদের এনে নিজেদের মেয়েদিগকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন এবং অনেককে আবাব বিদ্যাশিক্ষা করতে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। এসময়ে একজন বিদেশী ভদ্রলোক তুরস্কে বেড়াতে যান এবং খুব উচ্চ শিক্ষিতা একদল মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেন। সেই সব মেয়েরা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা মাতৃভাষারই মত বলতো, সে সব সাহিত্য পড়তো। এদেরই সমসাময়িক আর একদল মেয়ে, অবশ্য তারা ছিল গরীব, নিজেদের পুরোণো ধারাতেই লেখাপড়া শিখতো, তারা ফরাসী জার্ম্মাণী জানতো না। তারা গ্রাম দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক স্কুল সমূহে শিক্ষকতা করতো এবং তাদের প্রভাবই পূর্ব্বোক্ত মেয়েদের চেয়ে অধিক ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। তখন অনেক মেয়েলেখকও ছিলেন, তাঁরা "মেয়েদের জগৎ" বলে একটা কাগজও চালাতেন। রাজনীতি পাশ্চাত্য ধরণেই শেখান আরম্ভ হলো। ১৯০৮ সন হইতে ৬ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে দ্রুত পরিবর্ত্তন ও বিস্তার হতে লাগলো। ১৯০৮ সনে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য মাত্র একটি, ছাত্রীদের জন্য মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মসজিদ স্কুল ছিল; সেস্থলে ১৯১৪ সনে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ৯টি এবং ছাত্রীদের জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। দেশের গভীরতম গ্রামেও ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হোলো। ছাত্রীরা আমেরিকায় জার্ম্মাণীতে ও সুইট্জারল্যাণ্ডে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলো, তারা যেন এ শিক্ষা ব্যাপারে একেবারে ঝাপিয়ে পড়লো, বয়স্ক লোকদের জন্য মেয়েরা ও পুরুষেরা ক্লাসের বন্দোবস্ত করতে লাগলো।

এখন অনেকেরই হয়ত ধারণা হতে পারে যে এই মেয়ে জাগরণের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য অনুকরণ। কিন্তু তুরস্কেরা বলে যে তা নয়, এই শুভ প্রেরণা তুর্কী জাতির অন্তরেই ছিল, এতদিন সুযোগ সুবিধা পায়নি বলে বিকাশ হতে পারে নি, আজ মেয়েরা সুযোগ পেয়েছে তাই তাদের জাগরণ হয়েছে। এতে মেয়েদের দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়েছে এবং দশজনের মঙ্গলের জন্য কাজ করবার দায়িত্ব বেড়ে গেছে। মেয়েদের প্রথম সমিতি "নারীর উন্নয়ন" মেয়েদের জন্য বক্তৃতার বন্দোবস্ত করলো, তারপরে ক্রমশঃ পুরুষেরা মেয়েদের সভায় এবং মেয়েরা পুরুষদের সভায় এবং পরে মেয়ে পুরুষ উভয়েরাই মিশ্র সভায় বক্তৃতা প্রদান করতে লাগলেন। কোন কোন পুরুষ মেয়েদের উন্নয়নই মস্ত বড় ধর্ম্মকার্য্য হিসাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন। আর এর ফলে দেখতে পাই ১৯১২ সনেই মেয়েরা পুরুষদের দায়িত্বের গুরুভার খানিকটা আপনাদের স্কন্ধে নিলেন। বলকান বিপদে (Balkan disaster) হাসপাতাল স্থাপন করে মেয়েরা সকলের সেবাশুশ্রূষা ও পিতৃমাতৃহীনদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং

বিধবা অনাথাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। বিগত মহাসমরে ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে ওঠলো। তুর্কীজাতি সংখ্যায় ও শক্তিতে প্রায় বিশগুণ বেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। পুরুষেরা সবই যুদ্ধে ; জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য এমন কি গবর্ণমেণ্ট বন্ধ হওয়ার দাখিল। মেয়েরা তখন পুরুষদের কাজ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। গ্রাম্য মেয়েরা—যারা এতদিন সহরের দ্রুত পরিবর্ত্তন থেকে নিজেদের সনাতনত্ব বজায় রাখছিলেন—তারা পর্য্যন্ত সহরে এসে কাজকর্ম্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলেন। মেয়েরাই সংসারের সকল ভার নিলেন। সৈন্যদের খাওয়া পরা ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা মেয়েরা দেখলেন। শাসন সংরক্ষণেও অনেক মেয়ে পুরুষদের শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন, ছেলেরা কলেজ ছেড়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলেন আর মেয়েরা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে বিদ্যামন্দিরে ঢুকলেন, শিক্ষায় মেয়েদের ও পুরুষদের শত যুগের ব্যবধান একেবারে মিটে গেল।

১৯১৬ সন মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বৎসর। গ্রীকেরা ১৯১৮ সনে তুরস্ককে আক্রমণ করায় জগত থেকে তার অস্তিত্ব লোপ পাওয়ারই আশঙ্কা হলো কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন, তাদের দায়িত্ব বোধ হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯১৮ সন হতে ২২ সন পর্য্যন্ত তাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করলেন। এই চেষ্টার প্রথম উদ্দেশ্য দেশ-থেকে আক্রমণকারীদের বহিষ্করণ, দেশে শান্তি স্থাপন এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনপূর্ব্বক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ। অজ্ঞ কৃষাণী থেকে আরম্ভ করে সহরের উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা পর্য্যন্ত সকলেই এই উদ্দেশ্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করে কাজে লেগে গেলেন। আনাটোলিয়ার প্রথম অব্যবস্থিত মুখবন্ধরূপ যুদ্ধে দেশের নিমিত্ত প্রাণোৎসর্গীদের মধ্যে অনেক মেয়েরও নাম আছে। তৎপরবর্ত্তী যুদ্ধেও মেয়েরাই বিশেষ ভাবে করেছিলেন। তুরস্কের তখনকার জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সময়োপযোগী করে তুর্কী জাতিকে গড়ে তোলা। এ ব্যাপারটিও মেয়েপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই বুঝতেন।

১৯২৩ সনে লউসানের যুদ্ধে তুরস্কের শান্তি স্থাপিত হোলো, তার চিরবাঞ্ছিত সামগ্রী সে লাভ করলে। সেই হতে তুর্কীজাতির কপাল ফিরলো, আর মেয়েদেরও নানাদিকের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটলো। মেয়েদের দেশকে উন্নীত করবার জন্য সেবা ও সাহায্য করা আরও অনেক বেড়ে গেল। প্রজাতন্ত্রগঠনে মেয়েপুরুষ উভয়েই সমান ত্যাগ, দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মেয়েরাও মৃত্যু বরণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। যে কোন রমণী এমন কি নীচজাতীয়া গ্রাম্য রমণীও স্পর্দ্ধা করে বলতে পারেন, "প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের যেমন তুরস্ক রক্ষায় ও নূতন রাজ্যগঠনে দান আছে আমারও তেমনি এর উন্নয়নে ত্যাগ রয়েছে।"

বর্ত্তমানে তুর্কী-নারীরা জাতীয় উন্নতির একটি বিশেষ অঙ্গ, একথা বলা বাহুল্য। তারা সকল কাজেই দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাদের সনাতন ব্রতে অর্থাৎ শিক্ষাদানে কৃতিত্ব অদ্ভুত। মেয়ে ডাক্তারের সংখ্যাও ক্রম-বর্দ্ধমান। ডাক্তারদের সহকারিণী ও রোগীর শুশ্রূষাকারিণীরূপে তাদের সেবাযত্ন অপূর্ব্ব, অনেকে আবার ডাক্তার-দিগকেই বে করে গ্রামদেশের ভেতরে ঢুকে তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁরা ওকালতীও আরম্ভ করেছেন। গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে তাঁদের সংখ্যা কম নয়। তুরস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তুরস্ক কুমারীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। আজকাল দেশে এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে মেয়েরা কিছু কাজ দিচ্ছেন না। ১৯৩০ সন থেকে মেয়েদিগকে ম্যুনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন-ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হতে থাকে। এ যে তারা

আন্দোলন করে আদায় করেছেন তা নয়, তাঁদের যোগ্যতা উপলব্ধি করে সর্ব্বসাধারণ তাদিগকে স্থান করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তুরস্ক-রমণীর উদাহরণে তুরস্ক-পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে নারী-জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। সিরিয়া, মিশর থেকে আরম্ভ করে আর সমস্ত মুসলমান জগতে এর প্রভাব তরঙ্গের ন্যায় দুলতে দুলতে চলছে, এ প্রভাব তাদের অপরোক্ষ দান হিসাবে গণ্য হতে পারে।

গ্রামে গ্রামে আজও মেয়েরা পূর্ব্ব প্রথামত চাষবাসে সাহায্য করছে। চাষের উপকরণগুলি অবশ্য সামান্য বদলেছে। ছোট ছোট যন্ত্রে সারা দেশ ভরে গেছে। আজও মেয়েরাই কৃষিকার্য্যে বিশেষ সহায়ক। শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী, মেয়ে ডাক্তার, সমাজ সেবিকা, আইন ব্যবসায়িনী, লেখিকা কর্ম্মচারিণী প্রভৃতি আছেন, যাঁরা এই জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ দান করেছেন। তাঁদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত প্রতীয়মান আনুসঙ্গিক গুলো যথা বাইরের বড় বড় আমোদ প্রমোদ, ভোগবিলাসিতা ইত্যাদি মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

মেয়ে ও পুরুষের সমবেত শক্তিতে এই জাতিটি আজ জগতে বড় হয়ে উঠেছে; কে বলতে পারে মেয়েরা অনাথের মুখে অন্ন তুলে না ধরলে, দুঃখ-দৈন্যে দুর্ভিক্ষে সবাইকে অন্নবস্ত্র সেবাদ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য না করলে এবং সমরে মহাসমরে পুরুষদের পার্শ্বে গিয়ে না দাড়ালে, দেশভরে শিক্ষাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে উন্নীত না করলে, এ তুরস্ক জাতি কতদিনে তার এই বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌছতে পারত? অথবা আদৌ পারত কিনা তাও ভাববার বিষয়। "এক পক্ষে বিহঙ্গম কখনও উড়িতে পারে না।" জাতীয় পক্ষীর উত্থানও শুধু পুরুষ বা শুধু মেয়েদের উন্নয়নে সম্পন্ন হয় না।

তুরস্কে এক প্রবল ঝড় উঠেছে। "প্রথম ঝড় উঠলে" যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "কোন্‌টি তেতুল গাছ, কোন্‌টি আম গাছ বোঝা যায় না" তেমনি প্রথম আন্দোলনে কোন্‌টি জাতির যথার্থ কল্যাণকর, কোন্‌টি অকল্যাণকর বোঝা সম্ভব নয়। উন্নতির বীজের সঙ্গে অবনতির বীজও মিশে যাওয়া সম্ভব, তুরস্ক রমণীরা যাহা করছেন, তা সবই যে ভাল তা বলা যায় না। উন্নতি কথাটাই বস্তুতঃ প্রথম বোঝবার। উন্নতি বলতে কেউ বোঝে শরীরের উৎকর্ষ, কেউ বোঝে মনের, কেউ প্রাণের, কেউ বা জানে খাওয়াপরার সুখস্বাচ্ছন্দ্যই, কেউ বোঝে স্বাধীনতা অর্জ্জন। কিন্তু এ গুলিই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হোত, এইতেই যদি চরম ও পরম শান্তি লাভ হোতো, তাহলে না হয় একথা মেনে নেওয়া যেত; কিন্তু তা যখন হয় না তবে কি করে এগুলিকেই উন্নতির সব-অংশ বলি। এগুলি অবশ্য উন্নতির স্তর হিসাবে গ্রহণ করবো তবে, তা পূর্ণ মাত্রায় বোঝান হবে বোধ হয় এই আখ্যায়—যা কিছু ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে তাই উন্নতি। এই কষ্টি পাথরে ঘসে নিলে তুরস্কের শিক্ষা দীক্ষা যদি টেঁকে তবেই তাকে উন্নতির পন্থী বলে নির্দ্দেশ করবো। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে অপূর্ব্ব উৎসাহ, সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ইত্যাদি গুণরাজি অবশ্য জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই অনুকরণীয়। সংযম ও পবিত্রতার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মেয়েরা যদি সমাজের এই কল্যাণ সাধন করতে থাকেন, কোনওরকম অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতা তার হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে না দেয়—তবেই এই কল্যাণ চিরস্থায়ী ও শাশ্বত হবে। সব চেয়ে আনন্দের বিষয় তুরস্ক-মেয়েদের বেশীর ভাগই ইস্‌লামীয় সংস্কৃতিটা বাদ দেননি।

ব্রহ্মচারী নগেন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব *

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥২ ॥
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধবনাটকঃ।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ একদিকে যেমন মধুর হইতেও সুমধুর তেমনি আবার পরম পবিত্র ও গম্ভীর। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ভক্তি-বিগলিত মধুরকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার"

সেই পরম মধুর, পরম গম্ভীর, পরম পবিত্র গৌরাঙ্গলীলা-প্রসঙ্গ যত শ্রবণ করা যায়, যত স্মরণ করা যায়, ও যত কীর্ত্তন করা যায় ততই ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে কল্যাণকর। তাঁহার শুভাবির্ভাব দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের মূল প্রয়োজন এবং ভক্তচূড়ামণি রায় রামানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের "সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব" সম্বন্ধীয় আলাপনের কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
শ্রীরূপগোস্বামি কড়চা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাবরূপিনী হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থ পৃথক শরীর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুইটী স্বরূপ একীভূত, শ্রীচৈতন্য নাম প্রাপ্ত এবং শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গ কান্তিতে সুগঠিত হইয়া পুনরায় সম্মিলিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা বা সীমা কতদূর? শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুর্য্য রস যাহা শ্রীরাধাই কেবল আস্বাদন করিতে সক্ষম তাহাই বা কিরূপ? আর ঐ মধুর রস আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাই বা কীদৃশ?—এই তিনটী তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচী-গর্ভসিন্ধুতে উদয় লাভ করিলেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের নিগূঢ় মূল প্রয়োজন। দ্বিতীয় বহিরঙ্গ প্রয়োজন জীবে নাম-প্রেম বিতরণ করা। প্রথমোক্ত তিনটী বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য ১৪০৭ শকে পবিত্র জাহ্নবীতীরস্থ বিদ্বজ্জন পরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে মনোহর ফাল্গুনমাসের জ্যোৎস্নাবিধৌত নির্ম্মল পূর্ণিমা নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই সময় চন্দ্র-গ্রহণ উপলক্ষে নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর বলেন যে চন্দ্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিলনা —বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্দ্রস্বরূপ

* বিগত শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম-তিথি-বাসরে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আহূত জনসভায় পঠিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন নাই। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। অন্য কোন গৌরভক্ত বলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে, সেই মহাব্যাপার ঘোষণা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রেই হরিধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথা, যেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন অমনি নবদ্বীপবাসী সকলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গৌরাঙ্গ-প্রচারিত হরিনামই কীর্ত্তন ও ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব সময়ে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মত্ত ছিল! স্ত্রীলোক ঘাটে শাস্ত্র চর্চ্চা করিত, বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যাযুদ্ধ করিত, আর সহস্র সহস্র পড়ুয়া গঙ্গাতীরে মণ্ডলী করিয়া বিদ্যালোচনা করিত। পুঁথি তাহাদের ভূষণ, পুঁথি তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল! এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের ছাত্রের বিবাদ বাধিয়া কখন কখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে পর্য্যবসিত হইত। আবার যেদিন রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপন করিলেন, সেইদিন হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চার আর এক গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হইল। ঈদৃশ ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যাচর্চ্চার ফলস্বরূপ নবদ্বীপ রঘুনাথ, রঘুনন্দন, ভবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কীর্ত্তিকলাপে দেদীপ্যমান ছিল। স্বয়ং গৌরাঙ্গ দেবও নানাশাস্ত্র বিশারদ সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য শুধু শুষ্ক বিচার ও তর্কে পর্য্যবসিত না হইয়া ভক্তিরসে সরস হইয়া জীবের কল্যাণ ও মুক্তির হেতুস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি বাস্তবিক গীতায় উক্ত 'পণ্ডিতের' গুণাবলীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন,—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

অর্থাৎ যাহারা বিদ্যাবিনয়াদিগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে সমভাবে প্রেমের চক্ষে দেখেন তাহারাই পণ্ডিত নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য না হইলে আর কে হইতে পারেন!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা কাহিনীর সর্ব্বোত্তম ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুণ্যসলিলা গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগরের (বর্ত্তমান্ রাজমহেন্দ্রী) রায় রামানন্দের সহিত সম্মিলন। শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের শুভ সম্মিলনে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে যে অনাস্বাদিত পূর্ব্ব ভক্তিরসামৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা চিরকালের জন্য কৃষ্ণভক্তিরসের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিল। এই রস-তত্ত্বই বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'সাধ্যসাধন তত্ত্ব, নামে অভিহিত।

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে;
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃ স্থানে।
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলা।

রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে নমস্কার করিলেন; মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত নিভৃতে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ অবতারণা করিলেন। মহাপ্রভু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধ্য বস্তু কি?" তদুত্তরে রামানন্দ বলিলেন, "বিষ্ণুভক্তিই জীবের সাধ্য অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ, এবং স্বধর্ম্ম আচরণেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়"। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে,

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

অর্থাৎ আচারবান্ বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধনের অধিকারী। এতদ্ভিন্ন তাঁহার তুষ্টির অন্য উপায় নাই। রায় রামানন্দ স্বধর্ম্মাচরণই পরম পুরুষার্থ বলিলেন না। তিনি

বলিলেন স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় অর্থাৎ উহা গৌণভাবে বিষ্ণুভক্তির প্রাপক, বস্তুতঃ উহা সাধ্য বস্তু নহে। এই কারণে মহাপ্রভু বলিলেন "এহ বাহ্য" অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা; নিগূঢ় কথা বল।

প্রভু কহে 'এহ বাহ্য আগে কহ আর'।
রায় কহে, 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার'॥

মহাপ্রভু বলিলেন, "তুমি এই স্বধর্ম্মাচরণের কথা যাহা বলিলে উহা নিতান্ত বাহিরের কথা। অতএব ইহার উপরে যদি কিছু থাকে তবে তাহা বল"। তখন রায় রামানন্দ উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার"। গীতায় উক্ত আছে,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ মদর্পণম্॥

ভগবান বলিলেন, হে অর্জ্জুন, তুমি লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম্ম করিতেছ, যাহা হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, এবং তপঃ করিতেছ, সমস্তই আমাতেই অর্পণ কর অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থে করিও। অর্জ্জুন তখনও অহৈতুকী বা কেবলা ভক্তির অধিকারী হন নাই —তাঁহার তখন কর্ম্মে স্পৃহা রহিয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবোপযোগী যে ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবানের প্রীত্যর্থে নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উপদেশ করিলেন। এই "কর্ম্মার্পণ" অহৈতুকী ভক্তির পর্য্যায়ভুক্ত নয় বলিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। তদুত্তরে রামানন্দ বলিলেন, 'স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্য সার'। গীতায় উক্ত আছে,

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতেই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া স্বীয় মুক্তি মোচনের জন্য স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ায় ভিতরও কামনা থাকায় উহা সকাম ভক্তি হইল। এইজন্য মহাপ্রভু এই "স্বধর্ম্মত্যাগকেও "এহ বাহ্য" বলিলেন।

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার"॥

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির লক্ষণ এই যে জ্ঞানিভক্ত কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মবোধে সর্ব্বভূতে ভাবনা করিয়া থাকেন। যাহাকিছু সবই সেই কৃষ্ণের প্রকাশ জানিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই শান্ত-ভক্তি বলে। এই অবস্থা লাভ করা বড়ই কঠিন; তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিতে (ব্রহ্ম বুদ্ধিতে) আমাকে উপাসনা করেন। তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-লাভ হইলে সাধকের চিত্তপ্রসন্ন, ও শোক-আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হয়। তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতিরূপ পরম সুখ অনুভব করেন। এই জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির পরের সোপান পরাভক্তি।

পরাভক্তির তিনটি স্তর—শ্রদ্ধা, রতি, ও ভক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে ভক্তির এই সকল স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন, "এহ বাহ্য আগে কহ আর"। রামানন্দ উত্তরে বলিলেন, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার"। যদি একবার শ্রীভগবানের নামে কিংবা লীলা-কথায় অথবা তাঁহার ... ভক্ত সম্বন্ধীয় কথায় অনুরাগ জন্মে, তবে তাহাতে ...

সুখ, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতিরূপ সুখ তাহার তুলনায় সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা দ্বারা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশূন্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইল। ইহাকেই পরাভক্তির প্রথম স্তর বা শ্রদ্ধাভক্তি বলে। তখন,

"প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে "প্রেম ভক্তি" সর্ব্বসাধ্য সার" ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, যে ইহা শুদ্ধাভক্তি পদবাচ্য হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিরও স্তর আছে; তাই তিনি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভক্তির কথা জানিতে চাহিলেন। এই প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভূতি দ্বারা তৎপ্রতি গাঢ় নিষ্ঠা বুঝায়। ইহা পরাভক্তির দ্বিতীয় স্তর বা রতিভক্তি।

প্রেমভক্তি বা রতি-ভক্তিতে সেবানুরাগ লক্ষিত হয় না। তজ্জন্য মহাপ্রভু ইহার উপরিতন স্তরের ভক্তির কথা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।"

রায় কহে **"দাস্যপ্রেম"** সর্ব্বসাধ্য সার ॥

দাস্যপ্রেম লাভ করিতে হইলে "প্রশান্ত—নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ" অর্থাৎ অন্যাভিলাষ শূন্য স্বচ্ছ নির্ম্মল চিত্ত হওয়া চাই। অতএব দাস্য-প্রেমের ভিতর শান্তভাব লুক্কায়িত আছে। এই দাস্যপ্রেমই পরাভক্তির তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ স্তর।

দাস্যপ্রেমের ভিতরেও একটু বাধ বাধ ভাব আছে। তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি বড় আমি ছোট, ঈদৃশ সম্ভ্রমের ভাব দাস্যপ্রেমের ভিতরে থাকায় সেবাসুখে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। এই জন্য

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে **সখ্যপ্রেম** সর্ব্বসাধ্যসার ॥

ব্রজের রাখালগণ কৃষ্ণকে আপনাদিগেরই মত একজন গোপবালক বলিয়াই জানিতেন। কোনও প্রকারের লঘু-গুরু ভাব তাঁহাদের ভিতরে ছিল না। কৃষ্ণকে যেমন তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, আবার তেমনি কখন কখন অভিমান ভরে তাঁহার সহিত কলহও করিতেন। তাঁহাদের সখ্যপ্রেমের ভিতরে কোন প্রকারের বাধা বা সঙ্কোচ ছিল না। আহারের সামগ্রী খাইতে বড় মিষ্ট লাগিয়াছে তাই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কানাইকে না দিয়া ব্রজবালকগণ খাইবে না। অমনি উচ্ছিষ্ট কানাইর মুখে তুলিয়া দিতেছেন! বিশ্বম্ভর দাস এই নিঃসঙ্কোচ সখ্য ভাবটি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,

সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সবে দেই কানাইর মুখে ॥

এই সখ্যপ্রেমের ভিতর দাস্যপ্রেমও লুক্কায়িত আছে। কেননা সখা সখাকে শুধু ভালবাসেন এমন নহে, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অকপটে সেবাও করিয়া থাকেন।

সখ্যপ্রেম সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিলেন, "ইহা উত্তম সন্দেহ নাই। তবে যদি ইহারও উপরে কিছু থাকে, তাহা বল। সখ্যপ্রেম প্রেমের প্রথম স্তর।"

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে **"বাৎসল্য প্রেম"** সর্ব্বসাধ্যসার।

শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে ভালবাসার নাম বাৎসল্য প্রেম। শ্রীনন্দ ও যশোদার ভাগ্যের সীমা কেহ করিতে পারে না। তাঁহারা জানিতেন যে কৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্র—ভগবান তাঁহারা বুঝিতেন না। পিতামাতা পুত্রস্নেহে আত্মহারা। পুত্র ও পিতামাতার বাৎসল্যে আত্মহারা! কোনও জন্মে যে কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন, এই জ্ঞানও যশোদার ছিলনা। তাই মহাজন-পদে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে,—

নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবন পতি যায় পলাইয়া ॥

এ তিন ভুবনে যাঁরে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালায়ে যায় জননীর ডরে॥

বাৎসল্য প্রেমে তিনটি ভাব আছে—সেবা, স্নেহ, এবং তাড়ন-ভৎর্সনযুক্ত লালন। এই বাৎসল্য প্রেম প্রেমের দ্বিতীয় স্তর। ইহাকে ভাব বলে। তৎপর "প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।"
রায় কহে "কান্তাপ্রেম" সর্ব্বসাধ্যসার॥

শ্রীভগবানকে পতিভাবে নিষ্কাম ভালবাসার নাম কান্তাপ্রেম বা মধুর ভাব। কান্তাপ্রেম প্রেমের তৃতীয় স্তর। রায় রামানন্দ এই কান্তাপ্রেমকেই শ্রেষ্ঠতম সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। মধুর রস বা কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সমস্ত ভাবই বিদ্যমান আছে। কিন্তু সকলেই যে এই কান্তাপ্রেমের অধিকারী তাহা নহে, এই জন্য যাঁর যেমন ভাব ও রুচি সেই ভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজিবেন এবং সেই ভাবেই কৃষ্ণকে পাইবেন। তজ্জন্য বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥

যেমন,—

১। শান্তরসে কেবল শান্ত ভাব।
২। দাস্যরসে=শান্ত+দাস্যভাব।
৩। সখ্যরসে=শান্ত+দাস্য+সখ্যভাব।
৪। বাৎসল্যরসে=শান্ত+দাস্য+সখ্য+বাৎসল্য।
৫। মধুররসে=শান্ত+দাস্য+সখ্য+বাৎসল্য+মাধুর্য্য।

মধুররস সর্ব্বরসের সমাবেশ, তজ্জন্য বলিলেন,

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

কৃষ্ণ এই প্রেমে একান্ত বশীভূত। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, "হে গোপিকাগণ! তোমাদের প্রেম নিরবদ্য নিষ্কাম। তোমাদের প্রেমের ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না। তোমাদের নিজগুণেই উহার প্রতিশোধ হউক"। গোপী যাহা কিছু করেন, কৃষ্ণেরই সুখের নিমিত্ত। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "মধুর! মধুর! আরও বল, আরও বল। রায় রামানন্দ, ইহাই সাধ্যাবধি। যদি ইহার আগে আর কিছু থাকে, তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

"রায় কহে, ইহার আগে পুছে, হেন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছে ত্রিভুবনে॥
ইহারমধ্যে **রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি**।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

কান্তাপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণের প্রতি প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। রাধাপ্রেম প্রেমের তৃতীয় স্তর—ইহারই নাম মহাভাব। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিনী বা পূর্ণানন্দস্বরূপিনী।

তৎপর রায় রামানন্দ **শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ** সম্বন্ধে বলিলেন,

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস পূর্ণ॥"

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দেহ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ অপ্রাকৃত উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে উক্ত আছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন,

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-
বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং
তমহং ভজামি ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি ॥
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ কান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেহোঁ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি ॥

তৎপর রায় রামানন্দ সংক্ষেপে **রাধাতত্ত্ব-রূপ** সম্বন্ধে বলিলেন,—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান,—
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীব শক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা, কহি যারে ;
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে।
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ;
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি।
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী ;
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন ;
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ;
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ;
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তাহার মধ্যে স্বরূপশক্তি তিনটি। তিনি সৎস্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও ত্রিবিধা—যথা, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। সৎ অর্থে বিশুদ্ধ সত্তা বুঝায়। যে শক্তিদ্বারা ভগবান স্বতঃ নিত্য বর্ত্তমান উহার নাম সন্ধিনী। যে শক্তিদ্বারা ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশিত উহার নাম সম্বিৎ। আর ভগবানের যে শক্তি আনন্দ বিস্তার করে, উহার নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী শক্তির গাঢ়তর অবস্থাই প্রেম। প্রেমের সার ভাব। আবার ভাবের চরম অবস্থা মহাভাব। এই মহাভাবের প্রতিমূর্ত্তিই ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, সুতরাং ভগবান্ ও তাঁহার শক্তিতেও প্রভেদ নাই, তত্ত্বতঃ একই। কেবল লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত পৃথকরূপ হইয়াছিলেন।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ পায় না। সেই সাধন সম্বন্ধে রায় রামানন্দ বলিলেন,—"প্রভো, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, ভালমন্দ কিছুই জানিনা। তুমি যাহা বলাইতেছ, আমি তাহাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা। এই যে রাধাকৃষ্ণলীলা, ইহা অতি নিগূঢ়। একমাত্র সখীগণ দ্বারাই এই লীলা পুষ্টিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্যলীলা দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবেরও গোচর নহে। সখীর অনুগতি ভিন্ন এই লীলায় কাহারও প্রবেশাধিকার জন্মে না। অতএব গোপীর অনুগত হওয়াই ইহার একমাত্র সাধন।"

"গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥"

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রেমরসজ্ঞ রায় রামানন্দের মধ্যে "সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব" আলাপিত হইয়াছিল।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিশাল ও অনন্তবিস্তৃত প্রেমের এক কণিকাও আমাদের সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া আমাদের জীবন কৃতার্থ ও ধন্য হউক ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বনানীর ডাক

(১)

বসন্তকাল। বসন্তোৎসবে সারাটি প্রকৃতি মাতোয়ারা। মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ অরুণালোকে উদ্ভাসিত। নৈশগগন শুভ্র শ্রী-মণ্ডিত। মন্দ মন্দ মলয়ানিল প্রবাহিত—তরু-লতিকা সঞ্চালিত, বাপীনীর আন্দোলিত।

দিকে দিকে কুসুমের সুষমা-বিকাশ, সুরভি-সিক্ত বসন্ত-পবনের বিপুল উল্লাস; বিহগ কূজন, মধুপ-গুঞ্জন,—আনন্দময় ঋতুরাজের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

আজ অনাবিল আনন্দ-প্রবাহ সৃষ্টির স্তর বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ, জলে আনন্দ, স্থলে আনন্দ—দশদিকে শতধারায় আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে। বসন্তের এই নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল আনন্দোৎসব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই বোধ হয় প্রাচীন ঋষি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' ইত্যাদি।

(২)

এমনি একটি উজ্জ্বল বসন্ত-প্রভাতে ধনি-বিলাসীর প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ কিশোরী বন-হরিণী। কাতর কি তার চাহনি, চঞ্চল কি তার অঙ্গ ভঙ্গী। মুক্তির চেষ্টা তার কি দুর্দ্দম!—প্রতি রোমে তাহা প্রকট।

বনানীর ডাক সে যে আজ শুনিয়াছে,—দূরে—বহুদূরে; তবু সে শুনিয়াছে। কি জানি, কেমন করিয়া সে শুনিয়াছে! বসন্ত-পবন হয়ত তারে বলিয়াছে। বনানীর অভিনব শ্যামশোভা সে আজ দেখিয়াছে, বোধ হয় মনশ্চক্ষে। তার মন প্রাণ, সকল ইন্দ্রিয় চায় বনানীর সঙ্গ। সে তার ডাকে সাড়া দিতেছে, কিন্তু তার সহিত মিলনে বঞ্চিত।

আজ তার অন্তরাত্মা ব্যাকুল, ক্ষুব্ধ, চঞ্চল—মুক্তির জন্য; মিনতিপূর্ণ—মানুষের হৃদয়ের নিকট, তার দয়ার জন্য; বিরক্ত অভিমানে ভরা—মানুষের অন্যায়-বিজৃম্ভিত বিলাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদরূপে।

তার স্বাধীন জীবনের এই যে অবমাননা, তার স্বচ্ছন্দ গতির এই যে বাধা, তার নির্ব্বিঘ্ন সুখতৃপ্তির এই যে বিক্ষোভ—ইহা মানবতার নিকট নিষ্ফল আবেদন করিয়াছে। অসহায়া শক্তিহীনা হরিণীর সকল মর্ম্মবেদনা আজ একত্রিত হইয়াছে—জমাট বাঁধিয়াছে, বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে অবলুণ্ঠিত হইতেছে, তার মুক্তির চেষ্টাস্বরূপে। তার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা আজ কঠিন আঘাতে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে কেমন করিয়া বিশ্বরাজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই সে আজ কল্পনানেত্রে কখন বিশ্বরাজের বরাভয় কল্যাণমূর্ত্তি দেখিয়া আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, আবার কখন রোষরক্ত রুদ্রভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার গ্রন্থি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে, উন্নত অভিমান নত হইয়া আসিতেছে, আর তার বেদনাথির অন্তরাত্মা ফুকারিয়া নিরন্তর বলিতেছে—"তুহুঁ তুহুঁ", "নাহং নাহং"।

—শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

উত্তর কাশীর পথে

ত্রিবেণী হইতে ফিরিতে প্রায় মধ্যাহ্ন হইল। যমুনোত্তরী আসিয়া দেখিলাম অনেক পরিচিত যাত্রী ইতিমধ্যে নামিয়া গিয়াছে। আবার নূতন যাত্রীর সমাগম হইতেছে। আমরাও সেইদিনই গঙ্গোত্তরী অভিমুখে রওনা হইব স্থির হইল। তাড়াতাড়ি রন্ধনাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। স্নানাহার সমাপনান্তে জিনিষপত্র গুছাইয়া বিশ্রাম না করিয়াই যমুনোত্তরী হইতে বাহির হইলাম। যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল, কারণ যমুনোত্তরী হইতে নির্গমনের আর দ্বিতীয় পথ নাই। পূর্ব্বদিন এই পথে কঠিন চড়াই করিতে হইয়াছিল, যেন কতই না কষ্ট বোধ হইয়াছিল, কত সুদীর্ঘ সময় অতীত হইয়াছিল। আজ উৎরাইর পালা,—হুড়্ হুড়্ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। চড়াই ও উৎরাইয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কথা। প্রবৃত্তির পথে ভাসিয়া যাওয়া যেমন সোজা নিবৃত্তির উজান পথে চলা তেমনি কঠিন।

অনতিকাল মধ্যে সাড়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 'বন্দর' চটীতে উপস্থিত হইলাম। তখনও সূর্য্যাস্তের অনেক বিলম্ব। কিন্তু বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া আমরা আর অধিক অগ্রসর না হইয়া 'বন্দর' চটিতে রাত্রি যাপন করা সঙ্গত মনে করিলাম। 'বন্দরপুচ্ছ' পর্ব্বতের নামানুসারে সম্ভবতঃ এই চটির নাম 'বন্দর চটি' হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চটির তিনখানা চালাঘর যাত্রীতে ভরিয়া গেল। এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে চালার মধ্য দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছাতা খুলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বিছানাপত্র কিছুতেই সামলাইতে পারা গেল না। যাত্রিগণ নিরুপায় হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। স্থানাভাবে কাহারও নড়িবার জো ছিল না।

সন্ধ্যার অনেক পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। কিন্তু তখনও মেঘ চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে, যেন মেঘেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। সমতলে মেঘ আকাশে ভাসে, পাহাড়ে মেঘ মাটিতে হাঁটে। এইজন্য অনেক সময় মেঘের মধ্য দিয়াই চলাফেরা করিতে হয়। বৃষ্টি থামিয়া যাওয়াতে, আমরা আহারের চেষ্টায় বাহির হইলাম। এই দারুণ শীতে জঠরাগ্নি কিছুমাত্র প্রশমিত না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। চটীতে তৈরী খাবার কোথায়ও পাওয়া গেল না, এই ভীষণ দুর্যোগে যাত্রীর ভিড়ে জীর্ণ চালাঘরে রান্না করাও দুরূহ ব্যাপার। বাহিরেও প্রবল ঝড় বহিতেছিল। বেগতিক দেখিয়া আমাদের কেহ কেহ 'ক্ষুধা নাই' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই হঠিবার পাত্র নহেন। তিনি সমস্ত অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া একাই যোগাড়যন্ত্র করিয়া চালার বাহিরে কোন এক কোণে পাকযজ্ঞ সমাপন করিলেন। খাবার ডাক পড়িবামাত্র একে একে সকলেই কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে রুটী তরকারি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। খাওয়ার পর বাসন মাজিবার পালা, তাহাও কষ্টে সৃষ্টে সারিয়া ফেলা গেল। আজ সুযোগ বুঝিয়া কুলীও কোথায় উধাও হইয়াছে। জল আনা, বাসন মাজা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজ কুলীই প্রত্যহ করিত। অনেক খুঁজিয়া দেখা গেল যে সে যাত্রীদের মাঝে এক কোণে কুকুর কুণ্ডলী হইয়া পড়িয়া আছে। বারকয়েক ধাক্কাধাক্কির পর সে জাগিল। খাবার তৈরী হইয়াছে শুনিয়া

সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি চুলার ধারে যাইয়া হাতে ঠোকা মোটা মোটা রুটি সেঁকিতে আরম্ভ করিল। আমাদের তরকারির ভাগ প্রতিদিনই তাহাকে দেওয়া হইত। আজও সেই তরকারি সহযোগে অতি উপাদেয় জ্ঞানে অর্দ্ধপক্ক পুরু রুটিগুলি সে অক্লেশে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

আহারাদি সারিতে সারিতে পুনরায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাড়াতাড়ি কুটীর মধ্যে আসিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিলাম। ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ বাড়িতে লাগিল; বিছানাপত্তর সামলান দায় হইয়া উঠিল। 'কি করিব' নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজনের মনে হইল যমুনোত্তরী যাইবার সময় নিকটে রাস্তার ধারে একটী প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেই গুহায় দিনের বেলায় ঝড় বৃষ্টির সময় পাহাড়ীরা গরু মেষ ছাগলসহ আশ্রয় লইয়া থাকে। অগত্যা আমরা সেখানে যাইয়াই ঝড় বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচিতে পারিব মনে করিলাম। অবিলম্বে বিছানাপত্র গুটাইয়া হারিকেন লইয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। একে অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক মেঘে আচ্ছন্ন; সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি; এদিকে আবার পাহাড়ের উচু নীচু সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ;—গুহাটী বাহির করিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইল। গুহাটী বেশ বড়। উহার মুখ তদনুপাতে আরও বড়। আমরা কম্বল বস্ত্রাদির দ্বারা যথাসম্ভব উহা আচ্ছাদন করিয়া ঝড় বৃষ্টি ও শীতের প্রকোপ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিল। স্থানাভাববশতঃ আমাদের দুইজন স্বেচ্ছায় 'বন্দর চটীতে' ফিরিয়া গেলেন। যমুনোত্তরীতে যাইবার পথে ইঁহারাই দুদিন পূর্ব্বে তথায় রাত্রিবাস করিয়াছিলেন।

পরদিন ২রা আষাঢ় শুক্রবার। সকালবেলা উঠিয়া দেখিলাম, আকাশে সাদা তরল মেঘ ভাসিতেছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া মন আশ্বাসে উৎফুল্ল হইল। আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিলাম। যে পথে যমুনোত্তরী গিয়াছিলাম সেই পথেই গঙ্গানির অভিমুখে ফিরিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে সূর্য্য দেখা দিল। তরুণ অরুণালোকে শুচিস্নাত প্রকৃতির দৃশ্য অতি কমনীয় বোধ হইল। বারিপাতের ফলে বৃক্ষরাজির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সরস সজীবতার সঞ্চার হইয়াছে। শ্যামল বসনে আবৃত পর্ব্বতের পাষাণ অঙ্গও সুষমায় পূর্ণ হইয়া অদ্ভুত শ্রী বিস্তার করিতেছে। বৃষ্টির জলে নদী ও ঝরণা সমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটীয়া চলিয়াছে। কত নূতন জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। কত অদৃশ্য নির্ঝরের ঝঙ্কারে গিরিকন্দর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। নির্ঝরিণীর উদাত্তগানে নির্ব্বাক পাষাণপুরী সুধাসঙ্গীতে চির মুখরিত। ঝড়ে কোথাও কোথাও গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টির জলে কোন কোন স্থান ধ্বসিয়া গিয়াছিল। জায়গায় জায়গায় প্রস্তরসমূহ এমন ভাবে জড় হইয়াছিল যে পদক্ষেপ করা বিপদজনক। যাহাহউক আমরা কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া উৎসাহভরে একটীর পর একটী চটি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। উৎরাইএর রাস্তা বলিয়া বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। প্রথমেই হনুমান চটি পথে পড়িল। এই স্থলেই না আমাদের দুইজন তিনদিন পূর্ব্বে ক্ষুদ্র দোকান ঘরে মাথা গুজিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। সেই দুঃখের কথা মনে করিয়া আজ অন্তরে হাসি পাইল। দুঃখের অনুভূতি ভিন্ন সুখ ভোগ কোথায়?

বন্দর চটি হইতে বমুনা চটী পৌছিতে প্রায় মধ্যাহ্ন হইল। ইতিমধ্যে সাড়ে এগার মাইল পথ চলা হইয়াছে। শরীরও অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছে। ইচ্ছা হইল এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। চটিটিও বেশ বড়—যমুনাপুলিনে অবস্থিত। স্নানেরও বিশেষ সুবিধা। অনুকূল স্থান দেখিয়া ইতি পূর্ব্বেই অনেক যাত্রী চটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তারমধ্যে একজন শেঠ বহুলোকজন কুলী ডাণ্ডি ও মালপত্রের দ্বারা চটির অর্দ্ধেক জুড়িয়া ফেলিয়াছে। আমরাও স্থান খুঁজিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম আমাদের দলের দুইজন আরোও আগাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন আমরা বাকী তিনজনও নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলাম। মনে মনে রাগও হইল। দ্রুত হাঁটিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোথায়ও তাঁহাদের নাগাল পাওয়া গেল না। অবশেষে যমুনাচটি হইতে সাড়ে চারি মাইল দূরবর্ত্তী 'খরাদ' চটিতে পৌছিয়া দেখি, তাঁহারা রান্না চাপাইয়া আমাদের আশায় বসিয়া আছেন। তখন কতই না আনন্দ!

'খরাদ্' চটিতে তিনজন প্রৌঢ়া বাঙালী বৈষ্ণবী দেখিতে পাইলাম। তাহারা যমুনোত্তরী যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ ছিল না। বিষাক্ত মাছির দংশনে তাহাদের একজনের পায়ে ঘা হইয়া পা ফুলিয়া গিয়াছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর চলিতে পারিতেছিল না। আমাদের নিকট আসিয়া সে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। আমাদের সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটী তৎক্ষণাৎ তাঁহার ব্যাগ্ বা 'জড়িবুটির পুটলী' হইতে ঔষধ বাহির করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে দিলেন। আমরা সেই বৈষ্ণবী ও তাহার সঙ্গিগণকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিলাম, "আজ আর হাঁটিও না।" ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাদের দয়ায় বেদনা সারিয়া গিয়াছে, এখন আবার চলিতে পারিব।" কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তাহারা নিজ নিজ পুটলী মাথায় পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আহারাদি সারিতে সেদিন অপরাহ্ণ হইল। আমরা ধীরে ধীরে চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গানিতে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গানি 'বন্দর চটি' হইতে সাড়ে আঠারো মাইল। খরাদ্ হইতে মাত্র দুই মাইল। গঙ্গানির আরো দুই মাইল নীচে শিমলী চটি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গঙ্গানি ও শিমলীর মাঝামাঝি স্থান হইতে একটী গিরিবর্ত্ম যমুনোত্তরীর রাস্তা হইতে গঙ্গোত্তরীর রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে। উহা গঙ্গাতীরে 'নকুড়ি' নামক স্থানে গঙ্গোত্তরীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গানি হইতে প্রায় এক মাইল শিমলির দিকে অগ্রসর হইয়া এই পথ ধরিতে হয়। এই পথে যেমন ভীষণ জঙ্গল তেমন বিকট চড়াই ও উৎরাই আছে। এই বিজন গিরিসঙ্কটে একটীমাত্র বিশ্রামস্থান—নাম শিঙ্গড়। গঙ্গানি হইতে শিঙ্গড় দশ মাইল। এই দশ মাইলের অধিকাংশ উৎকট চড়াই। সকালবেলার ঠাণ্ডায় পাহাড় চড়াই অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য। এই কারণে যাত্রিগণ গঙ্গানিতে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন সিঙ্গড়ে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনাদি করিয়া থাকেন। গঙ্গানির উপরে যমুনোত্তরীর রাস্তায় অন্য কোন চটিতে রাত্রবাস করিলে পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সিঙ্গড়ে যাওয়া সহজসাধ্য নয়। আবার পূর্ব্বাহ্নে গঙ্গানিতে অবস্থান করিয়া অপরাহ্নে সিঙ্গড়ে যাওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। এই সকল কারণে রাত্রে গঙ্গানিতে যাত্রীর খুব ভিড় হয়।

(ক্রমশঃ)

—সৎপ্রকাশানন্দ

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতি

সাগর-বিধৌত, শস্যশ্যামল, নদী বহুল, গিরিরাজি সমন্বিত, নির্ব্বাক বনানীর শ্যামচ্ছায়া পরিপুষ্ট শত শত মন্দির বক্ষে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন এই ব্রহ্মদেশ। এদেশকে ইংরেজেরা বলে থাকেন, "I and of Pagodas" ভারতীয়েরা বলেন, "মন্দিরের দেশ" আর এদের নিজেদের ভাষায় হল 'ফয়ার দেশ'—ফয়া অর্থ মন্দির বা দেবতা।

কতকাল পূর্ব্বে যে এদেশে কখন্ কোন্ ধর্ম্ম-প্রচারক প্রথম এসে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন তা এখানে আলোচ্য নয়—কারণ ঐতিহাসিকই সে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন। তবে খুব প্রভাবশালী এবং বিচক্ষণ প্রচারক যে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ সমগ্র ব্রহ্মদেশ ঘুরে এলে এই মনে হয় যে কিছুকাল পূর্ব্বেও এদেশে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মই ছিল না। কার্য্যব্যপদেশে বিদেশীরা যখন এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগল সে সময় হতেই গীর্জ্জা, মসজিদ এবং দুচারটী হিন্দুমন্দিরও তৈরী হয়েছে। ধর্ম্মপ্রভাবে একটা গোটা দেশ কি ভাবে বিজিত হয় তা এদেশ দেখলে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। এই কারণেই সেদিন শিক্ষিত একদল বর্ম্মা রাজনৈতিক সভায় বলছিলেন—'আমরা একজাত, একধর্ম্মী, এক ভাষাভাষী,—কাজেই ভারতের পূর্ব্বেই আমাদের স্বরাজ পাওয়া উচিত।' এক সময় সমগ্র ব্রহ্মদেশই বৌদ্ধধর্ম্ম-স্রোতে প্লাবিত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে যে বুদ্ধদেবের প্রত্যেকটী সত্যবাণী এদের জীবনে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে তা নয়। কারণ যখন যে কোন দেশে কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়, সে সময় সে দেশের জাতীয় স্বভাব এবং সমাজের অবস্থানুযায়ী নিয়ম শাসন এবং শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম বিকশিত হয়। যেমন এক বৌদ্ধধর্ম্মই চীন, জাপান, সিংহল, বাংলা এবং তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই তাদের কতকগুলো নিজস্ব নিয়ম ও শাসনের ভিতর দিয়েই তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কি প্রত্যেক দেশের চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়েও শিল্পীরা নিজ দেশের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। কিন্তু তাঁর মূর্ত্তি জাপান চীন প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব গঠন ভঙ্গীতে তৈরী হয়ে পূজিত হচ্ছে। ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যান্য দেশের মতই এদেশের জাতীয় স্বভাবের ভিতর দিয়েই অনুরূপ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি এদেশবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অসীম।

বুদ্ধদেবের মহান্‌বাণী—"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"। কিন্তু আজ যদি ব্রহ্মদেশে এই উক্তি এদের জীবনের কর্ম্মধারার সাথে কেউ মিলিয়ে দেখতে চায়—তা হলে মনে হবে—এই মহতী বাণী যেন শুধু শাস্ত্রে লেখা থাকবার জন্যই। যেমন প্রভু যীশুর সব বাণী খৃষ্ট ভক্তদের কর্ম্ম জীবনে স্থান পায়নি এও ঠিক সেরূপ। ব্রহ্মবাসীদের জাতীয় কর্ম্মজীবন দেখলে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ'—থেকে অত্যুচিত রজোগুণেরই বিশেষ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়—এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় অন্য ধর্ম্মেও বিরল নয়। কিন্তু তাই বলে এরা যে বৌদ্ধ এ আর অস্বীকার করার সাধ্য নেই। এদের ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের সারসত্য একটু অন্যরূপে পরিণতি লাভ করেছে এই যা প্রভেদ।

মহারাজ অশোক যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের

জন্য তাঁর প্রবল শক্তি নিয়োগ করে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে—ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করেছিলেন, ব্রহ্মরাজেরাও এই নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। তাঁরাও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন—বহু অর্থব্যয়ে—নদীতীরে, গিরিশৃঙ্গে এবং জনপদে মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণময়, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বিশিষ্ট অগণিত বৌদ্ধস্তূপ, মন্দিরশ্রেণী এবং ভিক্ষুকদের জন্য বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যা আজ ব্রহ্মের ধর্ম্ম-গৌরবের প্রত্যক্ষ সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের চেষ্টায় সমগ্র ব্রহ্ম ঐ ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আজও ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হয়নি। ভগবান তথাগতের প্রতি, তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আমাদের যেমন বাল্যকাল হতেই 'ফেরজ' বিদ্যা-বুদ্ধিতে ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল করে দিয়েছে, এদের এখনও অতটা দুর্দ্দশা হয়নি। বাংলায় যেমন একদল লোক বলে থাকেন, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটা উৎসন্ন গেল" এদেশের লোক কিন্তু ধর্ম্মকেই জাতীয়-জীবনের আদর্শ ও শক্তি বলে মনে করে।

এখানে প্রায় গ্রামেই একটী করে বৌদ্ধমন্দির এবং তার সঙ্গে 'ফুঙ্গিচঙ' (বৌদ্ধ বিহার) স্থাপিত। এদের ভাষায় 'ফুঙ্গি' অর্থ—ভিক্ষু, 'চঙ' অর্থ বিহার। প্রত্যেকটী সহরে তিন চারটীর অধিক মন্দির বা 'ফয়া' ও 'চঙ' রয়েছে। বড বড সহরে অনেক মন্দির ও শত শত 'ফুঙ্গি' থাকবার জন্য 'চঙ' স্থাপিত। গৃহস্থগণ বহু অর্থব্যয়ে আপন আগ্রহে ঐ ফয়া ও ফুঙ্গি চঙ তৈয়ার করেন। এঁদের কিছু অর্থ হলেই প্রথমে একটী মন্দির, দেবতা অথবা একটী বিহার প্রতিষ্ঠা করে গার্হস্থ্য ধর্মের চরম সার্থকতা এবং পরম প্রীতি অনুভব করেন। ধর্ম্মকর্ম্মে—ধনী গরীব সবাই মুক্তহস্ত; এমন কি গরীব-পল্লীতে পর্য্যন্ত সবাই চাঁদা তুলে ফয়া ও চঙ প্রতিষ্ঠা করেছে; তবে মন্দির ও দেবতা এদেশের ভঙ্গীতেই তৈরী। প্রত্যহ সকালে বিকালে অথবা যে কোন সময় প্রত্যেক গ্রামের মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী সবাই নিয়মিতভাবে গ্রামের মন্দিরে গিয়ে ধূপ দীপ জ্বেলে বারত্রয় ভূলুণ্ঠিত প্রণামান্তে দেবতার সম্মুখে নতজানু হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তি-আর্দ্রকণ্ঠে প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ করে। প্রার্থনাশেষে পুষ্পাধারে পুষ্পগুচ্ছ সাজিয়ে দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে আসে। কোন কোনদিন ভিক্ষুকগণ ধর্ম্মোপদেশাদি দিয়ে প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ করেন। যে সব পল্লীতে মন্দির অথবা বিহার নেই, সেখানেও অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন নির্দ্দিষ্ট একটী ঘরে নির্দ্ধারিত সময়ে সবাই মিলে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনাদি করে থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তি অথবা আলেখ্য সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় ধূপবাতি পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে সাজিয়ে দেবতাকে আহার্য্যের অগ্রভাগ নিবেদন করা হয়। কোন কোন গৃহী অবসর সময় মালাজপ করে। মন্ত্র—"অনেইছা, ডৌখা, অনিট্টা" (এ জগৎ অনিত্য, দুঃখময় এবং অনৃত)। এইভাবেই এদের নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি পৌর্ণমাসীতে মন্দিরে কোন একটী ধর্ম্মোৎসব হবেই—কারণ বৈশাখী-পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধদেব জন্ম, সিদ্ধি এবং নির্ব্বাণলাভ করেছিলেন। তাই পূর্ণিমা তিথিই বৌদ্ধদের উৎসবের প্রসিদ্ধ দিন। উৎসবের দিন মেয়ে পুরুষ, শিশু সবাই মহানন্দে সুদৃশ্য পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে পূজানুষ্ঠানের ধূপদীপ ফুল সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনাদির ভিতর দিয়ে পুণ্যার্জ্জন করে। বৃদ্ধ পুরুষেরা কিন্তু ধর্ম্মোৎসবের দিন শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে মন্দিরে উপস্থিত হয়। গৃহীদের শ্বেতবস্ত্রই ধর্ম্মকার্য্যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র। কিন্তু এদেশে লক্ষ্য

করবার একটী ব্যাপার এই যে হিন্দুদের বিশেষ কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে পৌর্ণমাসীতে এদেরও কোন বিশেষ ধর্ম্মোৎসব থাকবেই। হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণও ঠিক একই সময় ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। হিন্দুদের দোলপূর্ণিমায় রং খেলা প্রচলিত রয়েছে আর এদের ঠিক পরের পূর্ণিমায় জলখেলা আরম্ভ হয়। এরূপ অনেক ব্যাপারে হিন্দুদের সাথে বৌদ্ধদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদের অনুশাসন অনুযায়ী মেয়েপুরুষ সবারই ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী হবার সমান অধিকার এবং সন্ন্যাস জীবনই হল মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজীবন—এর চেয়ে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক দেবজীবন আর জগতে সম্ভব নয়। ধর্ম্মের এই ভাবটী বর্ম্মীদের জীবনে বেশ পরিস্ফুট তাই এদেশে ফুঙ্গির সংখ্যা যথেষ্ট এবং ভিক্ষুনীর দলও কম নয়।

অপর দেশের মত এখানকার মেয়েদের ভিতরও ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস পুরুষদের চেয়ে অধিক; তাই মায়ের কাছেই ব্রহ্মশিশু প্রথম ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা করে—মায়ের সাথে মন্দিরে অথবা বিহারে যাওয়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। ছেলেবেলা থেকেই বর্ম্মাছেলে মেয়েরা এমন কতকগুলো নিয়মের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠে যাতে ধর্ম্মের ভাবটা স্বাভাবিক ভাবেই এদের ভিতর বিস্তার লাভ করে। এদের মেয়েপুরুষ কেউ বৃদ্ধবয়সের জন্য ধর্ম্মকে শিকায় তুলে রেখে দেয় না।

এদের প্রত্যেক গ্রামের ফুঙ্গি চঙেই একটী করে পাঠশালা রয়েছে। ভিক্ষুগণই শিক্ষক—গ্রামের গরীব ধনী সবার ছেলেমেয়েকে ছোট বেলায় ওখানে পড়তে হবে। সেখান হতেই প্রথমে লেখাপড়ার ভিতর দিয়ে এদের ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় এবং ক্রমেই ধর্ম্মের প্রতি এদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এই জন্যই ব্রহ্মদেশে জনশিক্ষার কোন সমস্যা নেই—এই ভিক্ষুদের পাঠশালা থেকেই ব্রহ্মবাসীদের মেয়ে-পুরুষ শতকরা আশিজন নিজেদের ভাষায় লেখাপড়া শিখেছে।

ছেলেদের প্রত্যেককেই জীবনে অন্ততঃ কিছুদিন ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ফুঙ্গি চঙে ব্রহ্মচারিভাবে ফুঙ্গিদের পোষাকে তাদের মতই কষায়বস্ত্র পরিহিত এবং মুণ্ডিত মস্তক হয়ে—নিয়মিতভাবে ত্রিপিটকের মহাবাণী এবং বুদ্ধের নীতিশাসন শিক্ষা করে কঠোর নিয়মের ভিতর দিয়ে একাহারে পরিতৃপ্ত থেকে এই ব্রত উদ্‌যাপন কর্ত্তে হয়। এনিয়মটী রাজপুত্র হতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সবার জীবনে বাধ্যতামূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান—পালন কর্ত্তেই হবে, নয় ত মৃত্যুর পর তাকে কষ্ট পেতে হবে। পিতামাতা ছেলের এই প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় অর্থব্যয় করে ধর্ম্মোৎসব করে থাকে। কোন ছেলে যদি প্রব্রজ্যা ব্রত হতে আর সংসারে ফিরে আসতে অস্বীকৃত হয় এবং ভিক্ষুকজীবনকেই আদর্শজ্ঞানে ভিক্ষু হতে চায় তাহলে তার মা-বাপ মহানন্দে অবস্থানুযায়ী অর্থব্যয়ে ভিক্ষুগণকে অন্ন ও বস্ত্রদান, আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়ান ইত্যাদি নানাভাবে বিরাট উৎসব সম্পন্ন করে ছেলেকে ভিক্ষু সাজিয়ে দেয়—এমন কি একমাত্র ছেলে হলেও—এবং মনে মনে ভাবে, সত্যই আজ আমরা মহান সৌভাগ্যের অধিকারী আমাদের জীবনে আর কখনও এমন শুভদিন উপস্থিত হয় নি। যদিও আমাদের নিজেদের জীবন ভিক্ষুভাবে উদ্‌যাপন কর্ত্তে পারি নি তা-সত্ত্বেও আজ আমরা এমন ছেলের গৌরবে গৌরবান্বিত, আমাদের কুল পবিত্র হল। গৃহস্থের পক্ষে এটী মহান ধর্ম্মের কাজ। বিবাহিত ব্যক্তিও সর্ব্বত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসলাভের অধিকারী হতে পারে। মেয়েরাও নির্ব্বাণলাভের জন্য দলে দলে ভিক্ষুনী হয়। এদের বিহারগুলি ভিক্ষুদের বিহার হতে পৃথক ও দূরে অবস্থিত।

এদেশে বৌদ্ধের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়

প্রত্যেক পরিবারেই অন্ততঃ দু একজন ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী হয়েছে। এরা ধর্ম্মগুরু সন্ন্যাসীদের দেবতার ন্যায় এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে নিজের ছেলে ফুঙি হলেও মা বাপ ভক্তিভরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করে না এবং দেবসম্মানে তাদের ফয়া বলে সম্বোধন করে। ফয়া অর্থে এদের ভাষায় দেবতা ও মন্দির। দেবতা ও মন্দিরে এরা কোন প্রভেদ না মেনে সমান শ্রদ্ধাই পোষণ করে থাকে। এদেশের সমাজের উপর ফুঙিদের অপ্রতিহত প্রভাব দেখলে খুবই আশ্চর্য্য হতে হয়। শুধু ধর্ম্ম নয় সমাজে ও রাষ্ট্রে ভিক্ষুগণ যা বলবেন তাই দেববাক্য বলে দেশের লোক নত মস্তকে মেনে নেয়।

শুধু মন্দিরে প্রার্থনা বা উৎসবাদির দ্বারাই এরা ধর্ম্ম সঞ্চয় করে না। বর্ম্মার গ্রামে গ্রামে বিশ্রামাগার, রাস্তায়, পল্লীতে সর্ব্বত্র জলসত্র এবং অতিথি সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপেই প্রতিপালিত হয়। এছাড়া গৃহস্থের আর একটী বিশেষ ধর্ম্মের কাজ হল ফুঙিদের ভরণ পোষণ করা। ফুঙি চঙ তৈরী থেকে আরম্ভ করে তাঁদের অন্নবস্ত্র যা কিছু দরকার সে সব গৃহস্থগণ মহা আনন্দ সহকারে দান করে নিজেরা কৃতার্থ বোধ করে। প্রত্যেক গ্রাম অথবা পল্লীর ফুঙিচঙে যত জন ভিক্ষুক থাকবেন তাঁদের জন্য সেই গ্রামের গৃহিগণ প্রতিদিন রান্নার পরই খাবারের অগ্রভাগ উঠিয়ে রাখবে। ভিক্ষুগণ একসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রামের পথে ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির হন। কোন কোন স্থানে ফুঙিগণ ভিক্ষায় বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই ঘণ্টাধ্বনি করে পল্লীবাসীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। গৃহলক্ষ্মীরা রাস্তার পার্শ্বে সব জিনিষ নিয়ে অপেক্ষা করেন। ফুঙিগণ এলেই তাঁদের ভিক্ষাপাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি দান করে দিবসের মহান্ ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করেন। গৃহস্থদের সবাই —এমন কি শাকাহারভোজী পর্য্যন্ত তার আহার্য্যের অগ্রভাগ ফুঙিকে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে নির্ব্বাণের পবিত্র পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ভিক্ষুগণ যেন পরিবারের ধর্ম্মাচার্য্য দেবতা, তাই আহার্য্যের অগ্রভাগ তাঁদের দান কর্ত্তেই হবে—নইলে অধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানটী নিত্যকার কর্ম্মজীবনে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে নিয়মিতভাবেই চল্‌ছে।

ফুঙিগণই প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্যরূপে ভিক্ষুজীবনের কঠোর কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়ে নিজেদের জীবনযাপন করেন। সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তেই বিহার স্থাপিত হয় কিন্তু ভিক্ষুগণ ভিক্ষাসংগ্রহ ব্যতীত বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কখনো গ্রামে প্রবেশ করেন না। বিলাস দ্রব্য এঁদের ব্যবহার করতে দেখা যায় না—এমন কি জামা পর্য্যন্ত নয়। টাকা পয়সা এঁরা হস্তদ্বারা গ্রহণ বা স্পর্শ করেন না। প্রত্যেক বিহারেই আশ্রম পালিত বালক বা সেবকগণ টাকা পয়সা গ্রহণ ও দরকার হলে খরচ ইত্যাদি করে থাকে—অবশ্য আচার্য্যের পরামর্শ নিয়ে। প্রত্যেক ভিক্ষুর সাথে এক একটী বালক ব্রহ্মচারী থাকে। ভিক্ষুগণ কোন আহার্য্যই আপন হস্তে গ্রহণ করেন না, কেউ হাতে তুলে দিলে নেন। এজন্য বালক সেবকগণ সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকে নয়ত গৃহস্থরাই তুলে দেয়। কোন ভিক্ষুকে কোন সময় বিহারের বাইরে যেতে হলে বিহারের প্রধান ভিক্ষুর অনুমতি নিতে হয়। ভিক্ষুদের নেশার ভিতর চুরুট এবং পান। দুপুর বারটার পর কোন সন্ন্যাসীই অন্নগ্রহণ করেন না—এ নিয়মটী খুব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেক ভিক্ষুই পালন করেন। কেউ এ নিয়ম অমান্য করলে সন্ন্যাস আশ্রম হতে তিনি বিহার-অধ্যক্ষ দ্বারা বিতাড়িত হন।

কোন ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে গৃহিগণ ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য আহ্বান করলে ফুঙিগণ তাদের গৃহে গমন করেন। হিন্দুদের মত বর্ম্মিদের ঠিক আনুষ্ঠানিক পুরোহিত নাই বটে, কিন্তু ফুঙিগণই এদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ কর্ত্তেন।

অন্য সময় বিহার অথবা মন্দিরে ধ্যানজপে মগ্ন থাকার নিয়ম। প্রাচীন ফুঙ্গিগণ মাঝে মাঝে গৃহস্থগণকে বুদ্ধের বাণী, ধর্ম্মের শাসন এবং নীতিশীল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র অধ্যাপনা হয়। প্রাচীন পণ্ডিত ভিক্ষু তাদের আচার্য্যরূপে শিক্ষা দান করেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ভিক্ষুগণ প্রার্থনাদি করে থাকেন। কখনও বা মালা জপ করেন। তাঁদের জপমন্ত্র—"আনইছা, ডোখা, অনিট্রা" এই তিনটী শব্দ। প্রায় বিহারেই একটী পাঠশালা রয়েছে—তাতে এঁরা শিক্ষকতা করেন। এছাড়া ভিক্ষুদের অপর কোন কাজ করতে দেখা যায় না।

ফুঙ্গিদের ভিতর এমন সব নিয়ম রয়েছে যে মেয়েদের মুখের দিকে তাকান নিষেধ। তাই ভিক্ষা গ্রহণের সময় ভিক্ষুগণ একজনের পর একজন শ্রেণীবদ্ধভাবে নিম্নদিকে মুখ করে রাস্তায় চলেন। বক্তৃতাদির সময় আপনার মুখ একখানা বৃহৎ পাখা দ্বারা আবৃত করে লোকের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন যাতে লোকের প্রশংসায় অহমিকা না জাগতে পারে। কোন ভিক্ষু বয়সে প্রাচীন হলেই ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁকে অধ্যক্ষের সম্মান দেন না—সন্ন্যাস জীবনের প্রাচীনতা হিসাবেই তাঁরা ভিক্ষুকে সম্মানিত বা অধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। হয়ত কোন ভিক্ষু বয়সে অনেকের চাইতে ছোট হতে পারেন কিন্তু ভিক্ষু জীবন তাঁর অপরের চেয়ে অধিক তাই তিনি শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ এসব নিয়ম ভিক্ষুগণ পালন করে থাকেন। আশ্রম অধ্যক্ষ প্রাচীন ফুঙ্গির আদেশ ও উপদেশের প্রতি আশ্রমবাসী ফুঙ্গিগণ খুবই শ্রদ্ধাবান। এছাড়া এঁদের ভিতর আরও কিছু নিয়ম থাকতে পারে যা জানবার সুযোগ আমার হয়নি। সকল ভিক্ষুই যে সব নিয়ম বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর্ত্তে সক্ষম এ আমার মনে হয় না, তবে কতকগুলো নিয়ম বাধ্যতামূলক। ভিক্ষুণীদেরও এরূপ নিয়মাদির ভিতর দিয়ে পবিত্র জীবন যাপন কর্ত্তে হয় এবং গৃহিগণই তাঁদের অশন বসন যা কিছু দরকার সে সব দান করে পুণ্যার্জ্জন করেন।

ফুঙ্গিগণ মাছ মাংস প্রভৃতি সকল আহার্য্যই গ্রহণ করেন। কারণ ভিক্ষান্নে গৃহিগণ যা দান করেন তাই পবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ কর্ত্তে হয়। গৃহিগণও মাছ মাংস খাওয়া অধর্ম্ম বলে মনে করেন না। তবে দুচারজন গৃহস্থের নিকট শুনেছি তাঁরা বলেন—"আমাদের অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ কিন্তু আমরা মাছ মাংস না খেয়ে পারি না। তাই কি আর করব।" আবার কেউ বা বাজারে জীবন্ত মাছ কিনে দোকানীকে দিয়ে কাটিয়ে পাপ-পুণ্যের হিসাব খতিয়ে দ্যাখে—দোকানী যখন মেরেছে তখন হত্যার পাপ সম্পূর্ণ তার, আর আহারের জন্য যদি কিছু হয় সে অতি সামান্য। সঞ্চয় বুদ্ধি এদের মোটেই নেই—এরা যেন সত্যিই বুঝেছে জগৎটা দুদিনের। তাই যা আছে দানধর্ম্ম ও ভোগ করে কাটিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এ দেশের মেয়ে পুরুষ ধর্ম্মবিষয়ে এত গোঁড়া যে অপর কোন ধর্ম্মমত শুনতে বা মানতে চায় না। এরা গার্হস্থ্য জীবন যাপনে ধর্ম্মকাজকে এমনভাবে দৈনিক কর্ম্মজীবনের সাথে মিলিয়ে নিয়েছে যাতে নিত্যকার ধর্ম্মানুষ্ঠানটী পর্য্যন্ত প্রধান কর্ত্তব্য বোধেই পালন করা হয়। সবদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এদেশে তেমন ভাবে বিকশিত হয়নি, তাহলেও ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং কতকগুলো ধর্ম্মের নিয়ম পালন দ্বারা এরা নির্ব্বাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এই এদের ধারণা। তবে এও ঠিক বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় এরা যথেষ্ট বিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক। কেউ যদি প্রতিবাদ করে বলেন হিন্দুদের ভিতর প্রকৃত ধার্ম্মিক আছেন,

আমি বলব এদের ভিতরেও সেইরূপ ধার্ম্মিক বিরল নয়।

বিদেশীদের সর্ব্বপ্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে অসংখ্য মন্দির ও বুদ্ধদেবের সুশোভন প্রশান্তমূর্ত্তি যা ছড়িয়ে রয়েছে এদেশের পল্লীতে, নগরে, ঘাটে, মাঠে ও পর্ব্বতশীর্ষে। এ সবই এখানকার আবহাওয়াকে কেমন একটা পবিত্র ভাবময় করে রেখেছে এবং ইহাই যে এঁদের জাতীয় চরিত্রের প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাও বেশ মনে হয়। তবে ভারতের বর্ত্তমান রাজগুরু খৃষ্টভক্ত পাদ্রীদের আমদানীও এদেশে হয়েছে এবং তাঁরা স্বর্গের সরল পথ দেখাবার জন্য নির্ব্বাণপন্থী বর্ম্মীদের নানাভাবে আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করছেন। অবশ্য রাজ্য শাসনের সঙ্গে ধর্ম্ম বিস্তারের চেষ্টা এতো খুবই স্বাভাবিকই।

বৌদ্ধধর্ম্মের দুটী মত আছে—হীনযান ও মহাযান। ব্রহ্মবাসীরা হীনযান মতবাদই অবলম্বন করেছেন। তাদের দানধর্ম্ম, নিয়ম সবই ঐ মতের পরিপোষক; যতদিন এদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ রয়েছেন কখনই এ ধর্ম্ম হীনপ্রভ হবে না—যতই বিদেশী ধর্ম্ম বিস্তার চেষ্টা চলুক না কেন; দয়াল দেবতার করুণা কণা হতে এরা কখনই বঞ্চিত হবে না।

—ত্যাগীশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ *

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস

(১)

আপনাদের এই সভায় সভাপতিত্ব করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার পর আমার গৃহ-তলস্থিত শীতল জলের প্রস্রবণ হইতে মৃদুস্বরে এই আপত্তি উত্থিত হইল, "স্বামিজীর স্মৃতিসভায় তুমি কি বলিবে? তুমি সাধকও নও, ভক্তও নও! তোমার কি কথা বলিবার আছে? তোমার কথা লোকে শুনিবেই বা কেন?" শুনিবেন কি না সে কথা বলিতে পারি না। যদিও শুনিবার ইচ্ছা না থাকিলে সভাপতিত্বে আপনারা আহ্বান করিতেন না বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। তবে বলিবার কথা আমার মত সামাজিক সংসারী ব্যক্তির এখানে আছে ইহাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ যদি সংসার বিরাগী বা সংসার বিমুখ সাধু হইতেন তিনি যদি নিজের মোক্ষার্থ সংসারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সারাজীবন গুহাতলে বা অরণ্যে বসিয়া সাধনা করিতেন, তাঁহার বাণী যদি শুধু সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বা মুমুক্ষুর জন্যই হইত তাহা হইলে হয় তো আমার মত লোকের পক্ষে তাঁহার স্মৃতি সভায় নেতৃত্ব করা অশোভন হইত। কিন্তু তিনি তো সেরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি সংসারকে অশ্রদ্ধায় পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সারাজীবন না হইলেও তাঁহার পরিণত জীবন মানুষের সেবাতেই ও মঙ্গল চিন্তাতেই উৎসর্গিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার দেশের মানুষের সেবাতে ও মঙ্গল চিন্তায়। কাজেই তাঁহার দেশের মানুষের পক্ষে তাঁহার স্মৃতির

* পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে টাউন হলে যে বক্তৃতা দেন, তাহা সুরাজপত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাঁহার জীবনের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করা এবং তাঁহার জন্মদিনে উৎসব করা স্বাভাবিক। সেই কার্য্যেই আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। তিনি বার বার বলিয়াছেন, এই দেশের লোককে তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন, এই দেশের লোকের সেবার জন্য তিনি মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছেন; এবং এই দেশের সেবাতেই যে তিনি প্রাণপাত করিয়াছিলেন এ কথা বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না ইহাই আমার বিশ্বাস। ৩৩ বৎসর হইল তাঁহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছে কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর মাত্র হইত। এই অকাল মৃত্যুর কারণ যে তাঁহার নর সেবায় —বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বজাতীয় নরগণের সেবা —প্রাণান্ত পরিশ্রম তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আজ আমরা তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আসি নাই। তাঁহার জীবনের জন্য আনন্দ করিতে আসিয়াছি এবং সে আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার জীবন, তাঁহার স্বদেশ সেবা, তাঁহার স্বজাতি সেবা, তাঁহার নরসেবা ব্যর্থ হয় নাই। আজ এ কথা বলা চলে, "তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে চাও, চারিদিকে চাও!" মানুষের মনের, মানুষের চিত্তের উপর তিনি যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মোছে নাই, অল্পদিনে তাহা মুছিবার নয়।

(২)

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, নীতি সম্বন্ধীয় এবং চরিত্র সম্বন্ধীয় বিষয়ে নূতন কথা বলা অসম্ভব, সব কথাই বহুকাল পূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে—কাজেই হয় মিথ্যা কথা বলিতে হয়, নচেৎ পুরাতন কথা বলিতেই হইবে। কিন্তু পুরাতন সত্য কথাই যুগে যুগে নূতন করিয়া নূতনভাবে বলিতে হয় এবং যিনি প্রাণ দিয়া মন দিয়া সমস্ত জীবন দিয়া কোনও সত্য অনুভব এবং উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার কথাই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। সেই জন্য বিবেকানন্দের যে কথা—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

উহা মানুষের হৃদয়ে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানুষ যে নারায়ণ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা যে অভেদ এ কথা বহু পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষিরা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মানুষকে ভালবাসাই যে মানুষের চিত্তবৃত্তির পরম পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা এ কথা সকল দার্শনিক ও ধর্ম্মোপদেষ্টাই যুগে যুগে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধদেব, মহম্মদ, যিশুখৃষ্ট সকলেরই কথা ইহাই। নাস্তিক পণ্ডিতেরাও এই কথা অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যদি এ সংসার শুধু অন্ধজড়কণার অভাবিত সংযোগের ফল হয়, যদি ভবিষ্যৎ বলিয়া মানুষের কিছু নাও থাকে তাহা হইলেও এ জীবন সহনীয় কেবল এক উপায়েই হইতে পারে— পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পায় ও সহানুভূতিতে। কারণ প্রেম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং এ সংসারে মানুষ কেবল এক প্রেমকেই যথার্থ শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করিতে পারে। সেইখানেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, সেইখানেই মানুষ নিজের চিত্তবৃত্তির চরম স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। এই প্রেমকেই নানাভাবে নানা দার্শনিক অভিহিত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং...তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" কেহ বলিয়াছেন, "হিংসা করিও না।" কেহ বলিয়াছেন, "নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে।" এ সকল কথারই অর্থ এক। নিষ্কাম কর্ম্ম কখন আমরা করি? [illegible]

কখন্ আমরা মনেও আনি না?—যখন আমরা প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। যখন কর্ম্মটাকেই আমরা ভালবাসি—যখন যার জন্য কর্ম্ম করি তাকে আমরা ভালবাসি। তখনই আমরা ত্যাগের দ্বারা ভোগ করি, তখনই আমরা হিংসা করি না, তখনই আমরা আনন্দ পাই। ছোট ছোট বিষয়েও এই কথা খাটে—বড় বড় বিষয়েও। একটু চিন্তা করিলেই কবির কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, "যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।"

"ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে।" একি সংসার বিরাগীর ত্যাগ? তাহা হইলে তো আত্মহত্যা করিলেই চলে। কিন্তু মানুষ তো আত্মহত্যা করিতেছে না। মানুষ তো জীবনকে আনন্দময় বলিয়াই জানে এবং কার্য্যতঃ স্বীকার করিতেছে। কোথা হইতে এই দুঃখকষ্টময় সংসারে মানুষ এ আনন্দ পায়? একটু ভাবিলেই বোঝা যায় মানুষ ভালবাসে বলিয়াই মানুষ এ সংসারে জীবন ধারণ করিতে রাজি হয়।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কে এ সংসারের ঝকমারী সহিত আকাশ বাতাস যদি আনন্দে পরিপূর্ণ না হইত? সত্যই এ আকাশ আনন্দে পরিপূর্ণ এবং এই আনন্দেরই অপর দিক প্রেম। কাজেই সকল দার্শনিক সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাই যুগে যুগে এই বাণী প্রচার করিয়াছেন—দ্বেষ হিংসা মানুষের স্বভাব নয়। ইহা দ্বারা মানুষ বাঁচে না, ইহাতে মানুষ আনন্দ পায় না—মানুষের ধর্ম্ম প্রেম—মানুষের ধর্ম্ম প্রেমে আত্মত্যাগে, সেই ত্যাগেই মানুষের যথার্থ ভোগ। সেই প্রেমেই মানুষের যথার্থ পূজা—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

(৩)

বিবেকানন্দ স্বামীর বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি এ কথা শুধু দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করেন নাই, তিনি ইহা জীবনে কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান আনুষ্ঠানিক কীর্ত্তি রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী দল গঠন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এদেশে নূতন নয়—যদিও হিন্দু যুগে ইহার অস্তিত্ব বোধ হয় ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ হইতেই বরাবরই নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। *হিন্দু যুগে প্রপৌত্রের মুখ দর্শনের পর সংসার হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া বাণপ্রস্থ বা যতির জীবন যাপন করিবার প্রথা ছিল। কিন্তু সেকালে আর্য্যগণ মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তারপর বৌদ্ধ যুগে ভিক্ষু ভিক্ষুনীতে দেশ ছাইয়া যায় এবং শঙ্করাচার্য্য হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রায় ষোল আনা দর্শন হিন্দুধর্ম্মে ভুক্ত ও হজম করিবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের ভিতরও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্থান পাকা করিয়া দেন। তাঁহার "কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" ইত্যাদি শ্লোক আপনারা সকলেই জানেন।

এখন ইহা হিন্দু ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। কত প্রকার শাখা সম্প্রদায়ে যে এই সম্প্রদায় বিভক্ত এবং এক এক সম্প্রদায়ে যে কত লোক আছেন, তাহা প্রয়াগে কুম্ভ, অর্দ্ধোদয় ইত্যাদি যোগে দেখিয়া লোক বিস্মিত হয়। একদিক হইতে দেখিতে গেলে এতগুলি লোক সমাজের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছে এবং সমাজ ইঁহাদের সহযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া সমাজনীতিজ্ঞদিগের আক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আইন করিয়া সন্ন্যাসবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা করার পূর্ব্বে এ কথাও মনে উদয় হইতে বাধ্য যে, এ সকল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি শুধু কতকগুলি মানুষের জন্মগত আলস্য, ঔদাসীন্য বা দায়িত্ব গ্রহণ বিমুখতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। তাহা হইলে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সম্প্রদায়-

বদ্ধ ভাবে হউক বা না হউক অন্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে সংসার বিরাগী সাধুর অস্তিত্ব লক্ষ্য হইত না। এবং ইঁহাদের দ্বারা সাধারণ লোকের মনের কোনও কোনও বিশেষ প্রয়োজন সাধিত না হইলে এ সকল সম্প্রদায় এত ঋদ্ধিসম্পন্ন এবং বিভব সম্পন্ন হইতে পারিত না। শুধু দুর্ব্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও জিনিষই এতকাল ধরিয়া সমৃদ্ধি সম্পন্নভাবে জাগিয়া থাকিতে পারে না। ইহা নিশ্চয়ই মানব চরিত্রের কোনও মূলীভূত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে প্রয়োজন হইতেছে প্রধানতঃ দুইটী। প্রথমতঃ মানুষের মুমুক্ষুত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাকে মানুষের "ত্যাগ বিলাস" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে তাহা। মানুষমাত্রেই মোক্ষ লাভের জন্য, জীবনের পরাকাষ্ঠা লাভের জন্য, ভগবান দর্শনের জন্য ব্যগ্র। মানুষ মাত্রেই ত্যাগ করিয়া আনন্দ লাভ করে। কিন্তু মানুষে কেবলই ভুলিয়া যায় যে সামঞ্জস্য রক্ষাই সাফল্য, একদেশদর্শিতাই বিনাশের ও ব্যর্থতার সোপান এবং সকল পাপের মূলই হইতেছে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের অজুহাতে উপায় সম্বন্ধে বিচারহীনতা।

সেই জন্যই যুগে যুগে বিবেকানন্দের প্রয়োজন। তিনি সন্ন্যাসের প্রেরণা নিজেই অনুভব করিয়াছিলেন, কাজেই এ প্রেরণার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক রূপেই জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু এ প্রেরণাকে সার্থক করিতে হয় কি করিয়া তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে বলিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের সন্ন্যাস শুধু নিজের মোক্ষার্থ নহে। জগদ্ধিতায় চ। কারণ "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

ইহার ফলে আমরা যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পাইয়াছি, তাঁহারা সন্ন্যাস এবং সমাজ সেবার অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বিরলে বসিয়া নিজেদের মোক্ষ সাধন করেন কিন্তু লোক সমাজের সমক্ষে তাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা সেবক, তাঁহারা নানারূপ কল্যাণ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং সংসারী লোকদিগের শুধু পথ প্রদর্শক নহেন, সহকর্ম্মী। এই কার্য্যের প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে, ধর্ম্ম সমাজ হইতে অস্বাভাবিকরূপে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। মানুষ নিজের মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সঙ্কীর্ণতা এবং কুশিক্ষার ফলে ভুলিতে বসিয়াছিল, শুধু বিরাগী বা সন্ন্যাসী নয়, সংসারী লোকও অমৃতস্য পুত্রাঃ। তাহাকেও পরিপূর্ণতা অনুভব করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা তাহার নিজের আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই কাজ হাতে কলমে শিখাইয়া দিবার জন্য বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য তিনি আমাদের মত সমাজভুক্ত সংসারী লোকদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

(৪)

সেই জন্যই তাঁহার জীবনের জন্য আনন্দ উৎসব করিতে আমরা আসিয়াছি। তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জিত ছিলেন এবং মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কোথায় তাহা প্রাঞ্জল ভাষায়, বীরের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছুৎমার্গের প্রতি কষাঘাত, তাঁহার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে, পণ্ডিত মূর্খতার বিরুদ্ধে, বাক্‌চাতুরীর বিরুদ্ধে এবং ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে অভিযান, তাঁহার সত্যের জন্য ঐকান্তিক ব্যগ্রতা, তাঁহাকে প্রত্যেক চিন্তাশীল ও সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে।

"চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

"মোক্ষ মোক্ষ করে চ্যাচাতে হবে না। আগে পেটে ভাত পড়ুক, গায়ে বল হোক, বুদ্ধি বিকশিত

হোক, তারপর মোক্ষের কথা ভাবা যাবে।" "দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কার্য্য কর্‌তে পারনা—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছ।"

"জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"

এ সকল কথা সহজ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে।

তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলী, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'বর্ত্তমান ভারত,' "স্বামী শিষ্য সংবাদ," 'বীরবাণী,' 'রাজযোগ' ইত্যাদি পুস্তক সাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য এবং এই সকল লেখাতে যে মনুষ্যটীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, ভক্তি না করিয়া, শ্রদ্ধা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার জন্মদিনে সকলেরই মন আনন্দে পূর্ণ হয়, এই মনে করিয়া যে, তিনি যদিও চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায় নাই। তাঁহার দেহ বেলুড় মঠের মাটিতে মিশিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বীর আত্মা সত্যের, আনন্দের, প্রেমের পথে আগুয়ান হইতেছে, আমাদের পথ দেখাইয়া যাইতেছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যেককে সেই আনন্দলোকে না পৌছাইয়া দিবে, ততক্ষণ তাহার গতি স্থগিত হইবে না, কারণ তিনি আমাদিগকে ভাল বাসিয়াছিলেন, মনে প্রাণে আমাদেরই একজন ছিলেন।

পুঁথি ও পত্র

১। **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে**—প্রণেতা স্বামী নির্লেপানন্দ ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৵০ আনা। মূল পুস্তকখানি ২৫৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ভাষা মানুষের হৃদয়ের অভিব্যক্তি বই আর কিছু নয়। এই পুস্তকের প্রণেতা স্বামী নির্লেপানন্দ আশৈশব 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের' পূতস্নেহময় আবহাওয়ার ভিতরে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত। শুধু তাহাই নহে আবাল্য হৃদয়ে ত্যাগের আদর্শ জাগরূক থাকায়, ইঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী ও সংঘনায়ক পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ মহারাজ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের বিশেষ বিশেষ উপদেশাবলী এই সঙ্গে, পূজনীয়া যোগীন মা ও গোলাপ মা (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহচরী ও সেবিকাদ্বয়) প্রভৃতির জীবনের বিশেষ ঘটনা অধুনা বিলুপ্ত 'বিশ্ববাণী' মাসিকপত্রে গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত উপাদান সহযোগে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি সেই প্রবন্ধগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই লিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনালোকে—যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমই উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও উপদেশাবলী গ্রন্থকার সাধারণে প্রকাশ করিয়া 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের' ভাবে উদীয়মান বাংলাভাষী মানবের পরম কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন নিঃসন্দেহ।

'রামকৃষ্ণ সংঘের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ—যিনি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর নিজ ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ধীরে ধীরে সংঘের বিস্তৃতি ও দৃঢ়ভিত্তির অন্যতম কারণ ছিলেন—আমাদের এই গ্রন্থকার তাঁহার অপার স্নেহ ও অপরিসীম করুণার আভাষ স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়াছেন। তাই এই পুস্তকের প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে তাঁহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়া, পাঠককে স্বামী সারদানন্দের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করাইয়া স্বামী সারদানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের কিঞ্চিৎ আভাষ দান করিয়া, ধন্য করিতেছে।

ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ বিশেষ উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকায় গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা সামান্য অস্পষ্ট বোধ হইলেও একটু নিবিষ্ট হইলেই সকল জিনিষ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের' ভাবে উদ্ভাসিত গ্রন্থকার নিজ ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া চিন্তাশীল, মুমুক্ষু ও ভক্ত-সমাজে আদৃত হইবেন নিঃসন্দেহ। পুস্তকখানির বহুল প্রচারে সমাজের কল্যাণ হইবে আশা করা যায়।

২। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—মহন্ত মহারাজ ১০৮ শ্রীস্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা ভাল। ইহাতে মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও শব্দসূচী আছে। উপক্রমণিকায় নিম্বার্ক সম্মত শ্রুতিব্যাখ্যার দ্বারা গীতাতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। নিম্বার্ক দর্শনকে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ বাদ বলে। ইহা শাক্ত অভিনব গুপ্ত, শংকর সমসাময়িক ভাস্করাচার্য্য ও ভক্তিসূত্রকার শাণ্ডিল্যের প্রায় অনুযায়ী; যাঁহারা রামানুজাদির ন্যায় জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ-স্বীকার করেন না, আবার শংকর দর্শনের এক অখণ্ডতত্ত্বে জীব ও জগৎ রজ্জু-সর্পের ন্যায় অধ্যস্ত ব্যবহারিক সত্তা, ইহাও স্বীকার করিতে নারাজ, তাঁহাদের পক্ষে,—এক অখণ্ড পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, মৃত্তিকা হইতে ঘটের ন্যায়, জীবজগতে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,—এই ভেদাভেদবাদ হৃদয়গ্রাহী হইবে সন্দেহ নাই। আচার্য্য শংকর উভয়-লিঙ্গ ব্রহ্মের "আধারমানন্দ-মখণ্ডবোধং" (কৈউ, ১৪) এই নির্গুণপ্রকৃতির ওপর বেশী জোর দিয়াছেন। এখানে উপাসনা নিকৃষ্ট, কারণ উক্ত কৈবল্য শ্রুতি বলিতেছেন—

> ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো,
> ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ২২
> ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি
> ন চানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ।
> এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং
> গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৫৩
> সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং
> প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ২৪

সগুণ শ্রুতিও আছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"। ১৫। "ত্রিষুধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ"। ১৮। শংকর বলিয়াছেন, কারণ-ব্রহ্ম যখন "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং" (শ্বেউ, ১৯) তখন তাহাতে পরিণামরূপ কার্য্য-লক্ষণ "সক্রিয়ত্ব" কিরূপে সম্ভব। যা জাত তাই পরিণমিত কিন্তু ব্রহ্ম "অজাত" (শ্বেউ, ২১)। যখন, "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ" (শ্বেউ, ৪।১৮) তখন ব্রহ্মের "মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত"রূপ বা "দ্বা সুপর্ণা" সবই নিরঞ্জন ব্রহ্মে অধ্যস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যবহারিক উপাধিগত রূপ,—কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" (শ্বেউ,৪।১৯)। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্ব-মায়য়া কল্পিত জীবলোকে।" (কৈউ, ১৩)। অদ্বৈতবাদীরা আরও বলেন, জাবাল শ্রুতিতে (৪) আছে, "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" তারপর বলিতেছেন, "যদহরেব বিরজেৎ

তদহরেব প্রব্রজেৎ"। "যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই সন্ন্যাস লইবে" শ্রুতিটি "গৃহী হওয়া শ্রুতির বিরোধী বলিয়া যেমন শেষোক্ত শ্রুতির প্রতিবাদ করা চলে না, সেইরূপ নিকৃষ্ট উপাসনাপর শ্রুতির জন্ম উৎকৃষ্ট বিবর্ত্তপর মৈত্রেয়ী শ্রুতি—

ধ্রুবং স্তিমিত-গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং নির্ব্বাণময় সংবিদম্॥১।১০

—প্রতিবাদ করা চলে না। জগতের প্রতি আত্যন্তিক ভাবে ভোগ বিরাগ না হইলে, উহাকে বিবর্ত্তরূপে স্বীকার করিতে বাস্তবিকই কষ্ট বোধ হয়। অবশ্য প্রথম বিবর্ত্ত স্বীকার করিয়া তারপর ব্যবহারিক প্রকৃতির "পরিণাম" (শ্বেউ, ৫।৫) অদ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন।

পক্ষান্তরে নিম্বার্ক মতে, জগৎ যদি ব্রহ্মে সর্প রজ্জুর মত হয়, তাহা হইলে এ জগতের কোনও তাৎপর্য্যই থাকে না, কাজে কাজেই পরিণামবাদ স্বীকার্য্য। সেই জন্ম পূজ্যপাদ বাবাজী তাঁহার "ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "যদি জগৎকে একেবারে অস্তিত্ব বিহীন—কল্পিতমাত্র বলা যায়, তাহাতে বৈদিক উপাসনা বিষয়ক অধিকাংশ উপদেশ অসার হইয়া পড়ে, ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য কিছুরই বিচার থাকে না এবং কার্য্যতঃ নাস্তিকতা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়।" অতএব তিনি শাংকর দর্শনের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! কিন্তু ইহাতে হয়ত কোনও কোনও দুষ্ট লোক জগৎ সত্য মতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিবে যে জগৎ যদি সত্য হয় তাহা হইলে "দ্বৈতাদ্বৈতবিহীনোঽস্মি দ্বন্দ্বহীনোঽস্মি" (মৈত্রেয়ী উ, ৩।৪) প্রভৃতি শ্রৌত অনুভবকালেও জগৎ থাকিবে, কাজে কাজেই ঐরূপ শ্রৌত-অনুভব অসিদ্ধ। তাহা ছাড়া এমন সত্য জগৎ ছাড়িয়া অজানা ব্রহ্মের অনুসন্ধানে যাওয়ার প্রয়োজন কি?

সংঘ ও বার্ত্তা

ঢাকা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব দুই দিবস মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে জানুয়ারী তিথি পূজার দিবস ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ ও সঙ্গীতাদি হইয়াছে। অপরাহ্ণে ভক্তসম্মিলনীতে স্বামী প্রেমেশানন্দ, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্ত গুপ্ত ও ব্রহ্মচারী আগম চৈতন্য স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী ভজন, উপনিষদ্ পাঠ, দরিদ্রনারায়ণ সেবা, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। তিন সহস্র দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করিয়াছেন। অপরাহ্ণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এস্, এন্, রায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভায় স্বামী সুন্দরানন্দ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, হেমাঙ্গ মোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং অরুণকান্তি নাগ বিবেকানন্দজীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডক্টর রায় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে বিবেকানন্দের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং বিশেষরূপে তাঁহার আর্ত্তের সেবায় জীবনোৎসর্গ সম্বন্ধে সুললিতভাবে বলেন। সন্ধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন

রাহা হিন্দু সংগঠন ও ভারতীয় বীর রমণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—

গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার **আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে** শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দিন প্রাতে পূজা পাঠাদি, মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০ শত দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ভজন পাঠ ও সহরের সমাগত ভদ্রলোকগণ যথারীতি আসিয়া প্রসাদাদি গ্রহণ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে কুমাউ পাহাড়ের মত রক্ষণশীল সমাজও শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার কুটীরের ঠাকুর ও স্বামিজীর প্রভাবে ও ভাব অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য আদি জাতি নির্ব্বিশেষে সকল কুলাভিমানী দ্বিজাতিগণও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় কুষ্ঠাশ্রমে প্রায় শত সংখ্যা কুষ্ঠ রোগীদের জন্য পুরী হালুয়া আদি প্রসাদ পাঠান হয়, কারণ রোগীদের কুষ্ঠাশ্রমের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। স্থানীয় ভক্তদের কায়িক পরিশ্রম ও আর্থিক সাহায্যের দ্বারা উৎসব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, ইহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—কনখল, হরিদ্বার—**শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের** ৭৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে উক্ত আশ্রমে গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতে ভজন, কীর্ত্তন, গীতা, উপনিষদ্, চণ্ডীপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, দুপুরে স্থানীয় ভক্ত সাধু সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার ঐ উপলক্ষে দুপুর ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আশ্রমে একটী জনসভায় স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ও সন্ন্যাসিগণ স্বামিজীর ধর্ম্মজীবন, জনসেবা, ত্যাগ, পাশ্চাত্য জগতের উপর প্রভাব সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে প্রচারক শ্রীমৎ স্বামী দেবানন্দ, পাঞ্জাবনিবাসী স্বামী ঈশরানন্দ ও স্থানীয় যোগাশ্রমের ষড়দর্শনের পণ্ডিতের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ নবিশ নামক জনৈক ব্যক্তি ইংরাজীতে যথাক্রমে (১) স্বামিজীর বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার ও তাহার বাস্তবতা, (২) স্বামিজীর স্ত্রীজাতির আদর্শ ও ছুঁৎমার্গ বর্জ্জন নীতির সম্বন্ধে ২টী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাধু মণ্ডলী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্ত্তনের পর বেলা ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭০০ দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রেঙ্গুনে স্বামিজীর জন্মোৎসব

স্বামিজীর জন্মোৎসব এবার রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটী কর্ত্তৃক বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসব হইয়াছিল, প্রথম দিন প্রাতে বিশেষ পূজা ও কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে ফেণী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রক্ষিত ও স্বামী পুণ্যানন্দ স্বামিজীর জীবনী ও কার্য্যাবলী আলোচনা করেন। উভয় বক্তাই যুবসম্প্রদায়কে স্বামিজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়দিন অপরাহ্নে রাজা রেডিডয়ার হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলার মিঃ উসেট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডাঃ পিকক্, মিসেস্ পটুন, রায় সাহেব পি, এন্, সেন ও মিঃ কে, আর, চারী স্বামিজীর জীবনী ও সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভার বিভিন্নদিক আলোচনা করেন। বেঙ্গল একাডেমির বালিকাগণ সুললিত কণ্ঠে স্বামিজীর বন্দনাগীতি গান করে। তৃতীয় দিবস দরিদ্রনারায়ণের সেবা দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। সার্দ্ধ তিন সহস্র দরিদ্রনারায়ণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করে।

ডিব্রুগড়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে, ডিব্রুগড় মধ্য ইংরাজী স্কুল গৃহে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটী মহিলা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অবসর প্রাপ্ত ই, এ, সি, শ্রীযুক্ত বেনুধর রাজখোয়ার পত্নী শ্রীযুক্তা রত্নকুমারী রাজখোয়া সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুক্তা প্রভা দত্ত ও শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীমতী অমিয়া চক্রবর্ত্তী কবিতা পাঠ এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী (হেডমাষ্টার, গভঃ, হাই স্কুল,) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাভূষণ (অবসর প্রাপ্ত হেড পণ্ডিত, গভঃ হাই স্কুল,) ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীযুক্তা সুধাবাণী রায় মহোদয়া সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত দ্বারা সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সভার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সভা গৃহে বহু সংখ্যক মহিলার উপস্থিতিতে এক সুপবিত্র মাতৃভাবের উদ্দীপনা জন্মিয়া ছিল।

ডিব্রুগড়ে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ টার সময়, স্থানীয় ইণ্ডিয়াক্লাব গৃহে **শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের** জন্মোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বরুয়া, একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কয়েকটি বালিকা সভার প্রারম্ভে, মধ্যে ও শেষে সুমধুর সঙ্গীত করিয়া, সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীমান্ মাখনলাল চক্রবর্ত্তী সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দিত করে এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী হেড্ মাষ্টার গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, কলিকাতার স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ জে, সি, গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সিংহ স্বামিজীর অলৌকিক ও সুপবিত্র জীবন কথা অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিলে, মাননীয় সভাপতি মহোদয় অভিভাষণ প্রদান করেন।

পরিশেষে সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৯ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বালিয়াটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে স্বামী সুন্দরানন্দ ছায়াচিত্র যোগে মৈশামুড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে "বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান" ও "হিন্দুধর্ম্মের ক্রমোন্নতি" সম্বন্ধে, আমতা গ্রামে "হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস" সম্পর্কে, ভাটারা গ্রামে "অস্পৃশ্যতা" এবং "ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার" বিষয়ে এবং স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে—ছাত্রজীবনের অমূল্য সম্পদ "শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের জনসাধারণ তাঁহাকে তিনখানি অভিনন্দন পত্র দান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর ত্রিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে গত রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তাহরণ কুশারী বি-এল, মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। স্বামিজীর জীবন ও উপদেশ ব্যবহারিক-জীবনে কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে স্বামী সুন্দরানন্দজী ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয় ও সমাগত জনমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার মানসে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্বামী বাসুদেবানন্দ মেহেরপুর, নদীয়া সারস্বত সম্মেলন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সেখায় গমন করেন এবং বৈকালে সহরবাসীরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তিনি তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী কি ভাবে ভারত ও ভারতেতর প্রদেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজের যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দেন। সভার পর রাত্রে "পল্লী শ্রী" কার্য্যালয়ে একটি ধর্ম্মালোচনা সভা এবং ধর্ম্ম সংগীত হয়। পরদিন বৈকালে স্কুলের ছাত্রেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দান করেন এবং সারস্বত সম্মেলনানুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ এবং আগামী শিক্ষা-পদ্ধতির কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বিবৃতি দান করেন। অতঃপর ডাঃ গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুরোধে তিনি সেখানে, হিন্দুধর্ম্মের প্রগতি পথে, মহাপুরুষগণের প্রভাব সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের বাটীতে এক আলোচনী সভায় হিন্দুধর্ম্মের অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করেন এবং সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে সঙ্গীতাদি হয়।

সেখান হইতে তিনি কৃষ্ণনগর গমন করিলে ১৩ই জানুয়ারী স্থানীয় রামগোপাল টাউন হলে "বেদান্ত ও বিজ্ঞানের সমন্বয় কোথায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার বসু, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ধীরেন্দ্রনাথ বাগচী, মুনসেফ; কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বেচারাম লাহিড়ী, জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্লীডারগণ এবং অধ্যাপক এস, কে, দাস, পি-এইচ্-ডি, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

পরদিন সন্ধ্যায় তিনি কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শ্রীরামকৃষ্ণ পট উন্মোচন করেন এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে বিংশ শতাব্দীর ডাউন্-ডেসন সিস্টেম, মণ্টিসেরি সিষ্টেম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির ভিতর দিয়া কি-ভাবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আদর্শকে আমাদের সামাজিক জীবনে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ৺আনন্দময়ী দেবীর প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে, 'শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ৺মা ভবতারিণীর সম্বন্ধ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিগত ২রা মার্চ্চ আহিরিটোলা সরস্বতী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে স্যার হরিশংকর পাল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বার-এ্যট্-ল, চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী সমিতির উপযুক্ত বালকগণকে নানা বিষয়ে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বালকগণ তাহাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, ড্রিল ও বাইকের নানাবিধ ক্রীড়ার দ্বারা সমবেত প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তিকে মুগ্ধ করেন। স্বামী বাসুদেবানন্দ সেবা ও স্বাস্থ্যানুশীলনের একটি ক্ষুদ্র আদর্শস্বরূপ এই সমিতি কি ভাবে জাতীয় জাগরণে সাহায্য করিতেছে এবং এইরূপ শত শত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বালক হৃদয়ে কিভাবে শৃঙ্খলা, বশ্যতা ও পরস্পর সহানুভূতি জাগ্রত হইবে তাহা বিবৃত করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সমিতির কার্য্যকারিতার সম্বন্ধে, যথা বিগত ভূমিকম্পে সেবাকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে, প্রশংসা করেন এবং বলেন, "এইরূপ সাধনার দ্বারা জাতীয় জাগরণ ঘটিয়া থাকে। এই এতবড় ইংরাজ জাতির যদি ইতিহাস পাঠ করা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে জাতীয় জাগরণ কি কঠোর ত্যাগ ও তপস্যা সাপেক্ষ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী উড়িষ্যা প্রদেশে যাহাতে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই নিমিত্ত পুরীধামে, কটকে ও বালাসোরে গমন পূর্ব্বক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ঐ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যবিবরণী বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া বিগত ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সকল স্থানেই বিশেষ গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয়গণ উহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন এবং ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। এতদুদ্দেশ্যে কটকে একটি দৃঢ় সমিতিও গঠিত হইয়াছে, বাবু ব্রজসুন্দর দাস, জমিদার, ভূতপূর্ব্ব এম-এল-এ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের আচরিত এবং প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম্ম সাধন ও প্রচারোদ্দেশ্যে এবং নারায়ণ জ্ঞানে মানবের সর্ব্বপ্রকার সেবা করিবার উদ্দেশ্যে বিগত অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া খুরুট কাসুন্দিয়া পল্লীতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আত্ম-লাভোদ্দেশ্যে আশ্রমে প্রত্যহ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পূজা, আরাত্রিক, স্তবপাঠ, মধ্যে মধ্যে রামনাম সংকীর্ত্তন, ভজন, প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, দোলযাত্রা, ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও ভগবান যীশুর উৎসবাদি, গীতা, উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র, কথামৃত, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ পাঠ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা বহু পুস্তক আশ্রমে রহিয়াছে। আশ্রম একটি নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সাধারণতঃ ধোপা, নাপিত, ছুতার, কর্ম্মকার, জেলে, মেথর প্রভৃতি ছেলেদের এই স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। আশ্রম ১৯২২ সন হইতে "বিবেকানন্দ-ইনষ্টিটিউশন" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছে; ও একটি "ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উহা হইতে দুঃস্থ নরনারীকে চাউল, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এখানে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় আছে, ৫০।৬০ রোগী প্রত্যহ ঔষধ নেয়। কর্ম্মিগণ বিহার ভূমিকম্পে সাহায্যার্থ টাকা তুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে প্রেরণ করিয়াছেন, এখানে একটি ব্যায়ামাগার আছে, প্রত্যহ শতাধিক ছেলে সেখানে ব্যায়াম অভ্যাস করে। ঐ ব্যায়ামগৃহে আধুনিক ব্যায়ামের উপকরণ সমুদয় আছে। দুর্গাপূজা, রামনবমী উপলক্ষে আশ্রমে ব্যায়াম কৌশল, ক্রীড়াকৌতুক, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সহৃদয় জনসাধারণের মাসিক ও সাময়িক দানেই এখানকার খরচ নির্ব্বাহ হয়। কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দেহত্যাগে আশ্রম-বাসিগণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। যে মহাপুরুষ দ্বয়ের নামে ও প্রেরণায় এই মঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যেন তাঁহাদের নিয়ত শুভাশীষে আশ্রমটি ত্যাগে, পুণ্যে, সেবায়, ধনে, উপকরণে নিত্যই উন্নতি লাভ করে, "শ্রীরায়াতু, ব্রহ্মচারিণঃ আয়ান্তু"।

পরলোকগত ৺নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মিশন একজন বিশেষ বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী হারাইল। তিনি বহুবর্ষ যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস হোমের এড্ভাইসরি বোর্ডের মেম্বর ছিলেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টাতেই দমদম এ্যারোড্রোমের নিকটবর্ত্তী ৬০ বিঘার অধিক জমি সুলভ মূল্যে গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে কেনা সম্ভব হয়। বীরনগরের উন্নতিকল্পে তাঁহার অকাতরে অর্থদান, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সকলেরই পরিজ্ঞাত। দরিদ্র ও অনাথকে তাঁহার নিঃশব্দ দান বড় কম ছিল না। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পুণ্যশীলা **রাণী রাসমণীর** পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনার্থ বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এলবার্টহলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন :—"আজ আমরা আমাদের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। দেবতার পূজায় যেমন মনে আনন্দের উদয় হয়, পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির স্মৃতি তর্পণেও হৃদয়ে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইতেছে। রাণী রাসমণি আমাদের জাতির জীবনের নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে একজন। দয়া, দাক্ষিণ্য ও করুণা প্রভৃতি যে সব গুণ থাকিলে মানুষ দেবতার পদবীতে উন্নীত হয়, রাণী রাসমণি সেই সমস্ত গুণের আধার ছিলেন। রাণী রাসমণির বিত্তের চেয়ে চিত্তই ছিল বড়। তাঁহার দানশীলতা দেখিলে মনে হয় ধন, বিত্ত যেন পরের জন্যই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল।" সভাপতির বক্তৃতার পরে মিঃ জে, সি, গুপ্ত, প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা করেন। রাণীর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার্থে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত কার্য্যের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা হইবে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট সভা বিচার আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হাইস্কুলসমূহে বাঙ্গলার সাহায্যে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইবে।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথমে বাঙ্গলা সাহিত্যে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যান। স্যার আশুতোষ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা পরে যে শুভফল প্রসব করিতেছে, সে জন্য তিনিই জাতির আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

গত ৭৫ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষার স্থান ছিল অতি নিম্নে। এতদিনে বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে 'জাতে তোলা' হইতেছে, ইহাই সুখের কথা।

তবে রাজা রামমোহন রায় ও মেকলের যুগ হইতে ইংরেজীকে যে উচ্চস্থান দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র কথিত ভাষারূপে প্রচলিত করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষকদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৯৩৯ সন হইতে আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় শিক্ষার বাহন হইবে। বাঙ্গালীমাত্রেই যে ইহাতে আনন্দিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আনন্দের বিশেষ কারণ আছে। জগতে কোন জাতির পরের ভাষায় ধার করা শিক্ষার জোরে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। য়ুরোপেও বহু শতাব্দী যাবৎ ল্যাটিন ও গ্রীকে ব্যুৎপত্তি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এখনও যে ল্যাটিন ও গ্রীকে ব্যুৎপত্তি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে, এমন কথা বলিতেছি না। তবে এখনকার যুগে সকল সভ্য উন্নত দেশই তাহার মাতৃভাষাকে অন্য সকল ভাষার অপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়া থাকে। ইহার ফলে জাতি তাহার

জাতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়, অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে পারে না। (বসুমতী)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদাম হালিদা হানুমের বক্তৃতা—ভাইস্‌-চেন্সলার কর্তৃক আহূত হইয়া মাদাম ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী "তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস" ও "তুরস্কের সাহিত্য" সম্বন্ধে অতীব হৃদয়গ্রাহী দুইটি বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

"আমি আপনাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, আপনাদের দেশে যতই মহাপুরুষ ও মহিয়সী মহিলা থাকুন না কেন, যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই থাকুক না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা জনসাধারণ যাহাতে ভালভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভাবে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির বিধান না করিবেন, ততদিন কিছুই হইবে না। আপনারা যদি জনসাধারণের নিকট গিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার না করেন এবং ভারতবর্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতে তাহাদিগকে শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে আপনারা জাতি গঠনে সমর্থ হইতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক শততম জন্মোৎসব ও মন্দির আরম্ভ—বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজোপলক্ষে প্রায় ৫০০০ সহস্র ভক্ত প্রসাদ পান। সকালে স্বামী বিমুক্তানন্দ কথামৃত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে ভূপেন বাবুর মিলন কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গাচার্য্য ভগবান বাবু ও সঙ্গীতাচার্য্য দানী বাবুর ধ্রুপদ সঙ্গীত হয়। অপরাহ্নে ধর্ম্মসভায় **স্বামী পরমানন্দ মহারাজ** সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অনুকূল সান্যাল, স্বামী ঘনানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, শ্রীমতী উমাশশী দেবী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীপ্রভুর জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। রাত্রে স্বামী বাসুদেবানন্দ "ভারতীয় ধর্ম্মের সমন্বয়" সম্বন্ধে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যে বিরাট প্রস্তর মন্দিরের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছিল, তাঁহার শুভেচ্ছায় তাঁহার মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারই মঙ্গলাশীষে মন্দিরটি সুসম্পন্ন হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থণীয়। ইহাতে সকল ভক্তগণের সহানুভূতিও বিশেষভাবে আবশ্যক। মন্দিরের কার্য্যে উপদেশ দান করিবার মানসে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব পরিচালন নিমিত্ত মঠ ও মিশনের সহসভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম

অযোধ্যাপতি দশরথ, রামচন্দ্রের বনবাস জনিত শোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় নন্দীগ্রাম হইতে আনয়ন করা হইল। ভরত অযোধ্যায় আগমন করিয়া রামচন্দ্রের বনবাস কারণ ও দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন; এবং তাঁহার মাতাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কারণ জানিয়া তাঁহার রাক্ষসী আচরণের জন্য বহু নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনা করিলেন। অনন্তর দশদিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া পরদিবস ঋত্বিকগণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকারী অমাত্যবর্গ মিলিত হইয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্য শুভ আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গল বাদ্য সকল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সেই আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি শ্রবণে ভরত জাগরিত হইয়া অমাত্যগণকে বলিলেন :—

"ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সন্নিবর্ত্ত্য চ।
নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ॥
পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ।
বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ॥
তস্যৈষা ধর্ম্মরাজস্য ধর্ম্মমূলা মহাত্মনঃ।
পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে।
যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনম্।
অনয়া ধর্ম্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্॥
(অযোধ্যাকাণ্ড—একাশীতিতম সর্গঃ, ৪-৭)

তখন ভরত জাগরিত হইয়া "আমি রাজা নহি" বলিয়া সেই শব্দ নিবারণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে বলিলেন, "শত্রুঘ্ন, দেখ, কৈকেয়ী লোকের কি মহৎ অপকার করিয়াছে। রাজা দশরথ সমস্ত দুঃখভার আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ধার্ম্মিক প্রবর মহাত্মা দশরথের ধর্ম্মলব্ধ রাজশ্রী জল মধ্যে নাবিকবিহীন নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। আমাদিগকে যিনি সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতেন, সেই রঘুনন্দন রামকে, আমার জননী, ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন।"

অনন্তর ভরত বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে পুরোহিত বশিষ্ঠকে বলিলেন, "যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্যক কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুধ্যানে রত আছেন, আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে কেমন করিয়া পরের রাজ্য হরণ করিবে? এ রাজ্য রামের এবং আমিও তাঁহার অধীন। যদি আমি আর্য্য রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তবে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনে বাস করিব। আমি পূর্ব্বেই পথ নির্ম্মাণদক্ষদিগকে পথ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছি। এক্ষণে আমার তথায় যাওয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। সুমন্ত্র! তুমি সকলকে আমার গমন বার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে সজ্জিত কর।"

অনন্তর রামানয়নরূপ উৎসবে গমনোৎসুকা যোধাঙ্গনারা স্ব স্ব গৃহে স্বামীদিগকে হর্ষসহকারে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা সচেষ্ট হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও অশ্ব সকল সজ্জিত করিলেন।

"ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্যবৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অযূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চ কুলপ্রসূতান্॥"
(অযোধ্যাকাণ্ড দ্ব্যশীতিতম সর্গঃ, ৩২)

ভরত প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামদর্শনাভিলাষে সত্বর প্রস্থান করিলেন। পুরোহিত ও অমাত্যবর্গ সূর্য্য তুল্য প্রভাশালী রথ সমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নব সহস্র হস্তী সেই ইক্ষ্বাকু কুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। ধনু ও বিবিধ অস্ত্র সম্পন্ন ষষ্টি সহস্র রথী ও একলক্ষ অশ্বারোহীও সেই রাজকুমার ভরতের পশ্চাদ্‌গমন করিল। যশস্বিনী-কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাদেবী ইঁহারাও রামকে আনিবার জন্য প্রীত হইয়া দীপ্তিশালী রথে যাইতে লাগিলেন। আর্য্যগণও রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিবার ইচ্ছায় নানা বাক্যালাপকরতঃ হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।

নগরীস্থ প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ সমস্ত বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও রাজানুগত প্রজারা রাম উদ্দেশে সানন্দে যাইতে লাগিল। মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ী, ক্রকচ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, মুক্তাদিবেধক, কূপ্যাদি কারক, দন্ত ব্যবসায়ী, সুধাকর, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবন কারক, কৈবর্ত্ত ও গ্রামবাসী প্রধান প্রধান নটগণ নারীদিগের সহিত যাইতে লাগিল। পরে ভরত প্রভৃতি সকলে বহুদূর গমন করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গানদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে বীর্য্যশালী রামসখা গুহক জ্ঞাতিগণসহ বাস করিতেছিলেন। ভরতের অনুগামী সৈন্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল। ভরত অমাত্যগণকে বলিলেন, "অদ্য আমরা এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া কল্য গঙ্গানদী পার হইব। তোমরা সৈন্যদিগকে তাহাদের স্বস্ব ইচ্ছানুসারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমার স্বর্গগত পিতা দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তর্পণ করিতে ইচ্ছা করি"। ভরত সেইরূপ বলিলে, অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া সৈন্যদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে পৃথক পৃথক সন্নিবেশিত করিলেন। ভরত গঙ্গাতীরে ভূষণাদি বিভূষিত চতুরঙ্গসেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করতঃ তথায় বাস করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দেব পবিকল্পিত বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবেব মন্দিব
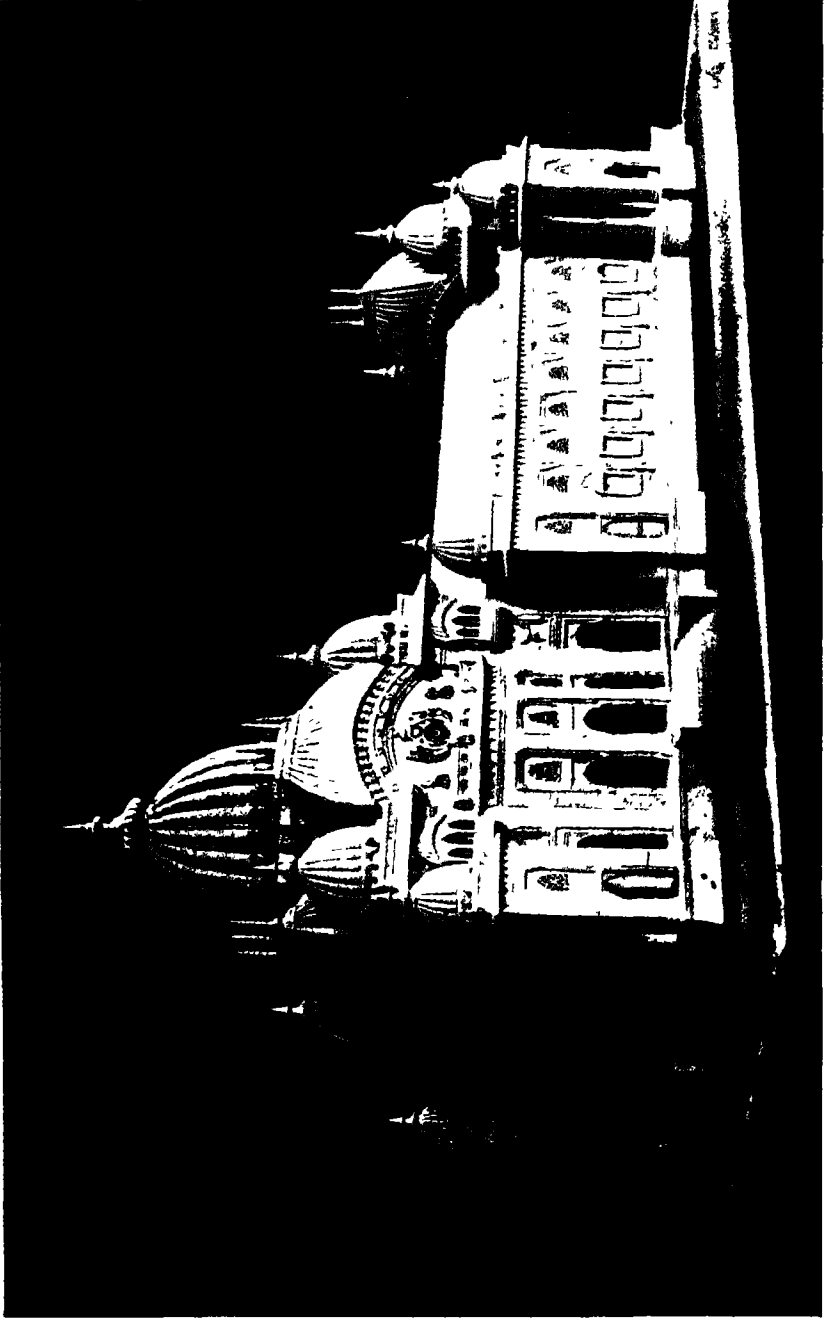
(এই মন্দিবেব নিম্মাণকার্য্য আবম্ভ হইয়াছে)

বৈশাখ—১৩৪২

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের উপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়—তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন—পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠ্‌তে পার্‌বে। তাঁর জীবন উপদেশ, চারিদিকে প্রচার করতে হবে—যেন হিন্দু সমাজের সর্ব্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে?—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা গ্রহণ করে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্য্যভোগ, এমন কি, ইহলোক পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগুবে?

—বিবেকানন্দ

বুদ্ধ-উৎসব

আজো যেন দেখা যায় ধ্যানমগ্ন বোধিতরুতলে
প্রবুদ্ধ মানব মূর্ত্তি,—শান্ত যার চক্ষে আজো জ্ব'লে
যুগযুগযুগান্তের সাধনার প্রদীপ্ত অনল—
আজো ঝরে—ত্যাগ প্রেম করুণার স্নিগ্ধ শান্তিজল।

আজো আসে আকাশেরে উদ্ভাসিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা—
ধরায় ঝরিয়া পড়ে আলোকের শান্ত মধুরিমা।
মনে পড়ে স্বপ্ন সম বহুযুগ বিস্মৃত কাহিনী—
মনে পড়ে সেই বুদ্ধ, সেই সংঘ, সে ভিক্ষুবাহিনী!

আজো যেন দেখা যায়—শরবিদ্ধ হংস বলাকার
রক্তাক্ত শরীর বক্ষে—কাঁদিতেছে সিদ্ধার্থ কুমার!
জরা ব্যাধি মৃত্যু ওই—পথিপার্শ্বে—রাজার তনয়
ভাবিছে আকুল প্রাণে—'কেন এত দুঃখ কষ্ট ভয়?'

ওই আলো দেখা যায়—ওই চলে পাগলের প্রায়
পিছনে ফেলিয়া সব—রাজা রাজ্য গোপার মায়ায়—
ছিঁড়িয়া চলিল বীর—জীবনের আলোর সন্ধানে।
অতৃপ্য পিপাসা তার আজন্ম যে কাতর পরাণে।

* * *

মিটিল না সে পিপাসা! সব বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়!
শাস্ত্রের অরণ্যে হায়, তথাগত ভ্রমিল বৃথায়।

* * *

মহাবোধিতরুতলে বসে বীর মহাযোগাসনে—
'কেন দুঃখ? কেন জ্বালা? কেন ভয় জীবনে মরণে?'
এই এক প্রশ্ন জ্বলে। চাই তার চাই সমাধান—
চাই সে সমাধি বোধি—চাই শেষ—শান্তি ও নির্বাণ।
'এ আসনে এ শরীর যায় যদি শুকাইয়া যাক্'!
অটল অচল দেহ। সারা মন নির্ভয় নির্বাক্।
সিদ্ধার্থ কি ব্যর্থ হবে? তথাগত রবে অনাগত?
জ্বলিবে কি এ পৃথিবী চিরদিন নরকাগ্নি মতো?
জাগো জাগো ওগো বীর। জাগো বুদ্ধ। জাগো ভগবান!
আরো কতোকাল রবে এ পৃথিবী স্বার্থের শ্মশান?
আর বার এসো তুমি ল'য়ে সেই শান্ত দীপ্ত মুখ।
তোমার অপূর্ব্ব মন্ত্রে তোলো ভরি পৃথিবীর বুক!
তোমার ত্যাগের মন্ত্রে সেই তব গৈরিকপ্রভায়
স্পন্দিত ছন্দিত কর বর্ত্তমান পৃথিবী সত্তায়!—
—স্বার্থ যেথা মূলমন্ত্র, ঘৃণা আর হিংসা অত্যাচার
অহম্-পূজার যার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র শ্রেষ্ঠ উপচার—
তুমি সেথা ল'য়ে এসো ত্যাগ প্রেম করুণার ধারা
তোমার জীবনছন্দে আর বার কর আত্মহারা!
ল'য়ে এসো সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, পিপাসা মহান্
সেই প্রেমকরুণার অহিংসার মহাসাম্যগান!

* * *

আজ তুমি একবার জাগাও সে মহাসংঘ তব।
সন্ন্যাসীর গৈরিক আগুন—সারা বিশ্বে নব নব
ছড়াক্ যুগের বার্ত্তা। প্রান্ত হতে প্রান্তে চলে যাক্।
স্বার্থের এ কোলাহল ত্যাগ ছন্দে ডুবাক্ ডুবাক্!

শুধু নহে এশিয়ায়—এবারের তব অভিযান
পৃথিবীর প্রতিদেশে। মেরু হতে মেরু ছোটে প্রাণ!

* * *

তুমি বুঝি এলে পুনঃ উদ্ভাসিয়া যুগের প্রভাত
মূর্ত্ত-আত্মা ভারতের। জাগাইয়া আদর্শ সংঘাত
আদর্শ বিহীন বিশ্বে—দিয়া গেলে যুগের আলোক!
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই তব প্রেমভরা চোখ—
সেই তব করুণার প্রস্রবণ মুক্ত প্রবাহিত
সেই তব তীব্র ত্যাগ সেই চিত্ত নিত্য সমাহিত।
সেই সারা বিশ্বব্যাপী সন্ন্যাসীর সংঘ জাগে আজ—
ছড়াইতে যুগবার্ত্তা—ভোগদগ্ধ মানবের মাঝ।

* * *

তোমারে পেয়েছে ফিরে—ওগো বুদ্ধ! প্রবুদ্ধ ভারত।
তাইত স্বপনে জাগে—সে অতীত! জাগে ভবিষ্যৎ
আরও উজ্জ্বলতর,—সে মহান্ দীপ্ত উজ্জ্বলতা
দিক্ আজ ম্লান করে অতীতের যত কিছু কথা!

তুমি দেখ ওগো বুদ্ধ, ভারতের ওগো ভগবান্—
তোমারি ভারত জাগে—বুকে তার বিশ্বজয়-গান!
তুমি আজ ভরে তোলো তার সারা অন্তর বাহির
ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে, ওগো ত্যাগী ধ্যানী প্রেমী বীর। *

শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

* মহাবোধি, সোসাইটি হলে—বিবেকানন্দ সোসাইটির বুদ্ধ-উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত।

মহাপুরুষ মহারাজের কয়েকটী স্মৃতি-কথা

বিগত ১৩৪০ সনের ৮ই ফাল্গুন বেলা ৫—৩৫ মিনিটে আমাদের পরম আরাধ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা—তাঁর ভক্ত শিষ্যেরা একাধারে পিতৃ-মাতৃহীন হলাম। মহাপুরুষ মহারাজের অপার করুণা, অহেতুকী ভালবাসার কথা প্রকাশ করিব কোন্ ভাষায়। আজ একে একে কত কথাই মনে পড়িতেছে—সেই আমার প্রথম দীক্ষার দিন, মহাপুরুষ মহারাজ আমায় ঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে, ঠাকুর ঘর থেকে সামনের দালানে বেরিয়ে এসে আমার মাকে বল্লেন—"দিলুম তোমার মেয়েকে ঠাকুরের চরণে ফেলে।" আমায় বল্লেন "বিয়ে করিস্ নি, কুমারী জীবন যাপন কর্। কি হবে বিয়ে করে। মিথ্যা মায়ায় জড়িয়ে পড়বি। ঠাকুরই তোর স্বামী, পিতা, পুত্র। তাঁকেই তোর সব বলে জানবি। যা মন্ত্র দিলুম রোজ জপ করবি, ঠাকুরকে ধ্যান করবি ব্যস্ তাহলেই হবে। কোন ভয় নেই, তোর জগৎ পিতা, জগৎ পুত্র।" কতবার মঠে গেছি। তিনি গঙ্গার ধারের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন। কত উপদেশবাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছি। তিনি বল্‌তেন—"তোর বহু ভাগ্য নইলে তুই ঠাকুরের কৃপা পাস্। ঠাকুরের ভক্তদের কৃপা পাস্! কজনের ভাগ্যে হয় যে ঠাকুরের ভক্তদের সঙ্গে বসে কথা কয়?" কত যত্নই না তিনি করতেন! একবার তাঁকে গিয়ে বল্লুম—মহারাজ, আমি রোজ হাজার হাজার জপ করতে পারি না। তিনি বল্লেন—"নাইবা হাজার হাজার জপ করতে পারলি? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবি, খুব করে প্রার্থনা করবি। বল্‌বি, ঠাকুর আমায় তোমার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা দাও। জপ করলেই কি হয় রে? তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেই সব হয়। প্রার্থনা কর্, প্রার্থনা কর্। রাতদিন প্রার্থনা করবি।" যখনি তাঁর কাছে গেছি তিনি বলেছেন "বিবাহ করিস নি।" যদি কোন বারে মা বলেছেন, সকলে বল্‌ছে বিয়ে দিতে। তখনি তিনি জোর করে বলেছেন,—"না বিয়ে দেবে না। লোকের স্বভাবই ওই। এবার বল্লে বলবে যে আমার নিষেধ।" আমায় বলতেন "লোকের কথায় কাণ দিস্‌নি, যেমন পূজা পাঠ করে যাচ্ছিস্ তেম্‌নি করে যাবি। মার কথা শুনিস্। তোর কোন ভয় নেই। ঠাকুর তোকে রক্ষা করবেন। ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছিস তুই, মানুষ তোকে কি রক্ষা করবে? আমি আছি তোর ভয় কি?"

একবার সূর্য্যগ্রহণে মঠে গেছি, গঙ্গাস্নান করতে আর মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করতে। মহারাজ আমাদের জন্যে কত ব্যস্ত হলেন। বল্লেন—"সমস্ত দিন উপোস করে আছিস্?" আমি বল্লাম, হাঁ মহারাজ। মহারাজ বল্লেন "কেন চা খেলি না? চা ত খাওয়ার মধ্যে নয়, তাতে কোন দোষ হত না।" তিনি আমাদের চা ও ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ালেন। আসবার সময় একজন মহারাজকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। বল্লেন—"আজ বড্ড ভিড় অনেকগুলি ছেলে পিলে নিয়ে এরা এসেছে, এদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস। কত কথা বলবো। দুই, একদিনের সম্বন্ধ ত নয়, ছোট্ট বেলা থেকেই মঠে যাই, বার বছর বয়সে তিনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন, আর সেই তখন থেকে তাঁর কৃপা, ভালবাসা, আদর পেয়ে আসছি।

একবার কি একটা ছুটির বারে মঠে গেছি। খুব ভিড় হয়েছে, অনেক ভক্ত শিষ্য মঠে গেছেন। সকলেই মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করবার জন্ত ব্যাকুল। কিন্তু সাধু মহারাজরা কাউকে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছেন না। কারণ সেদিন তিনি একটু অসুস্থ ছিলেন, কথা কইলে কষ্ট হবে। তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, মনটায় কেমন ক্ষুণ্ণ ক্ষুণ্ণ ভাব। মহারাজকে দর্শন করবো বলেই আসা, আর দেখা হল না। আমরা ত আর তাঁর সঙ্গে কথা কইতুম না, শুধু একটীবার প্রণাম করে চলে আসতুম। এই রকম মনে মনে ভাবছি এমন সময় মহারাজ বাথরুম থেকে ফিরে এলেন। দরজার পর্দ্দাটা সরান ছিল। মহারাজ আমায় দেখতে পেয়েই ডাক্‌লেন—"আয়, আয় কেমন আছিস? মা ভাল আছে ত? কার সঙ্গে এলি?" আমি বল্লুম, মার সঙ্গে এসেছি। ঐ যে মা! মা পূজনীয় খোকা মহারাজের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তিনিও এসে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করলেন। মহারাজ মার সঙ্গে অনেক কথা বল্‌লেন। আমাদের বল্লেন প্রসাদ খেয়ে যেতে। পূঃ কি— মহারাজ তখন তাঁর সেবা করতেন, তাঁকে ডেকে বল্লেন "এরা প্রসাদ পাবে বোলে এস।" সেই সময় মহারাজের খাবার নিয়ে একজন এলেন। আমরা নীচে নেমে আসছিলুম। মহারাজ বল্‌লেন "দাঁড়া আমারও একটু প্রসাদ নিয়ে যা। অনেক বেলা হয়ে গেছে।" পায়সের বাটী থেকে একটুখানি পায়স তুলে নিয়ে নিজে মুখে দিয়ে আমাদের দিলেন। আবার বল্লেন যাও খাওগে অনেক বেলা হয়ে গেছে। পূর্ব্বেকার সে ক্ষুণ্ণ ভাব কোথায় চলে গেল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে এলাম।

বছরখানেক আগে একবার তাঁর চরণ-বন্দনা করতে মঠে গিয়েছি। তখন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ। মহারাজ খাটের উপর বসে আছেন। তাঁর চরণে যেমনি মাথা দিয়ে প্রণাম করেছি, মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন,—"কেমন আছিস?" বললুম ভাল আছি। স্বামী গ— সেইখানে দাঁড়িয়েছিলেন। মহারাজ তাঁকে বল্‌লেন,—"চিনতে পারছ একে?" আমার বাবার নাম করে বল্লেন "অমুকের মেয়ে?" পূজনীয় গ— মহারাজ অল্প হেসে বল্লেন, "একে আর চিনিনা, কত ছোট বেলা থেকে দেখছি?" মহাপুরুষ মহারাজ বল্‌লেন, "দেখ, ঠিক সেই রকমটীই আছে। যেমন দীক্ষা দিয়েছিলুম ঠিক সেই রকম। কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। মাকে জিজ্ঞেস করলেন,—"কত বয়স হোল?" মা বল্লেন—বাইশে পড়েছে। তিনি বল্লেন,—"ব্যস্ আর কোন ভয় নেই। সব কেটে গেছে। কোন ভয় নেই। আমি আছি, আমি আছি। তোর মা আছে। তা ছাড়া আমি আছি, তোর কোন ভয় নেই। সমস্ত কথাগুলোর উপর এমন জোর দিয়ে তিনি বলছিলেন যে ঘরের প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটী বাণী যেন তাঁর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ কথা বলা। তার পরও মঠে গিয়েছি কিন্তু তাঁর পক্ষাঘাতে কথা বন্ধ হয়ে গেছলো বলে তিনি কথা কইতে পারতেন না। আমরা শুধু তাঁকে প্রণাম করেই চলে আসতাম। তবুও তিনি ইসারা করে আমাদের কুশল প্রশ্ন করতেন, আশীর্ব্বাদ করতেন। রোগে তাঁকে কখনও কাতর হতে দেখিনি। যখনি মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছি, মহারাজ কেমন আছেন, আপনার অসুখ করেছে? মহারাজ তাঁর বুকে হাত দিয়ে বলতেন,—"আমি ভাল আছি। আমার ভেতরটা ভাল আছে। তবে এই দেহটার একটু অসুখ করেছে।" আশ্চর্য্য তাঁর ইচ্ছা শক্তি দেখেছি। একবার আমার Facial paralysis হয়েছিল। ডাক্তাররা বল্লেন তিন

মাস লাগবে সারতে। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ একবার আমার মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "যা সব সেরে যাবে।" আশ্চর্য্য একমাসের মধ্যেই আমার মুখ ভাল হয়ে গেল। ডাক্তাররা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা সকলেই স্বীকার করলেন যে তাঁদের ঔষধের দ্বারা সারে নি। এ ভগবৎ ইচ্ছা ব্যতীত হতে পারে না। এ মহাপুরুষ মহারাজের অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তিরই ফল। মহারাজ বলেছেন, "আমি আছি, তোর—কোন ভয় নেই।" তাঁর বাক্য ত মিথ্যা হবার নয়। তিনি আছেন, আমাদের ছাড়িয়া যাননি এই বিশ্বাস যেন আমাদের থাকে এই প্রার্থনা তাঁর কাছে। মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে সবিশেষ লিখিবার শক্তি আমার নাই। মাত্র তাঁর কয়েকটী অমৃতময় বাণী একত্রে গাঁথিয়া এই ক্ষুদ্র বাক্য-মালাটী তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণকে উপহার দিলাম। তাঁর কৃপা, তাঁর আশীর্ব্বাণী আমি প্রাণ-ভরে পেয়েছি। মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণে প্রার্থনা তিনি আমায় শক্তি দিন—তাঁর আদেশ পালন করতে।

—জনৈকা শিষ্যা

ফুলের ভাষা

প্রভাত-সমীরণে আন্দোলিত অরুণরাগরঞ্জিত ঐ যে কুসুম বনভূমি আলোকিত করে মৃদু মৃদু হাস্‌চে, ওর ঐ হাসির মানে বুঝ কি? এমনি করে' কত ফুল হেসেচে, কত কথা কয়েচে;—আমরা কিছুই লক্ষ্য করিনি, আর কোন কথাই শুনিনি।

আমাদের মন যে বাহিরের দিকে,—কোলাহলে ডুবে আছে।

মনটাকে একটুখানি ভিতরের দিকে টেনে নিতে পার্‌লে ফুলের ভাষা শুন্‌তে পাওয়া যায়; শুধু ফুলের ভাষা কেন,—চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ বাতাস-অনেকের ভাষাই শোনা যায়, আর বোঝাও যায়।

মনটাকে ভিতরের দিকে টান্‌তে হবে কেন?—কারণ, প্রকৃতির ভাষা যে অনেক সময় নীরব, আর প্রায় সব সময়ই ইঙ্গিতপূর্ণ।

ফুল কি বল্‌চে জান?—ফুল বল্‌চে, 'আমি সুন্দর, আমার মত সুন্দর আর কি আছে! কিন্তু আমার এই অনুপম সৌন্দর্য্যের উৎস কোথায় জান? আমার এই সৌন্দর্য্যেই তোমরা এত মুগ্ধ? বিন্দুকে দেখে সিন্ধু মনে করচ? সত্যই যদি সৌন্দর্য্য সিন্ধু দেখতে পাও, তা হলে আমাদের অবস্থা কি হবে!—আমাকে বা আমার মত আর কাকেও তখন আর চাইবে না—ক্ষণেকের জন্যও আমাদের পানে ফিরে তাকাবে না। সত্য সত্য বল্‌চি সৌন্দর্য্যসিন্ধু আছেন, আর আমি তাঁরই বিন্দু, তাঁ' থেকে আমার উদ্ভব হয়েচে। আমার কথা বিশ্বাস কর, আর তাঁর সন্ধানে বাহির হও, সকল সৌন্দর্য্য-পিপাসার নিবৃত্তি হবে সেইখানে।

'আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমাদেরে তাঁর কথা বল্‌বার জন্যই ত আমি অফুরন্ত হাসি নিয়ে নিশিদিন বসে আছি।

আমি এত হাসি কেন, জান? তোমরা

আমার মধুর নির্ম্মল হাসিটী দেখে আমার কাছে আসবে, আর আমি যে কথা বলবার জন্য বসে আছি তা' তোমাদেরে বলবার চেষ্টা করব— শুধু এই জন্যেই আমি হাসি না। আমি হাসি—আনন্দে—নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দে। এ আনন্দ আমার জন্মগত অধিকার। যে সুন্দর—যার ভিতর বাহির সবই সুন্দর, সেই এই দুর্লভ আনন্দের অধিকারী। কেন না, অনন্ত সৌন্দর্য্য সিন্ধুর প্রতিজলকণার প্রতি পরমাণু আনন্দময়। সৌন্দর্য্যসিন্ধুকে আনন্দসিন্ধু বলা যায়, বলা যায়ই বা কেন,—সৌন্দর্য্যসিন্ধুই আনন্দ সিন্ধু।

'আমার সংক্ষিপ্ত জীবনের একটা মর্ম্মান্তিক কাহিনী আছে। বলি,—শুন। আমার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য আর অনুপম আনন্দ— প্রভাতকিরণের কোমলস্পর্শে ফুটে উঠেছে, সন্ধ্যার নিঃশ্বাসে মলিন হবে, আর নিশার শেষে নিঃশেষ হবে। হয়ত দু'একটা দিন থাকৃতে পারি কিন্তু আর বেশী দিন নয়। আমার সেই শেষের দিনে আমার মৃত্যুমলিন মুখের দিকে একবারও কি তাকাবে—একটা পলকপাতও কি করবে? আর ঐ ঝরা পাপ্‌ড়িগুলোর দুরবস্থা দেখে এক বিন্দু অশ্রুপাত করবে কি? আজ আমায় ভাল বাসচ, কত প্রশংসা করচ, আমার পাপ্‌ড়িগুলির বর্ণে আর গন্ধে আনন্দ পাচ্চ আর হাসচ, কিন্তু, সেই শেষের দিনে কি করবে?—নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় দারুণ অনাদরের একটা কটাক্ষপাত করবে মাত্র।—নয়? আর কি করবে?

'তোমারই বা দোষ দিই কেন?—ইহাই ত জগতের নিয়ম। আজ যে আদৃত ঐশ্বর্য্যের জন্য, কাল সে অনাদৃত অনৈশ্বর্য্যের জন্য। পরিবর্ত্তনশীল জগতে—মায়ামোহের রাজ্যে ইহা অপেক্ষা আর কিছু আশা করা যায় না।

'আমার কথা সব শুনলে—বুঝলে ত? আমার কথা মোটের উপর এই। অনন্ত সৌন্দর্য্য সিন্ধু আনন্দময় বিশ্বদেবতা কৃপা করিয়া তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্র দিয়া আমায় এমন অপূর্ব্ব সুন্দর করেছেন। তিনি আমারই ভিতর দিয়া তাঁর অসীম সৌন্দর্য্যের আভাস দিচ্চেন,—আমি তাঁর প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। এই সৌন্দর্য্যের জন্য আমার কিছুমাত্র গর্ব্ব নাই; তোমরাও গর্ব্ব করো না, সৌন্দর্য্যের জন্য— ঐশ্বর্য্যের জন্য। আর গর্ব্ব যদি কর, কদিনের জন্য করবে? আমার অস্তিত্ব যেমন ক্ষণস্থায়ী, তোমাদেরও তাই, কারণ এই মায়ার রাজ্যে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়—মায়ার সকলই যে পরিবর্ত্তনশীল। এইত আমি এমন সুন্দর, আমারও কত দুরবস্থা হবে, অতএব বুঝ,— সুন্দর অসুন্দর, মহৎ তুচ্ছ, উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন—কাহারও নিষ্কৃতি নাই। কারণ, কাল নিরপেক্ষ, নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

'আমার সকল কথা বললাম; আমার জীবনের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত করলাম, শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্য। যদি আমার কথা মেনে চল, তা হলে বুঝবো—তুমি আমাকে চিনেছ, আমায় ভালবাস—সত্যই ভালবাস। নচেৎ বুঝবো—তুমি আমাকে তোমার জঘন্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণ করে আমায় লাঞ্ছিত করতে চাও।

—শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

শ্রীম—*

(স্মৃতি কথা)

শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী সাহিত্যবিশারদ-
অধ্যক্ষ সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, শ্রীহট্ট

সে প্রথমবারের কথা। তখন পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুধু নাম শুনিয়াছি! 'এখনও তারে চোখে দেখি নাই বাঁশী শুনেছি।' চোখে না দেখিয়া বাঁশীর টানের মত—ততটা না হউক, মাষ্টার মহাশয়ের গুটী কয় কথা আর তাঁর নাম শুনিয়া আমার প্রাণেও কি জানি কেন বেশ একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে।

আমার এক বন্ধু (Friend নহে) ত্যাগের অনুরাগে যৌবন আরম্ভেই ছুটিয়া গিয়াছেন—সন্ন্যাস করিবেন। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচয় তার ছিল। তিনি প্রায়ই কিছুটা সময় কাছে রাখিয়া তাকে আপ্যায়িত করিতেন। এই বন্ধুর খবরে মাষ্টার মহাশয়ের ভিতরের খবর আরও জানিলাম। আকর্ষণ বাড়িয়াই গেল। তারপর তাঁর কাছে আরেক বন্ধু গেলেন। খাঁটি বন্ধু নহেন—কতকটা ফ্রেণ্ড রকমের। মাষ্টার মহাশয়ের কাছে দিন কয়েক রহিলেন। তিনি বৈষ্ণব ভক্ত। রোজ সকালে স্নানান্তে গীতা পাঠ করেন। মাষ্টার মহাশয় মুগ্ধ হইলেন। সে আমার বাড়ীর কাছের বন্ধু। দিন কয় পত্রাদি বাড়ীতে না দেওয়ায় তাহার আত্মীয়-পরিজন উতলা হইলে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পত্র দিয়া খোঁজ নিলাম। তিনি লিখিলেন, লোকটী বড় সরল। পাছে কোন বিপদে পড়েন এই ভয়—বাড়ী রোওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন কিনা জানাইবেন।

আমি জানি বন্ধুটী বাহিরে যত হাবা-গোবা ভিতরে তার অনেকটা বিপরীত। তাই মাষ্টার মহাশয়ের সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ হইলাম, হাসিলাম। তারপর সেই আমার কতিপয় বন্ধুসহ নারায়ণগঞ্জ দেওভোগ শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়ের বাড়ী হইয়া প্রথম কলিকাতায় যাত্রা। মাষ্টার মহাশয়কে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি হইল। দেওভোগের কতিপয় ভক্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত নাগমহাশয়ের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন বলায় একটু গম্ভীর থাকিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, কালে আরও কত কিছু হইবে। এঁরা বোধ হয় মনে করেন, নাগমহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের 'একজন' একথা স্বীকার করিলে তাঁকে খাটো করা হয়। তারপর নাগমহাশয় যে কি এবং কত বড় এসব অনেক কথা বলিলেন।

সে বহুদিনের কথা। তাই সব কথা মনে না থাকিলেও একটী কথা বেশ মনে আছে। পূর্ণাদর্শ ঠাকুরের গৃহী ভক্তের এমন আদর্শ বড় একটা দেখা যায় না।

আমার একটী ভাইয়ের সাথে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন মানসে কলিকাতায় গিয়াছি। সন্ধ্যায় ট্রেণ হইতে শিয়ালদহ নামিয়া বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের

* পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীমৎ শিবানন্দ মহারাজের আদেশ মত লিখিত।

দিকে সন্ধ্যার আঁধারে রাস্তার আলোয় ছুটিয়াছি। সে প্রায় তিন বৎসর পর। ফুটপাথ বাহিয়া শ্যামবাজারের মোড় ফিরিতেই বিপরীতদিক হইতে আগত একটী ভদ্রলোক "এই যে" বলিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিলেন। চাহিয়া দেখিলাম, মাষ্টার-মহাশয়, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমি অবাক হইলাম। একবারমাত্র দেখিয়াছিলাম, সেও দীর্ঘকাল পূর্ব্বে। আর এই সন্ধ্যার আঁধারে। আমাদের কলিকাতা আসা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ভিড়ের মাঝে কি করিয়া চিনিয়া লইলেন জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই সস্নেহ হাসিতে মুখ ভরিয়া লইয়া বলিলেন, "চেনা লোক কি অচেনা হয়? যান্, মাকে প্রণাম করে Morton Institution-এ চলে আসবেন। মনে থাক্‌বে ত? 50, Amherst Street, উদ্বোধনে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী জুটেছেন, সেখানে থাকবার নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে, চলে আসবেন।" 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলিলেন, "থাকার স্থান ঠিক আছে ত? কোথায় থাকা হবে?" মাষ্টার-মহাশয়ের কথা বলায় বলিলেন, "তা বেশ।"

প্রথমবারের একটী কথা এখানেই বলিতে হইল। ভক্ত কবি স্বর্গীয় বৃন্দাবন গোপের কথা অনেকটা হইল। প্রথমবারে এই বন্ধুটীও আমাদের সাথী ছিলেন, আর মাষ্টার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয় তাঁর অকাল মৃত্যুর কথায় কহিলেন, "অকাল বলে কিছু নেই। যার কাজ সারা হয়ে যাচ্ছে আর মা অমনি কোলে টেনে নিচ্ছেন। দুঃখ করবার কিছু নেই।" ইত্যাদি।

তারপরের কথা। যতবার গিয়াছি ততবারই বলিয়াছেন, "—কে কেন নিয়ে আসলেন না। আহা সে কি লোক, আর কি গানই না গায়! মায়ের গান এক শুনেছি ঠাকুরের মুখে আর শুনলুম তার মুখে।"

আমার বন্ধুটী ত ধন্যই। আমি তার বন্ধু, সুতরাং নিজেকেও ধন্য মনে করিতে লাগিলাম। তাহার পরের বার এই মায়ের গানের বন্ধুটীকেই নিয়া গেলাম। মাকে প্রণাম করিয়া সেই রাত্রেই আমরা দুইজন আরও পাঁচ সাতজন ভক্ত-বন্ধুসহ মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দারোয়ান বলিল, এখন দেখা হবে না। তেতলায় জপ-ধ্যানে আছেন। আমরা হাসিয়া বলিলাম, "আমাদের দেখা হবেই। তুমি পথ ছাড়।" কি জানি কি মনে করিয়া, হয় ত বা মাষ্টার মহাশয়ের আপন লোক মনে করিয়াই নিরাপত্তিতে পথ ছাড়িয়া দিল। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে নিরাপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। দরজার ফাঁকে দেখিলাম, কুঠুরীটি অন্ধকার নহে, মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছে। দরজায় ঘা দিলাম, জোরে—আরো জোরে। আর বলিতে লাগিলাম, "মাষ্টার-মশাই দোর খুলুন।" দরজার ঝন ঝন্ শব্দ বা অনবরত ডাক মিনিট কয় ব্যর্থই হইল—কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমরাও বে-পরোয়া না-ছোড়বান্দা। অবশেষে একটু কাসির শব্দ ও জিজ্ঞাসা আসিল, "কে?" আমরা বলিলাম, "আগে দোর খুলুন, তারপর দেখবেন কে কে।" একটু পরে দরজা খুলিল। সেই মিটি মিটি আলোর প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে পা সরাইয়া নিয়া কপালের উপর হাত ঢাকা দিয়া—ভাল করিয়া দেখিবার জন্যই বোধ হয়, প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন আর বলিতেছেন, "খুবই যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।" আমরা আলোটী উজ্জ্বল করিয়া দিলাম। তখন তাঁর আনন্দ কে দেখে! সেই গায়ক বন্ধুটীকে আগাইয়া দিয়া আমি বলিলাম, "এই নেন তাকে, যাকে ছেড়ে এসে বারবার কৈফিয়ত দিতে হয়েছে।" "বেশ বেশ" বলিয়া

গায়ক বন্ধুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এখন একটা মায়ের গান হউক।" আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম, ধ্যান-যোগ হইতে অকস্মাৎ টানিয়া আনায় তাঁহার মনটা তখন যেন জড় ও অজড় রাজ্যের দুটানায় দোল খাইতেছিল। এখন গান আরম্ভ হইলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া চুপ করিয়া শুনিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন, 'কি গান! ঠাকুর যদি এটী শুনতেন, অমনি সমাধিস্থ হয়ে যেতেন।" আমরা কেউ কেউ মনে মনে হাসিলাম, ততটা না হউক, তোমারই বা কি কম!

এবার দর্শন ৺কাশীধামে। ১৯১২ ইংরেজী, অগ্রহায়ণ মাস। সেখানে অদ্বৈতাশ্রমে আছেন পূজনীয় হরি মহারাজ প্রভৃতি। জুটিয়াছেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি। আমি প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া পরদিন বিকালের দিকে অদ্বৈতাশ্রমে গিয়াছি। দেখিলাম মাষ্টার মহাশয় গোপী গীতা পাঠ করিতেছেন। কুশল প্রশ্নাদির পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপী-গীতা পড়া আছে?" আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "ধারাবাহিক ভাবে নয়, মাঝে মাঝে।" সহাস্য দৃষ্টিখানি আমার চোখের উপর স্থাপন করিয়া কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "পড়ে নেবেন, বেশ করে পড়ে নেবেন। অমন বস্তু দুর্ল্লভ। গোপী-প্রেম প্রেমের সেরা।" আমি বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন।"

তারপর বেশ কিছু সময় গোপী গীতা পড়িয়া পড়িয়া এবং স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইলেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদও চলিল। পাঠ বন্ধ হইলে আমাকে বলিলেন মা ঠাকরুণ আসিয়াছেন। অদ্বৈতাশ্রমের বিপরীতদিকে একটী বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ বাড়ীতে মা আছেন, গিয়ে প্রণাম করে আসুন। যতদিন এখানে আছেন, মাঝে মাঝে এখানে আসবেন।" আমি জানিতাম না যে এখানে মা আছেন, তাই সানন্দে রওনা হইলাম। সঙ্গে চলিল আরো দুটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, যারা পূর্ব্বেই অদ্বৈতাশ্রম দেখায় ও ঘোরা-ফেরায় ব্যস্ত ছিল। যাই হউক, মার বাড়ীর সম্মুখেই পাইলাম আমার পূর্ব্ব-পরিচিত জনৈক ব্রহ্মচারী, অদ্বৈতাশ্রমের দিকে চলিয়াছেন। তিনি একথা সে কথার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টারমশায় কি আশ্রমে আছেন?" আমি বলিলাম, হাঁ।

"কি কচ্ছেন।"

"গোপী-গীতা পাঠে ছিলেন। আমাকেও শুনালেন।"

"কেমন দেখলেন?" এ জিজ্ঞাসার অর্থ না বুঝিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "বিষণ্ণ বলে বোধ হল কি?" আমি বলিলাম, "না, এমন কিছুত দেখিনি, বরং আনন্দে ভরপূর দেখলুম।" তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "একেই বলে কৃপা।" তারপর হাসিয়া বলিলেন, "এই একটু পূর্ব্বেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মেয়েটীর কলেরায় অকস্মাৎ মৃত্যুর খবর এসেছে।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তিনি জেনেছেন?" ব্রহ্মচারীটী সগর্ব্বে বলিলেন, "হাঁ, আলবৎ জেনেছেন। আমিই খবর দিয়েছি।"

আমি অবাক-বিস্ময়ে ভাবিলাম, আমরাও মানুষ আর ইনিও মানুষ। আমরাও তাঁর কৃপা চাহিয়াছি। আর তিনি তাঁর কৃপা লাভে কি হইয়াছেন, বেশ দেখিলাম। মুক্ত-পুরুষ আর কাকে বলে!

তারপর ব্রহ্মচারিটী আশ্রমের দিকে গেলেন; আর আমরা মাকে দর্শন করিতে সেই বাড়ীটীর দোতালায় গিয়া উঠিলাম। অন্য একজন ব্রহ্মচারী পশ্চিম বারান্দার উত্তরদিকে মা বসিয়া আছেন দেখাইয়া দিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, মা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা। প্রণাম করিলাম কিন্তু পদধূলি পাওয়া ভাগ্যে ঘটিল না। বস্ত্রের আবরণে পা দুখানি কোথায় আছে ঠিক বুঝিতে পারিলাম

না, তাই ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। তখন মনটা ভারি খারাপ হইয়া গিয়াছে। এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ৺বিশ্বনাথের গলিতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মাষ্টার মহাশয় ৺বিশ্বনাথের মন্দির হইতে ফিরিতেছেন। মুখামুখি সেই 'এই যে' বলিয়া কাঁধে হাত রাখিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার দর্শন হয়েছে ত ?" আমি একটু কষ্টের হাসি হাসিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলাম, "মাকে দর্শন করলাম, না কাপড়ের ঢিপি দর্শন করলাম ঠিক বলতে পারি না।" সব কথা খুলিয়া বলিলাম। মাষ্টার মহাশয় একটু গম্ভীর হইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একা ছিলেন ?" আমি বলিলাম, "না, আরো তুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সঙ্গে গিয়াছিলেন।" একটু চিন্তা করিয়া মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তাই হল ! কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে কিছু ফুল-বেলপাতা আর মিষ্টি নিয়ে সটান মায়ের বাড়ীতে চলে যাবেন। আজ আপনার মাতৃদর্শন হয়নি ওরা সঙ্গে ছিল বলে, ঠিক্ বলছি।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "মাষ্টারমশায়, এদের অপরাধটা কি ?" উত্তরে তিনি খোলা হাসিতে মুখ ভরিয়া বলিলেন, "আপনি গেছলেন মাকে দেখতে, আর ওরা হয়ত গেছলেন, পরমহংসের স্ত্রীকে দেখতে। ঠাকুরের ত আজকাল খুব নামডাক, তাই হয় ত ভেবেছে, পরমহংস ত পরমহংস, তার পরিবারটী কেমন দেখাই যাক্।"

বিষয়টী আমার যেন সত্য বলিয়াই বোধ হইল। আমি সশ্রদ্ধভাবে বলিলাম, "আচ্ছা মাষ্টার মশায়, তাই হবে।" তিনি আবার বলিলেন, "বেশ, কিন্তু মনে রাখবেন, একা একাই যাবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা"। একটু গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন, "আরও কথা আছে।" তারপর একটু থামিলেন, তারপর আবার বলিলেন, "থাক্।" আমি চাপিয়া ধরিলাম, "থাক্ কেন মাষ্টার মশাই, বলতেই হবে।" তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ও শ্রীমুখ দর্শন, আর পদধূলি কি যার তার ভাগ্য ! যার হবে তাবত সবই হয়ে গেল।" আমি বলিলাম, "তাই বুঝি লোক বুঝিয়া অমন করিয়া থাকেন ? তবে এত ঠিক নয়, পণ্ডিতের জন্যই যখন এসেছেন তখন আর এত কার্পণ্য কেন ?" মাষ্টার মহাশয় হাসিলেন, সে কি মিষ্টি হাসি। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেন, আপনি বুঝেন। তবুও আপনি একটু যাচাই করছেন কি ?" আমি হাসিয়া নীরব হইলাম।

পরের দিনের কথা। অবান্তর হইলেও ঠিক অবান্তর নয়, অপ্রাসঙ্গিক ত বলাই যায় না। একে মায়ের কথা, তারপর সেই কথার উপর মাষ্টার মহাশয়ের ঘনিষ্ট সংস্রব। তাই এখানে বলিতেই হইল। পরদিন খুব ভোরে পূজনীয় বড় কাকাকে আরেকটী সাথী জুটাইয়া দিয়া একা একা গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলাম। প্রয়াগ ঘাট। ঘাটটী খুব প্রশস্ত কিনা তাই এই কয়দিন বিনা জিজ্ঞাসাবাদে আমি প্রয়াগ ঘাটকেই সুপ্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাট ধরিয়া সেখানেই প্রত্যহ স্নান করিয়া আসিতেছিলাম। আর একটা বস্তুর খোঁজ করিয়া হয়রাণ হইতেছিলাম। আর কিছু দূর গিয়াই কেমন একটা খটকা বাঁধিল, তাই স্নানার্থিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা প্রয়াগ ঘাট। দশাশ্বমেধ ঘাট ডান দিকে। দশাশ্বমেধে ঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিয়া ঘাটের উত্তর দিকে গঙ্গাতীরে কুটীরের মত একটী মন্দির, তার মধ্যে একজন নেংটা সন্ন্যাসীর ফটো। এবং মন্দির পরিচর্যায় জনৈক ব্রহ্মচারী এবং জনৈকা বিধবা মহিলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় আমি যাঁহাকে খুঁজিতেছিলাম, তাঁহাকেই পাইলাম। ইনি গৃহস্থাশ্রমের বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল। প্রথমদিন মোকদ্দমা চালাইতে গিয়া

মিথ্যা বলিতেই হইবে দেখিয়া অন্য উকিলকে মোকদ্দমা সাজাইয়া দিয়া ঢাকার নর্ম্যাল স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাহাও ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতেই ভগবৎ চিন্তায় দিবারাত্র কাটাইয়া দিয়া অবশেষে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দশাশ্বমেধ ঘাটে একাসনে উলঙ্গ অবস্থায় তপস্যা-নিরত থাকিতেন বলিয়া সর্ব্ব-সাধারণ তাঁহাকে নেংটা-বাবা বলিয়াই ডাকিত। তদীয় স্ত্রী দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই একখানা বাড়ীতে থাকিয়া জীবদ্দশায় দূ'র থাকিয়াই যত্ন নিতেন। স্বামীর দেহান্তেও তপস্যা-স্থানে ফাটা বাগিয়া সেবা-পূজায় রত রহিয়াছেন। নেংটাবাবা শিষ্য করেন নাই, সেবক চাহেন নাই, তবুও অনুরাগী ভক্ত জুটিয়াছিল। এখনও দুই চারজন সেখানে সেবায় রত রহিয়াছেন। ইঁনি দশাশ্বমেধ ঘাটে যেন বুদ্ধদেবের মত 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' এই সংকল্প নিয়াই বসিয়াছিলেন এবং যতদিন দেহে ছিলেন, এক ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত ছাড়া আসন ত্যাগ করিতেন না, দিবারাত্রি মৌনীই থাকিতেন। কেবল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিয়া এক গণ্ডূষ গঙ্গোদক মাত্র গ্রহণ করিতেন। কারো কাছে কিছু চাহিতেন না, অযাচিত কিছু আসিলেও পড়িয়াই থাকিত, কখন কখন বা একটু আধটু গ্রহণ করিতেন মাত্র। যাক্, সে অনেক কথা।

সে অগ্রহায়ণ মাস। এর পূর্ব্ব পৌষ সংক্রান্তির দুই একদিন পূর্ব্বে তিনি অযাচিত সেবকগণকে জানাইয়াছিলেন, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, এই অপূর্ব্ব ইচ্ছা মৃত্যুর সংবাদ কাশীধামে তড়িৎবেগে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তাই উত্তরায়ণ দিবস সকালবেলা হইতেই দশাশ্বমেধ ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। মহাপুরুষ যেমন ছিলেন তেমনই রহিয়াছিলেন। রোগ নাই, তাপ নাই, সেই সহাস্য বদনমণ্ডল। দিনান্তে দেখা গেল, শরীরটা হটাৎ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আরও দেখা গেল তালুদেশ ফাটিয়া গিয়া তাঁর মহাপ্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রাণ প্রাণকেন্দ্রেই মিশিয়াছে সন্দেহ নাই।

আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, মহাপুরুষকে শরীরেই দর্শন করিব। কিন্তু তা যদিও হয় নাই, তবুও এই দর্শনও আমার কাছে মহা শুভ এবং ভাগ্যের দ্যোতক বলিয়া বোধ হইল। আমি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম।

গুটিকয় পেয়ারা, গুটিকয় মিষ্টি, গুটিকয় ফুল-বেল পাতা অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম—একা। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরিয়া দেখিতেছিলাম, কেহ সঙ্গ ধরিতেছে কি না। বাহিরের ঘর। দুই দিকে দুইটী কুঠুরী, মাঝখান দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের পথ। দূর হইতেই দেখিলাম, একজন স্ত্রীলোক গালে হাত দিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঘোমটা মাথার উপরে একটুখানি মাত্র। সমস্ত মুখমণ্ডল খোলা। আরো অগ্রসর হইয়া যা দেখিলাম, তাতে আমার পূর্ব্বস্মৃতি যা ঝাপসা ঝাপসা ছিল, তাই স্পষ্ট দেখাইয়া দিল, এ আমার মা। আর মা আমার সন্তানের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন! ভাবিলাম, সে ভাগ্যবান কি আমি? হয়ত আরো কেউ হইতে পারে। এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াই একবারে কাছেই গিয়া পড়িলাম। মা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "একটু দাঁড়াও বাবা।" আর সঙ্গে সঙ্গেই ডাকিলেন, "কেষ্ট কেষ্ট, শিগ্গীর এস।" শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণলাল মহারাজ যেন আদেশ-প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। "যাই মা" বলিয়া তখনই আসিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন, "ছেলের হাত থেকে এসব নিয়ে উপরে রাখ। আমি গঙ্গাস্নান করে এসে ঠাকুরের পূজায় লাগাব।" কৃষ্ণলাল মহারাজ আদেশ পালন করিলেন। আমি প্রণাম করিতে যাইতেছি দেখিয়া মা বলিলেন, "একটু থামো বাবা। ঠাকুরের পূজোর জিনিষ তোমার হাতে ছিল কিনা, হাতটা ধুয়ে নিয়ে প্রণাম কর।" গঙ্গাজলের ফরমাস গেল, হাত ধুইয়া প্রণাম করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১

শীতের জড়তা নিক্ষেপি দূরে
মধু ঋতু আজি উঠিল হাসি,
ফুলে ফুলে অলি করে গুঞ্জন
হরষে কোকিল বাজায় বাঁশী।

২

ঘোর-অমানিশা হ'ল অবসান
দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল আজি,
অন্ধকারের হেরি অবসান—
বিশ্বের বীণা উঠিল বাজি।

৩

যে চাঁদ আজিকে গগনের কোণে,
শোভিছে ক্ষুদ্র রেখার মত ;
একদিন এক পূর্ণিমা রাতে,
কে জানে সে আলো দানিবে কত।

৪

এই দ্বিতীয়ার মধুর নিশায়,—
'চন্দ্রা'দেবীর কোমল কোলে,
উদিল এ কোন্ স্বর্গের শশী—
যাঁহার আলোকে ভুবন ভোলে।

৫

'কামার পুকুর', 'কামার পুকুর',
ধন্য আজিকে ধন্য তুমি ;
নর-দেবতার চরণ-পরশে—
পবিত্র হ'ল তোমার ভূমি।

৬

আলোকে যাহার উজলি উঠিল
কংসের সেই অন্ধ কারা,
যাঁহার কমল-চরণ পরশে
কঠিন পাষাণ পাইল সাড়া।

৭

রাজার পুত্র ভিখারী সাজিল—
জগতের ব্যথা সহিতে নারি,
ক্রুশেতে বিদ্ধ যেই মহাজন
করিলেন দান আশীষ বারি।

৮

ধরণীর দুখে ব্যথিত হৃদয়
ধর্ম্মের গ্লানি করিতে দূর ;
যুগে যুগে যিনি নরদেহ ধরি
করেন মুক্ত এ মহীপুর।

৯

সে দেব মানবে অঙ্কে ধরিয়া
কামারপুকুর ধন্য তুমি,
পবিত্র হ'ল তোমার হৃদয়—
তাঁহার যুগল চরণ চুমি।

১০

এই সেই শিশু—এই গদাধর
কঠোর সাধনা করিল কত ;
ফুটায়ে জীবনে সকল সত্য—
প্রমাণ করিল শাস্ত্র শত।

১১

কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের ত্রিধারা,
বহাইল পুনঃ অবনীতলে,
ত্যাগ ও সেবার মহিমা অতুল—
প্রচার করিল কথার ছলে।

১২

"জীবে জীবে শিব"—শিখালেন যিনি
"জীবের সেবাই শিবের সেবা,"
সহি পদাঘাত করিলেন ক্ষমা
এমন ক্ষমার মূরতি কেবা!

১৩

'কাম-কাঞ্চন' করিল যে ত্যাগ—
জ্বালিল বিশ্বে জ্ঞানের বাতি ;
বিবাহজীবন করি পবিত্র
নারীরে করিল ধর্ম্মে সাথী।

১৪

সুপ্তনারীর গুপ্ত মহিমা,
প্রচার করিল বিশ্বময়।
দীক্ষা নিলেন নারীর মন্ত্রে
উঠিল বিশ্বে নারীর জয়।

১৫

'যত মত তত পথ'—দেখাইল
দ্বাদশ বর্ষ সাধন করি,
'সকল ধর্ম্ম সত্য'—এ বাণী
প্রচারিল যিনি ভুবনভরি।

১৬

যাঁর আগমনে জাগিল বুদ্ধ
জাগিল নিমাই ধরণীমাঝে,
যীশু, শঙ্কর, রামানুজ জাগে—
ইস্লাম জাগে নূতন সাজে।

১৭

'বিবেকানন্দ', 'অভেদানন্দ'—
পদরেণু যাঁর মাথায় ধরি,
বাজাইল যাঁর বিজয়-শঙ্খ—
সত্য আলোকে জগৎ ভরি।

১৮

জড়তা জড়িত বিপুল বিশ্ব—
মহান্ মন্ত্রে উঠিল জাগি,
যত অচেতন লভিয়া চেতন
সত্যের সুধা লইল মাগি।

১৯

শক্তি সাধক 'সারদানন্দ'
সত্যের ধারা ধরিয়া শিরে,
যাঁর আদর্শ করিল বহন
ডুবিয়া বিপুল কর্ম্মনীরে।

২০

সে মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ
জগতে যাঁহার তুলনা নাই,—
তাঁহার এ মহা জনম তিথিতে
যেন তাঁর প্রেম পরশ পাই।

২১

প্রণমি তোমায় শ্রীরামকৃষ্ণ,
প্রণমি তোমায় জগৎপতি
প্রণমি তোমায়, প্রণমি তোমায়
প্রণমি তোমায় বিশ্বরথী।

২২

জগতের গুরু সত্য মূরতি—
প্রণমি তোমায় হৃদয়ে ধরি,
তোমার এ দীনা সন্তানে প্রভু
দাও তব প্রেম চরণ তরী।

শ্রীননীবালা দেবী

কথা প্রসঙ্গে

(ভারতের চলন্তিকা)

বিগত শতাব্দীতে আমাদের গ্রহের সামাজিক আবহাওয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহিত একেবারে বদলে গ্যাছে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রত্যেক জাতি বাস করত একটা বিশিষ্ট দেশ কালের সীমার মধ্যে; কারণ পাহাড়, পর্ব্বত বা সমুদ্রের রেখা নির্দ্দেশকে অতিক্রম করা তখন এক রকম অসম্ভব ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের দেশ-কালের ওপর আধিপত্য হেতু গোটা বিশ্বে সমষ্টি মানবের সমস্যা, আশা, ধারণা ও আদর্শ নিরন্তর রূপান্তরিত হয়ে এক বিরাট লক্ষ্যে ধাবিত হচ্চে। গতানুগতিক জীবন ধারা ও প্রবাদতন্ত্র-আদর্শ ক্রমেই ক্ষীণ ও ভিত্তিহীন হয়ে পড়চে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মিলনের সূত্রপাত হয়েচে, সেটা কোন ব্যক্তি বা জাতিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্দ্দিষ্ট নয়, পরন্তু এক অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনই উভয়কে উভয়ের দিকে আকর্ষণ করে সাধারণ গৃহ-সমস্যা-সমূহ সমাধানে উভয়কে সচেষ্ট করে তুলচে। এমন একজন যে অপরকে তার কৃষ্টিগত আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা পরাজিত করে জগতে ঐক্য স্থাপন করবে তার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞানিক সমাজ ও জাতিগত বিশ্লেষণে এটা এখন বেশ ক্রমেই নিরূপিত হয়ে উঠচে যে আগামী বিরাট সভ্যতার উপকরণ স্বরূপে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন কৃষ্টি সমূহ অতীতের দীর্ঘকালের মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তার করেচে।—এর মধ্যে কোনটাই ছোট বা বড় নয়—সকলের সমবেততায় যে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন আমরা হইচি—তার সমাধান হবে। এ সমবেততায় কৃষ্টির গৌণ বা মুখ্যত্ব, জিত বা পরাজিত, একত্রীকরণ বা সংমিশ্রণ নেই—এ সমবেততার অর্থ সমন্বয়—যথা স্থানে সর্ব্বকৃষ্টির স্বাভাবিক বৃদ্ধি। এ নাট্যে একের প্রাধান্যে অপরে নিষ্প্রভ হয় না, পরন্তু একের অভাবে সকলে অভাব গ্রস্ত হয়।

কৃষ্টি অর্থে চিত্তভূমি কর্ষণের দ্বারা জ্ঞান সকলের উদ্ভাবন—যার দ্বারা মানুষের দৈহিক ও অধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষিত হতে পারে। কৃষ্টির প্রথম ফসল হচ্চে দৈহিক—খাদ্য, যৌন-সম্বন্ধ এবং আত্মরক্ষা, তার পর তাদের নৈতিক মূল নিরূপিত হয়। নৈতিক বোধের উত্থিতি না হলে মানুষ বুঝতে পারে না যে শুধু বাঁচাটা কিছু নয়—বাঁচতে হবে ভাল করে। এই ভালর বিবৃদ্ধির সহিত মানুষের আত্ম ও বিশ্বজ্ঞানের পরিধিরও বিবৃদ্ধি হতে থাকে এবং যার অবান্তর ফলরূপে জড় আবেষ্টনীর ওপরও সে প্রয়োগিক আধিপত্য সকল লাভ করতে থাকে। এ ভাবে যখন সে ধীরে ধীরে সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের সূক্ষ্মতা উপার্জ্জন করতে থাকে তখন তারই ফল স্বরূপে বিশিষ্ট সংঘ, শীল, দর্শন ও শিল্পের উদ্ভব হতে থাকে।

প্রত্যেক কৃষ্টিরই একটি জাতিগত ব্যক্তিত্ব আছে—এই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে তার পৃথিবীর ভৌগলিক সংস্থান এবং সেই আবেষ্টনীগত বিশিষ্ট ইতিহাসের প্রগতি-পথে বিশিষ্ট সমস্যা সকলের উপস্থিতি, কাল-তন্ত্র সদসৎ আকাস্মিক ঘটনা নিচয়, তথা বৈদেশিক আদান-প্রদান। কৃষ্টি যত দীর্ঘ তার সংঘতি তত জটিল। তার কোন উক্তটি হয়ত শত শতাব্দীর নিশ্চিত

ক্রমবিকাশে প্রস্ফুটিত ; কোনটি হয়ত এক বিরাট তত্ত্বের এক কোণে পূর্ব্ব-পক্ষরূপে উল্লিখিত ; কোনটি হয়ত এক বন্য-তত্ত্বের দার্শনিক সংস্করণ—যা সংস্কৃতির পরিচ্ছদে আদিম তত্ত্ব হতে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ; এবং কোনটি হয়ত কল্পনার এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আবার দেখা যায় প্রত্যেক জাতীয় তত্ত্ব সকল রক্ষিত হয়, তদ্দেশীয় তিনটি কোটার মধ্যে—আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড এবং প্রতীক। এখন কোনও জাতির মর্ম্মকথা ও কৃষ্টির কাল ও গভীরতার পরিমাণ করতে হলে, এই তিনটি আবরণ ভেদ করে সেখানে পৌঁছুতে হবে।

বর্ত্তমান কালের সভ্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্চে পরিবর্ত্তন। কারণ এখন জ্ঞানের অগ্রগতি চলেচে যেন দৌড়-ঝাঁপের সঙ্গে—আজকে যেটা অভ্রান্ত কালকে সেটা ভ্রান্ত—আজকে যেটা সার্ব্বজনীন কালকে সেটা প্রাদেশিক তত্ত্বে পরিণত হচ্চে। বহুকালের নির্ম্মিত প্রাসাদ যা অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়েও নিজের অস্তিত্ব এতকাল অটুট রেখেচে, আজ তা কালের সংঘর্ষে ভেঙে পড়বার দাখিল। যে সকল তথ্য অনাদি কাল ধরে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে আসচে, আজ সেই সব প্রাচীন বেদ, নবাগত অর্থের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌চে। যে সকল প্রতীক বিশ্বতত্ত্বসমূহকে জ্ঞানের এক বিশিষ্ট পরিধির দ্বারা প্রকাশিত করত, আজ তার পরিধির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহিত মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষারও অত্যধিক বৃদ্ধি হয়ে পড়চে। আধুনিক সভ্যতায় পরিবর্ত্তনটা একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ। বীজাণু হতে মানুষের বর্ণান্তর পর্য্যন্ত যে ক্রমবিকাশ—তার গতি ছিল এত মন্থর যে সেটা যেন পাষাণ বায়ু সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে শ্যামলিমায় রূপ নেওয়ার মত। বস্তুতঃ প্রতিভার সার্ব্বজনীনতা ছিল অসম্ভব ব্যাপার, কারণ দেশকালের ওপর মানুষের আধিপত্য তখনও শম্বুকগতির মত—কাজেকাজেই বাণিজ্য বিস্তারও ছিল অতি ধীর। অপর দিকে তখন পেশীবলের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু পৃথিবীর কোনও প্রান্তস্থিত কৃষ্টির পরিশ্রম, কোনও এক বর্ব্বর প্রবাহে নিমজ্জিত হওয়ায় প্রতিভাকে আবার নূতন করে তার কার্য্য আরম্ভ করতে হতো, অথবা দেখা যায় এক বিশিষ্ট কৃষ্টি অপর কৃষ্টির দ্বারা পরাজিত হয়ে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েচে। কাজেকাজেই কৃষ্টির সমন্বয় বা মানব প্রতিভার সর্ব্বোতমুখ বিস্তার তখনও হবার সুবিধা হয় নি। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দ্বারা অতি দুর্ব্বলও অতি-নিষ্ঠুর-কঠোর পেশী বলের নিকটও নিজের আত্ম কৃষ্টি, জাতীয়তা ও ভাব-ধারার রক্ষা করতে পারে এবং সেই জন্যই এখন সকল জাতীয়তার মধ্যে একটা আপোষ, সমন্বয় বা সংশ্লেষণের অবশ্য-প্রয়োজন বোধ হেতু, আমরা আগামী এক বিরাট মানবতার কল্পনা করতে পারি। নচেৎ বিজিগীষু হতে গেলেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি মারাত্মক যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ধ্বংসকেই প্রধান করে তুলতে হবে।

যন্ত্রের মধ্যে যেমন মৃত্যু-শক্তি নিহিত আছে, তেমনি আবার সৃষ্টি-শক্তিও নিহিত আছে। যন্ত্র যেমন মানুষের নানাবিধ মৃত্যু-বাণ তৈরী করেচে আর একদিকে তেমনি এর সাহায্যে মানুষ পৃথিবীর প্রত্যেক অজ্ঞানিত অংশে গিয়ে প্রত্যেক দেশের ও কালের বিশিষ্ট সম্পদকে সার্ব্বজনীন করে দিচ্চে। সমুদ্র পর্ব্বত আকাশের ব্যবধান অতিক্রম করে একদেশের পণ্য সম্ভারে অপর দেশ উপকৃত হচ্চে, একদেশের আচার-ব্যবহার রীতি নীতি সংঘ-গঠন প্রণালী প্রবাদ মূলক ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, আহার্য্য, পরিধেয় প্রভৃতি পাঠের দ্বারা স্বস্ব জীবনগতিকে পরিপুষ্ট করে ভাবী সভ্যতার বলাধান করচে এবং পৃথিবীর কলেবর পরিবর্ত্তন হেতু প্রাচীন ব্যক্তিগত

গ্রাম্য, গোষ্ঠি, গণ্ডি ও জাতিগত জীবনে এক বিরাট ব্যভিচার, বিপর্যায় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেচে। নবীন জ্ঞানের যাদুস্পর্শে প্রাচীন বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা যেন কর্পূরের মত উপে যাচ্চে। নব্য বেদান্ত ও বিজ্ঞান আজ মনুষ্য কৃষ্টিতে, জীবনের অর্থে, ব্যক্তিত্বের মূল্যে, বিশ্বের ব্যাখ্যায়, সংঘে, ধর্ম্মে, দর্শনে, প্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের মহিমায় এক নবালোক আনয়ন করচে।

এ পরিবর্ত্তনের হেতু কী? হিন্দু বলেন, সেই অনাদি অমূলা ইচ্ছা বা কালী। বিশ্বের যাবতীয় শক্তিই এই ইচ্ছার স্থূল বিকাশ। এই ইচ্ছাই প্রবৃত্তিমুখী হয়ে অখণ্ডকে খণ্ডিত, অব্যক্তকে ব্যক্ত, অসীমকে সসীম, অরূপকে কালাধা চিরপরিবর্ত্তনশীল রূপায়তনে বিস্তৃত করে লীলা সম্ভোগ করচে; আবার ঐ ইচ্ছাই নিবৃত্তিমুখী হয়ে জীবকে সমন্বয়ের দিকে, ঐক্য বা পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য অপূর্ণ জীবনের ভস্ম হতে অবিনাশী আত্মার নবীন সংস্করণকে অজ্ঞানাচরণ অপসারিত করে উদ্‌জীবিত ও মহিমাময় করে তুলচে।

অজ্ঞানই পরিবর্ত্তনের বিভীষিকা দেখে। জ্ঞান দেখে চিরপরিবর্ত্তন কালের ধ্বংসলীলার মধ্যে অপরিবর্ত্তনেরই স্বরূপ বিকাশ—ফলে নিত্যের উত্তরোত্তর পূর্ণতার অভিব্যক্তি। এই মহাকাল যেন চলচ্চিত্র, একে ত কোন বিশিষ্ট দেশে পেরেক মেরে টাঙিয়ে রাখবার যো নেই; যদি থাকত, তাহলে আমরা কোনও বিশিষ্ট দেশ কালের জাতি, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি বা সভ্যতাকে চিরন্তন করে রেখে দিতে পারতুম। কালের সৃষ্টি কালের মতনই চলেচে নিরন্তর, ঐ কালীর ইচ্ছায়—নদীর সহিত চলেচে যেমন তার তরঙ্গ। অপ্রতিহত গতিতে যুগের পর যুগ চলেচে। এ চলার পথে দুটি জিনিষ লক্ষ্যের বস্তু—একটি জীবাণু থেকে মনুষ্য পর্য্যন্ত অতি ধীর কিন্তু নিত্য পরিবর্ত্তন, আর একটি মনুষ্যস্তরে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ—উত্তর সত্তা ব্যক্তির স্থান অতি ক্ষণভঙ্গুর, সত্য কথা। ব্যক্তি মাত্র উপাধি, এই উপাধির মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড প্রকৃতি লীলাচ্ছলে এক অখণ্ড জ্ঞানাত্মক পুরুষের ওপর আবরণ দিয়ে কখনও যেন তাকে সংকুচিত কখনও আবরণের ধীরাপসারণে যেন তার স্ব স্বরূপ অনন্ত স্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের ক্রমবিকাশ করচেন—যার সমষ্টিফল ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চক্ষে সামাজিক প্রাণ-চেতনার ক্রমবিকাশ। কিন্তু তার পাশাপাশি যে চেতনার ক্রমসঙ্কোচ চলেচে, সেটা মাত্র ৬০০০ হাজার বৎসরের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের আলোচনার দ্বারা জানা যায় না। হিন্দু যখন দর্শনের আলোচনা করে তখন তার চোখের সামনে থাকে সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাণীর অধঃগতি ও অভ্যুত্থানের ইতিহাস, তাই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কীটাণুর ন্যায় ধ্বংস দর্শনেও তার মধ্যেই ক্রমবিকাশের পরিপূর্ণতার অভিব্যক্তিকে সে লক্ষ্য করে। ব্যক্তি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু সমষ্টি বুদ্ধত্ব লাভ করেচে তার ইতিহাস অদ্যাবধি আমাদের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, যদিও হিন্দুর শাস্ত্রে সৃষ্টি চেতনার উচ্চ উচ্চ বিভিন্ন স্তরে (তাও একটা বিশিষ্ট পরিধির মধ্যে) তাঁরা মহঃ জন তপঃ সত্য প্রভৃতি সমষ্টি জ্ঞানী সমাজের প্রত্যক্ষ করচেন, কিন্তু তার সাম্ভব্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ মিশ্রিত ভূলোকে সম্ভব নয়—কারণ এই জাগ্রৎ লোকে তিন গুণেরই আধিপত্য সমান। এখানে আত্মজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দেহাত্মবাদ, বুদ্ধের পার্শ্বে চার্বাক, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞান, সৃষ্টি-যন্ত্রের সহিত ধ্বংস-অস্ত্র সমস্তরাল ভাবে চলেচে। একদিকে যেমন মানবের তপস্যায় বিশ্বসমুদ্র মন্থিত হয়ে দর্শন বিজ্ঞানের উৎপত্তি, অপর দিকে অজ্ঞানী সে লব্ধ ফলের গর্ব্বতায় পাশবিকতাকে পরিস্ফুট করে তুলচে। এ গ্রহে এই সদসৎ, এই দৈবী ও আসুরী শক্তির সংঘর্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করচে এবং এক এক সময়

এক এক প্রবল ব্যক্তিত্ব হতে, বিভিন্ন কালে ও দেশে, শক্তি বিক্ষেপের দ্বারা বিভিন্ন সমাজাদর্শের সৃষ্টি হচ্ছে। ভগবৎ প্রতিনিধি রাজাদর্শের পশ্চাতে যেমন রাম, কৃষ্ণ, আলেকজেণ্ডার, সিজারের ব্যক্তিত্ব, ধর্ম্মাদর্শ সমাজের পশ্চাতে যেমন বুদ্ধ, লাউজি, কনফুসে, জোরোষ্টোয়ার, খৃষ্ট, মহম্মদের ব্যক্তিত্ব, তেমনি ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ দেখি আধুনিক সমাজতন্ত্রাদর্শের পশ্চাতে কার্লমার্কস, লেনিন প্রভৃতির। সাধারণ মানুষ চলেছে ঠিক গড্ডলিকার মত—চলার পথে হয়ত কিছু তার দেওয়ার আছে—কিন্তু প্রায় সবই ঐ অনন্ত ব্যক্তিত্বের অগ্নিতে নিজেদের ইন্ধনরূপেই আহুতি দিয়ে থাকে—এরই নাম সমাজের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস—এরই ভেতর দিয়ে আমরা জাতির ইতিহাসের আত্মার পরিচয় পাই। এই ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে প্রতি গোষ্ঠি মানবের গৃহ, সমাজ, আহার্য্য, অর্থনীতি, শাসননীতি, শিল্প, প্রতীক ও দার্শনিক ধারণা সকলের উদ্ভব।

এমনি করে বহু যুগ ধরে ভারতের একটা আনুশীলনিক অশ্বত্থ ধরণীর বক্ষে বহুজীবের আশ্রয়-স্থল হয়ে রয়েছে। ভারতের কৃষ্টি, তার প্রতিবেশী চীন, জাপান, আফগানিস্থান, পারসিয়া হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—অপরের ছাপ তার ভেতর পড়েছে খুব সামান্যই। হয়ত এক একটা যুগে ভিন্‌দেশী কৃষ্টির ভীষণ আক্রমণ প্রবাহ তার ওপর দিয়ে ভীষণ ভাবে চলে গ্যাছে, কিন্তু সে বন্যার পলিতে তার মাটি উর্ব্বর হয়ে দেশজ ফসলেরই শ্রীবৃদ্ধি করেছে। পরন্তু তারই শিল্প সাহিত্য দর্শনে নিকটবর্ত্তী সকল জাতিই উজ্জীবিত।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে কোনও ঐক্য-সূত্র—অসংখ্য বিষম-ভাবধারার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। এ দেশের আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ও উচ্চতা বিচিত্র। দ্রাবিড়ী, মঙ্গল, সেমাইট আমাদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। রাজনৈতিক ঐক্য, হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য কালে দু-একবার ঘটলেও ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে এরূপ দৃঢ়-ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যে প্রাসাদ কখনও গঠিত হয়নি। এ প্রাসাদের প্রত্যেক ইষ্টক বিচিত্র বাঙালী, তেলেগু, তামিল মারাহাট্টা ইত্যাদি। এ বিরাট মহাদেশের প্রাদেশিক ভাষা, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি,' দর্শন, শিল্প সব স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠেছে। এক একটা রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়েছে, কিন্তু তার পতনের সহিত কোন রাজনৈতিক ঐক্য সে রেখে যেতে পারেনি, কারণ তাদের প্রত্যেকেরই শাসন ও অনুশীলন পরস্পর সম্পর্ক-হীন—স্বাধীন। আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয় এই ধর্ম্মের জনয়িত্রী ভারতে যে অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্বাধীন উদ্ভব ঘটেছে—অদ্বৈত বেদান্তী, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ,—এবং যে সকল ধর্ম্ম বহিরাগত, যথা পারসিক, মুসলমান ও খৃষ্টান—তাদের মধ্যেও কোনও সমন্বয় নেই। কিন্তু যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তারাই বুঝতে পারেন, এই সভ্যতার বিচিত্র বসনে, প্রত্যেক বিশিষ্ট কৃষ্টিরই যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ আছে এবং সমগ্র ভারতোদ্ভূত ধর্ম্মের ভিত্তি এক অপরোক্ষ জ্ঞান-সাধন—যা বর্ণ আশ্রম, সম্প্রদায় বা দেশজ বা বিদেশাগত কোনও রূপ ক্রিয়াকাণ্ডকে অপেক্ষা করে না—যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই, (হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য আচার্য্যদের বাদ দিয়ে)—যাঁরা উচ্চস্তরে অজ্ঞাত হলেও, নিম্নস্তরে অত্যন্ত প্রভাবশালী—সেই বিশাল হৃদয় নানক, কবির, দাদু, দরাপ খাঁ, রুইদাস, কুবীর দাক্ষিণ আলোয়রগণের মধ্য দিয়ে।

ভারতের এই বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অপূর্ব্ব যাদুকরী ঐক্য সম্পাদক মন্ত্র আছে—সে কথাটী হ'লো "ধর্ম্ম"। ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈনের নিকট ধর্ম্ম—জড় বিজ্ঞানের তীব্র আলোক প্রভা সত্ত্বেও—পরপারের আলোক স্তম্ভ,—যে কোনও প্রকার শাসন পদ্ধতিই অবলম্বিত

হোক—দৈনন্দিন জীবনের শাসক—চরম সত্যলাভে মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, বেদী যে কোনও উপায়ই অবলম্বিত হোক না কেন—ধর্ম্মই তার প্রাণ—নিরাকার নির্গুণ, সগুণ নিরাকার, সগুণ সাকার যে কোনও ভাবেই পরমাত্মা উপাসিত হোন—সকল সাধনার মূল উৎস "ধর্ম্ম"—অর্থাৎ সর্ব্ব সংসার সুখ পরিত্যাগের দ্বারা সত্যতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি। "ধর্ম্মের" এই সাধারণ সংজ্ঞা ভারতীয় সর্ব্ব-সম্প্রদায়ে স্বীকৃত ছিল বলে, সাধু ও ফকিরের, আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বেও, ছিল সমান সম্মান। এখানে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম কথা শোনে, পরস্পরের ধর্ম্মস্থানে পরস্পর মানত ও পরস্পরের উৎসবে পরস্পর যোগদান করে—বিভিন্ন স্তরের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ সর্ব্ব সম্প্রদায়েই দেখা যায়—পরস্পর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দার্শনিক বিচারও হয়ে থাকে। তা বলে বিরোধও অস্বীকার করা চলে না। দর্ব্বদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মীর ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টান্ট, সিয়া-সুন্নীর বিরোধের তীব্রতা এ দেশে দেখা না দিলেও, কাশীতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বিতর্কে যেমন সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হয়, তেমনি ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যেও আজকাল বিদ্বেষ-বহ্নিতে নীতি-কূটর্দের ইন্ধন নিক্ষেপ অস্বীকার করা চলে না।

স্বাধীন চিন্তায় ভারতবর্ষ ঠিক ইউরোপের মত, তবে দুটোর উদ্দীপনার বিষয় বিভিন্ন—একের ধর্ম্মনীতি, অপরের অর্থনীতি। ভারতে মানুষ যখন এক অত্যাচারী ভগবান এবং ভোগ-সর্ব্বস্ব স্বর্গের সৃষ্টি করল, তখন ভারতের বৌদ্ধেরা প্রথম চার্লস এবং ষোড়শ লুইএর মতই সে ঈশ্বর ও স্বর্গকে অপসারিত করেছিল এবং তার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হলো এক সার্ব্বজনীন নীতি এবং ধীরে পুনরায় আবির্ভূত হলেন সর্ব্ব কল্যাণগুণ মহাসমুদ্র এক আদর্শ ভগবান।

অধুনা ভারতের গ্রাম সংখ্যা ৭,৫০,০০০, লোক সংখ্যা ৩৫,০০,০০,০০০। ফার্দ্দুসির সময় লোক সংখ্যা ছিল ৬০,০০,০০,০০০। ভারতের কৃষ্টির উৎস চিরকালই এই গ্রামে। শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি, সন্ন্যাসী পূর্ব্বে বাস করত গ্রামে, কখনও কখনও রাজাদেশে রাজধানীতে তাঁদের বসবাস করতে হত। রাজধানী সমূহের সহিত গ্রামের সম্বন্ধ ছিল মাত্র কর দানে। আক্রমণের পর আক্রমণের তরঙ্গ ভারতের ওপর দিয়ে চলে গ্যাছে, কিন্তু তার গ্রামাতল সমুদ্রেরই ন্যায় স্থির। ঋগ্বেদের সময়কার 'জন' 'বিশ' থেকে আরম্ভ করে আজকাল পঞ্চায়েৎ সভা একই রকমে চলে আসছিল—খুব কমই পরিবর্ত্তন তাতে দেখা গ্যাছে। কিন্তু আজ যন্ত্র-সাহায্যে দেশকালের ওপর আধিপত্য হেতু শিক্ষার বিস্তারের সহিত চিরাচরিত গ্রামেও একটা বেশ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েচে। হাব-ভাব আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ক্রীড়া-কৌতুক, সংঘ-সমিতি বিদেশের সহিত কারবার স্থাপনের সঙ্গেসঙ্গে পাশ্চাত্যের নিকট বহিরঙ্গ সভ্যতার পরাজয় প্রাচ্য একপ্রকার স্বীকারই করে নিয়েচে। কিন্তু তার মূল-কৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা এবং গৌণ-শিল্পাদি বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্টতর উপাধিযোগে অধিকতর গৌরবান্বিত ও ব্যাপক হয়ে উঠচে এবং পাশ্চাত্যও ধীরে ধীরে বুঝতে পারচে, কেমন প্রাচ্যের মোহনীয় প্রভাব তাদের বাহ্য কৃষ্টিকে পরাভূত করে আত্মবিস্তার করচে।

এই গ্রাম্য সভ্যতা এখনও সহর হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন—সমাজ-তন্ত্রই তার ভিত্তি। দশ জনে বসে সর্ব্ব বিষয়ে ব্যবস্থা, কেবল কর ও ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজদ্বারে উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু একটা পরিবর্ত্তন খুব বিরাট ভাবে আসচে বলে বোধ হয়—যা বৌদ্ধ উপপ্লাবন যুগে ঘটেছিল, কিন্তু অধিকারি-বিচারহীন-আধ্যাত্মিক বিস্তারে যা আবার চাপা পড়ে যায়। সেটা হচ্চে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণ-

বিভাগ মানে সমাজের পবিশ্রম বিভাগ। এ বিভাগ সভ্য সমাজের একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। বৈদিক যুগে এই বর্ণ-বিভাগ ছিল গুণ-কর্ম্মানুযায়ী, ক্রমে তা বংশগত হয়ে পড়ল। কিন্তু ক্রমে আবার আর্থিক-সঙ্কট-হেতু বংশগত বর্ণ-বিভাগে ধরেচে ভাঙন—তাই এখন বর্ণ গুণকর্ম্মহীন নাম মাত্র। দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন রজোগুণ ও দৈহিক বল সম্পন্ন এক শ্রেণীর লোকের ওপর দেশের শাসন কার্য্যের ভার ছিল। বৈশ্যদের ওপর ভার ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের এবং শিল্প ও শ্রমকার্য্যের ভার ছিল শূদ্রদের ওপর। এই ত্রিবর্ণের বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনা নিশ্চিন্ত মনে করতেন। ক্রমে বিদেশী রাজত্বের প্রারম্ভ হতেই ক্ষত্রিয়-বৃত্তির উচ্ছেদ, পাশ্চাত্য বণিকদের কর্ম্ম-তৎপরতা হেতু বৈশ্যবৃত্তির লোপ এবং নব-বিজ্ঞানের উন্মেষে দেশজ পণ্যশিল্পের ধ্বংস হেতু শূদ্র নিরন্ন হয়ে পড়ায়—ব্রাহ্মণও বৃত্তির অভাবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে আরম্ভ করেচেন। এই বিপর্য্যয়ের ফলে বহু লোক অন্ন-সংস্থানের জন্য পর-ধর্ম্ম গ্রহণ এবং প্রত্যেক বিভাগই নিজের নিজের সুবিধা মত পর বৃত্তির দ্বারা অন্ন সংস্থানে ব্যাপৃত।

ফলে নব সভ্যতার জাগরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির বিষম সংঘর্ষের ফলে প্রাচ্য প্রতি ব্যক্তির মধ্যে বংশ-নিরপেক্ষ ভাবে যে সকল মহৎ গুণ প্রতিযোগিতার মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করচে, তার ফলে সেই বৈদিক যুগের গুণকর্ম্মানুযায়ী নব সমাজেরই সুপ্রভাত আমরা কল্পনা করতে পারি। শ্রম বিভাগ বংশগত এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারানুযায়ী কর্ম্মস্ফূর্ত্তির পথ নিরুদ্ধ হওয়ায় যে সব বর্ণ নাম মাত্র হয়েছিল, অথবা বিধি নিষেধের বাঁধনে কোন বর্ণের ব্যক্তির আত্মস্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভবপর ছিল না, এখন সেই শ্রম-বর্ণের বা প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিভার যথার্থ সার্থকতা আমরা কল্পনা করিতে পারি। বর্ণ বা শ্রম-বিভাগ চিরকালই সকল সমাজে ছিল, আছে এবং থাকবে। কারণ শাস্ত্র, শাসন, বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পকে উপেক্ষা করে চলতে পারে, সমাজের এমন উপকরণ এখনও মানুষ সংগ্রহ করতে পারেনি। তবে যদি মানুষ কখন মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে অতিবায়ু মণ্ডলে (Strato-sphere) রাজ্য বিস্তার করে, অথবা অতিপরমাণু মণ্ডলকেও (Ionosphere) অতিক্রম করে যদি কোনও সুদূর গ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে অথবা সৌরশক্তি হতে বর্ত্তমান খাদ্যাপেক্ষাও অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে, তখন হয়ত এ বর্ণবিভাগের লোপ হওয়া সম্ভব—এবং তখন হয়ত থাকবে এক জ্ঞানি-সমাজ এবং তার মধ্যে আবিষ্কারের এক প্রতিযোগিতা। কিন্তু এখন এটা বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন মাত্র।

আমাদের যুবকদের আদর্শ

উত্থান ও পতন কালের গতিতে সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কাহারও সাধ্য নাই সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে মানবের কর্ত্তব্য কি? যদি স্বাভাবিক গতিতেই আমাদের উত্থান ও পতন, তবে আর আমাদের চেষ্টা করার আবশ্যক কোথায় আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে আহার নিদ্রাদিতে বেশ আনন্দে দিন কাটাইলেই তো কালের স্বাভাবিক গতিতে চলিতে থাকিব এবং সময়ে আনন্দ ও নিরানন্দের উপভোগ করিতে পারিব—শুধু শুধু পরিশ্রম করিয়া নিজের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইতে যাই কেন? এস্থলে বলা যায়—আচ্ছা স্বাভাবিক নিয়মেই চলিয়া মনে কখনও শান্তি পাইয়াছ কি —সংসারে লোকে যাহাকে আনন্দ নিরানন্দ, শান্তি অশান্তি, ধনী নির্ধন, ভোগ ত্যাগ, জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ জিনিষ বলিয়া থাকে, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারিয়াছ কি? নিজ প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে ও অপ্রাপ্তিতে, প্রিয় জিনিষের বর্ত্তমানে ও অবর্ত্তমানে, মান অপমানের লাভালাভে মন অবিচলিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছ কি? যদি পারিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যায় শাস্ত্রে যাঁহাকে পূর্ণ জ্ঞানী বলিয়া থাকে তুমি তাই, নতুবা তুমি জড় প্রকৃতি সম্পন্ন। কারণ এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থাতেই সাধারণে অবস্থান করিয়া থাকে অর্থাৎ মানব মনে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা বা ভাব আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া একটিকে গ্রাহ্য ও অপরটিকে ত্যাজ্য বলিয়া গ্রাহ্যটিরই প্রাপ্তির জন্য ধাবিত হইয়া থাকে।

আবার অনেক সময় দেখা যায় আলস্য ও তমো গুণের আধিক্য হেতু কাম্য জিনিষের দিকেও কেহ কেহ অগ্রসর হইতে চায় না। পরন্তু মনে মনে নিজ বাসনাদিকে চাপিয়া রাখিয়া ত্যাগীর আদর্শানুযায়ী বাক্য সকলের অবতারণা করিয়া থাকে। অথচ বিনা আয়াস লভ্য ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য মনে মনে প্রবল বাসনা। এই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা অনেকটা সেই প্রকারই কিনা তাহাই বিবেচ্য।

মানব জাতির উদ্ভব ঠিক কোন সময় হইতে হইয়াছে তাহার যথাযথ সময় নিরূপণ কোন কালে ঠিক ঠিক হইবে কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বহু লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বেই উহার সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে কাল স্রোতে নানা আবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব বোধ ও তাহার প্রাপ্তির চেষ্টা মানব মনে সৃষ্ট হইয়াছে। নূতনতম অভাব ও তাহা পূরণার্থে চেষ্টাকেই কেহ কেহ সভ্যতা বলিয়া আখ্যা দেন। এইভাবে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, মুদ্রা, কলা, নৃত্য, গীত, গাড়ী, মটর, রেডিও, এয়ারপ্লেন, ব্যাঙ্ক, সিনেমা পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি উপভোগ্য দ্রব্যের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে পরিবার গোষ্ঠী গ্রাম দেশ নগরী মহানগরী প্রভৃতিও তৈরী হইয়াছে। আবার অপরদিকে কত প্রকার শাসন প্রণালী, ভাব বা ইজম্ (-ism) সৃষ্টি হইল! আমরা কি এই সমস্ত জিনিষের উৎপত্তি অস্বীকার করিতে পারি?

অপর দিকে চিন্তাশীল ঋষিগণ, যে সমস্ত বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আমাদের সম্মুখে প্রত্যহ উপস্থিত

তাহার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভগবান লাভের জন্ম যত্নবান হইতে বলিতেছেন। বাস্তবতঃ আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা নাকি সকলই মায়া—ইহার নাকি বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানলাভে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা আত্মা লাভ হইলে সর্পে রজ্জু-ভ্রমবৎ সমগ্র জগৎটা প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান তখনই তিরোহিত হইবে যখনই মনে হইবে প্রকৃত পক্ষে উহা একটি রজ্জু মাত্র। সেইরূপ যখনই মনে হইবে একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি ছাড়া জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু নাই তখনই দৃশ্য বস্তুসকলের অস্তিত্ব-জ্ঞান এককালে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

আচ্ছা ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? কি করিয়া জগৎ বরেণ্য ঋষিগণের বাক্যের সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে এবং কি করিয়াই বা সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হইতে মনকে নিরপেক্ষ রাখা যায়?

এই প্রসঙ্গে একটি বড় সুন্দর কথা মনে পড়িতেছে। বর্ত্তমান যুগের পূর্ণ আদর্শ মানব শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কতিপয় স্বভাবতঃত্যাগী বালক শিষ্যকে নানা প্রকার কঠোরতায় অভ্যাসশীল দেখিয়া কয়েকজন সংসারাভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—মহাশয় এই ছেলেরা সংসারে কোন প্রকার ভোগ করিল না সংসারের কোন প্রকার আস্বাদ পাইল না, অথচ এই অল্প বয়সে কেন ত্যাগের পথ অবলম্বন করিল? তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন "দেখ তোমরা তো ওদের বর্ত্তমান অবস্থাই মাত্র দেখিতেছ, তাই এই প্রকার বলিতেছ, আমি কিন্তু ওদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের যাবতীয় কার্য্যাবলী দেখিতে পাই। তাহারা যার যা ভোগ্য ছিল সব শেষ করিয়াই এবার আসিয়াছে তাই এবার তাহাদের ত্যাগই স্বাভাবিক হইয়াছে এবং সে জন্যই ওরা এত সহজেই এই পথ ধরিতে সমর্থ হইতেছে।" আবার সময় সময় ধর্ম্মলাভার্থে কেহ কেহ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সংবাদ নিতেন তাহার কি প্রকার আর্থিক অবস্থা, খাইবার পরিবার ব্যবস্থা আছে কি না। অর্থাৎ যদি সাধারণ গুণসম্পন্ন মানবের সেই ব্যবস্থাটুকুই না থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতেই ধর্ম্মলাভের সাময়িক উৎসাহ তিরোহিত হইয়া মনে নানাপ্রকার ভোগবাসনার সৃষ্টি হইয়া তাহার 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইবারই আশঙ্কা। ধর্ম্মপথে বিচরণশীল অতিশয় যোগ্য অধিকারীদেরও সময় সময় এইভাবের সামান্য উদ্রেক হইয়াছে দেখা যায়। আজ সভ্য জগৎ যে স্বামী বিবেকানন্দ-ভাব ধারায় স্নাত হইয়া পরম শান্তি লাভের জন্য ব্যাকুল, সেই ভাব-ঘন-মূর্ত্তি শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীও যৌবনে নিজের মাতা প্রভৃতির অন্নসংস্থানের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষত্ব ছিল তিনি নিজের জন্য ব্যস্ত হন নাই এবং তাঁহার ব্যস্ততা অল্পকাল স্থায়ী থাকিয়া সাধারণ অধিকারীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে মাত্র। ধর্ম্মলাভ করিতে আসিয়া নিজেকে প্রবঞ্চিত না করিয়া যাহাতে ভবিষ্যৎ যাত্রিগণ পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইতে পারেন সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার ইঙ্গিত।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ বিষয়ে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে কত প্রশ্নেরই না উদ্রেক হয়? এক সময় এই দেশ জগতের মধ্যে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল—ঐশ্বর্য্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে—এমন কি যে দেশ হইতে যুগে যুগে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মানবহৃদয়ে শান্তিদান করিয়াছেন সে দেশের শতকরা নব্বই জন লোক অনাহার, অর্দ্ধাহার, নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কাটাইতেছে। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক দুইবেলা কোন রকমে খাইতে পায় এবং তথাকথিত ভদ্রসমাজে মিশিতে পারে। কিন্তু তাহাতেই কি শান্তি আছে—চলাফেরা, কথাবলা, বিদ্যাভ্যাস করা, কোন নূতন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণা করা, এমন কি

নিঃসম্বল হইয়া এদেশের চিরাচরিত প্রথানুসারে ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার মত যথেষ্ট সুযোগ আছে কি? অথচ সেদিকে চিন্তা করিবার মত সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত অনেকের লোপ পাইয়াছে। জানিনা এই প্রকারে চলিলে ভবিষ্যতে আরও কি পরিণতি হইবে!

অনেক সময় দেখা যায় অকাল বার্দ্ধক্য জর্জ্জরিত সুধীমণ্ডলী অপেক্ষাকৃত স্বল্পবয়স্কগণকে যুবকদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ করিয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতে যে দেশের উন্নতি যুবসমাজের হস্তেই নির্ভর করিতেছে বারংবার বলিয়া থাকেন। অবশ্য প্রত্যেক দেশের উন্নতিই যুবসমাজের হস্তে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন, সকলেইতো উপদেশ করিয়াই খালাস, আচ্ছা যৌবনের মাপকাটি কি? যৌবন ও বার্দ্ধক্য কেমন করিয়া স্থির করা যায়? যদি বলা যায় যে, যাহার ভিতর কর্ম্মপ্রবণতা আছে, যাহার ভিতর প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়, যে শুধু উপদেশ করিয়াই অবসর না নিয়া নিজেও জীবনে কিছু করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তাহাকেই যদি যুবক বলা যায় তবে কি তাহার উপর অতিরিক্ত গুণারোপ করা হইল? নিশ্চয়ই নহে। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, দর্শন যিনি যাহা নিয়া আছেন তাহাতেই যদি তাঁহার অধ্যবসায়, উৎসাহ, তিতিক্ষা প্রভৃতি দেখা যায় তবেই তাহাকে যুবক বলিতে হইবে। হায়—আলস্যে জড়িত, মোহে অভিভূত সমাজ তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়াও কর্ম্মপ্রবণতার দিকে মোটেই আগ্রহান্বিত না হইয়া অপরে যৌবন আখ্যা প্রদান করিয়াই আত্মপ্রতারণা করিয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহা কি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নহে?

দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের জাতি বার্দ্ধক্য ভোগ করিয়াছে, দীর্ঘকাল বিশ্রাম করিয়াছে—এখন আর বিশ্রামের অবসর বা আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশ্রামক্লান্ত-জনিত জাতি যথেষ্ট শক্তিই সঞ্চয় করিয়াছে—অন্ততঃ আমরা তাহাই মনে করিতে চাই এবং তাহার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান।

অথচ, আমাদের জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে মনে করিবারও কোন কারণ নাই। আমাদের সমাজ বা জাতি মন্দ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই—বরং ভালই বলিতে হইবে—তবে আরও ভাল হওয়া দরকার। আমাদিগকে মিথ্যা হইতে সত্যে বা মন্দ হইতে ভালতে যাইতে হইবে না, সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে এবং ভাল হইতে আরও ভালর দিকে যাইতে হইবে। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর, নিজের সমাজের উপর বিশ্বাস না রাখিলে কোন জাতি উন্নতি করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উত্থান ও পতন পাশাপাশি চলে। দীর্ঘকাল যে পরিমাণে বিশ্রাম করা হইয়াছে সেই অনুপাতেই এখন কর্ম্মশীল হইতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায় কাহারও সাধ্য নাই। ইতিহাসের দিকে একটু লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে সারা জগৎ জুড়িয়া একটা বিরাট শক্তির খেলা চলিয়াছে—সকলের ভিতরই সজীবতা আসিয়াছে—কোন জাতই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাই আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকি।

তবে আমাদের কোন পথে চলিতে হইবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে সভ্য সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, নব নব আদর্শ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের আদর্শ কি আমাদের গ্রহণীয়? তাঁহারা তো অর্থবলে, সৈন্যবলে, শিক্ষাবলে, শিল্পবলে সকল প্রকারেই আমাদের অপেক্ষা অনেক বড় — আমাদের দরিদ্র দেশের উপর সকলই তো অবাধ

আধিপত্য চালাইয়া বেশ আনন্দে আছেন! তবে তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়া আমরাও কেন তাঁহাদের মত সুখের অধিকারী না হই? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর রহিয়াছে। আচ্ছা, উঁহাদের সভ্যতা কত কালের, উঁহাদের আধিপত্যই বা কত কালের এবং উঁহাদের সুখ-দুঃখের মাপ-কাটিই বা কি? উঁহারা যাকে সুখ বলিয়া মনে করেন, যে সুখ লাভ করিয়া আনন্দে মসগুল হইয়া আছেন আমাদের মধ্যে কয়জন সেই আনন্দ প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছেন? আর উঁহারা প্রাণে প্রাণে কতটুকু আনন্দ লাভ করিতেছেন তাহাও কি বিচার সাপেক্ষ নহে? এই কয়েকশত বর্ষ পূর্ব্বেও যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পরিধেয় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে রং মাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন, গৃহাদির পরিবর্ত্তে বৃক্ষছায়া ও গভীর অরণ্যই যাহাদের আশ্রয় ছিল তাহাদের সভ্যতাই কি আমাদের আদর্শ? একদিকে যেমন কতগুলি যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করিয়া দেহটিকে অপেক্ষাকৃত সুখে রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন, নানাস্থানে যাতায়াতের নানাবিধ সুবিধা সুযোগ করিয়াছেন—অপর দিকে অন্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্যাকুল হইয়া বণ-সম্ভার বর্দ্ধিত করিবার জন্য উদ্বিগ্ন পড়িয়া লাগিয়াছেন না কি? কত প্রকার শান্তি বৈঠকই না কতবার হইল, কিন্তু বিন্দুমাত্র শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কি? তাহারা পরলোকে যাইয়াও অধিকতর দৈহিক সুখ ভোগের কল্পনাই করিতেছেন। দিবারাত্র দেহের চিন্তাতেই ব্যাকুল। যে ধর্ম্মযাজক অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, যিনি অধিকতর মনোহর দাম্পত্য জীবনের ব্যবস্থা করিতে পারেন তাঁহাকেই উঁহারা যোগ্যতর ধর্ম্মযাজক বলিবেন।

আর আমাদের দেশে? হাজার হাজার বৎসর যাবৎ এজাতি ও সভ্যতা চলিয়া আসিতেছে এবং তা আজও সগৌরবে বাঁচিয়া আছে। এই দেশ হইতে যে সমস্ত দার্শনিকতত্ত্ব সাহিত্য ও শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে সমগ্র সভ্য সমাজ গ্রহণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এ দেশ চিরকালই দৈহিক উপভোগকে অনিত্য-জ্ঞানে নিম্নতর আদর্শ করিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কোন কালে তরবারির সাহায্যে অন্য দেশে ধর্ম্ম প্রচারের কল্পনাই করে নাই। এ দেশ চিরকালই 'মোক্ষ'কেই আদর্শ করিয়াছে—এ জগতের সুখ এমন কি পরজগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে হেয় জ্ঞান করিয়াই আসিতেছে। আদর্শের দিক দিয়া আমাদের জাতি ও দেশ কত উপরে এখনও রহিয়াছে তাহাই বিচার করিয়া সকলকে চলিতে হইবে। হাজার হাজার বৎসরের মজ্জাগত স্বভাবকে যদি ত্যাগ করিবার প্রয়াস পাওয়া যায় তবে জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবারই আশংকা। সুখের বিষয় আমাদের মনীষিগণ পূর্ব্বাহ্ণেই সেই দিকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সেই ভাবেই দেশ চালিত করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত জাতীয় জাগরণের আন্দোলন দেশে গোড়া পত্তন করিতেছে তন্মধ্যে যে আন্দোলনে ত্যাগের, সংযমের, বা এক কথায় নিজস্ব ভাবের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে তাহারই অপেক্ষাকৃত সাফল্য হইতেছে না কি? অবশ্য অতিরিক্ত আদর্শবাদী হইয়া একটা বিরাট জাতিকে যদি অসম্ভব রকমের অল্পকালের মধ্যে উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাওয়া যায় তবে তাহাতে দূরদর্শিতার অভাবই বলিতে হইবে। আর যে সকল আন্দোলন এদেশের সংস্কার ও স্বভাব বিরুদ্ধ সেই সকল আন্দোলন-কারীরা কি প্রকার সাফল্য লাভ করিতেছেন,—বিংশতি শতাব্দীর ইতিহাস তাহার প্রমাণ। শত শত চরিত্রবান যুবক ভাব প্রবণতার বশে অদূরদর্শী আন্দোলনকারীর পরানুকরণ প্রিয়তার মোহে

চালিত হইয়া ভারতীয় আদর্শ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য অভিজ্ঞতা লাভ সময় সাপেক্ষ। তাই আশা করা যায় এ যুগের নিঃস্বার্থ চরিত্রবান মুষ্টিমেয় ত্যাগী ভারতবাসীর জীবনের প্রতিদানে তাহাদের পদানুসরণকারী ভবিষ্য যুবকগণ প্রকৃত আদর্শে চালিত হইতে পারিবে।

সত্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সরলতা, পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন কোন কাজই হইতে পারে না। অপরপক্ষে এই কয়টি গুণের সমাবেশ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘই চলিতে পারে না। অথচ সংঘ শক্তি ছাড়া কোন মহৎ কাজ হয় না। অসাধারণ শক্তিশালী মানব অবশ্য কোন সংঘের অধীনস্থ না থাকিলেও জগতে অনেক কাজ করিতে পারেন কিন্তু সংঘের অধীন না হইলেও তাঁহার মধ্যেও ঐ সমস্ত গুণরাজী থাকিতেই হইবে। অথচ অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মানবকেই কেন্দ্র করিয়া পুনরায় একটি সংঘ তৈয়ার হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে অনেকেই অসংযমের প্রেরণায় নিজ প্রতিভার অতিরিক্ত কল্পনা করিয়া সংঘের অধীনে থাকিতে প্রস্তুত হন না। ইহা একটি মারাত্মক জিনিষ। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বলিয়াছেন—'তোমাদের নিকট এই চাই—হাম বড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষ্যা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহা হইতে হইবে, এইটি চাই, পরে দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসিবে।' অবশ্য একদিনে এই সকল গুণ লাভ করা অসম্ভব। তবে সময়ে লাভ করিতেই হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থে আত্মসংযম ও একাগ্রতা বুঝায়। অবিবাহিত জীবন ভিন্ন ইহা অসম্ভব। যিনি জগতে এমন কিছু মহৎ কাজ করিয়া যাইতে চান যেজন্য তাঁহার দেশ ও সমাজ কিছু উপকৃত হইতে পারে তাঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচারী থাকিতে হইবেই। অনেক সময় দেখা যায় অন্তর্নিহিত সৎগুণের প্রভাবে কেহ কেহ সাংসারিক বন্ধনে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সৎকাজে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই পদস্খলিত বা আদর্শচ্যুত হইয়া নানা প্রকার স্বার্থ বুদ্ধি, দলাদলি, নীচতা প্রভৃতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া পড়েন। নিজেদের দেশের নানাবিধ আন্দোলন কারীদের ও তাহাদের সাফল্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই অনেকেই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। এ স্থলে হয়ত কেহ কেহ প্রশ্ন করিবেন বিবাহাদি না করিলে ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে? তাঁহাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই সমস্তই ভগবানের অভিপ্রায়—তুমি না হয় তাঁহার শেষ কাজটিই করিলে—তোমাকে তাঁহার সৃষ্টিই রক্ষা করিতে হইবে কে বলিল? তবে তাঁহার সৃষ্টির জন্য তোমার এত ভাবনা কেন? অনেক সময়ই কি আমরা নিজেদের অসংযম স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইয়া এই প্রকারে আত্মপ্রবঞ্চনা করি না? তারপর যদি তোমার সেই প্রকার ক্ষমতা না-ই থাকে অথচ যথেষ্ট বিত্তশালী হইয়া থাক বেশ তো তুমি সৎগৃহস্থ হইয়া সাধ্যানুসারে সমাজের কল্যাণ সাধন কর—সৎ পুত্রকন্যার জনক হও—আত্মপ্রবঞ্চনা না করিলেই হইল—আদর্শকে ছোট না করিলেই হইল। এই দেশে যদি কোন প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে প্রথমতঃ সংযমাদির সহায়ে ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তদ্ভিন্ন কোন কাজই সুদৃঢ় হইবে না। আমাদের দেশের কত প্রকার আন্দোলন, কত প্রকার প্রতিষ্ঠান, কত প্রকার যৌথ ব্যবসাই না নীচতা, স্বার্থপরতা, অসাধুতার দরুণ নষ্ট হইয়াছে! তাই যে কোন কাজই হউক না—সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য এমন কি রাজনীতি প্রত্যেকটিতেই ধর্ম্মকে অবলম্বন

করিয়া চলিতে হইবে। ভারতের বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারেই মূল আদর্শ থাকিবে ধর্ম্মলাভ। প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্যবসায় প্রভৃতির ভিতর দিয়া আবার ধর্ম্মলাভ কি প্রকারে হইতে পারে? সততা, সংযম, প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি সহায়ে যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায় সেই কাজেই চিত্ত মলিনতা হইতে স্বল্পকাল মধ্যে মুক্ত হইয়া থাকে এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে অতি সহজেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রাশি ধারণ করা সম্ভব হয়। অপর পক্ষে স্বার্থপরতা, অসংযম, নীচতা প্রভৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দিন দিন হয়তো দৃশ্যতঃ আর্থিক সচ্ছলতা, বাহ্যিক সম্ভ্রমাদি দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই তাহা ভেল্কিবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া থাকে। এই জাতি ও সভ্যতার প্রতি ধমনীতে উক্ত ভাবরাশি বিদ্যমান।

তাই আমাদের যুবকগণকে যেমন সর্ব্ববিষয়ে কর্ম্মঠ বা রজঃগুণসম্পন্ন হইতে হইবে, তেমনি আবার সর্ব্বদা জাতীয় আদর্শ 'ধর্ম্মই আমাদের মেরুদণ্ড' তাহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে।

আপাতঃ দৃশ্যমান নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য প্রভৃতিও শিক্ষা ও প্রকৃত ধর্ম্মভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হইবে। কাজেই তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই দূরীভূত হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে পাশ্চাত্যের শীর্ষস্থান মার্কিনদেশে বর্ত্তমানে অসংখ্য কর্ম্মপ্রবণ যুবক জীবনের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই, অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রসূত কার্য্যের পরিণাম স্বরূপে স্নায়বিক অবসাদ-জনিত নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য একেবারে ভুলিয়া যাইয়া আহার নিদ্রা ও নানাপ্রকার কামনা বাসনার প্রেরণায় যন্ত্রবৎ অতিরিক্ত স্নায়ুচালনার ফলেই এই প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া বাকী জীবনের জন্য স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে সর্ব্বদার তরে কর্ম্মীদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে আমরা যেন জীবনের প্রকৃত আদর্শ একেবারে ভুলিয়া যাইয়া কেবল মাত্র কর্ম্মপ্রবণ যন্ত্রে পরিণত না হই।

রজঃ গুণের সাধনা দ্বারা একদিকে আমরা নিজেদের দুঃখ দারিদ্র, নীচতা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষাবলীর সংশোধনে যেমন যত্নবান হইব অপর দিকে ভারতের প্রাণ, ভারতের মেরুদণ্ড ও জগতের একমাত্র শান্তি-দায়ক 'ধর্ম্ম'রূপ মৃতসঞ্জিবনীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব। আমাদের সকলকেই মনে রাখিতে হইবে ভারতের অস্তিত্ব রক্ষায় সকলেরই কিছু কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে—সকলেই সাধ্যানুসারে ইহার সেবা করিব—সকলেই আজ মানব-জাতির যৌবনে আসীন, কেহই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় নহি। গভীর তমঃ প্রকৃতিকে যেন সত্ত্ব বলিয়া ভ্রমে পতিত না হই—তবেই আমাদের পক্ষে উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ সম্ভব এবং তাহাতেই আমাদের কল্যাণ।

ব্রহ্মচারী ক্ষীরোদ

আণবিক তত্ত্ব

অধ্যাপক—শ্রীসুবর্ণ কমল রায় এম-এস-সি

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অবিরাম গতিতে সে পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। প্রতি বস্তু প্রতি জীবে এ চাঞ্চল্য বর্ত্তমান। বিশাল শরীরে যে আন্দোলন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাবয়বেও সেই আন্দোলন। আজ যে বস্তুটীর সত্তা আছে কাল হয়ত সে লুপ্ত। সহস্র বৎসর পরে বর্ত্তমান জগৎ নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। রামের অযোধ্যা, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও রাবণের লঙ্কা সবই এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র। বাস্তব রাজ্যে উহাদের কঙ্কাল পর্য্যন্ত অবশেষ নাই, অধুনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মনের খোরাকে পর্য্যবসিত। বিরাট পর্ব্বত ধূলিকণায় শেষ প্রাপ্ত হয়, আবার সেই ধূলিকণার সমষ্টিই গিরিরাজরূপে দণ্ডায়মান হয়। বিশ্বসংসার এক অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে "অবিরাম বেগে নিয়ত ধায়ন" কোন্ যন্ত্রী এক শুভমুহূর্ত্তে এই যন্ত্র গতি ধরাইয়া দিয়াছেন, সে অবধি ইহার বিরাম নাই। (Law of Inertia)

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। সেই জ্ঞানী ঋষিদের জ্ঞানের গভীরতা তলাইয়া দেখা বর্ত্তমান সভ্যজগতের সম্ভব নয়। নব্য বিজ্ঞানের আলোতে জগৎ প্লাবিত। ঋষিগণ সেদিক দিয়া কতদূর উন্নত ছিলেন তাহা পরিমাণ করার মাপকাঠি আমাদের নাই। শুনা যায় খৃষ্টের জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষ হইতে রসায়নের মূলসূত্র—বস্তু গঠন সমস্যা আলোচিত হইয়াছিল; অর্থাৎ সমস্ত বস্তুরই পরিণতি, অণু পরমাণুতে এ ধারণা তাহাদের ছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে গ্রীকগণ ভারতবাসীর নিকট ইহা পাইয়াছেন। গ্রীকরাও ইহাদের মত অতিমাত্রায় কাল্পনিক ছিলেন। প্রকৃতির নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। উক্ত দার্শনিকদিগের মধ্যে লুক্রিসিয়াসের (Lucritius) নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনিই প্রথম বস্তুগঠন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। তাঁহার মতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। আকাশ পাতাল এমন স্থান নাই যেখানে এই ক্ষুদ্রতম রেণুর স্থান নাই। আবার ইহাদের স্বভাবধর্ম্মও অদ্ভুত। সঞ্চরণ ও গতিশীলতাই ইহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ঐরূপ ছুটা-ছুটির ফলে উহাদের মধ্যে কখনও মিলন কখনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এভাবে সমষ্টিগত মিলনে বস্তুগঠন ক্রিয়া ও সংঘর্ষের ফলে ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। অবয়ব বৃদ্ধি হইলেও উহাদের চঞ্চলতা দূরীভূত হয় না। নিজ নিজ কক্ষমধ্যে সেই একই ঘূর্ণন চলিতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সঞ্চরণ পটু পরমাণুর সমষ্টিই যাবতীয় প্রাণী ও অপ্রাণী দেহ। আঘাত বা সংঘর্ষ উহাদের জীবন, ফলে কখনও বিবর্দ্ধন কখনও সঙ্কোচন। লুক্রিসিয়াসের মতে পরমাণুগুলি বিভিন্ন অবয়বের এবং উহারা অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী। যদিও প্রাণী ও অপ্রাণী জগতে সৃষ্টি এবং ধ্বংসলীলা পরিদৃশ্যমান, পুরাতনের স্থান নূতনের দ্বারা সংশোধিত, তথাপি উহাদের আকৃতির মূল সত্তা পরমাণুগুলি আজও চিরন্তন সত্য বলিয়া সমাদৃত।

উহারা ক্ষুদ্র এবং এত ক্ষুদ্র যে মনুষ্য চক্ষুর অন্তরালেই চিরদিন অবস্থিত—এমন কি কল্পনায়ও ছবি আঁকা ভার। এত ক্ষুদ্র বলিয়াই উহাদের চাঞ্চল্যের পরিধিও কম—সে জন্য সাধারণ শরীরে সেই গতি নির্দ্দেশ করা যায় না; তখন তাহাদের সুস্থির বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। লুক্রিসিয়াসের কল্পনা যে অনেকটা সত্য তাহা বর্ত্তমান জগৎ স্বীকার করেন। উক্ত দার্শনিকগণ তাহাদের কথার প্রতিধ্বনি সূর্য্যকিরণে ধূলিকণার নৃত্য হইতে পাইয়াছিলেন।

উন্নতশীল গ্রীকজাতির ধ্বংসের সাথে সাথে তাহাদের এরূপ অর্থযুক্ত কল্পনা দ্বিসহস্র বৎসর প্রায় লুপ্ত ছিল। তৎপর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ডালটন (Dalton) পুনরায় উহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। ডালটনের পরমাণুবাদ (atomic theory) একটী জগৎ বিখ্যাত তত্ত্ব এক রসায়ন শাস্ত্রের মূল মন্ত্র স্বরূপ। তিনি বলেন "প্রত্যেক বস্তু, যৌগিক বা মৌলিক, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি মাত্র। ইহাদের নাম পরমাণু (atom) উহারা মৌলিক পদার্থের এত ক্ষুদ্র পরিণতি যে, উহাদের আর ভাগ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের জন্য আলাদা আলাদা পরমাণু আছে, তাহারা সমগুণ ও গুরুত্ব বিশিষ্ট, কিন্তু অপর পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যখন কোন নূতন বস্তু সৃষ্টি হয়, প্রকৃতপক্ষে সেখানে পরমাণুরই মিলন হয়। দরিদ্র কোয়েকার (Quaker) গৃহে যাহার জন্ম, সামান্য একটু লেখাপড়া যাহার প্রথম সম্বল ছিল, সেই ডালটন উত্তরকালে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক হন, এবং রসায়নের মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। ডালটন কিন্তু ততটা রাসায়নিক ছিলেন না, গণিত বা পদার্থ বিদ্যায় তাহার বেশী ঝোঁক্ ছিল। কি ভাবে কাহার দ্বারা কোন দ্বার উদ্ঘাটিত হয় তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পরমাণুবাদ ধারণা করিবার পর তিনি ইহাদ্বারা কতকগুলি রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল তদন্ত করেন এবং তাহা হইতে কিছু কিছু সমর্থন পান, পরে সুইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বার্জিলিয়াস্ (Berzilius) ও বেলজিয়মের ষ্টাস্ (Stas) নানা পরীক্ষা দ্বারা ডালটন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

ডালটনের পূর্ব্ববর্ত্তী রসায়ন একটা বাজিকরের ব্যাপার ছিল। কি ভাবে অপধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে ইহাই ছিল উহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। আবার জীবন সরস ও ব্যাধিমুক্ত করিবার দিকে উহাদের কম চেষ্টা ছিল না। সে জন্য নানাবিধ রসযুক্ত পানীয় ও বৃক্ষাদির রস উহারা সেবন করিত। এ সমস্ত চোর মধ্যে সময় সময় এরূপ আশ্চর্য্যজনক কৌতুকপূর্ণ পদার্থ উহাদের হস্তগত হইত যে উহার গুণাবলী আলোচনা করিয়া কিছু দিন অতিবাহিত হইত। রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ধারা বাহিক প্রণালী ছিল না। মনীষী ডালটন সর্ব্বপ্রথম এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পদার্থের আভ্যন্তরীণ, গঠন বা আণবিক পরিণতি, পরমাণুর একত্র সন্নিবেশ ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি কোন্ কোন্ পদার্থে কি কি মৌলিক পদার্থের পরমাণু বর্ত্তমান, তাহাদের আবার বন্ধুত্বের ধারা কি—এ সমস্তই তখন অতি সহজ ও বোধগম্য হইল। ৯২টী মৌলিক পরমাণুদ্বারা বিশ্বসংসার গ্রথিত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যেমন বন্ধুত্বের ক্রম আছে—রাম শ্যামের মধ্যে যে ভালবাসা, রাম যদুতে তাহা নাই, আবার রাম মধুতে ভীষণ দ্বন্দ্ব, একে অন্যের ছায়া মাড়ায় না; সেইরূপ পরমাণুদের মধ্যেও ভাব অভাবের খেলা লক্ষ্য করা যায়। এও যেন একটা সংসার, যেখানে মিলন বিচ্ছেদ সবই

আছে। ওও এক অভিনব বিরাট সমাজ, মৌলিকত্ব ভেদে প্রত্যেকটী পরমাণু সেই সমাজের সভ্য। উহারা মেলা মেশা দ্বারা যত প্রকার ব্যক্তি বা বস্তু দেহ সৃষ্টি করিয়াছে। মনীষী ডালটন জীব ও পদার্থবিষয় সম্বন্ধে এরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিলেন যে দেখিতে দেখিতে উনবিংশ-শতাব্দীতে রসায়ন এক অপূর্ব্ব উন্নত বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রত্যেকটী মৌলিক পদার্থের স্বভাব, চেহারা, হাবভাব, গড়ন ব্যবস্থা সমস্তই এখন রসবিশারদের নিকট সুস্পষ্ট। কোন পথে চলিলে কোন জিনিসটী সুলভ হইবে, ইহার গঠন প্রণালী হস্তগত হইবে সে বিষয়ে রসরাজ এখন নিশ্চিন্ত। একমাত্র অঙ্গারের আকৃতি অনুধাবন করিয়া তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন। অঙ্গারের পরমাণুগুলি নিজেদের মধ্যে এরূপ হাতধরাধরি করিয়া দাঁড়াইতে পারে যে ঐরূপ অবস্থানের ফলে সহস্র সহস্র অতি মনোরম পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য ও উদ্ভিদ শরীর, যাবতীয় আহার্য্য পদার্থ, নানা বৈচিত্র্যের রং, সুগন্ধি দ্রব্য আরও অনেক কিছু পদার্থের মধ্যে অঙ্গার পরমাণুর লীলাখেলা দেখা যায়। যেখানে সাধারণ দৃষ্টিতে নীল, সবুজ, লাল রং বোধ হয় সেখানে কেমিষ্ট (Chemist) দেখেন কতকগুলি অঙ্গার অক্সিজেন (oxygen), নাইট্রোজেন (Nitrogen), প্রভৃতি পরমাণু বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে হস্তবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সত্যই ডালটন আসিয়া কেমিষ্টের এক দিব্য দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন। ঐ যে ভয়ঙ্কর ক্লোরিন গ্যাস (Chlorine gas), যাহাকে যুদ্ধে কালান্তক যমরূপে ব্যবহার করা হইত, তাহারই পরমাণু কেমন শান্তশিষ্ট ভাবে লবণের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এমন যে মধুর শর্করা রাসায়নিকের দৃষ্টির কাছে তাহাকেও লজ্জা পাইতে হয়। তাহার আভ্যন্তরীণ গঠনের সম্বলমাত্র কতকগুলি হাইড্রোজেন (Hydrogen), ও অক্সিজেন পরমাণু, যন্ত্রীর খেয়াল মত অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভাবের বন্যায় ডুবিয়া আছে। রাসায়নিক যখন বলেন যে বহুমূল্য হীরকখণ্ড ও আমাদের পাকশালের অঙ্গার একই পরমাণুর সমষ্টি তখন সাধারণ লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এমন কারিকর কে যিনি এরূপ ক্ষুদ্রতম পরমাণু দ্বারা বিশ্বে এত কৃতিত্ব ফলাইয়াছেন। সেই কারিকর যিনিই হউন, বৈজ্ঞানিক তাঁহার গঠনকৌশল কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছেন। একবার যদি জিনিষটাকে ভাঙ্গিয়া উহার পরমাণু সন্নিবেশ নমুনা লক্ষ্য করিতে পারেন, তবে উহাদের গঠন করার চেষ্টা হইতে পারে। অধুনা গবেষণাগার হইতে প্রকৃতিজাত বহু জিনিস বাহির হইতেছে। প্রকৃতি কোন পথে, কোন্ গোপন হস্তে বিশ্বকারখানায় কাজ করেন, তাহা অবশ্য কেহই অবগত নন, তবুও তাঁহার সুনিপুণ হস্তের তৈয়ারী জিনিসের মত সামগ্রী যে আজ মানুষের যত্নে গঠন করা সম্ভব হইয়াছে, তাহাতেই আমরা ধন্য।

উনবিংশ শতাব্দীর গবেষণা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় মনীষী ডালটন ১৮০৩ সনে পরমাণুকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন তাহার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। বড় বড় মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রসায়নের বহুদিকে উঁহাদের চিন্তাধারা ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরমাণুকে শেষ সত্তা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে টমসন ও ক্রুক্স্ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক পরমাণুকে নিয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করেন। কোন একটা বায়ুশূন্য কাঁচ গোলকের মধ্যে খুব জোরাল বিদ্যুৎ চালিত করিয়া দেখিলেন ঋণাত্মক ফলক (negative electrode) হইতে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র রেণু

ছুটিয়া বাহির হইতেছে এবং ধনাত্মক ফলকের (positive electrode) উপর পতিত হইতেছে এবং ইহার ফলে কাঁচের গোলকটী সবুজবর্ণ আলোতে ভরিয়া গিয়াছে। টমসন (Thomson) ও ক্রুক্স্ (Crookes) দেখিলেন যে ঐ ক্ষুদ্র রেণুগুলি ক্যাথোড্ রশ্মি (Cathode rays) ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বিশিষ্ট ও প্রায় জড়মান (mass) হীন। হাইড্রোজেনের পরমাণু সবচেয়ে হাল্কা, এই রেণুগুলি ইহা হইতে প্রায় ১৮০০ গুণ আরও হাল্কা। বিজ্ঞানের বলে হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব বা জড়মান (mass) এখন আমরা অবগত হইয়াছি। একটী পরমাণুর ওজন—০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৪ গ্রাম। (১গ্রাম= ১৫ গ্রেণ) উক্ত রেণুগুলির গুরুত্ব ইহা হইতে অনুমান করা যায়।

টম্সনের আবিষ্কার আবার নূতন আন্দোলন সৃষ্টি করিল। তিনি তাঁহার এ গবেষণার ফল যখন সভ্য মহলে প্রচার করিলেন, অনেকে বিশ্বাস করিলেন, আবার জার্ম্মাণীর মত সন্দিগ্ধ জাতি মোটেই আমল দিলেন না। বিজ্ঞান জগতে ইংরেজ ও জার্ম্মাণদের মধ্যে মাঝে মাঝে এরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ও জার্ম্মাণগণ এক বিরুদ্ধদল গঠন করিয়া টমসনের দোষারোপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইলেন এবং এ যুদ্ধের ফলস্বরূপ ডালটনের পরমাণুবাদে কুঠারাঘাত হইল। টমসনের অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি পরমাণুর মধ্যে আরও ক্ষুদ্র কণিকার খেলা দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন প্রত্যেকটী পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন (Electron) ও হাইড্রোজেন পরমাণুতুল্য জড়মানবিশিষ্ট ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা বা প্রোটন (Proton) পাওয়া যায়। টমসনের এই নূতন আন্দোলনে মার্কিন ও ইউরোপের বহু বৈজ্ঞানিক উদ্বেলিত হইলেন এবং উঁহাদের গবেষণার দানে ইহা আরও পরিস্ফুট হইল। ডালটনের সূক্ষ্ম পরমাণুকে এ ভাবে ছেদন করা এক বিস্ময়ের ব্যাপার হইল। টমসন তাঁহার অমিত কার্য্যশক্তিদ্বারা পরমাণুকে এক অভিনব সুন্দর কাঠামোর উপর দাঁড় করাইলেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক পরমাণু ধনবিদ্যুৎ বিশিষ্ট একটি বীজ (nucleus)। ইহাতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনগুলি সন্নিবেশিত আছে। বীজ স্বরূপ গোলক কণিকার গুরুত্ব ইলেকট্রন হইতে শত সহস্রগুণ বেশী। সন্নিবেশিত ইলেকট্রনগুলির সমষ্টিগত ঋণশক্তি ঐ গোলকের ধনশক্তি দ্বারা সার্থকতা লাভ করে। ইলেকট্রনের যদিও ঘনমান (mass) নাই ঐ বীজের ঘনমান দ্বারা পরমাণুর ঘনমান সংরক্ষিত হয়।

টমসন যে পরমাণুকে আরও ক্ষুদ্রাকারে বিভক্ত করিলেন তাহাতে সকলের মন পরিতুষ্ট হইল না। কেবল বিশ্বাসিগণ কাজ করিবার নূতন সূত্র পাইলেন। সাধক পাগল ঐ বৈজ্ঞানিকগণ টমসনকৃত দেহাকৃতিতে নূতন নূতন আলো ঢালিতে লাগিলেন। এই পৃথিবী ৯২ প্রকার পরমাণুর লীলাক্ষেত্র। যখন টমসন বলিতেছেন উক্ত প্রত্যেকটী পরমাণুই প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র তখন ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুতে পার্থক্য কি? উত্তরে উহারা বলেন যদিও পরমাণু সমষ্টি প্রোটন ও ইলেকট্রনগত প্রাণ উহাদের বিভিন্নতা প্রোটন ও ও ইলেকট্রন সংখ্যার ও দাঁড়াইবার ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।

টমসনের সময়ে ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে একটী কাজের সাড়া পড়িয়া যায়। ঠিক্ এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক রঞ্জেন (Roentgen) তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত আলোকরশ্মি এক্সরে (Xray) আবিষ্কার করেন। এদিকে সেই স্বনাম ধন্যা পোলীয় মহিলা ম্যাডাম কুরী ও তাহার ফরাসী স্বামী প্যারিতে বসিয়া রেডিয়াম ধাতুর সন্ধান

পায়। রঞ্জেন ক্রুক্স্ নলে (Crooke's tube) ইলেকট্রন বা ক্যাথোড্ রশ্মির পরীক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত ক্যাথোড্ রশ্মি প্রকৃতই ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার স্রোত কিংবা একপ্রকার আলোকরশ্মি তাহা পরীক্ষা করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। টম্‌সনের ন্যায় তিনিও স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে ক্যাথোড্ রশ্মি (Cathode rays) ঋণতড়িৎ সংযুক্ত একপ্রকার জড়কণা বই অপর কিছু নহে। রঞ্জেন আরও লক্ষ্য করিলেন যে ক্যাথোড্ রশ্মি বা ইলেকট্রন যেই ধন ফলকের উপর পতিত হইতেছে তাহা হইতে এক নূতন আলোকরশ্মি স্ফুরিত হইতেছে। এই রশ্মির বার্ত্তা পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিলেন না, এমন কি ইহা সুযোগ্য টমসন ক্রুক্সের দৃষ্টিও এড়াইয়াছিল। এই আলোর বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা অস্বচ্ছ পদার্থকে স্বচ্ছ করিতে পারে। এই অদ্ভুত রশ্মি যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা কেবল বস্তু বা ব্যক্তি মাত্রের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহার আগাগোড়া উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাহা নহে, প্রত্যেক দেহের পরমাণুর অবস্থান বিধি ও উহার সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেক শরীরে উক্ত অণুগুলি কি ভাবে সংযোজিত আছে, কতটা দূরে একে অন্য হইতে অবস্থান করে সমস্তই ঐ আলোধারা দান করিয়াছে।

এদিকে ম্যাডাম কুরী ও তাহার সুযোগ্য স্বামী কর্ম্ম সফলতায় হাবুডুবু খাইতেছিল। তাহাদের আবিষ্কার ডাল্‌টনের পরমাণুকে আরও উন্মুক্ত করিল। ধাতু জগতে উহাদের দান একেবারে বিশ্বছাড়া। সত্য বটে রেডিয়াম একটী ধাতু কিন্তু এরূপ কৌতুকময় ধাতু কেহ কোন দিন কল্পনায়ও দেখেন নাই। এ যেন একটী ক্ষুদ্র জলন্ত আগ্নেয়গিরি ইহার দেহ হইতে ত্রিবিধ শক্তি অনর্গল বিচ্ছুরিত হইতেছে। উহাদের বৈজ্ঞানিক নাম—আলফা (Alpha) বিটা (Beta) ও গামা (Gama)। আলফা ও বিটা জড়মান বিশিষ্ট বিদ্যুৎ কণা এবং গামা একরূপ যে জাতীয় আলোক রশ্মি। উহাদের মধ্যে আলফা কণাগুলি হিলিয়াম নামক মৌলিক পদার্থের পরমাণু। কেবল ইহাতে বহির্ভাগের ইলেকট্রন দুইটী নাই—এজন্য আলফা কণাগুলিতে ধনবল (positive charge) পাওয়া যায়। বিটা কণিকাগুলি আমাদের পরিচিত ইলেকট্রন ক্যাথোড্ রশ্মি হইতে দ্রুত গামী। রেডিয়াম ধাতু মৌলিকত্বের দাবী করে অথচ হিলিয়াম কণা ইলেকট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কণিকা সমষ্টিতে ইহা গঠিত। সুতরাং জড় মানবিশিষ্ট পরমাণুই যে ধাতু মাত্রের শেষগতি নয় রেডিয়াম তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন (positron) প্রভৃতি শক্তি পুঞ্জই সকলের শেষ অবস্থান করে। মানুষ গরু আস্‌বাব পোষাক ঘরবাড়ী এ সমস্তের অস্তিত্ব কোথায়? সবই যেন মায়ার পোষাক বা ভেল্কিবাজি, কতকগুলি তড়িৎকণা—মায়াবাদ।

রেডিয়াম যে মৌলিক পদার্থের গোড়ায়ে আঘাত করিয়াছে তাহাই নহে ইহা হইতে একটী অপূর্ব্ব অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছে। এল কেমিষ্টের (Alchemist) চেষ্টা এতদিনে সার্থক হইল। ইলেকট্রন, প্রোটন সংখ্যা অদলবদল করিয়া—অপধাতু হইতে উৎকৃষ্ট ধাতু তৈয়ার করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হিলিয়াম নামক মৌলিক গ্যাস্ রেডিয়াম হইতে উৎগত হইল। ইউরেনিয়াম ধাতুর মধ্যে রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়াতে অনেকে ইউরেনিয়ামকে ইহার বহুদূরের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন। আবার রেডিয়াম যখন একেবারে নিঃশেষিত হয় তখন সীসক (Lead) মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কাজেই সীসককে রেডিয়ামের অধস্তন নিম্নপুরুষ বলা যায়।

কতকগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটন যদি মৌলিক পদার্থের পরিচয় হয় তাহা হইলে উহাদের নাড়াচাড়া বা কম বেশী দ্বারা এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে পৌছান সম্ভব হইবে। অপরদিকে রেডিয়াম পরমাণুর ভাঙন দ্বারা এত শক্তি যুক্ত হয় যে সরিষা ভোর রেডিয়ামের সাহায্যে একখানি রেলগাড়ী একহাজার বৎসর চলিতে পারে। দুনিয়ায় শক্তির মূল উৎস কোথায় ইহা দ্বারাই স্থির করিতে পারি। এ সূক্ষ্মতম মহালে এত এত পুঞ্জীভূত শক্তি কে রাখিল? এজন্যই ঋষি বলিয়াছেন "অণোরণীয়ান্"।

যদি প্রত্যেকটী পরমাণুতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ বিশিষ্ট একটি বীজ (nucleus) থাকে এক ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ইলেকট্রন একটী সূক্ষ্ম সৌর জগৎ সৃষ্টি করে তাহা হইলে বহির্জগতের সৌরমণ্ডলের সাথে তুলনা করিয়া পরমাণুগঠন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বোর (Bohr) এ বিষয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন এবং ব্যাপারটা যে অনেকটা ঐরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীজের মধ্যে নাকি প্রোটন ইলেকট্রন দুই আছে। কিন্তু সেখানে উহারা ঘন সন্নিবেশিত এবং প্রোটনের মাত্রা বেশী; সেজন্য উক্ত ধনাত্মক শক্তিকণার (প্রোটনের) সাথে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ঋণাত্মক শক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকারে ইহার চতুঃপার্শ্বে ঠিক উপগ্রহের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের গতিবিধি সম্বন্ধে নানাপ্রকার জটিল তত্ত্ব আছে, বোর (Bohr) ও অন্যান্য মনীষিগণ প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান আজ কিসের আয়োজনে ব্যস্ত? মানুষের অবস্থা কি? কোথায় তাহাদের শেষগতি? বিরাট কি সূক্ষ্ম কোনটা সত্য? বিশাল পর্ব্বত, অকূল জলধি—সকলের পেছনেই সূক্ষ্ম বর্ত্তমান; আবার সূক্ষ্মের পেছনে এ কোন অসীম শক্তির বাহুত্ব। তিনিই কি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"? ইলেকট্রন যেমন জড়মানহীন ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা, ঠিক সমশক্তি বিশিষ্ট জড়মানহীন ধনাত্মক কণা বা পজিট্রন (Positron) ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুইটী বিরুদ্ধ শক্তির খেলা এই সংসার। জোয়ার ভাটা, আকর্ষণ বিকর্ষণ, সৃষ্টি ধ্বংশ এসমস্তই উহাদের লীলাখেলা। একটী ইলেকট্রন ও একটী পজিট্রনের মিলনে যে সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয় তাহা যেন নির্গুণ ব্রহ্মের ক্ষেত্র বলা যায়। আবার একটী ইলেকট্রন ও একটী প্রোটনের ঘনসমাবেশ ও অপর একটী সাম্যাবস্থা পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ইহাকে নিউট্রন (neutron) নামে অভিহিত করেন। এখানে গুরুত্ব বিশিষ্ট শান্তভাব। নিউট্রনকে কেহ কেহ শূন্যবাদে ও পর্য্যবসিত করেন; তখন ইহাতে না আছে ইলেকট্রন, না আছে প্রোটন—আছে কেবল প্রোটনের গুরুত্ব লইয়া এক অদ্ভুত শূন্যাবস্থা। জানিনা হিন্দু-ঋষিদের দার্শনিক তত্ত্বের পথে এসমস্ত প্রত্যক্ষ সত্যের সামঞ্জস্য আছে কিনা। সাধক ইহার মীমাংসা করিবেন।

———

শক্তি ও শান্তি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

আনন্দময় সংসারে আনন্দের খেলা—আনন্দের মেলা, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ নাচে, কেহ গায়। কেহ চলে, কেহ চলিতে পারে না। তাতে অপরেরই বা কি আনন্দ! পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিত অহিত, ভাল মন্দ সে কি—তাহা বুঝিবা কেহ সুস্পষ্ট জানে না। জানিতে চেষ্টা করিলেও জানিতে পারে না। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, এসব মনের অবস্থা, সৃষ্টির আদিতে এসব কিছুই ছিল না। কেহ বলেন সব জলময় ছিল, কেহ বলেন সব অন্ধকারময় ছিল। পরে ক্রমোন্নতির পরাকাষ্ঠায় মানবের সৃষ্টি। আবার মানবের বুদ্ধিবৃত্তি, অন্তঃকরণের ব্যাপাব সব চেয়ে আশ্চর্য্যের। এখানে বেদনার ভাবে বেদের প্রকাশ—জ্ঞানের আরম্ভ। ঐখানে ঐ ভাবগুলি বোধ সাপেক্ষ মনের বিভিন্ন সময়ের মাত্র বিভিন্ন ভাব প্রকাশক। যাহা একজনের সুখের, তাহা অন্যের দুঃখের। একের আনন্দে, অন্যের নিরানন্দ। সুতরাং এগুলি তারতম্য মূলক। সুখ দুঃখ উভয়েই জীবনের সাড়া আছে। সব তারেই সুর বাজে। ঝঙ্কার উঠে। হৃদয় কাঁদে মানুষ সত্য চায়, বৃহদারণ্যকে আছে 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'। এই হল সকলের গোড়ার কথা। এখানে কি সৎ কি অসৎ, কি তমঃ কি জ্যোতিঃ, কি মৃত কি অমৃত এই যে ভেদাভেদ ইহার উপর বিভিন্ন মতে বিভিন্নপথ। অনুভবকারীর উপলব্ধিও চিন্তার উপর ইহার গূঢ়ার্থ নিহিত। এজন্য তন্ত্র মন্ত্র। তন্ত্রের আদি শক্তির রূপ তাই বুঝি দেওয়া হইয়াছে কাল, সে কারণ দেবী কালী। সব রঙের একত্র সমাবেশেই সাদা রং। সাদার উপর কালোর রেখাপাতেই অক্ষরের সৃষ্টি। সেজন্য বুঝি সত্ত্ব তমের মিলনে শিব শ্যামায় সৃষ্টির সৃজন। রজে পালন তমে ধ্বংস, অসামঞ্জস্যেইত সৃষ্টি। রুদ্র রূপই উহার কারণ। সেজন্য মহাদেব সত্য-সুন্দর শিবসুন্দর। প্রতিদিনই নূতনের জন্ম পুরাতনের মৃত্যু। অন্ধকার সূর্য্য কাল নাই, কালকের তা পরশ নাই, অথচ সূর্য্যের প্রতিদিন উদয় অস্ত আছে এ অতি সত্য। এ যাওয়া আসার কারণ কি? কেন এমন হয়, কে উত্তর দিবে? সূর্য্য চিরনূতনে' চিরপুরাতন। তবে কি আমরা পুরাতন? বিজ্ঞানে এর সদুত্তর আজিও পায় নাই। দর্শনে বলিতেছে "ত্র্যম্রাত্মকতা"। নামরূপ কর্ম্মময় সংসারে বীজ অঙ্কুরের কার্য্যকারণ ভাব অনাদি অনন্ত। সংস্কারই এ সকলের মূলে। অদৃষ্টই অভিব্যক্তির কারণ। এই অদৃষ্ট কি? ইহার কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। কেহ অনাদি মহাশক্তি, কেহ অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম, কেহ অঘটন ঘটন পটিয়সী চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন। সকলের জ্ঞান এখানে পঙ্গু, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সাধনা, কি চিন্তা এই মহাসত্যের কারণ নির্দ্দেশে সর্ব্বত্র সকলে সদা মহা ব্যস্ত। এই পরম সত্য উপলব্ধির বলিয়া কেহ নির্ব্বাক্ কেহ কূল না পাইয়া অব্যক্ত, অজ্ঞেয় বলিয়া নিরস্ত। পাত্র পূর্ণ হইলে আর শব্দ নাই। সেজন্য অজানার খোঁজে জানার শেষ, সীমানার শেষই অসীম।

যখন সবার এ অমীমাংসিত অবস্থা তখন দুদিনের তরে এত হিংসা দ্বেষ, মারামারি, কাটা-

কাটি কেন? শক্তি শাস্তির জন্যই এত মাথা ব্যথা কিসের? সহজ অব্যাকৃতা প্রকৃতির পথে চলিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়। শক্তি সামর্থ্যের তারতম্যে সব নিয়মিত হয়। কার্য্যতঃ চক্ষুর অন্তরালে তা হইলেও দৃশ্যতঃ তা হয় না। ইহার কারণ মানব দেখাতে চায় যে মানব মানব। মানব সামাজিক ভাবে থাক্তে ভালবাসে। সমাজ গঠন করতে গেলে সব স্বাধীনতা দেওয়া চলে না। কোন কোন স্থানে তার ছাট কাট চাই-ই চাই। নচেৎ মানুষের গড়া সমাজ থাকে না। তাই শাস্তির ব্যবস্থা। তাহলে সমাজ শাসন সব বাধনের, মুক্তির নয়, অথচ মানবের মন চির-উন্মুক্ত, চির প্রসারিত, চির উদার। মুক্তির জন্য সদা লালায়িত, সদা চেষ্টিত। ইহা না পাইলে যেন পূর্ণানন্দ হয় না। রস জমে না। মনে কিছুই ভাল লাগে না। পূর্ণতার পরিণতি হয় না। হায়, মানব মানবত্বের পরিণতির কি অন্তরায়? এইত সমাজ, এইত সভ্যতা, এর আবার এত গৌরব! এই মিথ্যাচারের মিথ্যা ব্যবহারের কি না অনর্থই সংঘটন হইতেছে? আচার ব্যবহারের তাড়না—ধর্ম্মের বহিরাবরণ। লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ সব স্বার্থের বিকার—সমস্তই দৈহিক জীবন ধারণের উপায় ভিন্ন আর কি? লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বন্ধন, ছেদন এসব শক্তির হীন পরীক্ষা। শাস্তি কি শান্তির? শক্তি কি কেবল শাস্তির জন্য? শাস্তি কি কেবল দমনের জন্য? তবে গঠনের, সংশোধনের পথ কোথা? কর্দ্দম পুড়াইলেই কঠিন ইষ্টকে পরিণত হয়, কোমলত্ব থাকে না। গঠন আর তখন সম্ভব হয় না। অপরাধ—প্রকৃতির প্রবৃত্তির তাড়নায় একের অন্যের মন গড়া তথাকথিত স্বার্থ রক্ষার্থে সমাজের শাস্তির নামে সংশোধনের আবরণের কতকগুলি নির্ম্মম কঠোর বাধ ভাঙ্গা বইত নয়। একজন চায় উড়তে, অন্যে চায় বাঁধতে। একে চায় বাঁচতে, অন্যে চায় মারতে। একে চায় হাঁটতে, অন্যে চায় ধরতে। এইত বর্ত্তমানে বিশ্ব মানবের মানসিক গতি। তাহলে দেখা যাইতেছে সসীম মানব চায় অসীম প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে। খণ্ড শক্তি চায় অখণ্ড অনন্ত শক্তিকে দমনে রাখ্‌তে, একি সম্ভব? তাই বুঝি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া, যাকে তোমরা বিপ্লব, বিদ্রোহ বল।

তাই বুঁঝি মাঝে মাঝে চিরাচরিত পথের আবর্জ্জনায় পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রমে ভাঙ্গা গড়া যাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলা হয় এবং এই জন্যই যুগে যুগে প্রকৃতির দুলাল তাহার খেয়ালে দু-একজন মহা শক্তিধরের আবির্ভাব—যে সমাজ মানে না, শাসন মানে না, বাঁধন মানে না, যার শক্তির বন্যায় সব আবর্জ্জনা ভেসে যায়। সমাজ আবার নূতন করিয়া গড়ে—ধর্ম্ম আবার সংস্থাপিত হয়। সৃষ্টি রক্ষা হয়। মহাশক্তির প্রকাশে মানবের ভুল ভাঙ্গে—সমাজ গড়ে—আইন-কানুন নিয়ম সব বদলায়। রীতিনীতি শাসন বাঁধন আবার নূতন হয়। তারা যেন অন্ধকারে জ্যোতিষ্ক। তাদের আলোকে অন্ধকার সব কাটতে থাকে। তাদের কেহ বলে বিপ্লবী, কেহ বলে বিদ্রোহী, কেহ বলে অতিমানব, কেহ বলে অবতার। কেহ বলে এ যুগের ফল, কেহ বলে এ প্রকৃতির খেয়াল, কেহ বলে এ শক্তির লীলা।

এরা সাধারণ মানুষ হইতে বিভিন্ন। তাদের ভাব ভাষা, কাজকর্ম, সব ভিন্ন রকমের। তাদের একটা নিজের বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যের শক্তির সামর্থ্যে তারা তাদের অন্তরালোকে ভবিষ্যৎ যেন দেখিতে পায়। সেই ভবিষ্যতের আশা পরিপূর্ণ করতে নিজেদের শক্তির বলে, বিবেকের বাণীতে তখনকার মানবের পূর্ণতার পরিপন্থী আচার ব্যবহার সব দলিত, মথিত করিয়া চলিয়া যায়। সমাজের শক্তিধর তাহাদিগকে বাঁধিতে চেষ্টা করে, শাস্তি দেয়। একঘরে করে। দমনের কত পথ বাহির করে।

কিন্তু তারা তাতে ভ্রুক্ষেপও করে না। তাদের সেই শাস্তি নির্যাতন যাতনা লাঞ্ছনাই তাদের ভবিষ্যৎ গৌরবের পথকে আরো প্রগতি দিয়া দেয়। শাস্তি তাহাদিগের শক্তির, মনের দৃঢ়তার, বিশ্বাসের পরীক্ষা স্থল হয়। উহাতে তাদের কার্য্য বরং অধিকতর সফলতার দিকে চলিতে থাকে। কংসের দেবকীকে কারাবন্ধন, নৃশংস শিশু হত্যা, পূতনা প্রেরণ, প্রহ্লাদের হস্তী পদতলে নিক্ষেপণ, পাণ্ডবের জতুগৃহ দাহ এসব ক্ষমতাচ্যুত হইবার ভয়ের শক্তির অপব্যবহার মাত্র। পুরাতনকে ধরিয়া রাখিবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্বে যে নূতনের জয় অবশ্যম্ভাবী। দুর্য্যোধনের পরাজয়, শিশুপালের বধসাধন, যে তারি পরিচায়ক। খৃষ্টের ক্রুশেবিদ্ধকরণ, মার্টিন লুথারের প্রতি অত্যাচার যে তারই উদাহরণ। ফরাসীর বিপ্লব, ইংলণ্ডের ম্যাগনাকার্টা, রুশিয়ার সাধারণ তন্ত্র যে এই কথাই বলিয়া দেয়। এখানে নূতনের দাবী পরীক্ষিত, স্বীকৃত। নূতনের ঋত্বিক বীর সাধকগণ তবে কি দোষে দোষী। রাজ্যে, ধর্ম্মে, সমাজে, আচারে, ব্যবহারে কি তবে চির পুরাতনই সব ভাল—সব ঈপ্সিত! যদি তাই হইত তবে ঋতু, মাস, বৎসরের পরিবর্ত্তন কেন? সময়ের সহিত যে সকলের চলিতে হইবে। বদ্ধ জলায় ময়লা জমে, কীট জন্মে; পুতিগন্ধের সৃষ্টি হয়, বিষাক্ত বাষ্প উঠে, চারিদিক মানুষের বাসের অযোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া কলেরায় দেশ—

অধ্যুষিত হয়। এ কে না জানে।

মানব সমাজ চির পরিবর্ত্তনশীল। নীতিরক্ষক, সমাজরক্ষক স্বভাবতই পুরাতনের ভক্ত। পুরাতনের সহিত অনেক দিনের বসবাসে, ক্ষমতার আস্বাদে, মদের মাদকতায় সদাই উন্মত্ত। শক্তির অপরিমিত মোহান্ধে সদাই অন্ধ। কিছু ছাড়িতে গেলেই, কিছু দিতে গেলেই যেন সব অন্ধকারময় দেখে। ভীষণ একজেদে দুর্য্যোধনের মত সূচ্যগ্র ভূমিও দিতে অস্বীকৃত। কিন্তু এরা একবারও মনে ভুল করিয়াও বোঝে না যে পাণ্ডবেরাও ন্যায্যবাদী—তারাও সমান অংশীদার। তাইত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য মহা বিপ্লবী মহা বিদ্রোহী অতিমানব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বেদব্যাস, জিতেন্দ্রিয় মহাযোদ্ধা ভীষণ ভীষ্ম, প্রকৃতি তনয়া স্বভাব কন্যা শকুন্তলা কি পুরাতন সমাজের আচার ব্যবহারের ধ্বংসের বা পরিবর্ত্তনের ফল নহে! সমাজ যে চির নবীন। নিত্য নূতন জীবন—নিত্য নূতন তপন—নিত্য নূতন সৃজন। এই বিচিত্রতার মধ্যে একত্বই সৃষ্টির রহস্য। এই পুরাতন নূতনের দ্বন্দ্বই সৃষ্টির লীলা। এখানেই জীবন।

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান মানব। মানব আত্মার অংশ। এই আত্মা মুক্ত। তবে কেহ কেহ বদ্ধভাব ভালবাসে কেন? কেহ চিরাচরিত পথে চলিতে সুখী। সন্তানোৎপাদনে জীবন ধারণেই তাঁর আনন্দ। গতানুগতিক চিরদিনের নিয়মে সে বদ্ধ—সে নড়ন চড়ন পরিবর্ত্তন ভাল বাসে না। তারা সব পরিবর্ত্তন বিরোধী অচলায়তনের গোঁড়ার দল। রক্ষণশীলতাই তাদের ধর্ম্ম। আর এক প্রকারের মানব আছে যারা বাধন ভাল বাসে না, বদ্ধ থাকতে একান্ত অনিচ্ছুক—। পাখীর মত মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে চলিতে ফিরিতে বলিতে কহিতে ভালবাসে। সোণার খাঁচায় আরামে রাজভোগ তাদের ভাল লাগে না। তারা প্রকৃতির প্রকৃত সন্তান—প্রকৃতিই যেন তাদের অতি ভালবাসার। এদের নিয়াই যত গণ্ডগোল। যত বিপদ। যত মুস্কিল। এরা চায় মুক্তির বাণী দিতে, মুক্তির কথা কইতে। প্রকৃতির খেয়ালে কি জানি কিসে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন চিন্তা, নূতন ভাবধারা, নূতন কর্ম্মসূচী লইয়া আসে। এই নূতনের জন্য প্রাণ পণ করে।

লাঞ্ছনা, যাতনা, সব অকাতরে সহ্য ক'রে। তারা যেন পুরাতনের সব ভালবাসে না বা পুরাতনকে পরিবর্ত্তন করিতেই যেন তাদের আবির্ভাব। তাদের যে এই সেই সময়ের অনিয়মের নিয়ম শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি ইহাই কি অপরাধের? ইহাই কি পাপের? ইহাই কি শাস্তির? ইহাই কি মানবতার পরিপন্থির না পরিপূর্ণতার অগ্রগতির?

এই নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্বে কে দোষী, কে বলিবে? ভবিষ্যৎ ইহার সাক্ষী। মানব ইহার ফলভোগী। তারা চায় যে, যাহা মানবের পরিণতির সহায়ক—মুক্তির উপায়স্বরূপ তাহাই থাকুক—তাহারই জয় হউক। আছে বলিয়াই যে তাহা রাখিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। শাস্ত্র তাদের গতি নির্দ্দেশ করে না, সভ্যতা তাদের কথা বলিয়া দেয় না, সমাজ ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিচালনা করে না—তাদের অন্তরের বাণীই তাদের পথ প্রদর্শক। তাদের হৃদয়ে ন্যায়ের রাজ্যে ভগবানের সাড়া পায়। চিত্তে ব্যথা পায়। এইজন্যই তারা মহামানব—এই কারণেই তারা যুগাবতার। তাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য দরকার নিয়ম শৃঙ্খলার পদদলন, মৃতের রাশির উপর দিয়া চরণ চালন, সবই তাদের বরণীয়—সেইজন্য কুরুক্ষেত্র। এখানে তারা বরেণ্য, এখানে তারা মহাপূজ্য। তাদের কার্য্য কি অপরাধের? তারা কি শাস্তির? তারা যে মহা তপস্বী। তারা যে মহা শক্তিধর। তাদের শক্তি রোধিবে কে? তবে যারা তাদের অপেক্ষা অল্প শক্তির আধার—যাহাদিগকে সংস্কারক বা সাধক বলা হয় তাদের সমাজের শৃঙ্খলাকে পদদলিত করিবার প্রবৃত্তিকে অপরাধ বা দোষ বল কেন? সাধারণ লোক অপেক্ষা কি তারা উচ্চ স্তরের নয়? তাদের কি অন্তরে ভবিষ্যতের আলোক দেখা যায় নাই! সাধারণ লোক তাহাদিগকে তখন বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না, বলিয়াই কি তাহারা দোষী। এইজন্যই কি তারা দণ্ডিত, এই জন্যই কি তারা লাঞ্ছিত। এইজন্যই কি তারা নির্য্যাতিত। পুরাতনের আবর্জ্জনার স্তূপে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় সর্প ফণা বিস্তার বা ছোঁ মারা বা ভীষণ দংশন একি তাদের কার্য্য পদ্ধতির সফলতার দিকে অগ্রগতির প্রেরণা দিয়া দেয় না?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণ লোক গতানুগতিক ভাবে চলিতে ভাল বাসে। বেদনা বাজিলেও ভিন্ন পথে যাইতে অনিচ্ছুক। যা আছে তাই ভাল এই ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে স্থিতিশীল। অসাধারণ লোক প্রাকৃতিক কারণেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক যাহার কারণ ঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না—স্বভাবতই আপনাদিগকে নিরীহ মেষ শাবকের মত না চালাইয়া ভিন্ন ধাতে ভিন্ন পথে গঠিত করে। তারা যেন স্বাভাবিক সহজাত চালকের বুদ্ধি বৃত্তি মন প্রাণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে—সকলের আগে থাকৃতে ভাল বাসে। আপনাদিগকে নূতন জীবনের নূতন শক্তির আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। যেন নূতন কিছু করিতে, নূতন ভাবের বন্যা বহাইতে আসিয়াছে এই চিন্তাতেই সদা ভরপুর থাকে। তাহাদিগকে সাধারণে চিনিয়াও চিনিতে পারে না। সেই সকল প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে মহা মানব যুগাবতারের পূর্ব্বে জন্মাইয়া তাহার আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করে—ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সাধারণ লোক ইহাদিগকে অনেক সময় বিকৃত মস্তিষ্ক পাগল আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। জগতে পাগলেরাই যত নূতন চিন্তা নূতন ভাব দিয়া গিয়াছেন। এই জন্য দেবাদিদেব মহাদেব পাগল ভোলা দান করিলেই পাওয়া যায়। সে জন্য

তারা চিরদিন থাকে। ত্যাগীর ধর্ম্মই রক্ষা করা।

মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনেক সাধু পুরুষ এই ভবিষ্যৎ বার্ত্তা লইয়া জন্মিয়া ছিলেন। 'জন' প্রভৃতি ধার্ম্মিক পূর্ব্বজন্মাগণও সেই জন্য খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই জন্মিয়া ছিলেন। তাহারা উষার কাকলীতে নবারুণের অগ্রদূতী জানাইয়া দেয়—তাহারা আলোকের আভাষ পূর্ব্ব হইতেই পায়। এজন্য তারা স্থির থাকতে পারে না। প্রচণ্ড বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের আলোক তাহারাই আগে পাইয়াছিলেন। যে আলোকের বন্যায় বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রতীচ্য মাথা নীচু করিয়াছে। চিকাগোতেই তার প্রথম আভাস। মুক্তি বিরোধী আরাম প্রয়াসই আচার ব্যবহারের কারা প্রাচীর তুলিয়া রক্ষণ শীলেরা চির কালই মন্থর—চির কালই সংখ্যায় অধিক।' সংস্কারক চির দিনই সংখ্যায় অল্প। কিন্তু তারাই ভবিষ্যদ্দর্শী। তারাই প্রকৃত সমাজ রক্ষক। তাদের আলোকেই স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার অন্ধকার দূরীভূত হয়। তারা কূপ মণ্ডূক নয়। তারা স্বার্থ শকুনি নয়—তারা মুক্ত গগনের বিমান চারী চাতক চকোর। একদল লোক সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পার্থিব দৈহিক সুখে রত। সন্তান সন্ততির প্রজননে সৃষ্টি রক্ষক। অন্য দল মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া মানবত্বের আদর্শ ছড়াইয়া দুঃখ কষ্ট যাতনা বেদনাকে বরণ করে। কি করিয়া তাদের সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত হইবে সেই দিকে সদাই সচেষ্ট। উভয় প্রকার লোকেরই সমাজে আবশ্যক। উভয়েই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃজিত। উভয়েই পরস্পরের সহায়ক বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।' তবে এ দ্বন্দ্ব কেন? অতি স্বার্থের যোয়াল রূপের রঙ্গিন কাচের আবছায়ায় এ বিসদৃশের সৃষ্টি। আলোক সব সময়ে আলোক। মুক্তির বাণী সকলেরই মনের কথা, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। মুক্তিভাব কার না ভাল লাগে? তবে স্বার্থের আপাত মধুরতার কথায় বিভিন্ন দিকে মত লওয়ানেই ক্ষণেকে স্তব্ধীভূত, মন্দীকৃত থাকে। এই যা প্রভেদ। মনে মনে সকলেই কি শ্রেয়, কি প্রেয় তা ভাল করিয়াই জানে।

সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে যে লোকের এই পার্থক্য ইহা কিরূপে বুঝা যায়? জন্মগত কি কোন বিশেষত্ব আছে, না অন্য কিছু? যাহা দ্বারা উভয় উভয়কে চিনিতে পারে। সমাজের স্থিতিশীলতার ধাক্কা ইহাদিগকে কম সহিতে হয় না। হরিদাসের মস্তক মুণ্ডন, বেত্রাঘাতের কথা কার না মনে আছে? ইহারা নৈতিক জীবনের পলি দিয়া দেশ উর্ব্বর করিয়া তুলে—আকাশে বাতাসে তখন নূতনত্বের আভাস প্রকাশ পাইতে থাকে। দেশের মন সমাজ সংস্কারের দিকে ঝুঁকিতে থাকে। তখন ক্ষমতাধিপতি ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইবার ভয়ে দশকে নিজের মতে রাখিবার জন্য ভয়ে অসহিষ্ণু হইয়া সেই অগ্রদূতদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে বাধ্য হন। তখন আর নীতির জ্ঞান থাকে না। দণ্ড ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর খুজিয়া পান না। তখন শাস্তিই শান্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হয়। সংশোধনের স্থান আর থাকে না। বাঁশত নামেই না বরং আগুনের তাপে, ধোঁয়ার সেকে ভিন্ন রং ধরিয়া আরও দৃঢ় হইতে আরম্ভ হয়। জন্ম বাঁকা গেরো কি কখনও সোজা হয়! যদি বা জোর করিয়া ঝাড় চ্যুত করা হয়, তবে না পাকিতেই কাঁচা থাকায় চিমটে ভাব ধরিয়া হয় ঘুণ লাগে, নয় অকেজো হইয়া থাকে। কাহারও কোন কাজে

লাগে না। সমাজে আবর্জ্জনার বৃদ্ধি করিয়া চির দিন অশান্তি ও অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। কখনও বা স্তূপীকৃত হইয়া পথ রুদ্ধ করে, কখনও বা বৃষ্টি জলে ভিজিয়া পচিয়া শেষে পূতিগন্ধের সৃষ্টি করে। লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগই বেশী হয়। অপর পক্ষ ইহাও ভুলিয়া যায় যে কাণা খোঁড়া ছেলেও ছেলে। দশের নৈতিক উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে ও তাদের আত্মীয় স্বজনের স্বাভাবিক মমতা হেতু তাদের তুষ্ণীভাবও কাহারও ক্ষমতার চেয়ে কম নয়। মমতা কখনও নির্দ্দয় হয় না। ক্ষমতাশালী সাধারণ লোককে ও আত্মীয় স্বজন *দিগকে শাস্তির ভয়ের শঙ্কায় তাদের বিচার* বুদ্ধি কতক পরিমাণে হতবুদ্ধ করিয়া মলিন করিয়া প্রকাশ করিতে না দিয়া মমতাকে নির্দ্দয় করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদের সুখ সুবিধার দোহাই দিয়া ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা সমাজ রক্ষা করিবার ভাণ দেখাইয়া সেই সকল মুক্তিকামী দিগের উপর যাতনা বেদনার অত্যাচার বহাইতে থাকে। তখন একদিকে সত্ব গুণাবলম্বী দেব ভাবাপন্ন মানবদিগের সহিত তমোগ্রস্ত মোহান্ধ ক্ষমতাদীপ্ত দিগের অন্যদিকে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠে। দেবাসুরের সংগ্রামের সূচনা হয়। এই অন্যায় অত্যাচারে এই অহেতুক শাস্তিতে নিভৃতে নির্জ্জনে মনের কোণে প্রত্যেকের বিবেক বিচারক হইয়া দাঁড়ায়। তারা মুখে চুপ করিয়া থাকিলেও তাদের অন্তরাত্মা চুপ করিয়া থাকে না। তাদের বিবেকে আঘাত করিতে থাকে। সেই দশের আঘাত ক্রমশঃ বলবান হইয়া মনুষ্য জাতির জন্য বিশ্ব মানবের হিতে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করণীয় বলিয়া সেই অগ্রগামী দিগের বিবেকেও প্রবল বেগে নিয়ত আঘাত করিতে থাকে। তারা পুণ্যের আলোকে অবিবেকী দিগের স্বার্থান্ধকারে অধিকতর রূপে উদ্ভাসিত হইয়া দিক সমুজ্জল করিয়া তুলে। তখন প্রকাশ্য প্রচারিত হয়—বিবেকের আঘাতই পাপ—আর বিবেকের বাণীই আত্মার বাণী—পুণ্যের প্রেরণা। তাই তখন তারা নির্ভীক হয়—বিগতভী হয়। তারা মানুষের শাস্তির ভয় করে না। মনের পাপই পাপ। উহাই প্রকৃত শাস্তির। এখানে তারা নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ। সেই আলোকের বর্ত্তিকা হাতে লইয়া যাইতে যাইতে যদি সেই সকল প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মক্ষেত্র রূপ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শক্তির ধ্বংসও সাধন করিতে হয় তাতেও তারা পশ্চাৎপদ হয় না। কারণ পাপের ধার তারা *ধারে না। সাধারণের স্বার্থের জন্য দশের হিতের* তরে, বিশ্ব হিতে তাদের বিবেক কঠিন বর্ম্মে রক্ষিত। সামান্য ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তাদের চিন্তার বিষয় হয় না, যখন তারা মহত্তর বৃহত্তর আদর্শের দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখে। সাধারণের দুঃখে দুঃখিত হৃদয়, বেদনায় যাতনায় মর্ম্মাহত সাধু আশা সৎ চিন্তা তখন তাদের সেই চির আকাঙ্খিত মুক্তির পথে তাহাদিগকে অদম্য উৎসাহে অসীম গতিতে পরিচালিত করে। সহস্র নারায়ণী সেনা রূপ জনমতের সাহায্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি রথী মহারথিদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া এক মহাভারতের সৃষ্টি করে। যুগধর্ম্ম প্রবল হইয়া নূতন আকারে দেখা দেয়। আবার শান্তি স্থাপিত হয়। বিকৃত অন্যায় আচার নিয়ম সব চলিয়া যায়।

সেই অব্যক্ত অজানাকে পাইবার আশা মানবের চিরন্তন ও সার্ব্বজনিক। ইহা কোথায়ও সীমাবদ্ধ নয় সর্ব্বদেশে সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব। সেজন্য এই নবীন ঋত্বিকগণ যে কেবল ধর্ম্ম জীবনে দেখা দেয় তাহা নহে—ধর্ম্মে যেমন খৃষ্ট ও কৃষ্ণ, সেইরূপ সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে নীতি প্রণয়নেও নূতনের উপাসকের অভাব নাই। নূতন পথ বাহির হয় বলিয়াই নব মানবের এত আদর—সত্যের এত

গৌরব। সত্য চিরদিনই সুন্দর। সত্য চিরদিনই সত্য। তবে নূতনের জন্য নূতন নূতন চিন্তা, নিত্য নবভাব নূতনের কাজ—নূতনের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য নূতনের এত সম্মান। নূতন তথ্যের নূতন পথে যাইয়া পাওয়াই নূতনের নূতনত্ব। এই কারণে সকলে নূতন চায়, নূতনের পিছে পিছে আপনা ভুলিয়া চলে। মানবের পূর্ণত্ব প্রকাশের বিভিন্ন বিভাগে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, ময়লা জন্মিয়াছে, তখনই নূতন লোক দেখা দিয়াছে। বুদ্ধ, আনাতোলে ফ্রাঁস, কার্ডিউসি, নিউটন, কেপলার, লাইকারগাছ, সোলন, মহম্মদ, নেপোলিয়ন সকলেই নূতনের সেই সময়ের উপাসক। রুসো ভোলটেয়ার, টুরগেনেভ্, গর্কিও সেই শ্রেণীর। ইহারা সকলেই পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবার পক্ষপাতী। প্রাচীন সমাজে যে আবর্জ্জনা পড়িয়াছে, তাহা মাজিয়া ঘসিয়া পরিমার্জ্জিত না করিলে নূতন সমাজ কিরূপে গড়িবে? কিরূপে উন্নতির দিকে প্রগতি হইবে? যাহারা গতি দিয়া দেয়, তাহারাও সাধক, তাহারাও সংস্কারক। সংস্কারকেরা জন্ম-ধীর ভাবাপন্ন। তজ্জন্য কি তাহারা অপরাধী! তজ্জন্য কি তারা দোষী। কার্য্য ব্যপদেশে ইঁহাদিগকেও নূতনকে পুরাতনের স্থানে স্থান দিবার জন্য যে কত অনর্থ পাত করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহারা দোষী হইয়াও নির্দ্দোষ। অপরাধী হইয়াও নিরপরাধ। ইহারা ভবিষ্যৎ মানব বংশের হৃদয়ে পূজ্য সম্মানার্হ। কিন্তু তদানীন্তন ক্ষমতাশালীর নিকট দণ্ডিত, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত এবং সমাজচ্যুত।

বিশ্বহিতে মানব কল্যাণে যারা নূতনের উপাসক, তারা চিরদিনই রক্ষণশীলদিগের নিকট দোষী। সুতরাং বিশ্বের মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ নূতনের উপাসক হইয়া চিরদিনই পুরাতনপন্থিদিগের নিকট অপরাধী। কিন্তু যাঁরা শক্তি সামর্থ্যে সাধারণের অপেক্ষা উচ্চে উঠিয়া যে ভাবেই হউক নূতনের জয় ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা উগ্র তপস্বী হইয়াও বীরের আসন পাইয়াছেন। তখন আর তারা বিদ্রোহী নন। তখন তারা পূজনীয় সংস্কারক, মহামান্য সম্রাট বা অসীম ক্ষমতাপন্ন বীর। তাই বলি মহৎ যখন জয়যুক্ত হয়, তখন মহা সম্মানের অধিকারী হয়। তখন তিনি পূজ্য, মান্য, গণ্য ও মহামহিমময়। তখন তিনি শাস্তির পাত্র না হইয়া শান্তির কারণ হইয়া উঠেন। শান্তির যশগানে, জয়ের উল্লাসের ঘোষণায় দিক মুখরিত হইতে থাকে, নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করে।

সেইজন্য বড় দুঃখে বলিতে হয়, জগতে ছোট থাকাই পাপ—ছোটত্বই যত দোষের—যত অপরাধের। এই ক্ষুদ্রত্বের কালিমা করিতে গেলে, ছোটভাব মুছিতে গেলে, শক্তির আবশ্যক। মহাশক্তির আরাধনা ভিন্ন ইহা কখনই সম্ভব হয় না। কখনও কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই, এই জন্যই ত সাধনা। সিদ্ধি সাধন সাপেক্ষ। চণ্ডী গীতা ঐ কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। তাই এস সকলে মিলিয়া ক্লীবত্ব ছাড়িয়া দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুর দলনী বরাভয়দাত্রী জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির পূজা করি। ঐ দেখ মায়ের দক্ষিণে ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী, মায়ের বামে অবিদ্যানাশিনী সরস্বতী। ওই দেখ উঁহার পাশে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ ও সর্ব্বশক্তি পরিচালক কুমার কার্ত্তিক। আর ওই দেখ জয়া বিজয়া এই শান্ত শরৎ প্রভাতে যখন গগন পবন মেঘমুক্ত, দিক স্বর্ণবর্ণ কিরণে উদ্ভাসিত, তড়াগ সরিৎ রক্ত নীলোৎপলে সুশোভিত, চত্বর মৃদুমধুর গন্ধাবলেপনে শেফালিকায় হাস্যালোকিত, শারদ চন্দ্রমার রজত ধারায় সবুজ শ্যামল সলেপ-প্রান্তর মাঠ-দিগন্তর প্লাবিত, তখন মধুর শঙ্খধ্বনিতে, ঢাক ঢোল পটহ দুন্দুভির বাদ্যে, আরতির দীপোজ্জ্বলে, সুস্পষ্ট সুদৃঢ় স্বরে সকলকে ডাকিতেছে, আয়, আয়, দে ঐ অলক্ত রাগরঞ্জিত

পায় বিল্বজবা দে, পূজা কর। ব্রত উদ্‌যাপিত হউক। জীবন সফল হউক। মানবনাম সার্থক হউক। মহাশক্তির কৃপাদৃষ্টিতে তোদের পূজায় দেশ-বিশ্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া উঠুক। মার মূর্ত্তির সার্থকতা ফুটিয়া উঠুক। পশুভাব দমিত হউক। দৈবীশক্তির উদ্বোধন হউক। প্রকৃতি দর্পণে আমাদের হৃদয় প্রতিফলিত হইয়া মার সত্য স্নিগ্ধ স্বরূপ দেখিয়া আমাদের জন্ম সার্থক করি। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী হইয়া ধনধান্যে শৌর্য্যরূপে মাধুর্য্যে দিক হাস্যময়ী করিয়া অমৃতের সন্তানদিগকে অমৃত দানে অমর করিয়া তুলুন। আবার যুগের বাণী সত্যভাবে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া দিক সমুজ্জ্বল করুক। আবার শান্তির বাতাস প্রবাহিত হইয়া চির পুরাতনের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা রাশি দূরে অপসারিত করিয়া সনাতন শাশ্বত সত্যের পতাকা পত্‌ পত্‌ রবে সুখে নির্বিঘ্নে হিল্লোলিত হউক। উহার সুর লহরীতে সামগানের সমতায় ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মমতায় ও ক্ষমায় সমদর্শনের জ্ঞানে শান্তিভাব মানবের মন থেকে চিরতরে দূরী-ভূত হউক। শান্তি পুনঃ স্থাপিত হউক। ভূমার প্রতিষ্ঠা হউক। খণ্ড বিশ্বে মিলিয়া যাউক। বিশ্বের মুক্তির তরে পরমা শান্তির পথ পরিষ্কৃত হউক। প্রতীচ্যের সদা সাজ সাজ ভাব অশান্তি অধৈর্য্যের দাবদাহ, মর্ম্মন্তুদ হিংসাদ্বেষের জ্বালাময়ী জ্বালা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া—প্রাচ্যের—বিশেষত হিন্দুর—শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল শান্তির ধারা বিশ্বে পরিপ্লাবিত হউক। জগৎ ধন্য হউক। ঋষির বাণী সত্য সফল হউক। সব এক—সব এক—মাত্র আকার ভেদ—এই বৈচিত্র্যে একত্বের মহান বাণী সুস্থাপিত হউক। তখন আর হিংসা-দ্বেষের জন্য মারামারি কাটাকাটির অসুর শক্তি প্রতীক শক্তির অপব্যবহার শান্তির আবশ্যক হইবে না। আবার সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে। আবার মানব সামান্য স্বার্থ ছাড়িয়া পূর্ণ মানবত্বের দিকে ছুটিবে। আবার জগতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে।

এইত শক্তি পূজা। এইত অসুর দলন—এইত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানবে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা—এইত শান্তির পথ। তাইত দেবী মহিষ মর্দ্দিনী—তাই তিনি অসুর দলনী—এইত দৈবীভাবে মহাশক্তির আসুরিক বলের হননে দমন। এখানেই শক্তির গৌরব—এইত শান্তির পথ এইখানেই বিশ্বহিতে শক্তির নিয়োজন—এখানে শক্তি শান্তির নয়—ধ্বংসের নয়—এখানে শান্তির শেষে পরমাশান্তিতে মহানিমজ্জন। এইত ত্যাগের ধর্ম্ম—এখানেই ভোগের নিঃশেষ। এইখানেই ক্ষত্র শক্তির পরাজয়ে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—মানবত্বের বিকাশ, এইত ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র। এইত হিন্দুর মর্ম্মকথা এইত তাদের ধর্ম্মের বাণী। যেদিন আত্মারাম পরমানন্দে মিশিয়া সব সুন্দর ও সত্য করিয়া তুলিবে—সব শিবসুন্দর সত্যসুন্দর হইয়া যাইবে সেই দিন মহাদিন। হায়, সে দিনের আর কত দেরী! হিন্দুর মহাবাণী 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' কি সফল হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম, বি

কোন পুণ্য-শ্লোক মহাপ্রাণ ব্যক্তির কথা যদি আলোচনা হয়, এবং যদি তাঁর প্রতিভা বহুমুখী হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর যেদিকটা যাকে আকর্ষণ করেছে, তিনি সেই দিক দিয়ে তাঁর কথা বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমাকে তাঁর অনুপম চরিত্র-সৌরভ যে দিক দিয়ে পরশ দিয়েছে, আমি খালি সেই দিকটা উপলক্ষ্য করে দু একটি কথা বলব। আমি আশৈশব স্বপন-পসারী, আমার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে কেমন করে জানিনা আমায় এই খেয়ালে পেয়ে বসল যে এই ভারতভূমি পুণ্যভূমি; ভগবৎ লীলাস্থল। এখানে রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন। এই দেশের প্রতি ধূলিকণা তাঁদের ও তাঁদের পরবর্ত্তী বহু সাধু সন্তের পদরজে পবিত্র। তাঁদের সাধন ভজনে সমৃদ্ধ সম্পন্ন যে দেশ, তার নিশ্চয় একটা বিশেষ কিছু করণীয় আছে। সে করণীয়টা আমার দিনের চিন্তা ও রাত্রের স্বপনে যে রূপ নিল তা হচ্ছে এই। পৃথিবীতে দুরকম মানব বাস করে—পশু-মানব ও দেব-মানব। ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, সাধনা বা জীবনধারার বিশেষ উদ্দেশ্য হবে মানবের পশুত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে শুধু মানবত্বে বা দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ পশুর স্বভাব হচ্ছে আত্ম-রক্ষার জন্য আত্মম্ভরিতা। যে যাকে পারে বঞ্চিত করে নিজের গ্রাসকে বাড়িয়ে যাওয়া। মানবত্ব হচ্ছে শরীর ধারণের প্রয়োজনীয়তাকে সংযত করে শুধু নিজে বাঁচা ও পরকে বাঁচতে দেওয়া নয়—পরন্তু প্রয়োজন হলে পরের জন্য আত্মবলি দেওয়া। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি"।

এবার দেখা যাক্ আমার এই স্বপ্নচিত্রে বিবেকানন্দের স্থান কোথায়? তিনি আমার হৃদয়ের শূর, বীর, তিনি আমার দিগ্বিজয়ী বাহাদুর। কারণ যে ভারত জগতকে পুণ্য ও ধন্য করবে, কালপ্রভাবে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প মনে পড়ল। এক বেদে বানর নাচ দেখিয়ে পয়সা নিচ্ছিল। বানরটির সেই বন্ধনের দুরবস্থা দেখে একজন লোক করুণাবিষ্ট হয়ে কৌতুহল বশে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনি কি সেই মহাবীর হনুমান, যিনি সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন, গন্ধমাদন পর্ব্বত বহন করেছিলেন, আরও কত বীরত্বের কাজ করেছিলেন।" বানরটি শোকাবিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"হাঁ আমি সেই, যে ঐ সব বীরত্ব কাহিনীর নায়ক। কিন্তু আজ আমার দুঃসময়, কপাল ভেঙ্গেছে। আর্ রাম বেদয়া খিঁচে তোরি।" দুর্গত এই ভারতকে যে বা যারা তার উচ্চাসনে বসাতে পারে, জগতের মানচিত্রে তার যোগ্য স্থান করে দিতে পারে, তাকে বা তাদের বীর বা দিগ্বিজয়ী বলতে হবে বৈকি। এপারের পাখী ওপারে গিয়ে কি গান গাইবে এ সমস্যা আমাদের আরও লজ্জিত করে তুলেছিল। প্রতীচির উদ্ধত সভ্যতা আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। ঠিক এমনি দিনে বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আরও পাঁচ জনের অবদান বিচারে আসতে পারে। কিন্তু তা প্রায়শঃই ওদের শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের ওদের কাছে পারদর্শিতা দেখিয়ে আসা। তার সুর হচ্ছে—"তোমার শিক্ষিত বিদ্যা শিখাব তোমারে।" অর্থাৎ শিষ্যের কৃতিত্ব নিয়ে গুরু সন্দর্শনে যাওয়া।

কিন্তু বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন ভারতের নিজস্ব কিছু নিয়ে। সে যাওয়াটা হচ্ছে গুরুর গরিমা নিয়ে শিষ্যকে ধন্য করতে যাওয়া। কিন্তু তাঁর এ অভিযানে দাম্ভিকতার লেশ মাত্র ছিল না। থাকার কথাও নয়। কারণ তিনি যে কত নিরভিমান তা এই ঘটনা থেকে বুঝা যাবে। দেশপূজ্য, স্বনাম-ধন্য, জন-নায়ক বরিশালবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় স্বাস্থ্য-ব্যপদেশে আলমোড়া যখন যান, তখন পরম্পরায় জানিতে পারেন যে স্বামী বিবেকানন্দ তথায় এসেছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন যুবক নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের স্নেহধন্য হন, তখন মাত্র অল্প সময়ের জন্য ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে উভয়ের আলাপ হয়। তারপর বহু বৎসর গত হয়েছে—দুজনে আর দেখাশুনা নাই। ইতিমধ্যে অখ্যাত নরেন্দ্রনাথ জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ফিরেচেন। একে পরিচিত, তাতে এত বড় লোক ও সন্ন্যাসী—সুতরাং স্বামিজীর সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর দেখা করার ইচ্ছা হল। অনেক অনুসন্ধান করলেন কিন্তু সংবাদপত্রে সুবিদিত বিবেকানন্দ তখনও আলমোড়ায় এক রকম অবিদিত বলে তাঁর ঠিকানার কোন কিনারা করতে পারলেন না। অবশেষে ঐ দেশের এক সাধারণ ব্যক্তি বলল—বিবেকানন্দ স্বামী বলে কাউকে সে চেনে না। তবে অদ্ভুত রকমের এক বাঙ্গালী সাধু এসেছে, সে ঘোড়ায় চড়ে, গেরুয়া পরে; আবার সাহেবে তার জুতা খুলে দেয়। তার কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে অশ্বিনীবাবু দেখা করতে গেলেন। ফটকে এক তরুণ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ মিলল। জিজ্ঞাসা করলেন "এখানে নরেন দত্ত আছেন?" সাধুত চটে আগুন, বললেন "নরেন দত্ত টত্ত বলে এখানে কেউ থাকেনা মশায়। সে অনেক কাল মরে গেছে। এখন আছেন স্বামী বিবেকানন্দ।" অশ্বিনীবাবু বললেন "স্বামী বিবেকানন্দকে আমার প্রয়োজন নাই। আমি জানতে চাই পরমহংসদেবের নরেন্দর এখানে আছেন কিনা?" স্বামিজীর কাছে খবর পৌছাল। তিনি অশ্বিনীবাবুকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। অশ্বিনীবাবু গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। স্বামিজী এইমাত্র ঘোড়ায় চড়ে ফিরেছেন। যাদের জুতা মাথায় করলে তখনকার লোকে ধন্য হত তাদেরই একজন সাহেব স্বামিজীর জুতা খুলে দিচ্ছে ও আর একজন বাতাস করছে। বিশ্ব-বিশ্রুত, প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত সাধু এখন অশ্বিনীবাবুকে কি আর চিনবেন? এই সংশয় অশ্বিনীবাবুর মনে উঠিতে না উঠিতেই কেটে গেল। স্বামিজী বললেন—"আপনারা আমায় নরেন বলে ডাকবেন। পরমহংসদেবের যারা ভক্ত আমি তাদের কাছে নরেন্দ্রই আছি।" জগদ্গুরু বা ঈশ্বরের সরাসরি একমাত্র প্রতিনিধি বা ঐ রকম আর একটা ঐ গোছের অভিমানের বাক্যও ওষ্ঠাগ্রে এল না।

এই ত আমার বীর। এইত আমার বাহাদুর! নিজে তৃণের মত নীচু থেকে সবাইকে মান দেন! সে মান আপনই তাঁর কাছে ফিরে যায়। মান এল কি গেল তিনি গ্রাহ্যও করেন না।

তবে কিসের প্রেরণায়, কোন বাণী নিয়ে তিনি ছুটেছিলেন বিশ্বের দরবারে? সে হচ্ছে জড়দেহের অভ্যুত্থানের পাশে পড়ে আত্মার যে নিরন্তর হৃদয়-মন্থন-কারী মুক্তির ক্রন্দন,—তার অন্তরতম ভাবের পুণ্য-পরশ নিয়ে, মানব মনের নিভৃত দেউলের নিভান প্রদীপের পুনরুজ্জ্বলিত দীপশিখায় অরূপকে হৃদয়ে হৃদয়ে রূপ-মূর্ত্ত করার কঠোর প্রয়াসের গীত ছন্দ। কেমন করে সে প্রয়াস তাঁকে পেয়ে বসেছিল? দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর যাদুকরের অঙ্গুলি সংকেতে তিনি তাঁর সত্তার প্রতি অণু পরমাণুতে যে অনুকম্পন উপলব্ধি করেছিলেন সেই দোলার আগুন তাঁকে জ্বালিয়ে নিয়ে ছুটেছিল দিকে দিকে পরমহংসদেবের কৃপায় তাঁর ভিতরের অব্যক্ত একদিন ভাবামুখর

ব্যক্ত হয়ে উঠল। বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কিছু বর্ত্তমান তার গঠনের উপাদান হচ্ছে জীবন্ত জাগ্রত অনু পরমাণু। সেথায় কম্পনে কম্পনে, দোলায় দোলায় অনন্তের নিত্য লীলা বিরাজমান। শাখী-শাখা, পুষ্প-পল্লব, বিহঙ্গ পতঙ্গের পাখা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জিনিষ হতে দিগন্ত প্রসারী বিশাল সাগর বক্ষেও সেই দোলা আর দোলা। অপ্রকাশ আত্ম-প্রকাশ করেছে সেই দোল দিয়ে। পুরীতে সাগরের দৃশ্য যে দেখেছে সেই তা অনুভব করেছে। কিসের জন্য অশান্তভাবে সমুদ্র-দৈত্য এমন করে অত আছাড়-পাছাড় খাচ্ছে? তটের ওপর বারম্বার তার তরঙ্গাঘাত কি এই কথা বলছে না যে হে প্রভু, জগতের নাথ, তুমি এত কাছে থেকেও এত দূরে কেন? আমি কি তোমার জগৎ ছাড়া যে মাটি ও বালির তুচ্ছ আবরণ দিয়ে আমায় এমন করে তোমার সান্নিধ্যে বঞ্চিৎ করছ? তোমার আমার মধ্য এ সামান্য ব্যবধান আর কত কাল প্রবল থাকবে? তাকে ঘুচিয়ে দাও, ঘুচিয়ে দাও। তুমি একবার ধরা দাও, ছোঁয়া দাও। সাগরের মনের এ ভাষা পেয়ে সাধকের মনে জাগে তার নিজের মনের ভাষা, যে বিশ্বতশ্চক্ষু অন্তররূপে দোলায় দোলায় বিরাজমান—সে যেমন ধূলা মাটির বাঁধনরূপ মোহ দিয়ে আমাদের বদ্ধ করেছে, তাকে কি আমরাও বেঁধে ফেলতে পারি না? দোলাই যার প্রিয় ব্যসন, তাকে একবার কোন রকমে দোলায় বসাতে পারলে ত হয়। কিন্তু তেমন দোলা পাওয়া যায় কোথায়? এইখানে গুরুর প্রয়োজন। তিনি শিখিয়ে দেন দোলা ছাড়া যে থাকতে পারে না, দোলাতেই যার অধিষ্ঠান, তাকে নিয়ত দোদুল্যমান হৃদয় দোলায় দুলিয়ে দেনা? আর তা হলে সে যাবে কোথায়? তার সম্ভোগের আত্মিক গুঞ্জন যদি দরকার হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের রজ্জু দিয়ে অন্তরের জমাট ভাবের মন্থনদণ্ড ঘুরিয়ে শুদ্ধা প্রেমের মাখন তুলে অর্ঘ্য দেনা? এ অর্ঘ্য নিবেদনের রীতি কেমন হবে? একজন অজ্ঞাত সাধক নির্দ্দেশ দিয়েছেন—"প্রেমকা মাখ্খন, শ্রদ্ধাকি মটকিমে রাখতা হুঁ, চোরা লে, চোরা লে দিল্‌সে, ময় আঁখে মিচকাতা হুঁ" প্রেমের মাখন শ্রদ্ধার পাত্রে রাখছি আর আমি চোখ বুজছি তুমি হৃদয় থেকে তা চুরি ক'রে নাও। সত্যই ত যদি আমার সংসারে ব্যাপৃত সদা জাগরুক চক্ষু তোমার লজ্জার কারণ হয়, আমি চোখ বুঁজছি, সেই অবকাশে আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব তুমি চুরি করে নাও।

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী নরেন্দ্রনাথ এই অবস্থায় পৌছে ভক্ত বিবেকানন্দ হন। তাঁর হৃদয় তাঁর মস্তিষ্ককে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর অনুভূতি তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি লোক হিতে, জগতের কল্যাণে স্বার্থ ভুলে আত্মবলি দিতে পেরেছিলেন। সেই জন্য এই ভূমার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে তিনি পর্য্যটক ও প্রচারক। এইখানে আচার্য্য রামানুজের হৃদয়বত্তার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের একটু তুলনা করতে পারি। বার বার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অবশেষ যেদিন রামানুজ গুরুর কাছে দীক্ষা পেলেন সেই সঙ্গে সর্ত্ত হল যে সিদ্ধ-বীজ মন্ত্র যেমন তিনি পেলেন, তেমনি তিনি কিন্তু আর কাউকে তা দিতে পারবেন না। সর্ত্ত ভঙ্গ করলেই গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপ হবে। আর তাতে নিরয়গামী হতে হবে। দীক্ষিত হবার পরই রামানুজ মনে করলেন যে মন্ত্র উচ্চারণে মোক্ষলাভ তা একলা দখল করা নিতান্ত হীন স্বার্থপরতা। বরং জগতের সকলে যদি এই মন্ত্র প্রভাবে মুক্ত হয়ে যায় আর গুরুবাক্য লঙ্ঘন করায় তাঁকে নরকে যেতে হয় তবে চতুর্বর্গাপেক্ষা সেই ত কাম্য। তিনি স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য বাছ

বিচার না রেখে সবাইকে ডেকে মুক্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। দেশের কল্যাণে কি কাজ করতে হবে জিজ্ঞাসা করায় স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন "হাড়ি, মুচি, মেথর, চণ্ডালকে ডেকে বলুন, তোরা সবাই শিব, অমৃতের সন্তান। একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়া দেখি"। অবশ্য এখানে দুই শিষ্যের কাজ একরূপ হলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যকে নরকভয় দেখান নাই। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে স্বামিজী কেবল নিজের মুক্তি চান নাই—চেয়েছিলেন বিশ্বের মুক্তি।

ঠাকুরের নিত্যমুক্তের থাক্ যাঁরা, তাঁদের অগ্রণী ছিলেন স্বামিজী। তিনি আজ অন্তর্দ্ধান করেছেন। কিন্তু তাঁর লোকমাতান আত্মিক শক্তি আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের পরতে পরতে ক্রিয়মান হয়ে জড় মুক্তিগ্রন্থীর চিরবিবাজিত সংঘর্ষে অশেষ সহায়, সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি দেহ—আত্মার মাঝে, জড় ও চেতন সভ্যতার মধ্যে একটা সমীকরণ আনতে সমর্থ হয়েছেন। লাহোরে প্রফেসর বোসের সার্কাস দেখে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন "Moti has shown what Bengalee muscles can do" দেহ ও দেহী উভয়ের প্রতি কর্ত্তব্যের একটা সমন্বয় ছিল তাঁর শিক্ষার আদর্শে। গেহকে তিনি মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে জপতে বলেছিলেন তাঁকে, যিনি "দেহকি সর্ব্বস্ব, গেহকি সার"। আজকের এ স্মৃতি বাসরে তাঁর অমর আত্মার আশীষ আমাদের উপর বর্ষিত হ'ক। তাঁর নির্দ্দেশে আমরা যেন সুমতি পাই, সুবুদ্ধি লাভ করি, সুরাহার সন্ধানে ফিরি। তিনি নিজে বড় হয়ে তাঁর মাতৃভূমিকে বড় করেছেন। সত্যই তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারি "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" পুরুষ সিংহ আজ নিদ্রিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজ নীরব, কত সুর, কত ব্যঞ্জনা ত কানে আসছে। মন তৃপ্ত হচ্ছে না। সুপ্ত মরমে আজকার দিনে যে সুরের স্মৃতি জেগে উঠ্ছে সে অতীত তান যেন বলছে—"গান ত আর লাগে না কানে। তোমার সেদিনের সেই গানটি শুনে, "বাগের গলায় গাইলে যেদিন আগুন ঢেলে প্রাণে।"
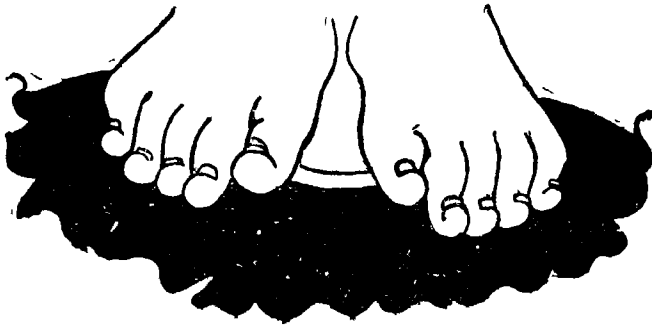
উত্তর কাশীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এবার যাত্রীর সংখ্যা আরো বেশী মনে হইল। ধর্ম্মশালা ও কুণ্ডতীরস্থ চত্বর যাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছিল। যাত্রীদের মধ্যে সংসারত্যাগী বিরক্তদের সংখ্যাই বেশী দেখিলাম। গৃহস্থ যাত্রীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। যমুনোত্তরীতে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ ও অভিবাদনাদি হইল। আজ অধিক বেলায় খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া রাত্রে রন্ধনাদি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কিছু দুধের যোগাড় হইল। তিন আনা সের গরম দুধ সকলেই কিছু কিছু পান করিলাম। যমুনোত্তরীর সেই যুবক সাধুটি নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁহাকেও ডাকিয়া দুধ খাওয়ান হইল। তিনি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পরিতোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। যাত্রীর ভিড়ে সুবিধামত স্থান না পাওয়াতে আমরা পুরোহিতের অনুমতি লইয়া দোকানঘরের উপরতলার রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিলাম।

গঙ্গানি-নকুড়ের পথ ভিন্ন যমুনোত্তরীর রাস্তা হইতে গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় যাবার আরও তিনটী গিরিবর্ত্ম আছে, যথা,—

১। খরসালি হইতে হরশিল। খরশালি যমুনোত্তরীর চার মাইল নীচে সর্ব্বশেষ গ্রাম। হরশিল হইতে গঙ্গোত্তরী ১৫ মাইল।

২। হনুমান চটি হইতে ভাটোয়ারী। হনুমান চটি হইতে যমুনোত্তরীর সাড়ে আট মাইল নীচে। ভাটোয়ারী হইতে গঙ্গোত্তরী ৩৭ মাইল।

৩। জগন্নাথ চটি হইতে উত্তর কাশী। যমুনোত্তরী হইতে সাড়ে আঠারো মাইল নামিয়া জগন্নাথ চটিতে আসিতে হয়। উত্তর কাশী হইতে গঙ্গোত্তরী ৫৬ মাইল। এই পথ তিনটীর মধ্যে প্রথমটী যে সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। ঐ পথেই সবচেয়ে কম সময়ে যমুনোত্তরী হইতে গঙ্গোত্তরীতে যাওয়া যায়। এই তিনটী গিরিসঙ্কটই অত্যন্ত দুর্গম। কোন কোন স্থান ভয়ঙ্কর দুরারোহ ও বিপজ্জনক। কোথায়ও কোথায়ও গ্রীষ্মকালেও বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সাহায্য ভিন্ন পথ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। এই জন্য পাহাড়ী ভিন্ন অন্য কোন যাত্রী সেই সকল পথে যাইতে সাহস পায় না। তীর্থযাত্রিগণ সাধারণতঃ গঙ্গানি-নকুড়ির পথেই যমুনোত্তরী হইতে গঙ্গোত্তরী যাইয়া থাকে।

পথ দুর্গম বলিয়া সিঙ্গড় পৌঁছিতে অনেক বেলা হইবে, এই আশঙ্কায় রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমরা অন্ধকারে হারিকেন জ্বালিয়া গঙ্গানি হইতে বাহির হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই যমুনোত্তরীর সুগম পথ ছাড়িতে হইল। পার্ব্বত্য-পথে ক্রমশঃ নিবিড় অরণ্য মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের একটি কিরণও বনমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি গভীর জঙ্গলেও দিবালোকের অভাব বোধ হইল না। বনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র চটি দেখা গেল। একটি মাত্র জীর্ণ চালাঘর। দোকানী তিন চারিটি মহিষ সহ উহাতে অবস্থান করে। এই দরিদ্র ভারতবর্ষ ভিন্ন সভ্য জগতের আর কোথায়ও মনুষ্য পশুর সহিত একত্রে বাস করে কিনা সন্দেহ। সাধারণতঃ পাহাড়ীরাই সেই চটিতে অবস্থান করে। আমাদের উপযুক্ত খাদ্যের মধ্যে একমাত্র ছোলাভাজা ও দুধ পাওয়া গেল। ছোলাভাজা প্রায় সকল চটিতেই পাওয়া যায়। দুধ সকল স্থানে পাওয়া

যায় না। সকাল হইতে এতক্ষণ আমাদের চারি মাইল হাটা হইয়াছিল। গরম দুধ পানে সকলেই অতিশয় তৃপ্তি বোধ করিলাম। কুলীকে দুধ দেওয়ায় সে দুধের পরিবর্ত্তে ছোলাভাজা খাইতে চাহিল। পাহাড়ে চড়াইতে যেমন পরিশ্রম হয়, তেমনই অত্যল্প বিশ্রামেই শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, কারণ সেখানকার বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্কর অম্লজানসার (ozone) থাকে। তার উপর গরম দুধ পাইলে তো কথাই নাই।

জঙ্গল চটি হইতে কিছুদূর নামিয়া একটি স্রোতস্বিনী পার হইলাম। সেখান হইতে বিকট চড়াই আরম্ভ হইল। আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রায় চারি মাইল চড়াই করিয়া দুইটি দুরারোহ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিলাম। অধিকাংশ জঙ্গলই বাঞ্জ গাছের (Banoak)। বাঞ্জ গাছ সাধারণতঃ ৫০০০ হইতে ৬৫০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। মাঝে মাঝে প্রচুর Rhododendron গাছ দেখিতে পাইলাম। উহারাও আয়তনে প্রায় বাঞ্জ গাছের মত। বসন্তকালে ঐ সকল গাছে রক্তজবার তোড়ার মত অসংখ্য ফুল ফুটিয়া থাকে, অপূর্ব্ব লোহিতশ্রী ধারণ করিয়া ঐ সকল বৃক্ষ বনভূমি আলোকিত করিয়া রাখে। Rhododendron সচরাচর ৫০০০ ফুট হইতে ৬৫০০ ফুটের মধ্যে ছায়াবহুল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি মাইল চড়াইর পর পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইয়া তীব্র সূর্য্যকিরণ অনুভব করিলাম। তথায় অসংখ্য দেবদারু বৃক্ষ মুকুটের মত বিরাজ করিতেছিল। দেবদারুর রাজ্য ৬০০০ ফুট হইতে ৯০০০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ৭৫০০ ফুট হইতে ৮৫০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ ইহার পক্ষে বিশেষ অনুকূল স্থান। আমরা এতক্ষণ পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে ছিলাম বলিয়া সূর্য্যালোক উপভোগ করিতে পারি নাই। এখন পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া হঠাৎ যেন আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখান থেকে নকুড়ি পর্য্যন্ত ক্রমাগত উত্তরাই। আমরা ধীরে ধীরে নামিয়া চীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চীরের স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীর মন অতিশয় প্রফুল্ল বোধ হইতে লাগিল। চীর শুষ্ক আলোকাকীর্ণ স্থানে জন্মিয়া থাকে। ৩০০০ ফুট হইতে ৬৫০০ ফুট পর্য্যন্ত চীরের ক্ষেত্র। চীরের হাওয়া ফুস্‌ফুস্ ও হৃদ্‌রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চীর গাছের রস হইতে তারপিন তেল ও রজন তৈয়ার হয়। চীর গাছে এত তেল থাকে যে কাঁচা অবস্থায় চীর কাঠ মশালের মত জ্বলে। চীরের ডাল জ্বালিয়া পাহাড়ীরা অনেক সময় প্রদীপ ও মশালের কাজ সারিয়া থাকে।

কিছুদূর নামিয়া দেখিতে পাইলাম পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে কয়েকজন লোক হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে বুঝিলাম চারিজন বৈষ্ণব বাবাজী পথসংক্ষেপের জন্য পাকডাণ্ডি অবলম্বনে ঐভাবে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। এই রাস্তায় সাধারণতঃ যমুনোত্তরীর যাত্রিগণই গঙ্গোত্তরী দর্শনে যাইয়া থাকে। গঙ্গোত্তরীর যাত্রিগণ এই পথে যমুনোত্তরী দর্শনে আসেন এরূপ কথা কখনও শুনি নাই। কাজেই তাহাদিগকে বিপরীত দিক্ হইতে ঐভাবে পর্ব্বতোল্লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। "আপনারা কি গঙ্গোত্তরী দর্শন করে এসেছেন?" জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিলেন, "কি আর বোল্‌বো বাবা, কপাল দোষে সব হয়। আমরা বাঙ্গলাদেশের লোক কখনও পাহাড়ে আসি নাই, পথঘাট কিছুই জানি না। ধরাসুতে পথ ভুলে যমুনোত্তরীর রাস্তায় না গিয়ে গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় চলে আসি। নকুড়ির কাছে এসে শুন্‌লাম যমুনোত্তরীর রাস্তা সেটা নয়। তাই এই পথ ধরে যমুনোত্তরী যাচ্ছি। কপালে কষ্ট থাক্‌লে কেউ খণ্ডাতে পারে না, বাবা।" তাদের এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল আবার হাসিও পাইল। বুঝাইয়া বলিলাম, "পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়া পথে চলিলে আপনাদের এই কষ্ট হইত না। আপনারা তাড়াতাড়ি করিয়া পথের সন্ধান না নিয়াই রওনা হইয়াছিলেন। এখন আবার তাড়াতাড়ি পাহাড় চড়াইর জন্য পাকডাণ্ডি ধরিয়াছেন। পাহাড়ের রাস্তায় তাড়াতাড়ি করিতে নাই। 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্', জানেনই তো।"

(ক্রমশঃ)

—সৎপ্রকাশানন্দ

শঙ্করাচার্য্য

জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন নয় যে শ্রীভগবান্‌ --যাঁহাকে "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্" বলিয়া বেদান্ত ঘোষণা করেন—অবতীর্ণ হন মানুষের মাঝখানে, মানবাকারে, লীলা করিয়া থাকেন ঠিক মানবের ন্যায়, পার্থক্য সেইখানে যে তিনি জ্ঞাত থাকেন জন্ম হইতেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যও কর্ম্ম।

এই অবতার-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অতীব দুরূহ, মানুষ সহজে কিছুই বিশ্বাস করিয়া লয় না—মনের ভিতর সন্দেহের জাল বোনা; তাহার চিরন্তনী রীতি স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে যিনি অনন্ত তিনি সান্ত হন কি করিয়া—অসীম তিনি কি প্রকারে সীমাবদ্ধ হন? এক কথায় ইহার উত্তর "সমুদ্রে বাড়বানল", জল এবং অগ্নি পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন; একটীর উপস্থিতিতে অন্যের অবস্থিতি একেবারেই অসম্ভব যেমন আলো ও অন্ধকার—এই সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থের একত্র সন্নিবেশ যেন বাতুলের প্রলাপোক্তির ন্যায়,—কিন্তু সমুদ্রে বাড়বানল যেমন কবির কল্পনা নয় বাস্তব সত্য—সেইরূপ অনন্ত সান্ত হয়েন, অসীম সসীম হয়েন ইহাও বাস্তব সত্য—অবিশ্বাস তরঙ্গের নিকট ইহা ভাসিয়া যায় কিন্তু প্রকাশিত হয় তাঁহাদের নিকট যাঁহারা বিশ্বাসী—

"Father, I thank thee that you have hidden those things from the wise and the prudent and have revealed unto babes"—"Christ"

এই বিশ্বাসই ধর্ম্মজগতের ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ—নহিলে ঈশ্বর, আত্মার ত কোন অস্তিত্বই নাই তাঁহার কাছে যিনি কখনও তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই—তবে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেন নাই তাঁহার উপায় কি? ইহার উপায় "বিশ্বাস"—কারণ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—

এক্ষণে প্রশ্ন এই বিশ্বাস যে করিব, তবে কি যাহাই দেখিব তাহাই বিশ্বাস করিব—তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব—যে যাহা বলিবে তাহাই? না—বিশ্বাস করিতে হইবে তাঁহার কথা যিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যাঁহার আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে, যেমন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণন্তমসঃ পরস্তাৎ" শাস্ত্রই এই কথা বলেন—তাই শাস্ত্র বাক্যকেই বিশ্বাস করিতে হইবে—ইহা ব্যতিরিক্ত উপায়ান্তর নাই। আত্মাকে বা ঈশ্বরকে জানিতে হইলে ঋষিবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

শ্রীভগবানের অদ্ভুত লীলা বুঝিবার সামর্থ্য বোধ হয় মানুষের নাই—না বোধ হয় কেন, একেবারেই নাই—নহিলে এই জগৎ দেখিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে ইহা স্বতই উদিত হয় যে ইহা "কি এবং কেন ইহার সৃষ্টি", হাজার চিন্তা করিয়াও যেন এই "কেন ও কি" এর উত্তর সম্যক্ ভাবে পাওয়া যায় না। চিন্তাধারা যতদূর শক্তি সম্পন্ন হউক না কেন এমন একস্থলে আসিয়া পড়ে যেন সেখান হইতে অগ্রসর হওয়া তাহার সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে করিয়া দেয় ঐ চিন্তাশীল ব্যক্তিকে মূক ও বিস্মিত—জগতের প্রতি কণা লইয়া চিন্তা করিলে যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়—বিরাট বিস্ময় রাজ্যে যেন আনিয়া ফেলে তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
> মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ
> আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
> শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।"

এই যে প্রশ্নদ্বয় "কেন এবং কি" ইহার উত্তর শাস্ত্রই ত দিয়াছেন—তবে ত শাস্ত্র পড়িলেই

আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায় কিন্তু শাস্ত্র পড়িয়াও ত ইহার যথাযথ উত্তর পাই না! তাহার কারণ শাস্ত্রে অবিশ্বাস।

উপরোক্ত যে প্রশ্ন তাহা সাধারণতঃ ধর্ম্মপিপাসু মানবের হৃদয়েই উদিত হইয়া থাকে কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, বস্তু কি, অবস্তু কি, শান্তি কি, অশান্তি কি—ঈশ্বর বা আত্মা কি ইহার কিছুই অবগত নয় এমন কি এই সকল জানিবার আকাঙ্ক্ষা ও নাই বা আকাঙ্ক্ষা রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করে না—তাহাদের জন্যও শ্রীভগবানের করুণা মন্দাকিনী রুদ্ধ নয়; ইহা সকলের জন্যই প্রবাহিত, কি সাধু, কি অসাধু, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক সকলেরই জন্য—"His Sun rises alike on the just and on the unjust"—এই জন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ংই দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন অজ্ঞান ও সংশয় অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত জ্যোতিষ্ক ভাস্কর হয়ে।

ইহা ত গেল ভক্তির দিক হইতে কথা—জ্ঞানের দিক হইতে দেখা যায় সে তত্ত্ব হইতেছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—অদ্বৈতই তত্ত্ব—বস্তু সচ্চিদানন্দ, ইহা ব্যতিত যাবতীয়ই অবস্তু—মানুষ যখন এই অদ্বৈতে স্থিতি হারাইয়া দ্বৈতময় হইয়া পড়ে, যখন একত্ব হারাইয়া বহু দেখিতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় নানান্ প্রকার অশান্তি, দুঃখ ও দ্বন্দ্বের। এই দুঃখ ও দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বলিয়া দেন লোকগুরু বা যাঁহাতে বিকশিত হয় প্রভূত ভাবে ঐশী শক্তি—যাঁহার ভিতর হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে সেই একত্বের অদ্বৈতের বা সাম্যের ধারা, যিনি প্রখর জ্ঞান সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া মানবের সমস্ত তমঃ বা অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া বিকীর্ণ করেন সত্যের বিমল আলোক এবং লইয়া যান সেই অনন্ত শান্তিধামে।

তাই যে সময় বিকৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে—যে সময় তান্ত্রিকদিগের প্রবল অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন লোকগুরু শঙ্কর—ঘোষণা করিতে সত্যের বারতা জাগরিত করিতে শাস্ত্রবিশ্বাস ও প্রেরণা দিতে আত্মানুভূতির।

আজ সেই শুভদিন—সেই জন্য আমরা তাঁহার জীবনী ও উপদেশাবলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি—প্রার্থনা করি তাঁহার মঙ্গলাশীষ সমাজের মস্তকে বর্ষিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক।

তাঁহার জীবনী কোন কোন পুস্তকে বেশ বিশদভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে যদিও তিনি খুব অল্পকালই অর্থাৎ দ্বাত্রিংশ বৎসর মানবদেহে বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ভগবান্ চন্দ্রমৌলিশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করায়—এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে তাঁহার পিতা, শিবগুরুর অধিক বয়স পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি না হওয়ায় বিশেষ মনঃকষ্টে ছিলেন কারণ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ—জানিতেন যে শাস্ত্রমতে গৃহস্থ হইয়া যদি পুত্রাদি না জন্মায় তাহা হইলে দেহাবসানের পর পুংনামক নরকে যাইতে হয়—এই জন্য তিনি একদিবস মনস্থ করিলেন যে—তাঁহার গ্রামের অনতিদূরে যে রাজা রাজশেখর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাজাগ্রত শিবমূর্ত্তি আছেন তাঁহার নিকট সস্ত্রীক ব্রতধারণ পূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিবেন—সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল—ব্রতধারণ অবস্থায় একদিবস রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে ভগবান্ শূলপাণি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন "তুমি কি বর চাও?" ইহার উত্তরে শিবগুরু পুত্র কামনা জ্ঞাপন করিলে ভগবান্ উত্তর দিলেন "সর্ব্বজ্ঞ পুত্র চাও না দীর্ঘায়ু পুত্র চাও—সর্ব্বজ্ঞ হইলে দীর্ঘায়ু হইবে না এবং দীর্ঘায়ু হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে না"—শিবগুরু কথঞ্চিৎ সমস্যায় পড়িলেন, তাহার পর উত্তর

করিলেন "সর্ব্বজ্ঞ পুত্র দাও"—কারণ তিনি জানিতেন যে মূর্খ দীর্ঘায়ু পুত্র লইয়া কেবল যন্ত্রণারই বৃদ্ধি হইবে—ভগবান্ এই প্রার্থনায় উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে—আমি স্বয়ংই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।"

৬০৮ শকাব্দের ১২ই বৈশাখ, শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্নকালে আলোয়াই নদীর উত্তর তীরস্থিত কলডি নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে আচার্য্য শঙ্করের জন্ম হয়—স্বপ্ন বৃত্তান্তানুযায়ী শিবগুরু নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন শঙ্কর,—দেশের প্রথানুযায়ী শিবগুরু স্থির করিলেন যে শঙ্করের ৫ম বর্ষ বয়সে উপনয়ন দিয়া গুরুগৃহে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য প্রেরণ করিবেন কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির নিকট তাঁহার সে সঙ্কল্প স্থায়ী হইল না—শঙ্করের মাত্র তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালেই শিবগুরুকে ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

শঙ্করের মাতার নাম বিশিষ্টা দেবী—পতি-শোকবিধুরা জননী কিন্তু স্বামীর ঐ সঙ্কল্প জানিতেন, তিনি শুভদিনে শঙ্করের উপনয়ন দিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের নিমিত্ত গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। শঙ্কর বাল্যকালেই খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। একবার যাহা শুনিতেন তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না এই জন্য গুরুগৃহে অন্যান্য সহাধ্যায়ী অপেক্ষা অধিক অল্পসময়ের মধ্যেই শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিয়া লওয়ায় তাঁহার পাঠাদি সমাপ্ত হইল—গুরুগৃহ হইতে বিদায় লইলেন।

উপস্থিত তিনি গৃহে থাকিয়াই শাস্ত্রালোচনা করিতে রত হইলেন, জননী বিশিষ্টা দেবী পুত্রের আয়ু যে অতি অল্পকালই তাহা স্বামী শিবগুরুর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত কতকাল যে পুত্র জীবিত থাকিবে তাহা জানিবার নিমিত্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পুত্রের কোষ্ঠী-গণনা করাইতে লাগিলেন—ব্রাহ্মণগণ কোষ্ঠীর ফলাফল বিচারপূর্ব্বক নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিলেন, "পুত্রের অষ্টম, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ বৎসরে জীবন সংশয়"—ইহা শ্রবণ করিয়া বিশিষ্টা দেবী অত্যন্ত ব্যথিতস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ইহাকে রাখিয়া যাইতে পারিব?"—ব্রাহ্মণগণ তদুত্তরে "হাঁ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শঙ্করের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পের ইহাই সূত্রপাৎ—তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সম্মুখে অগাধ কর্ত্তব্য কিন্তু আয়ু ত বেশীদিন নয়—এত অল্প আয়ু লইয়া যে কি করিয়া তিনি উদ্দেশ্য সাধন করিবেন—ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়—তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন—জানিতেন সন্ন্যাস ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না—সন্ন্যাস গ্রহণের প্রধান অন্তরায় তাঁহার মাতা—জননী জীবিত থাকিতে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প যেন বালকের চন্দ্র ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় অলীক হইয়া উঠিল। এই জন্য স্থির করিলেন যে জননীর দেহাবসানের পরই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন—কারণ মাতার অনুমতি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব—একমাত্র পুত্র শঙ্করকে যে বিশিষ্টা দেবী কোন মতেই সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিবেন না ইহা তিনি ভালরূপেই জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু অপরদিকে মৃত্যু ত মাতৃস্নেহের বাধা মানিবে না—সে যে বড়ই কঠোর—কোন বাধাই ত তাহার অপ্রতিহত গতিকে রুদ্ধ করিতে পারিবে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল—উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন—ব্যথিতের আর্ত্তনাদ শুনিবার জন্য ব্যথার ঠাকুর চিরদিনই প্রস্তুত—দৈবক্রমে একটি ঘটনা উপস্থিত হইল।

একদিন শঙ্কর স্নান করিতে নিকটবর্ত্তী এক নদীতে অবতরণ করিতেছেন—জননী বিশিষ্টাদেবী নদীর উপরে রহিয়াছেন—এমন সময় এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া নিম্নদিকে লইয়া

খাইতে লাগিল—কতই না চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাঁহার গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কিন্তু সকল চেষ্টাই যেন ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তার স্বরে জননীকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা—আমাকে কোন্ এক জল-জন্তুতে ধরিয়াছে, ইহার নিকট হইতে কোনরূপেই যেন পরিত্রাণের উপায় দেখিতেছি না—মৃত্যু অনিবার্য্য—এই সময় যদি আপনি আমাকে সন্ন্যাস লইবার অনুমতি দেন তাহা হইলেও অন্ত্য-সন্ন্যাস লইয়া পরলোকে যাইয়া মুক্ত হইতে পারিব—"

বিশিষ্টা দেবী এযাবৎ কেবল শোক বিহ্বলা হইয়া হাহাকার করিতেছিলেন, পুত্রের ঐরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বৎস তাহাই হউক, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইলেন—শঙ্করের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। ধন্য শ্রীভগবানের লীলা!

যাহা হউক ইত্যবসরে অন্যান্য ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন এবং সুস্থ হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না।

বিরজা হোম প্রভৃতি স্বয়ংই সম্পন্ন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন—অষ্টম বর্ষীয় বালক শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী হইলেন। (?)

তিনি জানিতেন গুরু ভিন্ন কিছুই আয়ত্ত করা যায় না—জ্ঞান লাভ ত দূরের কথা—শাস্ত্র বলেন "মেধাবী আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—এই কারণে সংসারত্যাগের পর তাঁহার কর্ত্তব্য হইল গুরু অন্বেষণ।

গৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন কালে তিনি অবগত হয়েন যে ভাষ্যকার ঋষি পতঞ্জলি গোবিন্দপাদ নাম ধারণ পূর্ব্বক আজ প্রায় সহস্রাধিক বর্ষকাল নর্ম্মদার নিকট এক স্থানে সমাধিস্থ আছেন—তদবধি ইঁহাকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করিবার একান্ত ইচ্ছা হয়—এক্ষণে এই মহাযোগীর অন্বেষণেই বহির্গত হইলেন—কত দেশ নদ-নদী অতিক্রম করিয়া বালক সন্ন্যাসী শঙ্কর, ক্রমে নর্ম্মদার নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং লোকমুখ হইতে এই যোগিবরেব আসন-স্থান অবগত হইলেন। (?)

এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে আরও কয়েকটী প্রাচীন সাধু এই ঋষির সমাধিভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছেন—সাধুদিগের নিকট যথাযথ আত্মপরিচয় দান করিয়া শঙ্কর একটী গুহা মধ্যস্থিত নিশ্চলভাবে অবস্থিত সমাধিমগ্ন যোগিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ উপস্থিত হইল, দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিলেন।

ঐ যোগিবর গোবিন্দপাদ গুরু গৌড়পাদাচার্য্যের আদেশে সহস্রাধিক বর্ষ কেবল শঙ্করেরই নিমিত্ত শরীর রাখিয়াছিলেন—উপস্থিত ইঁহার আগমনে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং শঙ্করের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন।

এই স্থানে মাত্র তিন বৎসর অবস্থানের পর তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয়—এবং গুরুদেব গোবিন্দপাদের তিরোধানের পর তাঁহারই আদেশে প্রচারের নিমিত্ত ৺বিশ্বনাথের আবাসভূমি ৺কাশী-ধামে আগমন করেন। ক্রমে তিনি ভাষ্যাদি রচনা করায় বহু খ্যাতি লাভ করেন এবং সনন্দন প্রভৃতি কয়েকজন তীব্রবৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী এই স্থানেই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বই তাঁহার প্রচারের বিষয় ছিল—অদ্বৈতজ্ঞান ব্যতীত যে সংসারভীতি চিরতরে নিবারিত হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যে যাবতীয় দুঃখ দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"—ইহা তিনি নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন এবং স্বীয়

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে এই একই তত্ত্ব অপরপক্ষীয় নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক নিরস্ত করিয়া সকলের সমক্ষে স্থাপিত করিয়াছিলেন—ইহাছাড়া ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভিন্ন যে এই ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতে স্থিতি লাভ করা যায় না, তাহাও নিজ জীবন সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছিলেন। ত্যাগই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র; প্রত্যেক অবতার কল্প মহাপুরুষের ইহাই একমাত্র উপদেশ।

কি বুদ্ধ, কি খ্রীষ্ট, কি শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেরই এই এক কথা—শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন—"ন ধনেন, ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—এই জীবন সমস্যা অতিক্রম করিবার ত্যাগই একমাত্র উপায়—বৈরাগ্য ভিন্ন কি জ্ঞান কি ভক্তি কিছুই লাভ করা যায় না। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার টীকায় একস্থলে বৈরাগ্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান ও ভক্তি লাভ অসম্ভব।"

ভগবান শঙ্কর অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার ভিতর ভক্তির পরিমাণ কথঞ্চিৎ কম ছিল তাহা নহে, তাঁহার রচিত স্তোত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একদিকে যেমন জ্ঞানের প্রখর জ্যোতিঃরূপে সকলের নিকট প্রতীয়মান হইতেন অপরদিকে ভক্তির স্নিগ্ধ আলোক কোন দিনই তাঁহার ভিতর হইতে বিকীর্ণ হইতে বিরত হয় নাই—জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত—I have come to fulfil but not to destroy. সকল ভাবই তাঁহার ভিতর বর্ত্তমান থাকে—তবে যে আমরা কোথাও জ্ঞানের বা কোথাও ভক্তির প্রকাশ অধিক মাত্রায় দেখিয়া থাকি সে তাঁহার দেশকাল পাত্রানুযায়ী উপদেশাদির জন্য; নহিলে একই ভগবান্ আসেন বিভিন্ন নামরূপে, ভাবের বৈষম্য যে তাঁহার ভিতর কোন দিনই নাই—একথা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনন্ত ভাবময় শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী ভাব প্রচার করিয়া থাকেন—যখন যে ভাবের আবশ্যকতা বোধ করেন, মূলে কিন্তু লক্ষ্য থাকে একটীর উপর—সেই একত্বের উপর—অদ্বৈতের উপর।

ব্রহ্মচারী সতীনাথ

পুঁথি ও পত্র

India In The Making—প্রণেতা স্বামী অব্যক্তানন্দ। প্রকাশক, দি ইউনিভারসেল পাবলিসিং করপোরেসন, বাঁকিপুর, পাটনা। মূল পুস্তক খানি ১৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

স্বামী অব্যক্তানন্দ লিখিত ইহা একখানি ইংরেজী পুস্তক। "প্রবুদ্ধ ভারত" ও অধুনা বিলুপ্ত "মর্ণিংষ্টার" নামক মাসিক পত্রে নানা সময়ে প্রবন্ধাকারে এই পুস্তকে সংযোজিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার শিক্ষিত জন সমাজে প্রচারের নিমিত্ত উক্ত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে মূলতঃ ছয়টি পরিচ্ছদ রহিয়াছে।

আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়া কি প্রকারে আজ সমগ্র ভারতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহাই এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। সমাজের প্রত্যেক মানবের শরীর মন ও ধর্ম্মের উন্নতির উপরই গোটা সমাজের উন্নতি নির্ভর করে। আমরা দীর্ঘকাল, নিজেদের ভিতরে যে অখণ্ডশক্তির বীজ নিহিত আছে তাহা ভুলিয়া

ছিলাম তাই জীবনের প্রত্যেক স্তরেই আমাদের এত হীন দশা ঘটিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পবিত্র জীবনী ও বাণীতে ভারতের প্রত্যেকদিকেই একটা গঠনমূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে দেশে নানা চিন্তাশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইতেছে, নানা সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়াও দেশ যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র দেশটির কালধর্ম্মে এককালে অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে পুনরায় শতধা বিভক্ত জাতি রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া একসূত্রে গ্রথিত হইতে চলিয়াছে বলিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকের নাম India In The Making বা 'গঠনশীল ভারত' দিয়াছেন। তাঁহার গভীর চিন্তা-প্রসূত পুস্তকখানি চিন্তাশীল দেশবাসীর হৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহ দান করুক ইহাই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর ও নির্ভুল। মূল্য এক টাকা।

মুক্তিমন্ত্র—প্রণেতা শ্রীমতিলাল রায়। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

যে সকল মহৎ-প্রাণ আজ দেশ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে চান তাঁহাদের প্রথমতঃ চিন্তা করিয়া দেখা সঙ্গত কোন পথ তাঁহাদের পক্ষে অবলম্বনীয়। এই স্বল্পায়তন পুস্তক খানিতে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সরল ভাষায় গল্পাকারে বাংলা দেশের কয়েকটি আন্দোলনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে জাতি-নির্ম্মাণ না হইলে কোন প্রকার আন্দোলনই স্থায়ী হয় না এবং তাহা জাতির পক্ষে কোন প্রকারেই কল্যাণকর হইতে পারে না। এই পুস্তকের প্রধান নায়ক সত্যানন্দ স্বামীর চরিত্রে মতিবাবু পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন যে চরিত্রবান, নিষ্কাম ও অক্লান্তকর্ম্মী ছাড়া বাংলাদেশের ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের কল্যাণ হইতে পারে না। তাঁহাদের চেষ্টার উপরই আজ বাংলা দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিকই গঠনমূলক কার্য্য ছাড়া কোন দেশের উন্নতি হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

পুস্তকের ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ—প্রণেতা বিপিন চন্দ্র পাল। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস কলিকাতা ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম সমগ্র বাংলাদেশে সকলের নিকটই সুপরিচিত এবং গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের নামও সকলেই জানেন। পাল মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর সাহিত্যজ্ঞান ও অসাধারণ বাগ্মীতা বাংলা দেশের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন তখন হইতেই পাল মহাশয় তাঁহার সঙ্গে বিশেষ রকমে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত এবং কালে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবেই অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

এই পুস্তকখানিতে গোস্বামী মহাশয়ের বংশ পরিচয় ও আংশিক জীবনী সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা আছে। সরল, নির্ভীক ও মুমুক্ষু গোস্বামী মহাশয়ের জীবন বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ। তবে এই পুস্তকখানি তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী নহে কারণ গ্রন্থকার তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে রহিয়াছে।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। তবে মূল্য একটু বেশী বলিয়া মনে হয়।

সংঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরে শ্রীমৎ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অভীপ্সিত এবং পরিকল্পিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য এতদিন পরে আরম্ভ হইয়াছে। জানি না আজ স্বামিজী এবং তাঁহার অন্যান্য গুরু ভ্রাতাগণ—যাঁহারা স্থূল শরীরে বর্ত্তমান নাই—এই মন্দিরের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখিলে কতই না আনন্দ অনুভব করিতেন। "সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্ব সমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" অতএব সর্ব্বভাব-সমন্বিত যুগাবতারের পূজা যে পরম কল্যাণের নিদান হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব উদারভাব—যাহা আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপূর্ব্ব আগ্রহে গ্রহণ করিতেছে এবং সমস্ত ভেদ বিবাদের অন্তঃ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে,—সেই উদার ভাবসমূহ সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়া সার্ব্বজনীন সমাজকে পুষ্ট করিতেছে। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে পড়িয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, তেমনি সকল ধর্ম্মভাব সমূহ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-সমুদ্রে মিলিত হইতেছে। এ ধর্ম্মের প্রকাশে ও প্রচারে শুধু ভারতের নয় সমস্ত জগতের কল্যাণ। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির বেলুড়ের গঙ্গাতীরে উন্নত শির তুলিয়া জগৎকে শান্তির ও আনন্দের পথ নির্দ্দেশ করিবে—এ সংবাদে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই আনন্দিত হইবেন, নিশ্চিত। একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে বিভিন্ন দেশ হইতে কত সব ভক্ত আসিয়া কালে তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার দর্শনের ও বাণীর সার্থকতা আজ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁহার এক পাশ্চাত্য দেশীয়া ভক্ত দ্বারাই শ্রীশ্রীস্বামিজীর এই মন্দিরের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। মার্কিণ দেশীয়া জনৈকা শ্রীরামকৃষ্ণ গতপ্রাণা বিদুষী মহিলা এই মন্দির নির্ম্মাণকল্পে ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ইঁনি আমেরিকার প্রভিডেন্স সহর-স্থিত বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, স্বামী অখিলানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শুধু গর্ভ মন্দিরটি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। কলিকাতার মার্টিন কোম্পানী এই মন্দির নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় ১৯৩৭ সালের শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি দিবসের পূর্ব্বেই ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার শুভাশীষে তাঁহার মন্দির সুগঠিত হইয়া উঠুক এবং আমরা সকল দেশের সকল ধর্ম্মের নরনারী তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া ধন্য হই। প্রথম পৃষ্ঠায় পরিকল্পিত মন্দিরের ছবি দেওয়া হইল।

মন্দিরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা

গর্ভগৃহ—২৬´×২৬´

বারন্দা সমেত বাহিরের মাপ :—৮৩´×৮৩´

উচ্চতা—ভিতর—৯০´, বাহির—১১২´

নাটমন্দির :—৯৮´×৪০´,

বাহিরের মাপ :—১২১´×৬৪´

উচ্চতা :—৪৪´

সমস্ত মন্দির :—২০৪´×৮৩´×১১২´

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১০ই মার্চ্চ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শততম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, পাঠ হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৈলচিত্র পত্র পুষ্পে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং শত সহস্র ভক্ত তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়াছিলেন। সমস্ত দিনব্যাপী আন্দুলের বিখ্যাত কালী কীর্ত্তন, সিদ্ধেশ্বরী কালী কীর্ত্তন, বরানগরের কন্‌সার্ট পার্টি ও অন্যান্য সঙ্গীত সম্প্রদায়ের সুললিত সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছে। উৎসবে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল এবং কিঞ্চিদধিক ৩০ হাজার লোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী, উপদেশ এবং তাঁহার শতবার্ষিকীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "ম্যাগাফোন" সাহায্যে বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত খ্যাতনামা বক্তাগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহকারী সভাপতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সুললিত ভাষায় শান্তির বার্ত্তা প্রচার করতঃ এই প্রচার কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ মঠ মিশনের ও অন্যান্য শাখার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বোষ্টন "আনন্দ আশ্রমের" শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ মহারাজ প্রাতে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। নেপলসের (ইটালী) বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মিঃ ডি, ম্যাকিওকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যীশুখৃষ্ট এবং স্বামী বিবেকানন্দকে সেণ্ট জনের সঙ্গে তুলনা করিয়া একটি পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। বোষ্টন আনন্দ আশ্রমের শ্রীযুক্তা গায়ত্রী দেবী, শ্রীযুক্তা লাবণ্যলক্ষ্মী দেবী, সিষ্টার অমলা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী ঘনানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দেবানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ বক্তৃতা দান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক এই উৎসবের কার্য্যাদি বিশেষ সন্তোষজনকভাবে নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যার পর জনৈক ভক্তের ব্যয়ে ও অধ্যক্ষতায় বিবিধ প্রকার সুদৃশ্য আতসবাজী পোড়ান হইলে উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ময়মনসিংহ—গত ১০ই চৈত্র রবিবার অত্র শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শততম জন্ম মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব দিন শনিবার সায়াহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি বহন করিয়া ব্যাণ্ড, পতাকাদিসহ শোভাযাত্রা ও নগর সংকীর্ত্তন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়াছিল। উক্ত শোভাযাত্রায় ন্যূনাধিক ৫০০ শত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। রবিবার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজার্চ্চনা, ভোগ, আরাত্রিক, ভজন সঙ্গীত, শ্রীশ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীপদাবলী কীর্ত্তনাদি নানা অনুষ্ঠানে আশ্রমপ্রাঙ্গণ দিব্য আনন্দে মুখরিত ছিল। অন্যূন ৫০০০ সহস্রাধিক স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সানন্দে পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবে লোক সমাগম ৭।৮ সহস্র হইয়াছিল। জাতি-লিঙ্গ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সহরের উচ্চাবচ ব্যক্তিগণ তথা বালক ও যুবকগণ সাগ্রহে শ্রীভগবানের লীলানন্দ মহোৎসবে যোগদান এবং অনুষ্ঠান সম্পন্ন করণে সযত্ন সেবা সহায়তাদি দান করিয়া শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ ভাজন ও আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শততম জন্মোৎসব দুই দিবস মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৬ই মার্চ্চ পূজা, হোম, ভজন এবং প্রসাদ বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ১০ই মার্চ্চ স্বামী প্রেমেশানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং নবাবপুর এপলো ক্লাবের সভ্যগণ শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে ঢাকার এসিষ্টেণ্ট সেসন্স্ জজ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফকির দাস ব্যানার্জ্জি শ্রীরামকৃষ্ণ ও সক্রেটিসের জীবনী ও শিক্ষার সুন্দর সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং বর্ত্তমানযুগের লোকদের আত্মসম্বন্ধে উদাসীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বামী মেঘেশ্বরানন্দ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্যান্য দিক্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় শ্রেষ্ঠ উপদেশ আলোচনা করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী অনুসরণ করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু কর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রদানানন্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বরিশালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বিগত ১৭ই মার্চ্চ রবিবার বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে যুগ্মভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার অংশবিশেষ উচ্চারণে মাঙ্গলিকী সম্পাদন করিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে উৎসবটি উদ্বোধিত হয়। অপরাহ্নে মিশন প্রাঙ্গনে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়; কয়েক শত মহিলাও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ, এম-এ, বি-এল বাহাদুর মহাশয় স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব্বস্মৃতি অবলম্বনে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর স্বামী নির্ব্বেদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের গূঢ় ভাবার্থ সম্বন্ধে একটি শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামী নির্ব্বেদানন্দ পরদিবস অপরাহ্নে একটি মহিলা সভায় ও সন্ধ্যায় একটি ভদ্র সম্মেলনীতে, ১৯শে মার্চ্চ অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজে 'পুনর্শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ২০শে মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যায় স্থানীয় 'জগদীশ আশ্রমে' দোল পূর্ণিমার বিশেষত্ব সম্বন্ধে 'বৈদিক ও পৌরাণিক' মতের ব্যাখ্যা করেন। ২১শে মার্চ্চ তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবনের' অন্তেবাসিগণকে "আদর্শ ছাত্র-জীবন" সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। ২৩শে মার্চ্চ তারিখে টর্কী বন্দরের এক বিরাট সভায় তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

জামসেদপুরে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শততম জন্ম মহোৎসব এবৎসর অতীব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে **শ্রীমৎ স্বামী শর্ব্বানন্দ মহারাজ**—জামসেদ্পুর বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আগমন করিয়া ২৩শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিলের মধ্যে ৯টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি "অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত", "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা", "প্রায়োগিক বেদান্ত" "বিজ্ঞান ও বেদান্ত", "ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা", "নারীর আদর্শ" প্রভৃতি

বিভিন্ন বিষয়ে ইংরাজীতে ও বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। উৎসবোপলক্ষে এক সহস্রের অধিক দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান। ব্রহ্মচারী অমূল্য কুমার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দেব" সম্বন্ধে প্রথম দিবসে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বিভিন্ন স্থানে ছায়াচিত্রে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

স্বামী বাসুদেবানন্দ—এলাহাবাদ ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই মার্চ্চ ধর্ম্মালোচনা করেন। ১৮ই মার্চ্চ এংগ্লো বেংগলি ইন্টার মিডিয়েট কলেজে "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম্মের নব জাগরণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯শে মার্চ্চ হইতে ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিনি প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করেন।

৭ই এপ্রিল দিল্লী রায়সেনা বাঙালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হলে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-এট-ল, এম-এ, ডি-এস-সি (লন্), এম্ এল্-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'ভারতীয় চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও প্রগতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ—১৭ই মার্চ্চ হইতে ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে রাঁচিতে, দেওঘরে ও ধানবাদে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ছয়টি বক্তৃতা করেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সম্বন্ধেও বলেন।

জৈ্যষ্ঠ—১৩৪২

গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাহাদের অন্যান্য বিষয়, ভুগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসিয়া বসিয়া রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায়, কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম্ম কর তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে।

—বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমেশ তুমি প্রভু, মানব আকার,
কখনো আকৃতি শূন্য কভু বা সাকার।
কখনো মানব-রূপে আসিয়া ধরায়,
ভক্ত সনে কত খেল উন্মত্তের প্রায়।
ভবে তুমি কে আগত চিনিতে না দাও,
চিনিতে পারিলে তুমি ছলেতে ভুলাও।
ভক্তির সাগর তুমি ভক্তি কথা বলে,
মজায়ে ভক্তের মন চরণ কমলে।
[illegible]য়ে বড় খুশী মন,
প্রণমি তোমায় প্রভু ভকত জীবন।

ভকত পরাণ বঁধু, প্রিয় অভিরাম,
ভক্তের সম্বল সদা তব পুণ্য নাম।
ভকত শরণ তুমি, ভক্ত প্রাণ সম,
ভক্তের সর্ব্বস্ব তুমি প্রাণ প্রিয়তম।
বিরাজিছ সদা ভক্ত হৃদি সিংহাসনে,
স্বরগ, পাতাল, মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে।
তুমি বিনে ভকতের নাহি অন্য গতি,
তব পদে ভক্ত তাই করে সদা নতি।
মহারাজ রাজেশ্বর—দীন দ্বিজ বেশে,
জ্ঞান বিতরণে আসি' এ ভরত দেশে।

জ্ঞান সিন্ধু হ'য়ে তুমি উন্মাদের প্রায়,
ভাবাবেশে দিন তব কোথা চলে যায়।
ভাবের আবেগে সদা কাঁপে কলেবর,
ভবে এসে কত লীলা কর লীলাধর!
বাহ্যিকে হেরিছে তোমা, নরের আকার,
ভগবৎ ভাব হৃদে খেলে অনিবার।
নরনারী ছিল পাপে হ'য়ে নিমগন,
তাই উদ্ধারিতে তব মর্ত্ত্যে আগমন।
ভক্তসনে নানা খেলা খেলি' বসুধায়,
চলে গেল দিন তব অব্যক্ত লীলায়।
লীলার সাগর তুমি, লীলাময় হরি,
মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ নররূপ ধরি।
হে ভক্ত কল্যাণকামী, ভকত শরণ,
নত শিরে বন্দি তব অভয় চরণ।

শ্রীবীণাপাণি চৌধুরী

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী

মা!
পুণ্য প্লাবনে প্লাবিতে ধরণী,
নাশিতে পাপের কালিমা, গ্লানি;
আঁধারে রচিতে আলোক-সরণি,
এসেছিলে তুমি জননী—রাণী।
হস্তে তোমার চির-বরাভয়,
কণ্ঠে তোমার অভয়-বাণী।
নয়নে তোমার অতুল করুণা,
চির স্নেহাতুর হৃদয় খানি।
এসেছিলে দীন-সন্তান লাগি
অশ্রু-সজল-চক্ষে;
তাপিত ধরার দুঃসহ ভার
বরিতে আপন বক্ষে।
বিশ্ব-পূজিত সন্তান তব,
তোমার আশীষ-লিপিকা খানি
মস্তকে ধরি',—লঙ্ঘি জলধি,
ঘোষিল তোমার 'মুক্তি-বাণী'।
তবুও জননী রহিলে গোপনে,
জানিল না কেহ বারতা তব।
আপন বারতা রাখিয়া গোপনে,
জানালে জগতে বারতা নব।
এসেছিলে তুমি অরণিব সম,
গুপ্ত বহ্নি বক্ষে।
'বহ্নি-মন্ত্রে' দানিতে চেতনা,
জানাতে পরম-লক্ষ্যে।
চির-বরেণ্য বিশ্ব-রাজের,
বরণীয়া-লীলা-সঙ্গিনী।
তপনে করেছ মুক্তি বপন,
অপরূপ লীলা-রঙ্গিনী।
এসেছিলে তুমি চরণ পরশে,
করিতে ধরণী ধন্যা।
এসেছিলে তুমি ধূলির মাঝারে,
বহাতে পীযূষ বন্যা।
মৌন ধরণী চরণে প্রণত,
বন্দনা গাহে স্বর্গ।
তুঙ্গ অদ্রি, বিশাল-সিন্ধু,
নিয়ত ঢালিছে অর্ঘ্য।
'ষড়-ঋতু' তার ঢালে সম্ভার,
মাধুরী, গন্ধ, বরণে।
আমি, আপনা এনেছি, অর্ঘ্য রচিয়া,
'সারদেশ্বরী'—চরণে।

শ্রীঅপর্ণা দেবী

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা

শ্রীশ্রীমহারাজ—(প্রঃ মহারাজের প্রতি) খুব struggle (প্রযত্ন) কর। কি কচ্ছিস্ তোরা ? গেরুয়া নিলে ও সংসার ত্যাগ করলেই সব হয়ে গেল ? কি হয়েছে তোদের—সময় শুধু চলে যাচ্চে—আর এক মুহূর্ত্তও waste (নষ্ট) করিস নে। খুব জোর আর তিন চার বছর কিছু করতে পারবি। তার পর শরীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়বে—তখন আর কিছু করতে পারবি না। না খাটলে কি কিছু হয় ? তোরা ভাবছিস যে আগে বিশ্বাস ভক্তি অনুরাগ হোক তার পর ডাকব। তা কি কখনও হয় ? অরুণোদয় না হলে কি আলো আসে ? তিনি এলেই তবে প্রেম ভক্তি বিশ্বাস আপনি আসবে। তাঁকে আনবার জন্যই ত তপস্যা। তপস্যা ছাড়া কি কিছু হয় ? ব্রহ্মা প্রথমে শুনেছিলেন, "তপঃ তপঃ তপঃ।" দেখছ না অবতার পুরুষদের পর্য্যন্ত কত খাটতে হয়েছে ! কেউ কি না খেটে কিছু পেয়েছে ? বুদ্ধ চৈতন্য শংকর এঁদের কত তপস্যা করতে হয়েছিল। আহা কী ত্যাগ !—কী তপস্যা !—

বিশ্বাস কি প্রথমে হয় ? Realisation (অনুভব) হলে তবে বিশ্বাস হয়। কিন্তু তার আগে শুধু গুরু মহাপুরুষ এঁদের বাক্যে বিশ্বাস—blind faith (অতর্ক বিশ্বাস) করে এগুতে হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা জানিস্ ত ? যাই এক ফোঁটা স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ল, অমনি ডুব দিলে মুক্তো তৈরী করবার জন্য। তোরাও সেই রকম কাজ লেগে যা—ডুবে যা। তোদের একটা self reliance (আত্মবিশ্বাস) নেই ? সাধন পথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর, চার বৎসর করে দেখ দেখি, যদি কিছু না হয় ত আমার গালে চড় মারিস্।

রজঃ তমঃ ছাড়িয়ে সত্ত্বে না যেতে পারলে, ধ্যান জপ হয় না। তারপর সত্ত্বকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে, যেন না আর আসতে হয়। মনুষ্য জন্ম কত দুর্লভ ! অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। মানুষ জন্মেই ভগবান লাভ করতে হবে—মানুষ জন্মেই জ্ঞান লাভ হয়। এই জন্যেই খেটে খেটে এমন জায়গায় যা যেন আর না আসতে হয়।

মনটাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে যেতে হবে। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর পাদপদ্মে ছেড়ে দে। তিনি ছাড়া যে আর কিছু নেই—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সবই তাঁর। কিছু calculate (খতান) করিস্ না। Self-surrender (আত্মসমর্পণ) কি একদিনে হয়। সেটা হলো ত সব হয়ে গেল। সেটার জন্য খুব struggle (প্রযত্ন) করতে হয়—তবে ত হয়।

অনন্ত জীবন রয়েছে। মানুষের বড় জোর একশো বছর। যদি Eternal Happiness (অনন্ত সুখ) চাও ত এই একশো বছরের সুখ ছেড়ে দাও।

কাশী, ৫।২।২১—সন্ধ্যার পর

ল—মঃ—ধ্যান কি, মহারাজ ?—মূর্ত্তির চিন্তা ত ?

শ্রীশ্রীমহারাজ—মূর্ত্তির চিন্তা আবার নির্গুণ চিন্তা—দুই-ই।

ল—মঃ—আচ্ছা, মহারাজ, কে মূর্ত্তি, কে

নির্গুণ চিন্তার অধিকারী, গুরুই ত সে সব ঠিক করে দেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ—হাঁ, তবে মনই গুরু। মনেই কখনও মূর্ত্তির চিন্তা করতে ভাল লাগে, কখনও বা নির্গুণ চিন্তা ভাল লাগে। বাহিরের গুরু ত সব সময় মেলে না। সাধন ভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে পারে, মনই সব দেখিয়ে দেবে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—মনের নানাদিকে স্রোত, নানাদিক দিয়ে সব শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে—কতক দেহে, কতক ইন্দ্রিয়ে, কতক বিষয় মনটা বাঁধা আছে। মনের সব বন্ধন কেটে ফেল, সমস্তটা গুটিয়ে সেই দিকে লাগিয়ে দাও এই ত সাধন। সমস্ত মনটাকে concentrate (একাগ্র) করে সেই দিকে লাগিয়ে দিতে হবে, যতদিন না অভিলষিত লাভ হচ্ছে। খুব খাট, লেগে পড়। এই ত বয়স—বুড়া মেরে গেলে আর হবে না। লাগ দেখি একবার জোর করে। দেখবে মনের সব শক্তি এক করতে পারলে আগুন ছুটে যাবে। লাগ, লাগ, জপ করে হয়, ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়—সবই সমান। একটা ধরে ডুবে যাও। আর প্রশ্ন নয়—কিছু করে এসে বল। (হ—কে) পঞ্চদেবতার পাঁচটা স্তোত্র রোজ পাঠ করবে—ওটা সাধনের মত হবে।

আ—মঃ—মহারাজ, গুরু কৃপা হলে ত কুণ্ডলিনী জাগেন?

শ্রীশ্রীমহারাজ—কুণ্ডলিনী জাগা কি বলছ?—সব হয়ে যায়—ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত হয়। (ল—কে) মনকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা কর—'কি করলে?' মন জবাব দেবে—'কিছুই কর নি'। কিছু কর, কিছু কর, লেগে পড়, আর কোন দিকে দৃষ্টি নয়—কেবল সেই জিনিষ নিয়ে পড়ে থাক, ডুবে যাও।

১২।২।২১—কর্ম্ম ও সাধন ভজন সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীমহারাজ—মনের গোলমালের জন্যই জপ ধ্যান হয় না। কাজের জন্য ধ্যান জপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল। Work and Worship (কাজ এবং উপাসনা) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হয়। কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল—কিন্তু কজন পারে তা? কিছু করবে না, অজগর বৃত্তি এক idiotই (নিরেট) পারে, যার brain (মস্তিষ্ক) খাটাবার শক্তি নেই—কোনও রকমে বেঁচে থাকে,—আর পারেন মহাপুরুষরা—যাঁরা কার্য্যের পারে। গীতাতেও আছে—কর্ম্ম না করে জ্ঞান লাভ হয় না—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে সাধন ভজন করে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়—দেখছিস্ ত? কর্ম্ম, ঠাকুর স্বামিজীর—এই ভাব নিয়ে কাজ করলে কোন বন্ধন ত হবেই না, অধিকন্তু তার through (মধ্য দিয়ে) spiritual, moral, intellectual, physical (আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং দৈহিক)—সব রকম উন্নতি হবে। সব তাঁদের পায়ে সমর্পণ কর, শরীর মন—সব তাঁদের দিয়ে দাও—তাঁদের গোলাম হয়ে যাও। ব্যস্—এই তোমাদের দিয়ে দিলুম—এই দ্বারা যা দরকার, কর। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, তা করবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তখন তোমার ভার তাঁদের ওপর তোমাকে নিজে কিছু করতে হবে না। ঠিক ঠিক এইটে করা চাই, না হলে—'রামও বলবে আবার কাপড়ও তুলবে'—এ চলবে না। আমরাও ত পাঁচ, ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। স্বামিজী আমাকে ডেকে বল্লেন,—'ওরে, ওতে কিছু নেই, কাজ কর। আমরাও তখন সব রকম কাজ করেছি। কই, তাতে ত কিছু খারাপ হয়েছে বলে বুঝতে পারি নি? তবে, আমাদের স্বামিজীর কথায় একটা শ্রদ্ধা ছিল। তোরাও এই দুই মহাপুরুষের কথায় অগাধ বিশ্বাস রেখে চলে যা। কিছুই ভয় নেই। একটাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ্। কতলোক এরপর ভাঙচি দেবে—'ও আবার স্বামিজীর কাজ কি?' কারুর কথা শুনবি নি। জগৎ যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবু ছাড়বি নি—যেটা পাকা করে ধরেছিস্।

কথা প্রসঙ্গে

(তীর্থ, মন্দির ও মূর্ত্তি)

তীর্থ দেখিতে এলুম, কিন্তু তীর্থ, কোথায়? সবই ত ধ্বংস স্তূপ। ভাগবত লীলার পরিবর্ত্তে ধ্বংস লীলাই অধিক প্রকট। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে ঔরঙ্গজেব মসজেদ্ গড়েছিলেন, এবং নাকি বলেছিলেন, 'যথার্থ বিশ্বনাথের মন্দির আমিই গড়েছি।' অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের ওপর বাবরের নির্ম্মিত বিরাট মসজেদ্,—সম্মুখে মাত্র একটু অপরিসর স্থলে রামচন্দ্রের জন্মস্থল বলে এখন নির্দ্দেশ করা হয়। প্রয়াগে অক্ষয় বট নিয়ে বেণীমাধবের মন্দির ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা অধিকার করে ধ্বংস করেন এবং আকবর পরে এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইংরাজরাজের উদারতায় তীর্থযাত্রীরা এখন দুর্গমধ্যে প্রত্নশালায় রক্ষিত ঋষি ও দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি এবং অক্ষয় বট দেখতে যায়। মথুরায় কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ নির্ম্মিত কেশব মন্দির স্থলে ঔরঙ্গজেবের মসজেদ শোভিত, ওর পেছুনে একটি ক্ষুদ্র গৃহে এখন কেশবজীর মন্দির। ব্রজমণ্ডলে ব্রজনাভ প্রতিষ্ঠিত ১৬টি দেবমূর্ত্তি ও বৌদ্ধযুগের মঠ মন্দিরগুলি পাঠান অত্যাচারে সবই ধ্বংস—ছিল মাত্র যমুনা, গোবর্দ্ধনগিরি ও গোপীর পদরেণু রজঃ ব্রজ। তাই রূপ গোস্বামী লিখেছিলেন, "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা।"

বৃন্দাবনকথাকার এ ধ্বংসলীলার একটি বিবরণী সংগ্রহ করেছেন, সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি, তাহলেই ১১শ হতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল বেশ বোঝা যাবে। "মামুদ গজনি ১৭ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়া নানা প্রসিদ্ধ দেবালয় ও সমৃদ্ধ নগর ধ্বংস করিয়া যান। তিনি ১০১৮ খৃঃ অঃ মথুরা হইতে অনেকগুলি মণিমাণিক্য বিজড়িত, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি অপহরণ করিয়া, পাষাণময় মূর্ত্তিগুলিকে ও সহস্রাধিক মন্দিরাদি চূর্ণ করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে নগরীকে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। ২০ দিন ধরিয়া লুণ্ঠন করিয়া এখান হইতে তিনি ৫০০০হাজার বন্দী ও ৩ কোটী টাকা লইয়া যান। মথুরা লুণ্ঠনের পূর্ব্বে বারণ ও বুলন্দ সহরের রাজা দুর্ব্বল হরদত্ত নিজ রাজ্যের মধ্যস্থ সমস্ত দেববিগ্রহ জলে ফেলিয়া দিয়া ও এক কোটী টাকা এবং ৩০টী হস্তী মামুদকে উপহার দিয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ওদিকে মহাবনের তেজস্বী বীর রাজা কুলচন্দ্র মামুদের সহিত ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া যান। সমস্ত সেনা নষ্ট হইয়া গেলে, তিনি গৃহে ফিরিয়া প্রথমে মহিষীর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া সেই তরবারি নিজ বক্ষে বসাইয়া দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন।

"ফিরোজ সা টোগলক (১৩৫১-১৩৮৮ খৃঃ অঃ) নিজ রাজ্যান্তর্গত সমস্ত দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। দিল্লীতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একখানা তক্তার উপর অভীষ্টদেবের মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিত শুনিয়া, ফিরোজ তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন। অভাগার হাত পা বাঁধিয়া প্রাসাদ সম্মুখে সেই তক্তাখানা সমেত তাহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিয়া মারেন। তাঁহার আমলে কোন হিন্দু, তীর্থ দর্শন বা পবিত্র নদী সঙ্গমাদিতে স্নান করিতে পারিত না। ইহার

পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে জিজিয়া কর দিতে হইত না, ফিরোজ তাহাদিগকেও এই জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করেন]। ফিরোজের আত্মজীবনীতে আছে, 'জিজিয়া কর' হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় হিন্দুরা নানাদেশ হইতে দলে দলে আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল; আমিও তাহাদিগকে আদর দেখাইয়া উপহার ও পুরস্কার দিয়াছি।' অন্যে পরে কা কথা, এইরূপ ভূসম্পত্তি পুরস্কারলোভেই লক্ষ্মণপাল, সম্বরপাল এবং সগরপাল নামে তিনজন যদুবংশীয় রাজকুমার ফেরোজের আমলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (See Cunningham's Archaeological Survey Vol XX) ইহার পর সেকেন্দর লোদীও, একজন গোঁড়া মুসলমান সম্রাট (১৪৮৮-১৫১৬ খৃঃ অঃ), যখন যে দেশ জয় করিতেন, তথাকার দেবমূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস করিতেন এবং কোনও স্থানে পবিত্র মেলা বা হিন্দুদিগের উৎসব হইতে দিতেন না। তাঁহার আদেশে রাজ্য মধ্যে কেহ পবিত্র কুণ্ড নদী বা সরোবরে স্নান করিতে পারিত না। 'কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী, যে কোন ধর্ম্মই হউক না কেন, দৃঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সাধন করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন,' এই মত প্রচার করেন বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। সেকেন্দর লোদী মথুরার সমস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল স্থানে কসাইদিগের দোকান বসাইয়া দেন এবং বিগ্রহের ভগ্ন খণ্ডগুলি লইয়া মাংস ওজনের বাট খারা করিয়াছিলেন। মথুরার হিন্দু অধিবাসিগণের ধোপা নাপিত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।"

কেন এরকম হলো?—কেনই বা মুষ্টিমেয় আফগান সমগ্র উত্তর ভারতে অচিরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করল? হিন্দু দুর্ব্বল--কিন্তু সেই হিন্দু মুসলমান হওয়া মাত্র এমন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠত কেন? - কেন দলে দলে হিন্দু ইসলামের পতাকার তলে সমবেত হবার জন্য এমন উদ্গ্রীব হয়ে উঠত, শুধু কি "ভূসম্পত্তি পুরস্কারলোভেই?" মুসলমান প্রকৃত হিন্দু, লক্ষ লক্ষ হিন্দু, উৎপীড়িত অত্যাচারিত হিন্দুর সহিত কখন লড়াই করে নি, বরং তাদের সহানুভূতিই পেয়েছিল—মুসলমান যুদ্ধ করেছিল যন্ত্রবৎ প্রাণহীন, কুকুরের ন্যায় পরস্পর বিবদমান, ভোগী, বিলাসী দুর্ব্বল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের সহিত। ইস্‌লামের সাম্য ও সংহতিতে মুগ্ধ হয়ে ভারতের যারা লক্ষ, উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক যারা কুকুর শেয়ালের ন্যায় চিরকাল ব্যবহার পেয়ে এসেছে, যাদের পেশীতে ছিল বল, হৃদয়ে ছিল অদ্ভুত ধৈর্য্য, যারা পবিত্র কুণ্ড নদী পুষ্করিণীতে স্নান পানাদি পর্য্যন্ত করতে পারত না, কথায় কথায় যারা সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করত, যার উদাহরণ এখনও পর্য্যন্ত দক্ষিণদেশের নীচ জাতিদের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্যবহারের মধ্যে পাই,—তারাই মুসলমান হয়ে মন্দির কলুষিত করেছে, হিন্দুদের পবিত্র কুণ্ড নদী সরোবরে স্নানাদি বন্ধ করেছে। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তীয় পূর্ব্বদেশীয় আর্য্যেরা পশ্চিমদেশীয় আর্য্য আফগান জাতির ওপর কিরূপ ঘৃণা পোষণ করতেন তা আমরা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে স্পষ্টরূপেই দেখতে পাই। তাই স্বামিজী বলচেন, "ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরায়ণ জাতি কখন দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না" (ভা-বি, ১৪০ পৃঃ), "ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়াছে। এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খৃষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ?" (ঐ, ১০৫ পৃঃ)। লোকে সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া কি অখাদ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হয়? অত্যাদার বেদান্ত ধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও তা কখনও ভারতে ব্যবহৃত হয় নি বলেই, অর্থহীন কর্ম্মকাণ্ড বহুল, অতি বিষম নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজ 'জন' ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বামিজী বলচেন, "যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, কি মুসলমান ধর্ম্ম, কি খৃষ্টান ধর্ম্ম, কি জগতের অন্য কোনও বাদ—কিছুই এখানে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইত না।" (ভা-বি, ১০৩

পৃঃ)। শরীর দুর্ব্বল না হলে কোনও ব্যাধিই আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য ত্যাগ ও তপস্যা এবং সাম্য ও স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে হিন্দু যখন কর্ত্তব্যকে দেশাচারের সমষ্টি এবং শ্রীভগবানের উদ্দীপক প্রতীক সমূহকে ক্রীড়াকন্দুক, চিন্তার স্বাধীনতা হেতু বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ গণ্ডিদ্বারা অন্ধকারায় পর্য্যবসিত এবং শ্রম-বিভাগজ বর্ণ সকলকে যখন উচ্চ নীচ আখ্যা দান করলে তখনই ভারতে ইসলাম ধর্ম্মের আবির্ভাব। স্বামিজী তাই বলচেন, "মুসলমান অধিকারেও এই ধর্ম্মের এক-চেটিয়া-অধিকার-রাহিত্যরূপ মহা সুফল ফলিয়াছে। আর মুসলমান রাজত্ব যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মন্দ ছিল তাহাও নহে—জগতের কোনও জিনিষই সম্পূর্ণ মন্দ নহে, কোন জিনিষই সম্পূর্ণ ভাল নহে। মুসলমানের ভারত অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কেবল তরবারি বলে উহা সাধিত হয় নাই।"

(ভা-বি ৩৩১—২)

সেকন্দর লোদীর অত্যাচার যখন চরম হয়ে উঠেচে, তখন পুনরায় শ্রীভগবানের আবির্ভাব। সেকন্দরের চতুর্থ বৎসরে ১৫১৬ খ্রীঃ অঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ব্রজ উদ্ধারে গমন করেন। তিনি প্রথম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাগপাশ ছেদন করলেন—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

—হিন্দু ধর্ম্ম উজ্জীবিত হলো, ইসলাম ধর্ম্মের গতিও অবরুদ্ধ হলো। তিনি যবন হরিদাসকে কোল দিলেন। সনাতন বারাণসীতে যখন প্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন ভগবান আলিঙ্গন করতে এলে বলেন, 'আমি যবন স্পর্শে অপবিত্র, আমাকে স্পর্শ করবেন না।' তাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি শ্লোক (৭।৯।১০) আবৃত্তি করেন,

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে বলেছিলেন, "যাঁর মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন সকলই শ্রীভগবানে অর্পিত তাদৃশ চণ্ডালও অরবিন্দনাভ শ্রীভগবচ্চরণার-বিন্দ-বিমুখ দ্বাদশ-গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা, সেই চণ্ডাল নিজ প্রাণ ও কুল পবিত্র করে, পরন্তু ভূরিমান দ্বিজ তা পারেন না।"

ভগবদিচ্ছায় এই সময় (১৫২৬ খ্রীঃ অঃ) বাবর দিল্লী অধিকার করেন, কাজেকাজেই পাঠানরা বিশেষভাবেই বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং হিন্দুদের সহানুভূতির জন্য একটু উদারও হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাবর লোদী-বংশেরই ধ্বংস কার্য্য গ্রহণ করে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের জন্মস্থানে মস্‌জেদ্ তুললেন। আবার পাঠানেরা শের সাহের নেতৃত্বে (১৫৪০ খৃঃ অঃ) বাবর পুত্র হুমায়ুনকে বিতাড়িত করেন এবং হুমায়ুন আবার ১৫৫৬ খ্রীঃব্দে দিল্লীর সিংহাসন উদ্ধার করেন। সেরসাহ হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। এ সময় দিল্লীর সিংহাসনের প্রতিযোগিতায় পাঠান ও মোগল উভয়েই হিন্দুর সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষায় কিছু উদার ভাব অবলম্বন করায় ধীরে ধীরে হিন্দুর তীর্থ-গুলি আবার জাগ্রত হতে লাগলো। সেকন্দর লোদীর অবসান কালে অলৌকিক ভাবে প্রথম মাধবেন্দ্র পুরী গোবর্দ্ধনে গিরিধারী গোপাল এবং হুমায়ুনের রাজত্বকালে শ্রীরূপ গোস্বামী গোবিন্দ দেবজী, সনাতন গোস্বামী মদনমোহন, মধু পণ্ডিত গোপীনাথ, গোপাল ভট্ট শ্রীরাধারমণ এবং তানসেন গুরু হরিদাসস্বামী বঙ্কুবিহারীর আবিষ্কার করেন এবং ধীরে ধীরে অপরাপর মূর্ত্তিরও প্রকট হতে লাগলো। এই সময় বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় হিন্দুর গঠন কার্য্যের কেবল

আরম্ভ হয় নি, পরন্তু মহারাষ্ট্রে তুকারাম, গুজরাটে ও রাজপুতনায় বল্লভাচার্য্য, পাঞ্জাবে নানক, বারাণসীতে কবির এবং অযোধ্যায় তুলসীদাস আবির্ভূত হয়ে হিন্দু ধর্ম্মকে সমধিক উদার ও তার পুষ্টিসাধন আরম্ভ করেন।

আকবর সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহ যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যকে জয় করতে যাবার পূর্ব্বে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণের মানৎ করেন। তিনি যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসে ১৫৯১ খ্রীঃঅব্দে লাল পাথরে গোবিন্দজীর বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের যোগপীঠের ভিত্তি গাত্রে লেখা আছে—সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহা রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথিরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস সুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ দেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দ দেব কো নামে উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিক চংদ চোপাঙ শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিলবলি কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল।

আকবর সাহ জয়পুরী লাল-পাথর মন্দিরের জন্ম নাকি বিনা মূল্যে দিয়েছিলেন। কেবল মসলা ও কারিগর বাবদ মানসিংহকে ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। উত্তর ভারতে এরূপ মন্দির ত নেই, পরন্তু কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতায় এ তাজ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাজের গাত্রে খোদাই কাজ কেবল ক্যানা ফুলের। মুসলমানের জীব জন্তু আঁকবার যো নেই—শাস্ত্রে নিষেধ; সেইজন্য ওস্তাদি দেখাতে হয়েচে মাত্র গোটা কতক পাতা লতা এবং ঝিলিমিলির ভেতর দিয়ে। পদ্ম, চক্র, গোলাপ, স্বস্তিক হিন্দুরা ব্যবহার করে বলে তাঁরা সেগুলোকে যত্নের সহিত উপেক্ষা করেচেন। তাছাড়া শঙ্খ, হংস, ময়ূর, অশ্ব, হরিণ, হস্তী, নর্ত্তকী প্রভৃতির ভেতর দিয়ে হিন্দু দক্ষিণ দেশীয় শিল্পীরা কারু-শিল্পে অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হয়েচে। তবে হিন্দুর কাজ খিজি, মুসলমানের কাজ প্রশস্ত—হিন্দুর মন্দির-গর্ভ হৃদয় গুহার ন্যায় অন্ধকার ও নিস্তব্ধ, পরন্তু মস্‌জেদ্ আলো-বাতাসে নির্ম্মল ও গম্ভীর। মন্দিরের বহির্দৃশ্য যেন উৎসর-ময়—মসজিদ যেন ধ্যানস্থ। তাজের উপাদান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্ম্মর, ২০ হাজার লোকের সতর বৎসরের পরিশ্রম এবং অনুমান ৫০ লক্ষ হতে ৬ কোটী টাকা (বোধ হয় স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিরত্নাদির সহিত)।

জাঠেরা আগ্রার ইমদাদদৌলা (নূরজিহানের পিতার কবর) তাজমহল, মতিমস্‌জেদ্, খাস-মহল, পরবর্ত্তী কালে অধিকার করেও হিন্দু বলে ধ্বংস করে নি, পরন্তু তৎপূর্ব্বে ঔরঙ্গজেবাদি কুরু-ক্ষেত্র, রাজপুতানা, আজমীড়, মথুরা, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বারাণসী, মুঙ্গেরের যেখানে যা কিছু পুরাতন মন্দির ছিল ভেঙ্গে মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ করেন। এর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হচ্ছে মথুরার কংসকারায় শ্রীভগবানের জন্মস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বুন্দেল রাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত কেশবজীর মন্দির। ১৬৭০ খ্রীঃঅব্দে ঔরঙ্গজেব স্বহস্তে এর ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ এবং পরে এর ওপর মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ করেন। তা ছাড়া তিনি নাকি একদিন আগ্রা হতে অভ্রভেদী গোবিন্দজীর মন্দির কিরীটে সোয়ামণ ঘৃত প্রদীপের আলোকে ঈর্ষান্বিত হয়ে ঐ মন্দিরের তথা গোপীনাথ ও মদনমোহনের চূড়াগুলি ভগ্ন এবং মন্দির কলুষিত করেন। আবার ১৭৫৭ খৃঃঅব্দে নৃশংস নাদীর সার সেনাপতি আমেদ শা দুরাণী ব্রজধাম লুণ্ঠন ও অধিবাসীদের নিরর্থক হত্যা করেন। দিল্লীশ্বর আহম্মদ শা ১৭৫২ খৃঃঅব্দে জাঠ দমনে সৈন্য প্রেরণ করেন, সেনাপতি জাহান খাঁ জাঠদের কিছু না করতে পেরে মথুরা লুণ্ঠন ও হত্যা করে ফিরে আসেন। সাহ আলমের উজীর নজফ খাঁ ১৭৬৮ খৃঃঅব্দে বর্ষণাগ্রামে পলা-তক মথুরাবাসীদের লুণ্ঠন ও মন্দির ভূমিসাৎ করেন।

এইত গেল হিন্দু কীর্ত্তির কথা। এখন বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলি গেল কোথা? তাজমহলের ফটকের পাশে যে প্রত্নশালিকা আছে, সেখানে দুটি উৎকৃষ্ট বুদ্ধ-মস্তক রক্ষিত আছে, ও নাকি সারনাথ থেকে কেটে নিয়ে আসা হয়। এক সময় এই সারনাথ ও কাশীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-কৃষ্টি সমভাবে চলেছিল। ঠিক তেমনি ব্রজ-মণ্ডলেও এক সময় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-কৃষ্টি উত্থান-পতনের সহিত তরঙ্গাকারে চলেছিল। বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় হিন্দু কীর্ত্তিগুলি ম্লান হয়ে আসে এবং পুনরায় হিন্দুর অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলি ম্লান হয়ে পড়েছিল। "বৃন্দাবন কথাকার" বলেন যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মথুরা প্রদেশে সম্রাট অশোক অনেকগুলি স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের বংশধরেরাও এখানে স্তূপ, চৈত্য ও সংঘারাম নির্ম্মাণ করেন এবং মথুরা তাঁহাদের রাজধানী হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান এখানে ২০টি বিহার ও ৩০০০ ভিক্ষুকের অবস্থান দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ এন্ সাং এখানে অশোকগুরু উপগুপ্ত নির্ম্মিত শ্রীবুদ্ধের নখস্তূপ বিহারাদি দেখেন এবং ৫টি হিন্দু দেবালয়ের উল্লেখ করেন। তখন মাত্র এখানে ২০০০ বৌদ্ধের বাস ছিল। বৌদ্ধ উপপ্লাবনে দ্বাপরের কীর্ত্তি ম্লান হয়ে আসে। পরে হিন্দুর পুনরাবির্ভাবে এই বৌদ্ধ কীর্ত্তিগুলিও ম্লান হয়ে পড়ে। হিন্দুরা যে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করেন নি এমন কথা বলা যায় না। মগধরাজ পুপ্‌ফমিত্র (খৃঃ পূঃ ১৮১-১৫০) চারবার বৌদ্ধ নির্য্যাতন করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে নবাগত শকরাজ মিহিরকুল শৈব ধর্ম্ম গ্রহণ করে ১৬০০ সংঘারাম ও বিহার ধ্বংস করেন। মহারাজ সুধন্বাও নাকি কুমারিল্ল ভট্টের উত্তেজনায় ঐরূপই করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের মধ্য দিয়েও ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণপতি রাজা শশাঙ্কও নাকি বোধগয়ায় বোধিদ্রুম ছেদন, বুদ্ধমূর্ত্তি আচ্ছাদিত, তথায় শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং পাটলিপুত্রের বুদ্ধ-পদাঙ্ক চূর্ণ করেন। বাকি শেষ করেন পাঠান বীরেরা।

এত বিপ্লব বয়ে গেল, প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি কিছুই নেই, কিন্তু তীর্থত যেমন তেমনিই আছে। কাশীর বিশ্বনাথ ও বেণীমাধব যেমন তেমনিই লোকারণ্য। সারনাথে ধর্ম্মপালের চেষ্টায় আবার মূলগন্ধকুটি মন্দির ও শ্রীবুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েচে—অযোধ্যায় লক্ষ যাত্রীর কণ্ঠে "জয় সীয়া রাম," "জয় মহাবীর স্বামীকি জয়" ধ্বনিতে সরযূ ও কনকভবন মুখরিত, আর চিন্ময়ধাম ব্রজমণ্ডলে অসংখ্য মূর্ত্তি পুনরায় ফুটে উঠচে। স্বামিজী বলচেন, "তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমাপূজা থাকিবেই থাকিবে।" (ভা-বি, ২৭৩ পৃঃ)।

যতকাল হিন্দুর মধ্যে হরগৌরী, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের স্মৃতি থাকবে, ততদিন তাদের হৃদয়ে ভাবের উৎস প্রবাহিত হয়ে তীর্থ স্থানগুলিকে জীবন্ত রাখবে। হিন্দু প্রতিমা নির্ম্মাণ কোরে তার ভেতর নিজের হৃদয় হতে ভাবরূপী ইষ্টের বহির্বিক্ষেপ করে পূজো করে এবং পূজো হয়ে গেলে সে পুনরায় ইষ্টের ভাব-ঘন মূর্ত্তি নিজ হৃদয়ে তুলে রাখে এবং প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়। তাই বলি যতবারই তীর্থ কলুষিত, মন্দির ভগ্ন এবং মূর্ত্তিগুলি চূর্ণ হোক, যতকাল ভক্তের হৃদয়ে ভাব থাকবে ততকাল ঐ পুণ্য স্থান গুলিতে তীর্থ আবার গড়ে উঠবে, মূর্ত্তিতে আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবে। স্বামিজী বলচেন, "মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জ্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, লোকে ইহার উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে

পবিত্র চিন্তার পরমাণু সদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে।" (রা-যো, ৩৭ পৃঃ)।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের জন্মে তীর্থ হয়েচে—তীর্থ রামকৃষ্ণ সৃষ্টি করে নি। সেইরূপ যতদিন ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের ভাব থাকবে, তীর্থ মঠ মন্দির ততদিন অবিনাশী। ভারতে যে কোনও ভাবধারাই আসুক না কেন, যদি আমাদের মধ্যে কিছু সত্য থাকে তাহা নাশ করে কাহার সাধ্য, আর যা মিথ্যা তা কোন কালেও চিরস্থায়ী নয়, আর তা নিয়েই বা কি হবে। পরন্তু যদি ভগবান সত্য হন এবং তাঁর লীলা সত্য এবং জগতের মঙ্গলকরী হয়, তা হলে তীর্থ, মন্দির ও মূর্তি চিন্ময়েরই মত নিত্য ভক্ত হৃদয়ের ভাবরাজ্যে এবং বাহ্য শিলাদিতে চিরন্তন হয়ে বিরাজিত থাকবেই।

লীলা কী?—একরস নিত্য ব্রহ্মে তাঁর প্রীতি-শক্তি বিচিত্র অরূপ রসের লহরী তুলচে। সাধারণের উপভোগ্য হবার জন্য যখন স্বতন্ত্র ভগবান স্বেচ্ছায় বিবিধ উপাধির ভেতর দিয়ে লীলা-স্বরূপ সেই নিত্য অরূপ রস লহরীকে রূপায়িত করেন তখনই হয় নর-লীলা। মিষ্ট অরূপ—আঙ্গুর তার রূপায়তন বা উপাধি; বাৎসল্য অরূপ—মাতা তার রূপায়তন বা উপাধি। আত্মা অরূপ—জীবত্ব তার রূপায়তন বা উপাধি। আত্মরস অরূপ—ঈশ্বর প্রীতি, জীব প্রেম, প্রাণীর মধুরাদি ভাব রূপায়িত। জীব ব্রহ্মই—তাই জীবের মধ্যে অসীম সচ্চিদানন্দ রসের সসীম বা ঔপাধিক অভিব্যক্তি—আবরণ হেতু হৃদে বিদ্যমান রসসিন্ধু বিন্দুবৎ হয়ে আছেন। ভক্ত-হৃদয়ে এই রসসমুদ্র নিরন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠচে, তাঁরা সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ রসময়কে প্রত্যক্ষ করেন, কারণ ভক্তের নিকট তিনি নিরাবরণ,—তাই ভক্ত সান্নিধ্যে পাষাণময়ী মূর্তি রসময়ী সচ্চিদানন্দময়ী হয়ে ওঠেন। তাই বলি যতদিন আমাদের দেশে রামপ্রসাদ কমলাকান্ত, তুলসীদাস সুরদাস, রূপ সনাতন, বল্লভ তুকারাম, নানক কবির, রামানুজ মধ্ব, নিম্বার্ক শংকর প্রভৃতি আত্মারাম জ্ঞানী ভক্তেরা বর্ত্তমান থাকবেন, ততদিন মিহির কুলের সংঘারাম ভূমিসাৎ, শশাংকের বোধিবৃক্ষ ছেদ, বক্তিয়ারের বিক্রমশীলা ধ্বংস, ঔরঙ্গজেবের কালাপাহাড়ী ব্যর্থ শ্রমেই পর্য্যবসিত হবে।
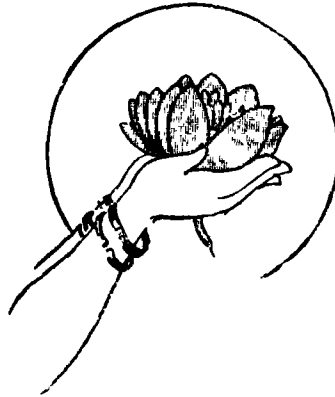
পথ-প্রেম

মাতৃগর্ভমাঝে ধরণীর ধূলিধ্বাস্ত পথ-প্রহেলিকা,
ঐশ্বর্য্যের চারু ইন্দ্রজাল, মোহময় মায়া-মরীচিকা,
প্রলোভিতে পারেনি তখন। দীপ্তাশায় অমিত উদ্যমে
সঙ্কল্প জাগিল মনে, কোনক্রমে কভু এতটুকু ভ্রমে
ধরণীর ধূলিময় পথে—কণ্টকিত কঙ্কর-কঠিন,
নাহি অপেক্ষিয়া সম্বরিবে সহস্র সে প্রলোভন-হীন।
প্রভাতের প্রথম আলোকে—

জগতের নগ্ন ক্ষুধা লয়ে,

যেদিন আসিলা ধীরে ধরণীর তীরে উচ্ছ্বসিত হয়ে,
সঙ্কল্প টলিল সেথা, প্রাক্তনের লিপি। কোথা হতে এসে
সূক্ষ্ম এক কালো যবনিকা ধীরে ধীরে আবরিল শেষে।
বিবশ ইন্দ্রিয়, হেরিলা আবেশে মরি! বিস্ময় গম্ভীরে,
সাভরণা শোভাময়ী নগ্ন-বিবসনা, দীপ্তা ধরণীরে।
ভেসে গেল সব—অনন্ত পথের স্মৃতি, প্রাবন্ধ তাহার!
প্রমত্ত মাতাল পান্থ রঙিন্ নেশায়, মরি চমৎকার!!
কামনা-শৃঙ্খল আসি মুগ্ধ পথিকেরে

জর্জ্জর-বন্ধনে,

নির্বিচারে বেড়িল বিষম অজানিত সেই কোন্ ক্ষণে।
হ'রেনিল মোহিত মানস ধীরে ধীরে অতি চুপি সারে;
এতটুকু পারেনি জানিতে, বুঝে নাই কিছু একেবারে
বিষাদের ঘোর অন্ধকার মুছে দিল অদম্য উৎসাহে
সান্ত্বনার হেতু। আনন্দের আলো হাসি অজস্র প্রবাহে
বহাইল নয়নের কূলে।

তবু যেন কোন্ আকর্ষণে—

হ'য়ে আকর্ষিত, ব্যগ্রতায় শৃঙ্খলিত চকিত চরণে
সুমুখে ছুটিতে চায়, আকুলিত প্রাণ ল'য়ে বারবার,
পারে না তো হায়। পিছে টানে, ধায় পুনঃ—ফিরায় আবার
এই হেথাকার ধর্ম, বন্ধু! হ'য়োনাকো ভীত কোনমতে;
পথের এইতো প্রেম। পুরস্কার!!

অনন্ত যাত্রার পথে।

—পূর্ণেন্দু রায়

স্বামী শিবানন্দ ও প্রাচীন মঠের অস্ফুট স্মৃতি

শ্রীভগবানের লীলা সহচর, অন্তরঙ্গ, ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ, মহাপুরুষ মহারাজ অখণ্ড ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৩।২।৮ মুণ্ডক উঃ

প্রবাহমান নদীসমূহ যে প্রকার নিজ নিজ নাম—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত গিয়া অভেদ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিদ্বান, ব্রহ্মবিদ পুরুষ নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষ পরমাত্মাতে অভেদ প্রাপ্ত হয়েন। আজ মহাপুরুষ মহারাজ দেহ, গেহ, শিষ্য, ভক্ত, মঠ ও মিশন ত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষ পরমাত্মাতে অভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্থূল শরীরের কার্য্য শেষ হইয়াছে, জগৎ তোমার কাজ তুমি দেখ। কত স্নেহ, কত ভালবাসা, কত দয়া পরোপকার, কত সুখে দুঃখে সহানুভূতি স্থূল শরীরের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হইয়াছে। সেই চিন্ময় মূর্ত্তি, চিদ্‌ঘন বিগ্রহ, জীবের ভববন্ধনের মোচনকারী, ইহকাল পরকালের কল্যাণকারী, আত্যন্তিক্ দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সহায়ক ও পথপ্রদর্শক, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ মহারাজ আজ ধ্যানের সামগ্রী। যিনি হাসি মুখে সকলের কুশল প্রশ্ন করিতেন, ত্রিতাপ তাপিত নরনারীগণের সকল দুঃখ কাহিনী ধীর স্থির হইয়া শুনিতেন ও অভয়বাণী দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া শান্তি দিতেন ও সকল জ্বালা মিটাইতেন, তিনি এখন কোথায়? আমাদের চির আদরের চির শ্রদ্ধার মহাপুরুষ মহারাজ দীর্ঘ ৩২ বৎসরের পরিচয়ের পর স্থূল শরীরে অন্তর্হিত। বারাসতে রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে ১৮৫৫ * সালের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারকেশ্বরের নিকট পূজা দিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন তারকনাথ। ইনিই উত্তর কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী বা মহাপুরুষ মহারাজ। বাল্যকাল হইতে শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন ও যাতায়াত আরম্ভ করেন। সমাধি কি জিনিষ, কিসে তাহা লাভ হয় জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঘটনাক্রমে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গিয়াছিলেন, তথায় বন্ধুগণের নিকট শুনিতে পাইলেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থাকেন, তাঁহার সমাধি হয়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত প্রথম দর্শন দিনে তাঁহাকে সমাধিস্থ দেখিলেন; মন ধীরে ধীরে বহির্জ্জগতে নামিতেছে, তখন কেবল সমাধির কথাই বলিতেছেন, দেখিয়া শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ও চাকরি করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী ভালবাসা ও স্নেহ সংসারকে ফিকা করিয়া তুলিল। কয়েক দিন যাতায়াতের পর একদিন শ্রীভগবান তাঁহার জিহ্বাতে প্রণব সংযুক্ত ইষ্টমন্ত্র লিখিয়া দিলেন। ভবসংসারের পথিক বাসা পাকড়াইল।

---

* এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তাঁহার নিজের কথায় তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের উপরে হইয়াছিল। তদনুযায়ী তাঁহার জন্ম-বৎসর আরও পিছাইয়া যায়।

স্বাতীনক্ষত্রের একবিন্দু বারি পাইয়া ঝিনুক অতল সমুদ্রে তলাইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ হওয়াতে তাঁহাকে কাশীপুর বাগানে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। ঐ সময়ে ভক্তগণ ও গুরুভ্রাতাগণের সহিত তিনি পরিচিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সাধন আরম্ভ করিলেন। দৈব অনুকূল হইল, পুণ্য প্রারব্ধ ফল দিতে উন্মুখ হইল; স্ত্রী বিয়োগ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। চাকরি ছাড়িয়া দিলেন, সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। একদিন নরেন্দ্র, তারক, কালী তপস্যা করিবার জন্য বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গিয়াছেন। কয়েক দিন পর শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন, তিনি দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বাদশ জনকে গেরুয়া কাপড় দিলেন—তারকনাথ স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

কাশীপুর বাগানে ১৮৮৬ সালের ১১ই আগষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহ মহাসমাধিতে অবসান হইল। তাঁহার দেহ অবসানের পর সুরেশবাবুর সহায়তায় বরাহনগরে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া ত্যাগিশিষ্যগণ তীব্র সাধনা আরম্ভ করিলেন। গুরু ভ্রাতাগণ সব একত্রিত হইলেন, মঠ গড়িয়া উঠিল। শশিমহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা পূজা, ভোগ, আরাত্রিক ও গুরুভ্রাতাগণের সকল প্রকার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীভগবানের মানস পুত্র নিত্যসিদ্ধ রাখাল মহারাজ ও খোকা মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনধামে মাধুকরী করিয়া সাধন ভজন করিতে চলিয়া গেলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। মাদ্রাজবাসিগণের উৎসাহে ও সাহায্যে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে আমেরিকার চিকাগো সহরে ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগ দিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় বেদান্ত প্রচার করিয়া বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিলেন। চারি বৎসর সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচার কার্য্য করিয়া ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে স্বামিজীর ইচ্ছায় মহাপুরুষ মহারাজ সিংহলে বেদান্ত প্রচার করিতে যান। স্বামিজী কলিকাতায় আসিলেন, মঠ তখন আলমবাজারে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম উৎসব দক্ষিণেশ্বরে করিলেন। দ্বিতীয় উৎসব দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে। স্বামিজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে গঙ্গার উপর মঠের উপযোগী স্থান ১৫।২০ বিঘা জমি দেখিতে বলেন। তাঁহারা উভয়ে খুব পরিশ্রম করিয়াও অনুকূল স্থান সন্ধান করিতে পারিলেন না। স্থান হয় ত ছোট, দাম বেশী চায়, না হয়ত ঠিক গঙ্গার উপরে নয়, কোথায়ও বড়লোকেরা স্থান বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। স্বামিজী প্রথমে গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে স্থান লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা উভয়ে নৌকা যোগে গঙ্গার পশ্চিম কূল দিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন, তখন বর্ত্তমান মঠের জমি জঙ্গলপূর্ণ ছিল। উঁচু নীচু সামান্য কয়েকখানা একতলা ঘর ও একখানা বাবাওা দেখিয়া তাঁহারা জমিতে উঠিলেন। দেখিলেন একটা খালের মত খানিকটা রহিয়াছে, তাহাতে নৌকা ও গাধাবোট মেরামত হয়। খুঁজিয়া দেখিলেন জন-মানব নাই। পার্শ্বেই বড় বড় কাঠের আড়ৎ। সেখানে স্থানটীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন; একজন স্থানটীর মালিকের নাম-ঠিকানা বলিয়া দিলেন, আর বলিলেন, যে চেষ্টা করিলে পাইবার আশা আছে। জমি ক্রয় করা হইল। নীলাম্বরের বাগান ভাড়া লইয়া মঠ তথায় উঠিয়া আসিল। তৃতীয়বার উৎসবের তিথি পূজার দিবস স্বামিজী শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি-বিভূতি (আত্মারামের কৌটা) মঠের জমিতে লইয়া আসিয়া পূজা ও হোমাদি কার্য্য শেষ করিলেন। উৎসব নীলাম্বরের বাগানেই হইল। ইহাই হইল নব্যবঙ্গের তীর্থভূমি—শ্রীমৎ

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র বেলুড়মঠ। এই সেই মঠ যাহার সম্বন্ধে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছেন, "মঠ যখন প্রস্তুত হইতেছে তখন একদিন বাহির হইতে মঠে আসিতেছি—দেখি মঠের উপরে সোণার মত উজ্জ্বল কি জল্‌জল্‌ করিতেছে, মনে হইল বুঝি—দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে। চক্ষু মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেখি—সেই প্রকারই আছে। মনে হইল প্রভু! তোমার লীলাভূমির কত কি বিভূতি—আমি কি বুঝিব!" আহা সেই মঠ। যেখানে পুণ্যশ্লোক ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বামিজী, রাখাল মহারাজ, হরি মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ বিচরণ করিয়াছেন, প্রতি পদ সঞ্চালনে মঠের প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র করিয়াছেন—তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন। যেখানে সমগ্র জীবজগতের কল্যাণের জন্য সেবা পরোপকারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ বেদান্ত জীবনে প্রতিফলিত করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; যেখানে স্বামিজী বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত একটি প্রাণী মুক্ত হইতে বাকি থাকিবে—সে পর্য্যন্ত তোমার মুক্তি নাই।" এই সেই মঠ—যাহার প্রত্যেক ধূলিকণা, প্রত্যেক পাদপ প্রত্যেকটি মন্দির সেই পবিত্র স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এই সকলের সঙ্গে পুণ্যতোয়া সুরধুনী সকল সময়েই ত্রিতাপতাপিত জীবগণের চিত্তে শান্তিদান করিতেছেন। আর যেখানে শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী ত্রিতাপহারিণী—অক্ষয় তৃতীয়া, শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা উৎসব প্রভৃতি সময়ে শুভ পদার্পণ করিয়া শান্তিময় উপদেশের শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছেন।

মঠের বাড়ী হইতে ২।৩ বৎসর লাগিল। ভিজনা গ্রামের মহারাজ কিছু টাকা স্বামিজীর হাতে দিয়া বলিলেন ৺কাশীধামে বেদান্ত প্রচারের কাজ আরম্ভ করুন, আমি সাহায্য করিব। স্বামিজী মহাপুরুষ মহারাজকে এ কার্য্যের জন্য ৺কাশীধামে পাঠাইলেন। তিনি কাশীধামে গিয়া বর্ত্তমান অদ্বৈতাশ্রমের বাগান ভাড়া লইয়া সাধন ভজন ও কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিলেন। ঘটনাচক্রে যেদিন আশ্রমের কাজ আরম্ভ হয় সেইদিনই বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মবিদ্‌ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলুড়মঠ ও মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। কাশী অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রম, সারগাছি, কনখল ও মাদ্রাজ মঠের কাজ ভাড়াটিয়া বাটীতে সবে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীভগবানের লীলাসম্বরণের ১৬ বৎসর পর সঙ্ঘের কর্ণধার ও প্রবর্ত্তক সকল কাজের আদর্শ দিয়া মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। সমস্ত কার্য্যের ভার শ্রীপ্রভুর লীলাসহচর রাখালরাজ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর পড়িল। তাঁহার বৈরাগ্যপ্রবণ অন্তর্মুখী মন কিছুতেই বহির্জগতে আসিতে চাহে না। গুরু ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কর্ণধার, সঙ্ঘের নেতা করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমে থাকিয়া সাধন ভজন ও প্রচারের কাজ চালাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর শরীর ত্যাগের পর ভিজনা গ্রামের মহারাজ আর অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ অতি কষ্টে একমাত্র শ্রীগুরুর চরণ ভরসা করিয়া পূর্ণনির্ভরতার সহিত স্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাকে অনেক আর্থিক কষ্ট ও অনেক তাল সাম্‌লাইতে হইয়াছে। ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অদ্বৈতাশ্রমে তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করি। সেই অবধি ১৯৩৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর তাঁহার স্নেহ, আশীর্ব্বাদ ও পূত সঙ্গলাভে জীবন ধন্য হইয়াছে। একদিন অদ্বৈতাশ্রমে সান্ধ্য-আরাত্রিকের পর বসিয়া তিনি স্বামিজীর আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলম্বো, জাফ্‌না, রামেশ্বর, মাদুরা, কুম্ভকোণম্‌ ত্রিচিনপলি, মাদ্রাজ,

কলিকাতা ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তথাকার অধিবাসিগণ কি প্রকারে তাঁহাকে স্বাগত করিয়াছেন, কি প্রকারে তিনি তদুত্তরে বক্তৃতাদি করিয়াছেন, কলম্বোয় জাহাজ হইতে নামিবার সময় গুরুভ্রাতা শশিমহারাজকে দর্শন করিয়াই প্রথম সম্ভাষণ "শশী খেলো হুকোটা এনেছিস্" প্রভৃতি হুবহু বর্ণনা করেন। শুভানন্দজী (চারুবাবু) শুনিয়া বলিলেন, "আজ আপনারা খুব ভাণ্ডারা পাইয়াছিলেন।" সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ কদাচিৎ আশ্রমের বাহিরে যাইতেন, নিজের ভাবে ধ্যান জপ পূজাপাঠ নিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন; কেহ আসিয়া কোনও প্রশ্ন করিলে বা কথা তুলিলে কথা বলিতেন। একটি গান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল—সেটি তাঁহাকে বহুবার গাহিতে শুনিয়াছি—

"প্রভু, তুমি নাহি দিলে দেখা কে তোমায়
দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়॥
তুমি পূর্ণ পরাৎপর তুমি অগম্য অপার।
ওহে নাথ সাধ্য কার, ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই এত, তুমি বাক্য মনাতীত
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়॥
দিয়ে দরশন, কর হে দুঃখ মোচন
ওহে লজ্জানিবারণ শীতল কর হৃদয়॥"

আপন ভোলা আপন মনে, গাহিতে গাহিতে বিভোর হইয়া যাইতেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটীর তখন প্রবল প্রতাপ, তাঁহাদের অনেক ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসিতেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য বড়ই সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসিতেন। তখন কাশীধামের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র শিরোমণি, বাসুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই কখনও কখনও দর্শন করিতে আসিতেন। ঈশ্বর শিরোমণি মহাশয় প্রায়ই আসিতেন, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ভক্তি ও নির্ভরতার কথা বলিতেন। তখন কাশীধামে সাধুগণের মধ্যে মগ্নী ব্রহ্মচারী, চামেলীপুরী, ও বিহারীবাবা প্রভৃতি ছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মগ্নী ব্রহ্মচারীর কথা বলিলাম—তিনি খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তখন কাশীর কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে থাকিতেন—ইহা শুনিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। তৎপর জ্ঞানভক্তি সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে একটু পরেই বলিলেন—'আমার আর সময় নেই'। এক সময়ে কাশী নরেশ ঐ ব্রহ্মচারিজীকে দর্শন করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি সেবা করিব বলুন।" ব্রহ্মচারিজী উত্তর করিলেন, "যদি আমার সেবা করিতে হয়—এই সেবা করিবে যে আমার কাছে পুনরায় আসিবে না।" এত ত্যাগী যে রাজা মহারাজা আসিলেই বিষয়ের কথা হইবে, রজোগুণের কথা হইবে—অতএব না আসাই শ্রেয়ঃ। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের পর ৺কাশীধামে গোখ্‌লেজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখন সেবাশ্রম রামাপুরাতে ভাড়াটিয়া বাটীতে ছিল। সেই সময় গোখ্‌লে, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম দেখিতে আসেন। ১৯০৬ সালে কাশীর সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের জমী ক্রয় করা হয়। সেইবারই প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয় ও স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সহর ও কাশী ভ্রমণ করিয়া পুনরায় আমেরিকা চলিয়া যান। তাহার পর ১৯০৯ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্ট্রী করা হয় ও ঐ বৎসর ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীভগবানের অন্যতম শিষ্য, শ্রীমৎস্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ

করেন। উহার অব্যবহিত পরেই মহাপুরুষ মহারাজ পশ্চিম হইতে মঠে আসিয়া থাকেন। তখন শ্রীশ্রীমহারাজের উপদেশ মত স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ মঠের সমস্ত কাজকর্ম্ম ও তত্ত্বাবধান করিতেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ মঠে চতুর্দ্দশ বৎসর কার্য্য করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া ২১শে আগষ্ট ১৯১১ সালে মহাসমাধি লাভ করেন। ১৯১২ সালে শ্রীশ্রীমহারাজ কনখলে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেন—সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি-মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৬ সালে শ্রীশ্রীমহারাজ কামাখ্যা, ময়মনসিংহ হইয়া ঢাকায় পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৯১৮ সালের ৩০শে জুলাই শ্রীভগবানের লীলা সহচর পবিত্র হৃদয়, প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "ওর হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ"। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিলেন "মঠ মা-হারা হইল"। ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল শ্রীভগবানের সেবক অদ্ভুতানন্দজী মহারাজ (লাটু মহারাজ) ৺কাশীধামে মহাসমাধি লাভ করেন। ঐ বৎসরই শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী সারদামণি দেবী ৩১শে জুলাই ভক্ত ও সন্তানগণকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। বিশেষতঃ স্ত্রীভক্তগণ যাঁহারা সব সময়ে তাঁহার পূত সঙ্গলাভ করিতেন তাঁহাদের শান্তির, আব্দারের ও জুড়াইবার স্থান চলিয়া গেল।

এই সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ মঠেই থাকিতেন। ১৯২২ সালের ২২শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীশ্রীমহারাজ মঠ হইতে বাগবাজার বলরামমন্দিরে আগমন করেন। ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। ঐ সময় মহাপুরুষ মহারাজ ও স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ ঢাকায় গিয়াছিলেন। ২৫শে মার্চ্চ শনিবার মহাপুরুষ মহারাজ বাগবাজারে উপস্থিত হন। কয়েকদিন পরে অভেদানন্দজী মহারাজ ময়মনসিংহ হইয়া মঠে আগমন করেন। শ্রীশ্রীমহারাজের সেবার জন্য প্রায় ২৫ জন সেবক উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার গুরুভ্রাতা মহাপুরুষ মহারাজ, অভেদানন্দজী মহারাজ, সারদানন্দজী মহারাজ ও সুবোধানন্দজী মহারাজ সব সময়েই দেখাশুনা করিতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, দুর্গাপদ ঘোষ, ডি, এন্, রায়, চন্দ্রশেখর কালী, কাঞ্জীলাল ও শ্যামাদাস বাচস্পতি প্রভৃতি প্রায় ১৫ জন চিকিৎসক দিনরাত চেষ্টা করেন। ৮ই এপ্রিল শনিবার রাত্রিতে নানাপ্রকার দিব্য দর্শন হয়,—শরীরের এত গ্লানি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বলিতে লাগিলেন, "তোরা এসেছিস্, আয় আমার নূপুর পরিয়ে দে, আমি তোদের সঙ্গে নাচব, ব্রজের রাখাল। তোরা এসেছিস্! আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দে।" আহা! কি কোমল হাত! আমার পিঠ জুড়িয়ে গেল। আমাদের কৃষ্ণ কষ্টের কৃষ্ণ নয়রে—কমলে কৃষ্ণ। কে? নরেন্ এসেছিস্? কে—যোগেন? আয় তোদের সঙ্গে যাব। একটি বিশ্বাসের পত্রে অকূল ভবসমুদ্রে ভেসে ভেসে যাচ্ছি। অন্ধ জগৎ এসব কি বুঝবে।" ইহার পর আর কথা বলিলেন না রবিবার বৈকালে কাছে উপস্থিত হইলাম—দেখি হলঘরের দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া শুইয়া আছেন —সম্মুখে গেলাম, চাহিয়া দেখিলেন—চিনিতে পারিলেন কিন্তু কিছুই বলিলেন না। মনে হইল এই বিশ বৎসর যাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিয়াছি, ধর্ম্মজগতে যিনি সব সময়ে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন সকল প্রকার কঠিন সমস্যা সমাধান করিয়াছেন। যিনি জগৎ প্রহেলিকা অতি সহজভাবে বুঝাইয়াছেন, যিনি অতি গম্ভীর হইয়াও সরলভাবে হাসি-খেলার সহিত ধর্ম্মভাব হৃদয়ের

অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন—তিনি আজ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে চলিয়াছেন। চক্ষে জল আসিল, মন বলিয়া উঠিল—এবার তিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকল মায়ামোহের পারে গিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৮।৫৫ মিনিটের সময় তাঁহার আত্মা ব্রহ্মলীন হইয়া গেল। স্বামিজীর শরীর ত্যাগের পর হইতে এই বিশ বৎসরে সমগ্র ভারতের—ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সিঙ্গাপুর ও আমেরিকার কেন্দ্র সকল গড়িয়া উঠিল। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণকে সাধন ভজন জপধ্যান শিক্ষাদীক্ষা দিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। সমস্ত কর্ম্ম অতি ধীর স্থিরভাবে, সমস্ত সঙ্ঘের মত শুনিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতেন। সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইতেন আর বলিতেন —'রাজা বাস্তবিকই রাজা'। শ্রীভগবানের মানস পুত্র, সঙ্ঘনেতা, গুরু, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রস্থানের পর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সঙ্ঘনেতা ও গুরু হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ের বিকাশ হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

—করুণানন্দ

বুদ্ধদেবের জীবনী

উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্য বিস্মৃত হইয়া, কর্ম্মকাণ্ড-সর্ব্বস্ব আর্য্যসমাজ ধর্ম্মকে ইহলোক-সর্ব্বস্ব ভোগ-তৃষ্ণায় পর্য্যবসিত করিয়াও যখন তৃপ্তি পাইতেছিল না, অতৃপ্ত বাসনায় অধিকতর ভোগসুখের জন্য এবং পরলোকে তদপেক্ষাও সুখকর স্বর্গলাভের আশায় বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেছিল, প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজনে অসংখ্য পশুহত্যা সাধন করিত, এমন সময়ে হিমালয়ের পাদমূলে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বৈশাখী পূর্ণিমায়, ফুল-পুষ্পে সুশোভিত, সুরভিত লুম্বিনিনামক এক উদ্যানে পুষ্পভারনম্র শালতরুর পাদমূলে উল্লসিতা বসুমতী ভগবান্ বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবী কুমারের জন্মের সাতদিন পরেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মনে হয় এই রত্নটি পৃথিবীকে দান করিবার জন্যই তাঁহার মর্ত্ত্যে অবতরণ।

গৌতমের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত হইল। জ্যোতিষীরা রাজাকে বলিলেন—এই অদ্ভুত বালক যদি সংসার-ধর্ম্ম করেন—তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর যদি বৈরাগ্য আশ্রয় করেন—তাহা হইলে গৃহত্যাগ করিয়া অভিনব ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করতঃ মানব সমাজে মোক্ষরূপ এক নূতন আলো দান করিবেন। জ্যোতিষীরা আরও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন —বৃদ্ধ, আতুর, মৃত ও সন্ন্যাসী এই চারিটী দৃশ্য তাঁহার গৃহত্যাগের প্রধান কারণ হইবে। বিধির এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জন্য এবং যাহাতে সংসারের কষ্টের ছবি কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত না হয় সেইরূপ বিধান করিয়া রাজা শুদ্ধোধন কেবল মোহকর কৌতুক বিলাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমারের বাসের জন্য বিভিন্ন বাসভবন নির্ম্মিত হইল, রূপবান ও রূপবতী দাসদাসী সংগৃহীত হইল, লতাবিতান, মনোহর উদ্যান, পঙ্কজকুমুদ-শোভিত সরোবর, নানা কারুকার্য্যখচিত বাসগৃহ নির্ম্মিত হইল। মহৎ

ফোয়ারার ঝর ঝর শব্দে সবুজ ঘাসের উপর ময়ূর-ময়ূরীর মনোহর নৃত্যে কুমারের মনপ্রাণ বিমোহিত হইতে লাগিল। কিন্তু এসব উপভোগের সামগ্রী তাঁহার নিকট কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি একান্তে নির্জ্জনে বসিয়া এক অভিনব চিন্তা-রাজ্যে ডুবিয়া যাইতে ভালবাসিতেন। সিদ্ধার্থের এইরূপ ভাব রাজা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। ছেলে যাহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে তাহার জন্য রাজা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোলীবংশের সুপ্রবুদ্ধের পরমাসুন্দরী কন্যা গোপার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হইল।

গৌতমকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাজা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। তিনি মনে ভাবিলেন—গৌতম এবার সংসারাবদ্ধ হইয়াছেন, বৈরাগ্যাবলম্বনের আর আশঙ্কা নাই। কিন্তু বিধির-ব্যবস্থা অন্যরূপ, উহা রোধ করিবার সাধ্য মানবের নাই। সংসারের ভোগবিলাসের মধ্যে সমস্ত দিন যামিনী ডুবিয়া থাকিয়া গৌতমের বিরক্তি ধরিতে লাগিল, তিনি রাজপুরীর বহির্দ্দেশে ভ্রমণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। অচিরেই রথ প্রস্তুত হইল, ভ্রমণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন একটি দন্তহীন পক্ককেশ জরাগ্রস্ত লোক কম্পান্বিত কলেবরে যষ্টিভর করিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতমের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে একদিন সকলেরই এরূপ জরাগ্রস্ত হইতে হইবে, তখন অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে নানাকথা ভাবিতে লাগিলেন। সেদিন তিনি আর অগ্রসর না হইয়া চিন্তিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া রাজা শুদ্ধোধন বিষম ভাবিত হইলেন, এই সকল দৃশ্য কুমারের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরে রাখিবার জন্য তিনি কত সিপাহী সান্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। বহু সান্ত্বনাবাক্যে তিনি কুমারকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে চারিক্রোশ ব্যাপিয়া অধিক সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—এবারে আর কোনও দৃশ্য গৌতমের দৃষ্টিপথে পড়া সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। আর একদিন গৌতম ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রোগ তাপে অভিভূত জীর্ণশীর্ণ ব্যাধিগ্রস্তরূপে আসিয়া একজন তাঁহাকে দেখা দিল। এই ঘটনা হইতে—'ব্যাধিই শরীর ধর্ম্ম' ইহা অবগত হইয়া বিষণ্ণ হইলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় একদিন গৌতম নগর পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। এবার উদ্যানপথে মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। গলিত মৃতদেহোপরি অসংখ্য কীটের পৈশাচিক ভোজব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গৌতমের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রত্যেকেরই মরিতে হইবে এরূপ জানিয়া তিনি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন—কিছুকাল পরে বৈশাখী-পূর্ণিমা দিনে গৌতম আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন। গৈরিকধারী শান্ত-সংযত-দৃষ্টি, মৃদুমন্দগতি, উজ্জ্বল মুখকান্তি-বিশিষ্ট এক সন্ন্যাসী গৌতমের চিত্ত আকর্ষণ করিল। জরাগ্রস্ত ব্যাধি-গ্রস্ত ও গলিত মৃতদেহ দর্শনের পর হইতেই উত্তরোত্তর গৌতমের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মন চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। আজ প্রশান্ত ভিক্ষুককে দেখিয়া তাঁহার অন্তর হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি উদ্যানবাটিতে যাইয়া সমস্তদিন জলক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদে কাটাইলেন। অপরাহ্নে সংবাদ আসিল—গোপার গর্ভে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। তাঁহার অন্তর ছাপিয়া উচ্ছ্বাস উঠিল—"রাহুলজাতো" অর্থাৎ 'আমার একটি বন্ধন জন্মিয়াছে'। নবজাত শিশুর নাম 'রাহুল' রাখা হইল। গৌতম রথারূঢ় হইয়া প্রাসাদাভিমুখে পুত্র সন্দর্শনে চলিলেন। জনৈকা শাক্যরমণী গবাক্ষপথে অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত

রথারূঢ় গৌতমকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতা নূন সো পিতা। নিব্বুতা নূন সা নারী যস্স-যস্ ঈদিসো পতি' 'নিব্বুতা' শব্দ শ্রবণ মাত্রই গৌতমের নিব্বুতি—নিব্বৃত্তি বা নির্ব্বাণ মনে পড়িল। পুত্রদর্শনেচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার মনে নির্ব্বাণ লাভেচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ রমণীকে বহুমূল্য মণিহার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিলেন। গৌতমের সমস্ত অন্তঃকরণ তখন একমাত্র নির্ব্বাণ চিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে ত্যাগের গভীর আহ্বান অপর দিকে স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী বিমাতা, পতিপ্রাণা গোপার মমতার বন্ধন ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আত্মজের আকর্ষণ। এই অন্তর্দ্রোহে বৈরাগ্যই জয় লাভ করিল। তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি গভীর রজনীতে নিদ্রিতা পত্নী ও সুখসুপ্ত নবজাত পুত্রের মুখের দিকে একবার স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরভাবে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। সেই স্তব্ধ নিশীথে চন্দ্র তারকা অসীম আকাশ সকলে যেন সমতানে তাঁহাকে সীমাহীন উন্মুক্ত পথে আনন্দে আহ্বান করিতে লাগিল। তিনি সারথিকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে অনমানদীর তীরে উপনীত হইলেন। নদী সৈকতে দাঁড়াইয়া তিনি আপনাকে নিরাভরণ করিয়া পরিচ্ছদ সারথির হস্তে সমর্পণ করতঃ তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন।

তৎপরে তিনি আলার ও রুদ্রনামে দুই খ্যাতনামা গুরুর নিকট বহু শাস্ত্র ও ধর্ম্মশিক্ষা করেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনমানদীর তীরে তিনজন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। তথাকার ঋষিরা কেহ পক্ষীর ন্যায় শস্য কুড়াইয়া ভক্ষণ করেন, কেহ মৃগের ন্যায় ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করেন—সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে কি লাভ হয়?" সাধুরা উত্তর করিলেন—ইহলোকে এইরূপে কঠোর সাধনা করিলে স্বর্গে স্থান পাইবার আশা আছে, স্বর্গে দুঃখ নাই, চির-আনন্দ বর্ত্তমান, ইহলোকে যিনি যত দুঃখ করিবেন স্বর্গে তিনি তত বেশী সুখ পাইবেন। সাধুদের এইরূপ উক্তি শুনিয়া সিদ্ধার্থ মনে মনে এরূপ চিন্তা করিলেন যে স্বর্গগত মানবদের ও দেবতাদের দেহ আছে বলিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদের দেহ সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ কামনা আছে। এই পৃথিবীতে আমরা যে সুখ অল্প পরিমাণে অল্প কালের জন্য ভোগ করি, স্বর্গে সেই সুখ অধিক পরিমাণে ভোগ করা যাইতে পারে। স্বর্গবাসীরা কেহই কামনা বর্জ্জিত নহে। মর্ত্ত্যবাসীদের ন্যায় তাঁহাদেরও কাম ক্রোধ হিংসা আছে, মর্ত্ত্যবাসীদের জীবনকাল অত্যল্প বলিয়া অত্যল্প কাল সুখ ভোগ করিয়া থাকে, স্বর্গবাসীদিগের সেই সুখ বহুকাল ভোগ করিতে হয়—স্বর্গে নিত্য সুখ নিত্য শান্তি থাকিতে পারে না। স্বর্গে—বিলাস বাসনা, কাম্যবস্তু, ইন্দ্রিয় সুখের প্রাচুর্য্য। স্বর্গে আত্যন্তিক সুখের আশা নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সুপণ্ডিত অড়ার কলামের নিকট গমন করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য দ্বারা মুক্তি লাভের কোনও আশা দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া সত্যালোক লাভ করা যায় না। অবশেষে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে ছয় বৎসর ঘোর তপস্যা করেন। এই কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্র রুদ্ধ হইল, তাঁহার আহার সংযত হইতে হইতে একটিমাত্র তণ্ডুলই সম্বল হইল, শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া চক্ষু কোটর-গত হইল, প্রত্যেকটি হাড় গোণা যাইতে লাগিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণে কালছায়া দেখা দিল,

অবশেষে তিনি অতি বিষণ্ণচিত্তে চলিতে চলিতে পথিমধ্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃতবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে গাঢ় নিদ্রা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল, তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে ত্রিতন্ত্রী বাদন করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। দেবরাজ একটি দৃঢ়রূপে বাঁধাতারে আঘাত করিবামাত্র উহার সুর কর্কশ শব্দ করিল, অপর তারটি অত্যন্ত শিথিল ছিল বলিয়া তাহা হইতে সুর মাত্রও বাহির হইল না। মধ্যবর্ত্তী অপর তারটি যথাযথরূপে বাঁধা ছিল বলিয়া বেশ মিষ্ট সুরধ্বনি করিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সিদ্ধার্থের শরীর বিমল জ্যোতির আবির্ভাবে পূর্ণ হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন—ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যবর্ত্তী সত্যমার্গই একমাত্র বোধিলাভের উপায়। কৃচ্ছ্রসাধনা পরিত্যাগ করিয়া আহারের পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি কঠোরতা ছাড়িয়া দিয়া অধিকক্ষণ ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন—বাসনা হইতে জীবের দুঃখের উৎপত্তি। বাসনার নাশই সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি। তিনি পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়া পরম-তত্ত্ব লাভেচ্ছায় এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন :—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসম্ প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাম্
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

আমার শরীর এই আসনে শুকাইয়া যাক্, ত্বক্, অস্থি, মাংস বিলয় প্রাপ্তি হোক তথাপি বহুকল্প দুর্লভ বোধিলাভ না করিয়া আমি আমার এই আসন পরিত্যাগ করিব না। তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইয়া রহিলেন। কিন্তু কামলোকের অধিপতি 'মার' সিদ্ধার্থকে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করা সত্ত্বেও দৃঢ়মতি জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধার্থের নিকট মারের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

সর্ব্বেয়ং ত্রিসহস্র মেদিনী যদি মারৈ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথ মেরু পর্ব্বতবরঃ পাণিষু খড্গো ভবেৎ,
তে মহ্যং ন সমর্থ লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতু
কর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়।

এই তিন সহস্র মেদিনী যদি মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, প্রত্যেক মারের হস্তের খড্গ যদি পর্ব্বতবর মেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড হয় তথাপি বিগ্রহের দৃঢ়বর্ম্মিত আমাকে পরাস্ত করা দূরে থাকুক—আমাকে টলাইতেও পারিবে না। মার পলায়ন করিল, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল, তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ইহাদের নিবারণের এই চারিটী উপায়—জন্ম দুঃখ, জরা ব্যাধিতে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ। তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৃষ্ণার নিবৃত্তিই দুঃখ নাশের কারণ। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আটটি—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যকজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই আট প্রকার যোগ সম্যক অভ্যস্ত হইলে কামক্রোধাদির সংযোগ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় দুঃখ দূর হয় এবং সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া পরমাশান্তি লাভ করা যাইতে পারে। তাঁহার পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে কোদন্ন অর্হত্ব লাভ করেন। এই পাঁচজন শিষ্য ছাড়া তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়া ষাট জনে পরিণত হইল, তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তিনি প্রাণীবধ, চৌর্য্যবৃত্তি, ব্যভিচার, অসত্য ও সুরাপান করিতে নিষেধ করিতেন; তিনি ভিক্ষুগণের দিনে দুইবার আহার গ্রহণ, নাট্যাদি দর্শন, উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ, প্রশস্ত শয্যায় শয়ন, স্বর্ণরৌপ্যাদি দান গ্রহণ প্রভৃতি

নিষেধ করিয়াছিলেন। শাক্য বংশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হন। তাঁহার উপদেশ ছিল এই—"দম্ভ ও গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া দয়া অবলম্বন কর। রিপুদলকে দমন কর, হাতী যেমন নলের কুঁড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলে রিপুরা তেমনি দেহকে চুরমার করিয়া দেয়। পৃথিবীর যাবতীয় জলেও যেমন সমুদ্রের পিপাসা মিটে না, তেমনি পার্থিব যাবতীয় ভোগও মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। জ্ঞানই আত্মাকে শান্তি দেয়। যাহারা সহ্য করিতে পারে না—তাহাদের কাছে সহনশীল হও, যাহারা উগ্রস্বভাব তাহাদের কাছে নম্র হও, এবং বুদ্ধের কাছে নিজেকে মুক্ত রাখ। এমন কাজ কর যেন অপর সকলেই করিতে পারে, কাহারও অনিষ্ট করিও না।" যদিও তাঁহার বেদান্তের ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ মতামত পাওয়া যায় না, কিন্তু তিনি বলেন—"সকলই অনিত্য এবং ক্ষয়শীল। অবিদ্যা প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে দেয় না, তাহা হইতেই যত দুঃখের উৎপত্তি, তাহার মূলেই তৃষ্ণা, তাহা হইতেই আসক্তি, জন্ম, রোগ, জরা, দুঃখ ও মৃত্যু। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে তোমার বর্ত্তমান জন্ম। সত্য, প্রিয়বাক্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, অহিংসা ইত্যাদি দ্বারা ধীরে ধীরে কর্ম্মপাশ খণ্ডন কর, তুমি মুক্ত হইবে, নির্ব্বাণ লাভ করিবে।" যুগ অনুযায়ী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল—লোকে আত্মচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া স্বর্গে গিয়া সুখভোগের সুবিধা করিবে, এই লইয়া দেবতাদের তুষ্টির জন্য কেবল প্রাণীহিংসায় ধর্ম্মকে পর্য্যবসিত করিয়াছিল, নানাপ্রকার যোগের ক্রিয়াও তখন প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ঐশ্বর্য্য লাভ। তাই বুদ্ধদেব দেখাইয়াছেন সংসারে গতায়াত দুঃখময়, ভোগের তৃষ্ণা ও রূপের তৃষ্ণা যতই বাড়িতে থাকিবে—দুঃখের পরিমাণ ও মূর্ত্তি তদনুযায়ী হইবে। ইহলোক ও পরলোকের সুখ কামনায় যাগ যজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়া কলাপকে বুদ্ধদেব সুদৃঢ়কণ্ঠে একান্ত নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় বিজয় ও চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়া দাক্ষিণ্য মৈত্রীমূলক কল্যাণ ব্রতকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলেন—যেমন সুন্দররূপে আচ্ছাদিত গৃহ ভেদ করিয়া বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না—সেইরূপ সুভাবিত চিত্ত ভেদ করিয়া পাপাসক্তি ভেদ করিতে পারে না—বুদ্ধদেবের মতে তিনিই যথার্থ সংযমী যাহার দেহ বাক্য মন তিনটী সংযত। তিনি বলেন—প্রেমদ্বারা ক্রোধ, মঙ্গলদ্বারা অমঙ্গল নিঃস্বার্থ দ্বারা স্বার্থ এবং সত্যদ্বারা মিথ্যা জয় কর। যে অপকার করে—তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া প্রেমদান কর। সর্ব্বাগ্রে তোমার চঞ্চল মনকে সংযত কর, কল্যাণ হইবে, পাপ ও পুণ্য সমস্তই নিজকৃত। কেহই তোমাকে পবিত্র করিতে পারে না। মানুষের হৃদয়ে যে ভাব যে পাপ যে চঞ্চলতা জমিয়া উঠিয়া তাহাকে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে বঞ্চিত করে, মানব মনের সেই মলিনতাকে বুদ্ধদেব অবিদ্যা নাম দিয়াছেন। এই অবিদ্যাকে তিনি নিকৃষ্ট মলিনতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি ভিক্ষুকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ তোমরা এই মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হও।" এই মলিনতা বা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে পারিলেই মানবের মন শুদ্ধ হয়, তখনই সত্যকে লাভ করিতে পারে। মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্ট ও ঠিক এইরূপ বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—"Blesed are the pure in heart for they shall see God"—নির্ম্মল হৃদয় ব্যক্তিরাই ধন্য কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরের দেখা পাইবেন। সিদ্ধার্থের হৃদয় দয়ার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তিনি অনর্থক ছাগ-বলিদানে কোনও ফল নাই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা বিম্বিসারকে এরূপ বলিলেন—

"হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন ?

দেবতুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয় ! জানিহ নিশ্চয়
হিংসার অধিক পাপ নাইকো জগতে
প্রাণদানে নাইকো শকতি—
হে ভূপতি । তবে কেন কর প্রাণনাশ ?

* * * *

বধ রাজা আমার জীবন ।

'নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণ দান'—বুদ্ধ এক জায়গায় বলিয়াছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার সাহায্য করিতে পারে না, আপনার সাহায্য আপনি কর । নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজের মুক্তির চেষ্টা কর । স্বামিজী বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বুদ্ধদেব সর্ব্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধি বর্জ্জিত ছিলেন । * * । তিনি রাজসিংহাসনের আশা ও সর্ব্ববিধ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা উদর পূরণ করিতেন এবং সমুদ্রবৎ প্রশস্ত হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই প্রচার করিতেন । * * * । আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব্ব হৃদয়ের লক্ষাংশের একাংশেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতাম ।"

ত্যাগীর আদর্শ, নীতির সংস্থাপক, সাম্যমৈত্রীর প্রথম মহাপুরুষ বুদ্ধের মত—উদার । বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধের নির্ব্বাণ ইহার মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না, বৈদান্তিক বলেন —নদী যেমন সমুদ্রে পতিত হইয়া তার নামরূপ ত্যাগ করতঃ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষ অবস্থায় নিজত্ব ছাড়িয়া পরব্রহ্মে বিলীন হয়—ইহা লইয়া যদি বিচার করা যায়—তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমার আমিত্ব নাশই একমাত্র আমাদের লক্ষ্য । যদি আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল তবে ব্রহ্মেতে বিলীন হই অথবা নির্ব্বাণ মহাসাগরে মিশিয়া যাই, তাহাতে কিছুই যায় আসে না । আমি কি—আমি জড় হইতে পৃথক, অন্য জীব হইতেও পৃথক । বাসনার নির্ব্বাণ অর্থ—বাসনার নাশ, কিন্তু ইহা শূন্যবাদ নহে । নির্ব্বাণাবস্থায় জাগতিক জ্ঞান নষ্ট হয় বটে কিন্তু সেখানে পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিদ্যমান । ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কিম্বা মহানির্ব্বাণে আত্মার লয় ইহার মধ্যে প্রভেদ কি ? বৈদান্তিকের তুরীয় অবস্থা আর বৌদ্ধের নির্ব্বাণ মুক্তি একই, বেদান্ত মতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে লয় আর বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণ মহাসাগরে ডুবিয়া যাওয়া এই উভয়ই এক ।

ব্রহ্মচারী—মনোরঞ্জন

কৃষ্ণ-প্রেম

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, এম্-এ, বিদ্যাভূষণ
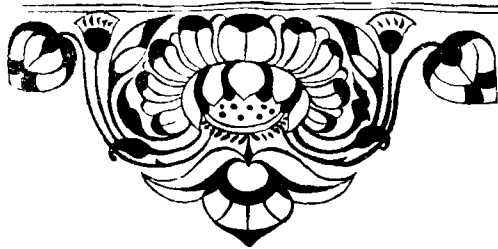
মানুষের স্বভাব ভালবাসা। যেমন করে সমুদ্র চাঁদের আকর্ষণ অনুভব করে—চুম্বক লোহাকে টানে, যেমন ভাবে প্রভাতের অরুণ-কিরণ নিমীলিত-দল পদ্মের উপর লুটিয়ে পড়ে, ঠিক তেমন করেই আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে পেতে চাই—তার হৃদয় দুয়ারে আঘাত করে মরি। যে দূরে আছে তাকে কাছে ডাকি আর কাছের ধনকে রাখ্‌তে চাই অন্তরের ধন ক'রে। কিন্তু তা আর হয় না। এক শাশ্বত বিরহ আমাদের পৃথক করে দিয়েছে। অতি প্রিয়জনেরও সবটা অন্তরের পরিচয় পাইনে, তবুও মানুষ চায় ভালবাস্‌তে।...

শুধু তাই নয়। যে ভাবে প্রত্যেক প্রাণী এমন কি প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পরের জন্য ব্যাকুল, সেই ভাবে সারা নিখিল এক দুর্জ্ঞেয় পরম পুরুষের বিরহ অনুভব করে। মনে হয়, কবে সে একদিন ছিল যখন আমাদের দিনগুলি তাঁর সঙ্গে মিলনানন্দের রভস-রসে উচ্ছলিত হয়ে উঠ্‌ত—কিন্তু কেন যে জানিনে বিচ্ছেদ-বেদনার যে কালো ছায়াটা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে ঘনিয়ে উঠ্‌ল তা' আজও সমান ভাবেই আছে। কবির কথায়—

"হেরি অহরহ (তোমারি) বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে।" পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ারই সুখ বেশী—তাই এই বিরহের মধ্যেই তাঁর প্রেমকে গভীর ভাবে অনুভব করি। আজও বরষায় যখন আকাশ পৃথিবী আঁধার করে আসে—সমস্ত ভাবনা চিন্তা, সকল কথা, সকল গান যখন বর্ষণ শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখনই সেই প্রিয়তমের বিরহে আমাদের হৃদয়কে মথিত করে তোলে—তখন মুখরা প্রকৃতিকেও স্তব্ধ করে দিয়ে প্রেমিক সেই বিরহকে প্রাণ দেয় গানে—

> তিমির দিগ্‌ ভরি ঘোর যামিনী
> অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
> বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি
> হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

আজও মধুমাসের জ্যোৎস্না-নিশীথে যখন জুই বকুলের মনকে মাতাল করে তোলে তখন হঠাৎ বেজে ওঠা "দূরাগত বংশধ্বনি" প্রাণকে যে উদাস করে না দেয় তা নয়। শরৎ-রাতে রজনী-গন্ধা যখন হাস্‌তে থাকে, শিউলি কেয়ার গন্ধমাখা বাতাস যখন গায়ের উপর একটা স্নিগ্ধতার আবেশ মাখিয়ে দিয়ে যায় তখন যদি চাঁদকে একটা হাল্‌কা মেঘে ঢাকে, তাহলে যে মায়ালোকের সৃষ্টি হয় তা ক্ষণিকের জন্যেও হৃদয়কে ব্যথিত করে—মনে হয় আমাদের জীবনটা কিসের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই ধরণের ঔৎসুক্যের কারণ নির্দ্দেশ কর্‌তে যেয়ে কালিদাস বলেছেন—

> "তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।"

তাই বলি, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের স্মৃতি যা এতদিন জন্ম জন্ম ধরে মনের কোণে চাপা পড়েছিল তাই যেন আলম্বনের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে থাকে।

বৈষ্ণবেরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগতের কারণ পরম পুরুষ। তিনি নিজের সৌন্দর্য্যকে, নিজের মাধুর্য্যকে—এক কথায় নিজেকে উপভোগ করবার

জন্তে বিভক্ত হলেন। শ্রীরাধা তাঁরই অংশ, তাঁরই হ্লাদিনী শক্তি। শ্রুতিতেও অনেকটা এইভাবের সামঞ্জস্য আছে—"তদৈক্ষত, বহুস্যাং প্রজায়েয়" ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।৩)। আমাদের মনে হয়, তিনি তাঁর নিজের প্রেমকে নিজেই আস্বাদ করবার জন্য বিভক্ত হলেন—আর রাধা শুধু হ্লাদিনী শক্তি নন, তিনি মূর্ত্ত প্রেম। উপনিষদের সঙ্গে মিল রেখে এই কথাটাই আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা এবং রাধা নিখিল জীবাত্মার প্রতীক; আর পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে চিরন্তন বিচ্ছেদের কথা উপরে বলা হয়েছে তাই ফুটে উঠেছে শ্রীরাধার বিরহে। শুধু প্রেমের বলেই যেরূপ রাধা কৃষ্ণকে জয় করেছিলেন, সেইরূপ আমাদেরও প্রেমের বিনিময়ে ভগবান্‌কে পেতে হবে। বৈষ্ণবপদাবলীর ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে জীবের একান্ত আপনার তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিখিল রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যে মানুষের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"

বৈষ্ণবের মতে ভগবৎ-প্রেম চরিতার্থ হয়, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে। শান্তভাব ভীষ্মের, দাস্য বিদুরের, সখ্য সুবল প্রভৃতি সখাদের, বাৎসল্য যশোদারাণীর এবং মধুরভাব শ্রীরাধা ও গোপিকাদের। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে ভাব তাহাই মধুর ভাব এবং সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে প্রিয়তম ভেবে সাধক যত আনন্দ পান, তেমন আর কোনও রকমেই পাওয়া যায় না। কারণ তিনি যে আমাদের এই প্রেমটুকুই অনুভব করতে চান—তিনি যে সেই জন্তেই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এ ভাবের প্রতিধ্বনি মিলে—

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রূপে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান॥

(গীতাঞ্জলি)

কৃষ্ণ-প্রেম বৈকুণ্ঠের জিনিষ। এ শুধু প্রেম—পবিত্র, অনাবিল, অনাঘ্রাত কুসুমের মত। সারা জীবনের ভালবাসাটি নরজগতের প্রিয়জনের সেবায় নিয়োজিত কোরে তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর মালা গেঁথে বার্দ্ধক্যের উচ্ছিষ্ট নিস্তেজ ভক্তিটুকু দিয়ে সেই পরম-প্রেমিকের পূজা চলে না। তাঁকে পেতে হলে রাধিকা ও গোপিকাদের মত তরুণ-হৃদয়ের প্রীতিটুকু দিতে হবে। রাধা যেমন রাজ-বৈভব, কুলগৌরব, পাতিব্রত্য ও পতির আদর অবহেলা করেছিলেন, তেমন আমাদেরও অর্থের লালসা, মান যশের আশা, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা, সব ত্যাগ করে এক প্রাণে ছুটে যেতে হবে যেদিকে তাঁর বাঁশীর স্বর আস্‌ছে।

ভগবৎ-প্রেম হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম—এতে স্বার্থের নাম-গন্ধ থাকবে না। অহঙ্কার অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হবে। নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের আমিত্বকে তাঁর প্রেমের মধ্যে ডুবিয়ে ফেলতে হবে। রবীন্দ্রনাথও জীবনদেবতাকে লক্ষ্য করে এই কথাই বলেছেন—

ম'রে গিয়ে বাঁচ্‌ব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে।

(গীতাঞ্জলি)

এই প্রেম লাভ হয় সেই অবস্থায় যখন ভক্ত বল্‌তে পারেন—

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।"

শ্রীভগবানও গীতাতে শিক্ষা দিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

এই উপদেশই রাধার জীবনেও প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রথমে যখন রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়, তখন তার মূলে নিষ্কাম প্রেম ছিল না—ছিল একটা রূপজ মোহ। রাধার মধ্যে আমিত্বও তখন একেবারে নষ্ট হয় নাই। তিনি নিজের সুখের জন্যেই কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন, আর কৃষ্ণকে পেতে হলে যে ত্যাগের দরকার তাও জান্‌তেন না—তিনি শ্যাম ও কুল, দুই রাখতে চান। তাই দেখি যে, দুদিন পরেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান রচিত হ'ল।

কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দ আছে—কিন্তু যাঁরা এর ভিতরে সুখের আশা করেন তাঁরা ভ্রান্ত—বরং এতে দুঃখ ও জ্বালাই পাওয়া যায়। রাধিকাও বলেছেন—

সজনি, না কহ ও সব কথা।
কালিয়া পীরিতি যার মরমে লাগিয়াছে
জনম অবধি তার ব্যথা॥
(চণ্ডীদাসের পদ)

সত্যই তাই—ঈশ্বরের প্রেরণা একবার প্রাণে জাগলে সংসারে আগুন ধর্‌বেই। খৃষ্টও স্পষ্ট করে বলেছিলেন—

"I am come to send fire on the earth, ..Suppose Ye, that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay: but rather division: The father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother-in-law against her daughter in-law, and the daughter in-law against her mother-in-law."

ভগবানের প্রতি ব্যাকুলতা ভক্তকে সারা জগতে ঘুরাবে—তার সমস্ত হৃদয়কে অশান্ত করে দেবে নিদারুণ দুঃখের মধ্যে তার পরীক্ষা চল্‌বে। তারপর সমস্ত বাধা বিপত্তি সে যদি কাটিয়ে দিতে পারে, তবে ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরের মত এই সংসারে ভাসতে ভাস্‌তে তার জীবন তরণীখানি সেই শান্তিময়ের ক্রোড়ে গিয়ে মহাশান্তি পাবে। চণ্ডীদাস বলেন—

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

চন্দনের যেমন সুগন্ধ আছে, তেমনি কৃষ্ণ-প্রেমের এমন একটা মাদকতা আছে যে একবার যে তার আস্বাদ পেয়েছে তাকে তা টানে কেবলই টানে। কিন্তু চন্দনের গন্ধ পাওয়া ঘস্‌বার পরে—তেমনই কৃষ্ণকে যত ভালবাসা যায় ততই তাঁ'র মধ্যে উন্মাদনা আসে। তবে সেই প্রেমচন্দন যতই স্নিগ্ধ হউক তা থেকে ভক্ত শান্তি পায় না। বিরহি-হিয়ায় তার প্রলেপে দহনজ্বালা দ্বিগুণ হ'য়ে উঠে। এই প্রেমে শান্তি নাই বটে, তবে এই প্রেমের সাহায্যে শান্তিময়ের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে যে কেমন অবস্থা তা কেও বল্‌তে পারে না,—বোধ হয়, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৪।১)।

শিয়া ও শুন্নি

ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ঈশ্বরদূত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার প্রতিনিধিত্ব বা খলিফা পদ লইয়া তদীয় মতাবলম্বীদের মধ্যে তৎকালে অনেক মতানৈক্য সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাত্মা মহম্মদের অন্তর্ধানের পরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম জগতে আর কোন পথ প্রদর্শকের আবশ্যকতা তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করেন না। অনেকে আবার ইস্‌লামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ইহা অপরিহার্য্য মনে করায় দুই দলে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এক দল বলিলেন মহম্মদ দেহত্যাগের পূর্ব্বে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া যান নাই, কারণ ইহা জন সাধারণের কর্ত্তব্য, তাঁহারাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে যোগ্য লোককে উক্তপদে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। এই ঘটনার অনেক পরবর্ত্তিকালে ধার্য্য হয় যে প্রত্যেক খলিফা তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া যাইবেন এবং কেহ যুদ্ধবিগ্রহে অপরকে পরাভূত বা জনসাধারণকে কেহ কোন প্রকারে বশীভূত করিয়াও খলিফার এই সম্মানিত পদ লাভ করিতে পারিবেন। এক সম্প্রদায় বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন যে সমগ্র ইস্‌লাম-জগৎ-মান্য এই মহাসম্মানিত খলিফা-পদ কেবল এক অদ্বিতীয় ভগবান বা তাঁহার একমাত্র প্রতিনিধি মহম্মদই নির্ব্বাচন করিতে পারেন, অপর কাহারও এই পদের যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের অধিকার নাই। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় "শিয়া" এবং যাঁহারা এই মতকে মান্য করেন না, তাঁহারা "শুন্নি" নামে পরিচিত।

"শিয়া" সম্প্রদায় বলেন যে যেহেতু মহম্মদ তাঁহার জীবিতাবস্থায় মুসলমান ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক, রক্ষক এবং ধারক ছিলেন, সেইজন্য ইহাকে জীবন্ত এবং সর্ব্বদোষমুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইলে খলিফা পদ সংরক্ষণ করা আবশ্যক। এই খলিফাকে ঈশ্বরদূতের ন্যায় সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সব মুসলমানকে মান্য করিতে হইবে। ঈশ্বরদূতের ন্যায় তিনিও নিষ্পাপ, দোষশূন্য এবং সকল বিষয়ে এই পদের যোগ্য হইবেন। মানুষের ভিতর-বাহির সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ জ্ঞান থাকিবে যে তিনি যেন সকলকে পরিচালিত করিতে পারেন। 'শিয়া' মতাবলম্বীরা বলেন, মুসলমান জনসাধারণের উপর এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ খলিফা-পদ নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করিলে তাঁহাদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমেও যোগ্য লোক নির্ব্বাচিত না হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং খলিফা-পদ খলিফাই নির্ব্বাচন করিবেন। 'শিয়া'মতে ভগবানের আদেশানুসারে মহম্মদ তাঁহার নিকট আত্মীয় আলিবু আবিতালিব কে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়া যান, এসম্বন্ধে তাঁহারা কোরাণ সরিফের অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন যে মহম্মদের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণই খলিফা-পদ লাভের যোগ্য। এই পরিবারের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য আছে তাঁহারা "তাবালা" অর্থাৎ বিশ্বস্ত ভক্ত এবং তদ্বিপরীত মতাবলম্বিগণ "তাবারা" অর্থাৎ অবিশ্বস্ত—অভক্ত—অমুসলমান বলিয়া গণ্য। শিয়ারা বলেন, মহাপুরুষ আবুতালিবের পুত্র আলির অনুমতি ভিন্ন কেহই স্বর্গে যাইতে পারিবেন না, কারণ ঈশ্বরদূত বলিয়াছেন, "যদি জগতের সমস্ত প্রাণী আলি বু আবুতালিবকে শ্রদ্ধা করিত তাহা হইলে ভগবান নরক সৃষ্টি করিতেন না।" শিয়া-মতে পুনরুত্থান (resurrection) মুসলমানকে অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। পুনরুত্থানের অর্থ

মুনকির ও নানকির নামীয় দুইজন স্বর্গীয় দূত কবরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন করিবেন এবং শেষ বিচারের দিন ভগবান সকল মানুষকে তাঁহাদের কবর হইতে উত্থিত করিয়া পুণ্য-পাপ অনুসারে স্বর্গ-নরকের ব্যবস্থা করিবেন। মৃত্যু হইতে শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে "বার্জাখ্" বলে। স্বর্গ ও নরক ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা এখনও আছে। স্বর্গ সম্বন্ধে এ মতে ধারণা এই,—"সেখানে তুবা নামে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে এবং উহা সমগ্র স্বর্গধামকে ছায়া প্রদান করিতেছে। স্বর্গে কান্সার নামে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী এবং সালসাবিল্ নামে একটী বিস্তীর্ণ ফোয়ারা আছে। ইহা ছাড়া স্বর্গে এমন সব অচিন্তনীয় সুখপ্রদ জিনিষ আছে যাহা চক্ষু কখনও দেখে নাই, কর্ণ কখনও শোনে নাই এবং মন কখনও ধারণা করে নাই" ইত্যাদি। আর নরকে আছে "হামিম্ নামক গলিত ধাতু এবং ঘিস্লিন্ নামক পুঁজ, জারিক্ ও জাকুম্ নামক বিষাক্ত গাছ এবং সব রকমের যন্ত্রনা-দায়ক দ্রব্যাদি।" শিয়ারা বলেন যে ভগবান শেষ বিচারের দিন মহম্মদ ও তাঁহার পরিবারভুক্ত পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রতিও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে মানুষকে প্রশ্ন করিবেন। শিয়ামতে মহম্মদ ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে এবং শিয়া ভিন্ন সব নরকে যাইবে।

শুন্নি সম্প্রদায় বলেন, মহম্মদের মৃত্যুর পর মহাত্মা আবু কাহাফার পুত্র আবু বেকার তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে মহম্মদের দেহত্যাগের পরই আলি এবং মহম্মদের পরিবারভুক্ত সকলে যখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন কয়েকজন লোক এই সুযোগে উক্ত ক্রিয়াস্থল ত্যাগ করতঃ "সাকিল বাণী সাইডা" নামক একটী ক্ষুদ্র কুটিরে খলিফা-পদ কাঁহাকে দেওয়া হইবে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বৈঠকে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল, মহাত্মা ওমর আবু বেকারের নামে "বয়াৎ" (শপথ) করিয়া ঝগড়া নিষ্পত্তি করিলেন এবং পরে সভাস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই মহাত্মা আবু বেকারকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন। শুন্নিরা বলেন, ঈশ্বর বা মহম্মদ কর্ত্তৃক খলিফা নির্ব্বাচনের বিধান থাকিলে এই ভাবে খলিফা নির্ব্বাচন করার দরকার হইত না। তাঁহারা আরও মত প্রকাশ করেন যে খলিফা-পদ বংশানুক্রমিক হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সকল খলিফাই মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান থাকিবেন ইহা আশা করা যায় না। মুসলমান ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অধিকার যাঁহাকে দেওয়া হইবে, তাঁহাকে জনসাধারণই নির্ব্বাচন করিবেন, কারণ মানুষ মাত্রেরই ভ্রম-প্রমাদ-দোষ থাকা স্বাভাবিক এবং এই দায়িত্বপূর্ণ খলিফা-নির্ব্বাচনের অধিকার জনসাধারণের হস্তে না থাকিলে কোন মুসলমান দেশে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। শিয়া মতে মহম্মদ, তাঁহার কন্যা এবং দ্বাদশ ইমামের কোন পাপ নাই এবং কোন খলিফার কোন দোষ থাকিতেই পারে না। শুন্নিরা বলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণান্তর যে কোন লোক খলিফা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন কিন্তু শিয়া মতে ইহা অসম্ভব। শুন্নি মতে মহাত্মা আলির পিতা আবুতালিব মুসলমান ছিলেন না এবং খলিফা ও ইমাম পাপী হইতে পারে কিন্তু শিয়া মতে ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার্য্য।

উভয় মতে মুসলমান মাত্রকেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; মহম্মদ এক মাত্র ঈশ্বরদূত এবং কোরাণ এক মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ।

ইহা ছাড়া উভয় মতে পাঁচ বার প্রত্যহ নমাজ

পড়া, অপবিত্র হইলে স্নান করা, মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা, রমজানের উপবাস, মক্কা তীর্থ যাত্রা এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রভৃতি প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ব্যভিচার, মদ্যপান, কুকুর ও শূকরের মাংস, অত্যাচার, হত্যা, রক্ত সম্বন্ধে বিবাহ ইত্যাদি বর্জ্জনীয়। শুন্নি মতে ইস্লাম ধর্ম্ম বিশ্বাসিগণ বিচারের দিন ভগবানকে দেখিতে পাইবেন কিন্তু শিয়ামতে উহা সম্ভব না,—তাঁহাকে ইহ লোকে বা পর লোকে কোন সময়ে দেখা যাইবে না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

ইস্লাম ধর্ম্ম জগতের শেষ খলিফা তুরস্কের সম্রাট মহামান্য আব্দুল হামেদ নব্য তুরস্ক কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হওয়ার পর এই খলিফা পদ শূন্য আছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও ইহা আর পূর্ণ হইবে না, কারণ ইদানীং পৃথিবীর মুসলমান দেশ সমূহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত, সুতরাং স্বার্থ বিরোধের জন্য ধর্ম্ম ভিত্তিতে খলিফাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমান জগতের ঐক্য সম্ভব নয়। এই খলিফা পদ লইয়াই ভারতে মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত আন্দোলন।

মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও শুন্নি মতবাদ বিশেষ মনোমালিন্য এবং বিরোধ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলেও সমধর্ম্মি-হিসাবে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করিতে পারে নাই। আচার্য্য বিবেকানন্দ ইস্লাম ধর্ম্মের এই মাধুর্য্যে মুগ্ধান্তঃকরণে বলিয়াছেন,—

"Mohammed by his life showed, that amongst Mohammedan there should be perfect equality and brotherhood There was no question of race, creed colour or sex The Sultan of Turkey may buy a Negro from the mart of Africa and bring him in chains to Turkey, but should he become a Mohammedan and have sufficient merit and abilities, he might even marry the daughter of the Sultan And what do Hindus do ? Not withstanding our grand philosophy, you note our weakness in practice

—সুন্দরানন্দ

সুখ ও দুঃখ *

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

জন্মমৃত্যুর ন্যায় দুঃখ ও সুখ জীবের আজন্ম সহচর। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে না। গ্রীষ্ম ও শীতে একই বায়ুর সুখকরত্ব ও দুঃখ বহত্বের ন্যায় একই বস্তু অবস্থাভেদে সুখদুঃখরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ দুঃখের সত্তাটী প্রাতিভাসিকী বা Apparent মাত্র। উহাদের ব্যবহারিক সত্তা (Phenomenal existence) থাকিলেও, পারমার্থিক বা বাস্তব সত্তা (Noumenal existence) নাই। সুখ দুঃখের অনুভূতি আমাদের জন্ম জন্মান্তরের বিষয় সম্পর্ক ঘটিত অভ্যাসের ফলমাত্র। একারণ বিভিন্ন ব্যক্তির অভ্যাসের প্রকৃতির পার্থক্যে একই বস্তু একজনের নিকট সুখ ও অন্যব্যক্তির

* বিগত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দর্শনশাখায় পঠিত।

নিকট দুঃখরূপে উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শনের সিদ্ধান্ত,—

"কুণপঃ কামিনী কান্তা একস্যাং প্রমদাতনৌ।
পরিব্রাট্ কামুকশুনামিতি তিস্রো বিকল্পনাঃ॥"

পথিপার্শ্বে পতিত যুবতীর মৃতদেহ দেখিয়া সন্ন্যাসী শববোধে উপেক্ষা, কামুক সুন্দরীরমণীবোধে উপভোগ্যা এবং কুক্কুর সুভোজ্য জ্ঞানে হর্ষোল্লসিত হইয়া থাকে। বিবেকী দর্শনকার বলিতেছেন, উহা একই বাহ্যবস্তুতে বিভিন্নভাবের ভাবুক তিনটী প্রাণীর যুগপৎ তিনটী অলীক কল্পনা। এই দৃষ্টান্তে সন্ন্যাসী, যুবক ও সারমেয়ের আজন্ম অভ্যাসের কল্পিত ফল সুখদুঃখ, ইহা যেমন অতি সুস্পষ্ট, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেও অনুক্ষণ অনুভূত সুখদুঃখও ঠিক তেমনি নিজ নিজ অভ্যাসের ফলমাত্র। ফলতঃ পৃথিবীতে সুখদুঃখ বলিয়া কোন স্থির পদার্থ (concrete object) নাই। আর্য্য দার্শনিকের মতে উহা নিরবয়ব গুণপদার্থ (attribute) এজন্য সুখদুঃখের বাহ্য প্রত্যক্ষ (external perception) হয় না। উহাদের কেবল মানসিক প্রত্যক্ষ (Internal perception) হইয়া থাকে। অর্থাৎ সুখদুঃখ আমরা চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই না, মনের সাহায্যে অনুভব করি।

এতাদৃশ অনুভবের মূল বিষয়—রূপরসাদিময় বিষয় যখন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারে অনুকূল মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়, তখন আমরা ঐগুলিকে সুখ, এবং যখন প্রতিকূলভাবে উপনীত হয়, তখন দুঃখরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। তত্ত্বটী আচার্য্যপাদ শঙ্কর তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে বেশ পরিষ্কার ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন।

"বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্য্যয়ে।
সুখং দুঃখঞ্চ তদ্ধর্ম্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ॥"

বিষয়গুলি জীবের নিকট যখন অনুকূলভাবে (প্রীতিজনকরূপে) উপস্থিত হয়, তখন জীব সুখী, আর যখন প্রতিকূলভাবে (দ্বেষ্যরূপে) সন্নিহিত হয়, তখন জীব দুঃখী হইয়া থাকে। কারণ সুখ দুঃখ বিষয়ের ধর্ম্ম (গুণ বা property)। গীতায় শ্রীভগবান্ "আগমাপায়িনঃ" (২।২২)। (Accidental), "আদ্যন্তবন্তঃ" (৫।২২) (আসে যায়), ইত্যাদি পরিষ্কার ভাষায় সুখদুঃখের অবাস্তবতার পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানিশিরোমণি মহর্ষি ব্যাস পুরাণবাজ বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ৪৩—৪৭ শ্লোকে ইহার অতি বিশদ ও মনোমদ বিবৃতি দিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবের উপসংহারে দেখিতে পাই,—

"তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদি লক্ষণঃ॥"

হে মৈত্রেয়, অতএব, সংসারে সুখময় কিংবা দুঃখময় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। সুখদুঃখাদি ভাব মনের পরিণাম অর্থাৎ নিছক্ কল্পনা। পাশ্চাত্য দার্শনিকের বিচার বিশ্লেষণেও দেখা যায়, "Pain is original, but pleasure is the absence of pain" কি সুন্দর কথা! ইহাদের মতে দুঃখই আসল জিনিষ, কিন্তু দুঃখের অভাবের অপর নাম সুখ। আলোক অন্ধকার যেমন নিত্যসম্বন্ধ। অন্ধকারের অভাবের নাম যেমন আলোক, এবং আলোকের অসত্তার নাম যেমন অন্ধকার, সুখদুঃখও ঠিক তেমনি; অবস্থা ও উপাধি ভেদে নীললোহিতাদি বর্ণসান্নিধ্যে এক শুদ্ধ (সর্ব্বদা শ্বেত) স্ফটিকের দৃশ্যভেদের মত ভিন্নভাবে প্রতীত হইয়া থাকে। যতটুকু আলোচিত হইল, তাহাতে সুখদুঃখের ঐক্যের ধারণা অনেকটা দৃঢ় হইবে বলিয়া মনে হয়। এখন পরস্পর বিরোধিরূপে প্রতীয়মান সুখদুঃখ দুইটী সাগর সলিলে বাড়বাগ্নির ন্যায় একই সময়ে, একই বিষয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক জন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতের উল্লেখ

করিয়া প্রাচ্যের কথা পরে বলিতেছি। সুবিদিত প্রবাদের মুখে শুনা যায়, "Adversity often leads to prosperity" দুঃখ অনেক সময়ে সুখে পরিণত হয়। অর্থাৎ দুঃখই সুখের মূল বীজ। ইহাতে বীজে অঙ্কুর ও ভাবী বৃক্ষের অস্তিত্বের মত দুঃখের গর্ভেই সুখের জন্ম বুঝায়। এ সম্পর্কে মহামতি বেকনের (Bacon) জ্ঞানগর্ভ মন্তব্যটী অনুস্মরণীয়। তাঁহার সিদ্ধান্ত—"Prosperity is not without many fears and distastes; and adversity is not without comforts and hopes" পাশ্চাত্য কবি কেশরী শেকসপিয়ারের (Shakespeare) "Sweet are the uses of adversity" (As you like it) ইত্যাদি অমূল্য কবিতার তাৎপর্য্য এস্থলে হৃদয়ঙ্গম করা বিধেয়। পরিশেষে "Every man's Encyclopaedia"র দীর্ঘ-বিবরণের ফলরূপে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায়, "A pleasurable stimulation continuing to act may become painful, or even if this does not happen it may at least lose its pleasurable effect Change, therefore, involves pleasure, because it limits their duration of any stimulus etc, etc" ইহার মর্ম্মার্থে বুঝা যায়, 'যে কোন সুখের উদ্দীপনাই পরিণামে দুঃখে পর্য্যবসিত না হইলেও ঐ উদ্দীপনা শেষের দিকে উহার সুখজনক শক্তি হারাইয়া ফেলে। কারণ পরিণামটী সুখের অন্তর্নিহিত। এজন্য উহা সুখজনক উদ্দীপনার স্থায়িত্ব কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়।' ইহার মূল ভাবটী মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে সাধন পাদের "পরিণাম-তাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" এই ১৫শ সংখ্যক সূত্রে সুবিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সূত্রের সারার্থ:—'আমাদের চিত্তের সুখ দুঃখ মোহাত্মক বৃত্তিগুলি পরস্পর বিরোধী। এমন কি স্পৃহনীয় বিষয়ের ভোগকালেও বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষের উদয়ে ক্রমশঃ ভোগ সংস্কারবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভোগের পরিণাম তৃষ্ণাবৃদ্ধি, ফলে অতৃপ্তি। এজন্য বিবেকী (বিষয় দোষদর্শী) যোগিগণ বিষয়মাত্রই দুঃখকর দেখেন। এ হেতু পতঞ্জলির পূর্ব্বগামী আদি বিদ্বান্ কপিলদেবও তদীয় দর্শনে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "কুত্রাপি কোঽপি সুখী" সাংখ্যদর্শন ৬।৭। অধ্যাত্ম রামায়ণে ৬।১৪ শ্লোকে মহর্ষি বশিষ্ঠ সহজ কথায় বুঝাইয়াছেন,—

"সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখ মধ্যে স্থিতং সুখং।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥"

কি সহজ সুন্দর উপদেশ। নির্জ্জল পঙ্কের ন্যায় নির্দুঃখ সুখের সত্তা আকাশ কুসুম সদৃশ। শারদ চন্দ্র কিরণে স্নিগ্ধ তাপের মত দুঃখের ভিতর সুখের অনুভূতির প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন, রামায়ণাদি করুণ রসাত্মক কাব্য হইলেও তাহা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকেরা পরমানন্দ উপভোগ করেন।

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কারণম্ ॥

সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

ভাবের রাজ্যে একই ভাষা। ভাবুক পাশ্চাত্য কবিরও অনুভূতি,—"Our sweetest songs are those that tell us the saddest thoughts" কীর্ত্তনানন্দে ভক্তের হর্ষাশ্রু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দর্শনের বিচারের পথ ছাড়িয়া লৌকিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেও দেখিতে পাই, অতি ভোজনের শেষে লোভনীয় মিষ্টদ্রব্য দেখিলেও গা বমি দেয়। ভোগের রাজ্যের প্রবাদেও বলে, "Surfeit is the mother of fasting" ব্যাপারটা এখন হিন্দুর উপবাসের পূর্ব্বরাত্রি ও মুসলমানের রোজার শেষ

রাত্রের অতি ভোজনের অকাট্য সাক্ষ্যদান করে। ইহার অতি সহজ ও সর্ব্বত্র সুলভ উদাহরণ, গলিত কুষ্ঠীর সুভোজ্য ভোজনের আনন্দ। ভোজনকালে একদিকে উহার কীটাকুলিত সর্কাঙ্গে কুষ্ঠব্রণে কীটদংশনের যাতনা, অন্য দিকে পরম ভোজনানন্দ। এ বিষয়ে উদাহরণ বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। লেখকের অভিপ্রায় আমাদের দেহ ভোগায়তন। ভোগের মুখ্য বিষয় দুঃখ ও সুখ। দেহী জীবমাত্রই এই সুখ-দুঃখের ক্রীতদাস। আমরা ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ দুঃখ ত্যাগ ও সুখলাভ করিতে পারি না। কেন না সুখ দুঃখ অদৃষ্টাধীন। অদৃষ্ট আবার পাপ পুণ্য বা নিজ নিজ সদসৎকর্ম্ম সাপেক্ষ। একন্য কৃতকর্ম্মের ভাল মন্দ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। মহীয়সী শ্রুতির অনুশাসন "ন বৈ—সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।" ছাঃ উঃ ৮।১২।১। প্রিয়াপ্রিয় সম্পর্কিত সুখ দুঃখের হাত হইতে দেহ ধারীর নিষ্কৃতি নাই। এরূপ অবস্থায় সুখই যখন আমাদের কাম্য ও দুঃখ হেয়, তখন নিত্য সুখের মহাজনগণ নিত্য দুঃখী মাদৃশ মানবকে সুখ প্রাপ্তির যে সুন্দর পন্থার সন্ধান দিয়াছেন,—সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমাদের সেই পথের পথিক হওয়া উচিত। এ বিষয়ে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ভগবান্ মনুর নির্দ্দেশ,—

"সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়॥"

যে ব্যক্তি সুখের বাসনা করে, তাহাকে সন্তোষশীল হইয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ সুখের মূল সন্তোষ, আর দুঃখের সতেজ বীজ অসন্তোষ। সন্তোষের অর্থ যথা লাভে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধিমূলক তৃপ্তি। অতৃপ্তিই অশান্তিমূলক দুঃখের নিদান। তাই ভগবান্ পতঞ্জলি সন্তোষশীলতার অভ্যাসকেই সুখ লাভের উত্তম উপায় বলিয়াছেন,—"সন্তোষানুত্তম সুখলাভঃ।" ২য় পাদ। ৪২ সূত্র।

গোমুখী যাত্রা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উত্তর কাশীর পথে

চীর বনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে একটি পর্ব্বতের প্রান্তভাগে মোড় ফিরিলে দেখিতে পাইলাম, অনেক দূরে নীচে গঙ্গা অজগরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে মনে হইল গঙ্গা যেন স্থির ধীর মন্থর গতিতে নীরবে বহিয়া যাইতেছে। আরও নীচে নামিয়া গঙ্গার গুরু গম্ভীর নিনাদ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। গঙ্গার ফেনিল তরঙ্গ মালাও ঈষৎ দৃষ্টি গোচর হইল। পর্ব্বতের পাদদেশে ২।৪টি কুটীরও নিরীক্ষণ করিলাম। বুঝিলাম এতক্ষণে আমরা লোকালয়ের নিকটে আসিয়াছি। এখানে একটি প্রকাণ্ড চীর গাছের ছায়ায় একজন পাহাড়ী এক হাড়ি ঘোল লইয়া যাত্রীদের নিকট বিক্রয়ের আশায় বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ পাহাড়ে চলিয়া আমাদের শরীর গরম হইয়াছিল। পথি মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে খাঁটী ঘোল পাইয়া মনে হইতে লাগিল, এ যেন ভগবানেরই দান। চীরের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়া মনের আনন্দে ঘোল পান করিলাম। কোন কোন চটিতে অবস্থানকালে দই ও

ঘোল কিনিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাস্তার উপরে আর কখনও এমন ঘন খাঁটি ঘোল এরূপ ভাবে জোটে নাই। কিছুক্ষণ পর একটি পাহাড়ী বালক একটি পাতার মধ্যে কতকগুলি কাপল ফল আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। আমরা একটা পয়সা দেওয়াতে সে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। পাহাড়ে আরও অনেক রকম বন্য ফল দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের প্রযত্নসম্ভূত ফলের সহিত উহাদের তুলনা হয় না।

আর প্রায় দুই মাইল উৎরাইর পর সিঙ্গড়ে পৌছিলাম। সিঙ্গড় পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। এখান হইতে গঙ্গা দুই মাইল দূরবর্ত্তী। দুইটি নির্ঝরিণী সিঙ্গড়ের দুই প্রান্তে নিরন্তর বহিয়া স্থানটিকে সুজলা সফলা শস্যবহুলা করিয়া তুলিয়াছে। আজ আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে অবতরণ করিয়াছি। অনেকক্ষণ রৌদ্রে হাঁটিয়া শরীরও উত্তপ্ত বোধ হইতেছিল। নির্ঝরিণীর জলে স্নান সমাধা করিয়া অতিশয় তৃপ্তি অনুভব করিলাম। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীতে অবগাহন প্রায়ই সম্ভবপর হয় না, কাজেই মাথায় ও গায়ে জল ঢালিয়াই আমাদিগকে স্নান নির্ব্বাহ করিতে হইল। সিঙ্গড়ে একটি পাহাড়ী ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যমুনোত্তরীর রাস্তায় এরূপ ধর্ম্মশালা থাকিলে তো কথাই ছিল না। ধর্ম্মশালার পাশেই একটি দোকান আছে। পাঞ্জাবী সত্রের পক্ষ হইতে এই দোকানে সাধুদিগকে সদাব্রত দেওয়া হয়। আমরাও সদাব্রত নিয়া আসিলাম। আমাদের সঙ্গী গৃহস্থ ভদ্রলোকটি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দোকান হইতে পৃথক্‌ভাবে সমস্ত জিনিষ কিনিয়া একসঙ্গে রান্না করতে দিলেন।

সিঙ্গড়ে দুইটী নেপালী সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলাম। উহাদের সঙ্গে একটী নেপালী বালিকা ব্রহ্মচারিণী ছিল। আমাদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা, সসম্ভ্রমে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিল। বাক্যালাপ না হইলেও বুঝিলাম তাহারা যমুনোত্তরী দর্শনান্তে গঙ্গোত্তরী অভিমুখে যাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বেই তাহারা আহারাদি সমাপন করিয়া উত্তরকাশীর দিকে অগ্রসর হইল।

অপরাহ্নে তিন মাইল পথ চলিয়া নকুড়িতে পৌছিলাম। নকুড়ি গঙ্গা তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধরাসু হইতে গঙ্গোত্তরীর রাস্তা নকুড়ির উপর দিয়া গিয়াছে। নকুড়িতে একটি পাহাড়ী ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু উহা এত অপরিষ্কার যে ভিতরে ঢুকিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিকটে একটি ব্রহ্মচারীর আবাস স্থান আছে; শুনিয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। ব্রহ্মচারী ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতাজী আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহাদের বাসগৃহে একটি কামরা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই বাড়ীতে ৺নাগেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবায়েত। তিনি বয়সে প্রবীণ। প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায় দেবং বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। নূতন মন্দির, নির্ম্মাণের জন্য ব্রহ্মচারী যাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনরূপ উৎপীড়ন করেন না। যাত্রীদের স্বেচ্ছাকৃত সামান্য দানও তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী ও তাঁহার মাতাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গা তীরবর্ত্তী সমতল পথে চলিতে লাগিলাম। অনেক দিন পর সমতল পথে হাঁটিতে বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। এদিকে গঙ্গার তরঙ্গাকুল ফেনিল বক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত নয়নগোচর হইতেছিল। গঙ্গার নিরবচ্ছিন্ন শোঁ শোঁ ধ্বনি দিগন্তে বিলীন হইয়া প্রাণে এক উদাস ভাবের সঞ্চার করিতেছিল।

আকাশে ধূসর বর্ণ মেঘ পংক্তি অবিরাম ভাসিয়া যাইতেছিল। দেখিয়া দেখিয়া মনে হইতে লাগিল আকাশ পথেও বুঝি গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। ক্রমে আমরা উত্তর কাশীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। ঘ'ড় দেখিয়া বুঝিলাম তিন ঘণ্টায় মাত্র ছয় মাইল পথ চলা হইয়াছে।

উত্তর কাশী

পূর্ব্বকাশীর ন্যায় উত্তরকাশীও অতি প্রাচীন পুণ্য তীর্থ। ইহা উত্তরাখণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ তপঃক্ষেত্র। জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম স্বয়ং এখানে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এখানে অনেক বৈরাগ্যবান মহাত্মা তপস্যায় নিরত আছেন। কত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভের পর অবশিষ্ট জীবন এখানেই অতিবাহিত করিয়াছেন। এখনও এখানে এরূপ মহাপুরুষের অসদ্ভাব নাই। আবহমান কাল হইতে পুণ্যকীর্ত্তি মহর্ষিগণ এখানে শুভাগমন ও অবস্থান করিয়া ইহার মহিমা ও গৌরব আরও বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। মহাত্মাদের পুণ্য সংস্পর্শে উত্তর কাশীর প্রত্যেক অণুপরমাণু যেন অধ্যাত্ম ভাবের দ্বারা উপসংক্রামিত। উত্তর কাশীর জলে স্থলে অনিলে তাঁহাদের দিব্য চিন্তারাশি নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্করও উত্তর কাশীতে শুভ পদার্পণ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, গঙ্গোত্তরী ও গোমুখী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সশিষ্য উত্তর কাশীতে আগমন করেন। আচার্য্যের বেদান্ত অধ্যাপনা এখানেও সমভাবে চলিতেছিল। একদিন আচার্য্য সবেমাত্র শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া বেদান্ত ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভাতকাল। ভাগীরথী সলিলে প্রাতঃ সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মি ক্ষরিত হইতেছিল। বৃদ্ধ আসিয়াই আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি যেন আচার্য্যের বেদান্তজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। শিষ্যগণ চমকিত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের সহিত বিচারে সাহসী!—এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? সেই দিন বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদ, প্রথম সূত্রের পাঠ হইতেছিল। সূত্রটি এই:—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্"॥ অর্থাৎ জীব যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে যায় তখন সে দেহ বীজ-ভূত সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

এই সূত্রের উপরই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত আচার্য্যের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে উভয়ে উভয়ের বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচার চলিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল। বিচার শেষ হইল না। সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

পরদিন যথারীতি আচার্য্য শিষ্যগণকে বেদান্ত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দিনও তুমুল বিচার চলিল; কিন্তু উহার অবসান হইল না। মধ্যাহ্ন অতীত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন বিচার চলিতে লাগিল। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে পারেন না। উভয়ে স্থির, ধীর, গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ আসনে সমাসীন হইয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার ধীশক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষ

খণ্ডন ও স্বপক্ষ সমর্থনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কোনদিন উত্তেজনা বা ধিক্কারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, শিষ্যগণ এইরূপ বিচার দর্শনে বিস্মিত হইলেন, এবং নির্ব্বাক হইয়া নির্নিমেষ নয়নে এই জ্ঞানযুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে কি না?—ইহাই ছিল বিচারের বিষয়। দেহ ত্যাগ কালে জীবাত্মা ভাবীদেহের বীজস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রিয় মন সহ প্রয়াণ করে, নিরাধারভাবে গমন করে না। এই জন্য মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের প্রয়োজন—ইহাই হইল সিদ্ধান্ত পথ। বিচারে শঙ্কর সিদ্ধান্ত পক্ষ এবং ব্রাহ্মণ পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বহু শাস্ত্রার্থের অবতারণা হইল। সপ্তাহকাল বিচারের ফলে আচার্য্য শঙ্করের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রতিবাদী আর কেহই নন, ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা মহামুনি বেদব্যাস স্বয়ং। অষ্টম দিন ব্রাহ্মণ পুনরায় সেইরূপে উপস্থিত হইলে আচার্য্য শঙ্কর পরম গুরুর যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহাকে ছদ্মবেশ পরিহারের জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন।—"হে পরম কারুণিক পরমগুরো! যখন করুণাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর অভাজন শিষ্যাধমকে ছলনা করা আপনার সাজে না। কৃপাপূর্ব্বক একবার মাত্র নিজরূপ প্রকটিত করুন। আমরা সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হই।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঈষন্মাত্র হাসিলেন। চকিতে শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাবিলম্বিত, দীর্ঘাকায়, কৃষ্ণকান্তি, চিরপুরাতন মহর্ষিমূর্ত্তি সকলসমক্ষে আবির্ভূত হইল। আচার্য্য ও শিষ্যগণের মস্তক মহামুনির চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্যাসদেব শঙ্করের প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইলেন, "বৎস! তোমার ভাষ্যরচনায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি। তোমার ভাষ্য জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবে। কর্ম্মবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক বেদান্তমত প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার আয়ুষ্কাল ষোড়শ বৎসর বর্দ্ধিত হউক।"

(ক্রমশঃ)

—সৎপ্রকাশানন্দ

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনন্তর গঙ্গাতীরে সন্নিবিষ্ট চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গ সেনা দেখিয়া নিষাদরাজ গুহক জ্ঞাতিদিগকে বলিলেন, "এই গঙ্গাতীরে সাগরতুল্য মহতী সেনা দেখিতেছি। যখন রথে অত্যুচ্চ ধ্বজা দেখা যাইতেছে তখন বোধহয় দুর্ব্বুদ্ধি ভরত নিজেই আসিয়াছে। পিতা কর্তৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত দশরথ তনয় রামকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে পাশ দ্বারা বদ্ধ বা নিহত করিবে। আমার বোধহয় কৈকেয়ীসুত ভরত রামকে নিহত করিবার জন্য যাইতেছে। রাম আমার সখাও বটেন এবং প্রভুও বটেন, অতএব তোমরা হিত-কামনা করিয়া চতুর্দ্দিকে গঙ্গাসলিলে প্লাবিত এই প্রদেশে অবস্থান কর। পঞ্চাশত নৌকা বাহনযোগ্য শত শত কৈবর্ত্তরা ও শত শত যুবক যোদ্ধৃবৃন্দ সজ্জিত হইয়া অবস্থান করুক। আর যদি এরূপ বোধহয়—ভরতের রামের প্রতি প্রীতি আছে, তবে এই সেনা নিরাপদে গঙ্গা নদী পার হইতে পারিবে।" ইহা বলিয়া গুহক মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন সহ ভরতের নিকট গমন করিয়া বিনয় নম্র বচনে বলিলেন "আপনি ত সেই সর্ব্বগুণাকর রামের নিকট শত্রুভাবে যাইতেছেন না?" গুহক এইরূপ বলিলে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল স্বভাব ভরত তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার সন্দেহ করা উচিত নহে। রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনি আমার পিতৃতুল্য। গুহক আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে আমি বনবাসী রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাইতেছি। তুমি আমার প্রতি অন্য আশঙ্কা করিও না।"

ইহা শুনিয়া গুহক অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং শুষ্ক ও আর্দ্র মাংস ও ফলমূল প্রভৃতি অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা ভরতের সৈন্যগণের অতিথি-সৎকার করিলেন। গুহক ভরতের নিকট রামের প্রতি লক্ষ্মণের যেরূপ সদ্ভাব তাহা বলিতে লাগিলেন:—"ভ্রাতৃ-রক্ষার্থ উত্তম ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক জাগরণকারী সর্ব্বগুণশালী লক্ষ্মণকে আমি বলিয়াছিলাম, 'রঘুনন্দন। আপনার জন্য এই সুখশয্যা রচনা হইয়াছে, আপনি ইহাতে শয়ন করুন। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি এই ভূমণ্ডল মধ্যে রাম হইতে প্রিয়তর আমার কেহ নাই। অতএব আমি আমার জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতা ও রামের শয্যাপার্শ্বে প্রহরীরূপে জাগরিত থাকিব।' গুহক এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ অনুনয়পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "গুহক! এই দাশরথি রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়ভূত সুখ ভোগ করিতে পারি? সমুদয় দেব ও দানবেরা যাঁহার বীর্য্য সহনে অক্ষম, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন; দেখ রাজা দশরথ মহতী তপস্যা প্রভাবে ইঁহার ন্যায় সর্ব্বসুলক্ষণসংক্রান্ত পুত্র লাভ করিয়াছেন। আমার নিশ্চয়ই বোধহয় পৃথিবীদেবী বিধবা হইবেন।" লক্ষ্মণ এইরূপে বিলাপ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন ও পরে রজনী প্রভাত হইলে এই গঙ্গানদীতীরে জটা নির্ম্মাণ করিলেন এবং আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে এই ভাগীরথী পার করিয়া দিলাম। চীর-বসন, জটা, উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণধারী সেই দুই শত্রুতাপন রাজনন্দন

সীতার সহিত আমাকে দেখিতে দেখিতে গমন করিলেন।"

ভরত গুহকের নিকট সেই জটাধারণরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুহক। আমার ভ্রাতা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী কোথায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, কি আহার করিয়াছিলেন এবং কিরূপ শয্যাতেই বা শয়ন করিয়াছিলেন তাহা তুমি আমার নিকট বল।" তখন নিষাদরাজ গুহক অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রিয়সখা রামের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং রামও তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে লাগিলেন, "আমি রামকে আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উপহার প্রদান করি, পরন্তু রাম, আমার বান্ধব, রাজ্য ও ধনের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুহক! তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি না, কেন না সম্প্রতি তাপসদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনবাসী কুশ চীরাজিনধারী ও ফলমূলভোজী হইয়াছি।"

"অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ ধনেষুচ।
যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্॥
সর্ব্বং তদনুজানামি নহি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে।
কুশচীরাজিনধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাম্॥

(অযোধ্যাকাণ্ড পঞ্চাশৎ সর্গঃ॥ ৪৩-৪৪)

পরে সেই রঘুনন্দন রাম সীতাদেবীর সহিত মহাত্মা লক্ষ্মণের আনীত জলমাত্র পান করিয়া উপবাসী রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের পানাবশিষ্ট জল পান করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহারা তিনজনে সমাহিতচিত্ত ও সংযত বাক্য হইয়া সান্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন। তৎপরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রঘুনন্দন রামের জন্য বহুতর কুশ আনয়নপূর্ব্বক অতি সত্বর শয্যা রচনা করিলেন। রাম সীতাদেবীর সহিত সেই শয্যায় উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া তথা হইতে কিছুদূরে গমন করিলেন। ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষতল, ঐ সেই তৃণপুঞ্জ, যেস্থানে রাম ও সীতাদেবী উভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ দুইটী শরপূর্ণ তূণ পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া তলত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান করিয়া জ্যাযুক্ত ধনু ধারণ করিয়া সমস্ত রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। আমিও উত্তম বাণ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক নিদ্রাবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত লক্ষ্মণের নিকট ছিলাম।

ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের তলে যাইয়া রামের শয্যা দেখিলেন এবং চীৎকার করিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"যে রামচন্দ্র দুগ্ধফেননিভ শয্যায় প্রত্যহ শয়ন করিতেন, যে সীতাদেবীর চরণযুগল কখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করিত না, তাঁহারা আমার ন্যায় হতভাগ্যের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।" এইরূপ ব্যাকুলরোদনে ভরত নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং সেই রাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিষাদপতি গুহককে বলিলেন, "ধীমান্। তুমি আমাদিগকে উত্তম অতিথিসৎকার করিয়াছ, এক্ষণে ধীবরগণ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা যাহাতে আমাদের নদীর পরপারে পৌঁছাইয়া দেয় তাহার উপায় কর।" গুহক ভরতের আদেশ পাইয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণ দ্বারা বহুসংখ্যক নৌকা আনয়ন করিলেন। নৌকায় অগ্রে আরোহণপূর্ব্বক স্থান গ্রহণে ব্যগ্র এবং নিজ নিজ গৃহ-সামগ্রী গ্রহণে ব্যাকুল সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনি আকাশতল স্পর্শ করিল। সৈন্যসকল ধীবরগণ কর্ত্তৃক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ে রমণীয় প্রয়াগবনে উপস্থিত হইল। ভরত সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত

করিয়া সদস্ত ও পুরোহিতের সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে গেলেন। পরে তিনি সেই মহানুভব দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি-তনয় দ্বিজবরের আশ্রমে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুলতা শোভিত বন দেখিতে লাগিলেন।

ভরত ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিত সহ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহা তপস্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়া আপনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরত বশিষ্ঠের সহিত আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে সেই মহাতেজা ভরদ্বাজ তাঁহাকে দশরথের তনয় বলিয়া জানিলেন এবং যথোচিত সম্মান সহ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। মুনিবর ভরতকে অতিথি সৎকারার্থ নিবেদন করিলে ভরত বলিলেন, "পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি বনে যাহা সম্ভব তদ্দ্বারা ত আপনি আতিথিসৎকার করিয়াছেন।" মুনিবর ভরতের এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন অর্থাৎ "ইনি আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র বলিয়া সপারিষদ ও সসৈন্য ভরতকে অতিথি সৎকারে অসমর্থ মনে করিয়াছেন" এইরূপ ভাবিলেন। পরে মহর্ষি ভরতকে সৈন্যগণকে তথায় আনিতে আদেশ করিলেন এবং অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া অতিথি-সৎকার করণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন, "আমি অতিথি সৎকার-মানসে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সম্যক বিহিত হউক। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমাকে সম্যক সিদ্ধিদান করুন। যে সকল সরিৎ পৃথিবীতে ও আকাশ মণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন, অদ্য তাঁহারা এ স্থানে আগমন করুন। সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সহ অপ্সরাগণকে আহ্বান করিতেছি। চৈত্ররথ নামে কুবেরের যে উদ্যান আছে, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার যাহার পত্র, ও দিব্য রমণীগণ যাহার ফলরূপে উৎপন্ন হয়, সেই উদ্যান আজ এইস্থানে আগমন করুক। ভগবান সোমদেব আমার আশ্রমে প্রচুর ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি বহুবিধ উত্তম অন্ন প্রস্তুত করুন।

সেই মহামুনি পূর্ব্বমুখ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকল দেবতারা পৃথক পৃথক রূপে আসিলেন। সুখকর ও স্বেদহর মলয়পবন মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। অপ্সরা গণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বীণা সকল ষড়্‌জাদি তান বিস্তার করিল। শ্বেতবর্ণ গৃহ সমূহ, অশ্বশালা, হস্তীশালা, রমণীয় অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার, এবং শ্বেত মেঘ সদৃশ সুতোরণ রাজ সদন নির্ম্মিত হইল, সেই সকল গৃহে বহুবিধ সুরস খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ছিল, পাত্র সকল ধৌত, ও পরিষ্কৃত ছিল এবং উত্তম আসন ও শয্যা বিস্তীর্ণ থাকায় উহা অতীব মনোহর হইয়াছিল, কৈকেয়ী তনয় ভরত, মহর্ষি কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই রত্নপরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভরত মন্ত্রিগণের সহিত তথায় রাজ-সিংহাসন, ছত্র ও চামর প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সিংহাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রামকে প্রণাম পূর্ব্বক ভরত চামর হস্তে করিয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। সচিব ও পুরোহিতগণ যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে সেনাপতি ও শিবির রক্ষক পশ্চাৎ উপবেশন করিল। পরে সকলে পরম প্রীতিসহকারে ভোজন সমাপন করিলেন।

এইরূপে ভরত সপারিষদ সসৈন্যে অতিথি-সৎকার লাভ করিয়া সেই রাত্রে সেখানে সুখে যাপন করিলেন। পরে রামকে পাইবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ভরদ্বাজ সমীপে নিবেদন করিলেন "ধর্ম্মজ্ঞ। রামচন্দ্রের আশ্রম কতদূর, এবং কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করুন।"

ভ্রাতৃদরশন কাতর ভরতকে মুনিবর প্রত্যুত্তর করিলেন—"এই স্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে বিদীর্ণ পাষণ ও কানন সমাকীর্ণ চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে, পুষ্পিত তরুগণ সমাবৃতা, রমণীয় কুসুমিত কাননা, মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বৎস। সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি, তথায় রামচন্দ্র পর্ণশালা তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন।"

ভরত শব্দায়মান চতুরঙ্গ সেনা সমাবৃত হইয়া নিবিড় অরণ্য ভেদ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। দূরপথ গমন করিয়া বাহন সকল অতিশয় পরিশ্রান্ত হইলে ভরত মন্ত্রিবর বশিষ্ঠকে বলিলেন, "মহর্ষি ভরদ্বাজ চিত্রকূট পর্ব্বতের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং আমিও পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছি।"

এদিকে রাম সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে জনক নন্দিনীর তৃপ্তি সাধন কামনায়—শৈলাবাস প্রিয়তর জ্ঞানে জানকীকে রমণীয় রমণীয় শৈল সকল সন্দর্শন করাইতে ছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহাদের নিকট ভরতের সৈন্যগণের গগনস্পর্শী কোলাহলধ্বনি শ্রুত হইল। ধাবমান যূথপতি সকলকে দেখিয়া রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে মেঘগর্জ্জনসদৃশ তুমুল শব্দ উত্থানের কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন যে ভরত সৈন্য-সামন্তসহ চিত্রকূট পর্ব্বত সমীপে অগ্রসর হইতেছেন। লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেই বিপুল সেনাদলকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করতঃ বলিলেন, "কৈকেয়ী পুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার কামনায় আমাদিগকে বধ করিতে এখানে আসিতেছে; আমি সসৈন্যে ভরতকে সংহার করিরা ধনুর্ব্বাণের ঋণ পরিশোধ করিব।"

অনন্তর রাম ভরতের প্রতি যুদ্ধোদ্যত লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ভরত স্নেহাকুল হৃদয় ও শোকবিহ্বল হইয়া আমাকে এখানে দেখিতে আসিতেছে। শ্রীমান্ ভরত জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক কটুবাক্য প্রয়োগ করতঃ আমাকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য আসিতেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই"। ধর্ম্মাত্মা রাম বৃক্ষাগ্রস্থিত সুমিত্রানন্দনকে এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ তরুশীর্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে ভরত যাহাতে শ্রীরামের কোন প্রকার আশ্রম পীড়া উপস্থিত না হয় সেই হেতু সৈন্যগণকে দূরে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিয়া পদব্রজে রামের নিকট যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরত রোদন করিতে করিতে রামের পদযুগল প্রাপ্ত না হইয়া ভূমে পতিত হইলেন এবং অতি দীনভাবে একবার মাত্র 'আর্য্য' এই কথা বলিয়া পুনরায় আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তিনি ভূমে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিলেন। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে চরণ বন্দনা করিলেন। পরে রাম উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করতঃ তাঁহাকে সাদরে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ। তোমার পিতা কোথায় আছেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কখনও তুমি আসিতে পারিতে না। হায়। কৃশতা ও মলিনতা হেতু ভরতকে চেনা যায় না, ভাই। রাজ্যের কুশল ত? তুমি কি জন্য চীর, জটা ও অজিন ধারণ করতঃ এখানে আসিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।"

তৎপরে ভরত প্রবল শোকাবেগ সম্বরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আর্য্য! আমার মাতা স্ত্রীলোক, মহাবাহু পিতা তাঁহার কথানু-সারে জ্যেষ্ঠ তনয়কে অতিক্রম পূর্ব্বক কনিষ্ঠকে

বাক্যদানরূপ দুষ্কর কার্য্য করতঃ পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমাদিগকে ও ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মানদ! জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই রাজ্যলাভে অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত। অতএব আপনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করুন ও সুহৃদ্গণের ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" ভরত অশ্রু পূর্ণ নেত্রে এই সকল কথা বলিয়া পুনরায় মস্তক দ্বারা রামের পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। রামও ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "অরি-দমন! আমার ন্যায় সদ্বংশজাত সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ও কৌলিক ব্রত পালনশীল লোক কেমন করিয়া পিতার আজ্ঞাভঙ্গরূপ পাপাচরণ করিতে পারে? আর বাল্য চপলতা বশতঃ তোমার জননীর প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করা উচিত হইতেছে না। অযোধ্যার রাজ্য এখন তোমারই পালনীয়, আর আমার বল্কল পরিধান পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা কর্ত্তব্য।"

রঘুনন্দন রাম ভরতের নিকট পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অচেতন হইলেন। কুঠারাঘাতে ছেদিত বনমধ্যে পুষ্পিত তরুর ন্যায় রামচন্দ্র বাহুযুগল উত্তোলন পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইলেন। পরে রাম সংজ্ঞা লাভ করিয়া অবিরল অশ্রুজল ত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও বাষ্পবারি পরিপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা, মহারাজ শ্বশুর স্বর্গে গিয়াছেন শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! পাষাণ পিষ্ট ইঙ্গুদী ফল আনয়ন কর, নূতন চীর বসন আহরণ কর, মহানুভব পিতার তর্পণাদির জন্য গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎ পশ্চাৎ চল, আমি সকলের পশ্চাৎ যাইব।" পরে সীতার সহিত রাজকুমারগণ মন্দাকিনী নদীতে অবতরণ করিলেন এবং পিতার নাম ও গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তর্পণজল প্রদান করিলেন। রাম দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "মহারাজ! তুমি পিতৃলোক গমন করিয়াছ, আমার প্রদত্ত এই নির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে গমন করুক।" তৎপরে রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনী হইতে তীরে উঠিয়া পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। বদরী ফল মিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করতঃ বলিলেন, "আমাদের যাহা ভোজ্য তাহাই ভোজন করুন। লোকে নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে পিতৃগণ ও দেবতা সকলকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকে।" পিতার তর্পণ ক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই মহাবল ভ্রাতৃগণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের রোদনধ্বনি ভূতল, আকাশতল, দিঙ্মণ্ডল ও গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করতঃ মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।

বশিষ্ঠ রামকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া তথায় গেলেন। শোকক্লিষ্ট মাতৃগণ রামকে সর্ব্বভোগ বিরাগী দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাম মাতৃগণের চরণ কমল গ্রহণ করিলেন। জননীরা করাঙ্গুলি দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ হইতে ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। রামের পর লক্ষ্মণও মাতৃগণকে ভক্তি পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অভিবাদন করিলেন। জনক নন্দিনী সীতা-দেবীও শ্বশ্রূদিগের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ভরত নিজ মন্ত্রিগণ, প্রধান পৌরজন, সৈনিকগণ ও ধার্ম্মিক জনগণের সহিত রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলি পুটে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অতি দুঃখে সেই সকল বান্ধব পরিবৃত শোককারী পুরুষ প্রবরগণের রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে ভ্রাতৃগণ বান্ধব সহ মন্দাকিনী নদী তীরে জপ হোম সমাপন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিলেন।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

বেদান্ত পাঠ

১ম অধ্যায়—১ম পাদ

দ্বিতীয় পাঠ।

বিষয়—। ব্রহ্মতত্ত্ব (ব্রহ্ম **চিৎ**-স্বরূপ—জগতের **নিমিত্ত কারণ**)।

শাস্ত্রপাঠ—
- মূলশ্রুতি—
  - (অ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (অ ৩, ৩—৫ , অ ২, ১, ১—৩)।
  - (আ) ছান্দোগ্য (অ ৬, ২, ৩—অ ৩, ৩, ৩ , অ ৬, ৮, ৭, অ ৬,১৪, ২ , অ ৬, ১, ২—৬ , অ ৬, ৮, ১ , অ. ৭, ২৬, ১)।
- অবান্তর শ্রুতি— ঐতরেয়োপনিষৎ (অ ১, ১, ১—২)। ঋগ্‌বেদ (নাসদীয়সূক্ত—ম ১০, ১২৯, ১—২ ও ৪ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (অ ৬, ৭)। প্রশ্ন (প্র, ৩, ৩)।
- স্মৃতি - শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা (অ ১৮, ৬২ ; অ ১০, ২০ , অ ৯, ৭ , অ ৭ ৪)।
- দর্শন—বেদান্তসূত্র (৫—১১)।

প্রাবন্তিক বিবৃতি।—এই জগৎকারণ **সৎ**-স্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা দেখাইয়া, এখন সেই **সৎ**বস্তু যে অচেতন প্রকৃতি বা অন্ধশক্তি মাত্র নহেন, বরং মনোময় ও বিজ্ঞানময়—ইচ্ছা ও জ্ঞানময়, সুতরাং চৈতন্যময় বস্তু, তাহাও সেই তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লীতেই, ইতিপূর্ব্বে পঠিত অংশের পরেই, পাঠ কর।

(অ)। **তৈত্তিরীয়ে—**

১। তদ্ বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরম্ উপসসার অধীহিভগবোব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—

২। মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্ বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরম্ উপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপোব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—

৩। বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব *খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।* বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। [অ, ৩, ৩—৫]।

অর্থ।—১। [প্রাণই ব্রহ্ম] এইরূপ জ্ঞান পাইয়াও [তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া ভৃগু] পুনর্ব্বার পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিলেন—"ভগবন্। আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।" পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা কর, তপই (বিশুদ্ধ অনুভূতিই) ব্রহ্ম। তিনি তখন তপঃ (বিশুদ্ধ অনুভূতি) লাভের চেষ্টা করিলেন। তিনি সেই চেষ্টা করিয়া—

২। বুঝিলেন—মনই ব্রহ্ম, যেহেতু মন হইতেই (সংকল্প বা দৃঢ় ইচ্ছা হইতেই) নিশ্চয় এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, সেই ভূতসমূহ মনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই জীবিত থাকে (অস্তিত্ব রক্ষা করে) এবং অন্তিমে মনেই লীন হইয়া অবস্থান করে। [কিন্তু এইরূপ জ্ঞানেও তৃপ্ত না হওয়ায়—সন্দেহ হওয়ায়] পুনর্ব্বার পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিলেন—*"ভগবন্। আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।"* পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে

জানিবার চেষ্টা কর, তপই ব্রহ্ম।" তিনি [তখন আবারও] তপঃ (বিশুদ্ধানুভূতি) লাভের চেষ্টা করিলেন। তাহা করিয়া—

৩। বুঝিলেন—বিজ্ঞানই (বিচিত্র বা নানা বিষয়িণী বুদ্ধিই) ব্রহ্মতত্ত্ব; যেহেতু এই বিচিত্র বুদ্ধি হইতেই নিশ্চয় এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সেই উৎপন্ন ভূতসমূহ জীবিত থাকে (অস্তিত্ব রক্ষা করে) এবং অন্তিমে বুদ্ধিতেই লীন হইয়া অবস্থান করে।

বিবৃতি।—এই সব অনুভূতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান কারণ সেই **সৎ** বস্তুটাই চৈতন্যময়রূপে বুদ্ধি ও মনঃ-শক্তি (ইচ্ছাশক্তি)রূপী হইয়া প্রাণময় (স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তিময়) ও অন্নময় (স্থূল ভূতময়) সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তাহা কিরূপে হইয়াছেন, অন্য শ্রুতিতে পাঠ কর। প্রথম পাঠের (আ) ২ চিহ্নিত শ্রুতি বচনটুকুর প্রায় অব্যবহিত পরেই আছে—

(আ) **ছান্দোগ্যে**—

১। তদ্ **ঐক্ষত** বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। তৎ তেজোঽসৃজত। [অ ৬, ২, ৩]।

টীকা।—তৎ (পূর্ব্বোক্তং **সদ্‌বস্তু**) ঐক্ষত (ঈক্ষাং কৃতবৎ পূর্ব্বকল্পম্ অপশ্যৎ যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ অমনুত ঐচ্ছৎ) [অহং] বহুস্যাম্ (ভবেয়ম্) প্রজায়েয় (প্রত্যক্ষং জায়েয় বিচিত্ররূপেণ উৎপদ্যেয় স্থূলরূপেণ ব্যক্তীভূতং ভবেয়ম্) [তদনন্তরং] তৎ (সৎস্বরূপং ব্রহ্ম) [প্রথমদৃশ্যমানং] তেজঃ অসৃজত (তেজোরূপম্ অকল্পয়ৎ স্বং তেজোরূপম্ ঐক্ষত, সাক্ষিরূপেণ স্বং তেজোরূপম্ অপশ্যৎ, তেজোরূপম্ অজায়ত, তেজোরূপেণ ব্যক্তীভাবং প্রাপ্নোৎ, তেজোরূপেণ ব্যবর্ত্তত আবির্বভূব)।

অর্থ।—সেই **সদ্‌বস্তু** [স্বীয় পূর্ব্বকল্পের] সাক্ষিরূপে মনন করিলেন (তাঁহার এই কল্পনা আসিল)—"আমার [এখন] বহু হইতে হয়, প্রত্যক্ষ স্থূলরূপে জন্মিতে হয়।" [তদনন্তর] সেই **সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম** [প্রথম দৃশ্যমান বস্তু] তেজ সৃষ্টি করিলেন (স্বীয় তেজোরূপের কল্পনা করিলেন —সাক্ষিরূপে নিজকে তেজোরূপ দর্শন করিলেন— আপনার নিকট আপনি তেজোরূপে দেখা দিলেন —তেজোরূপে বিবর্ত্তিত বা আবির্ভূত হইলেন)।*

বিবৃতি।—'ঈক্ষণ' শব্দের মূল অর্থ দর্শন। তিনি (সেই জ্ঞান বা চিৎস্বরূপ পরমাত্মা) বিশ্বজ্ঞানরূপ নিজকে—সুপ্ত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিকে—প্রকাশ করিলেন; তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির প্রকাশ রূপ **স্ব-ভাবই** 'ঈক্ষণ' (দর্শন, সাক্ষিত্ব, সংকল্প বা ইচ্ছা) রূপে প্রকাশ পাইল। বস্তুতঃ তাঁহার যে জ্ঞান, ঈক্ষণ, সংকল্প বা ইচ্ছা, ইহাই তাঁহার **স্ব-ভাব**। তিনি তাঁহার প্রলয়ে-সুপ্ত শক্তিকে ঈক্ষণ করিয়াই সর্ব্বসাক্ষী হইলেন। প্রলয়ে সর্ব্বগুণ বা শক্তির সম্যক সুপ্তাবস্থায় যে নির্গুণ সত্তা (**সৎ**) মাত্র বর্ত্তমান থাকে তাহাই তাঁহার **স্ব-রূপ** (মায়াতীত—গুণাতীত পরব্রহ্মরূপ); আর প্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে এই ঈক্ষণই তাঁহার সেই (**সচ্চিৎ**) স্ব-রূপের ভাব-প্রকাশ, এইজন্য এই 'ঈক্ষণ' (সাক্ষিত্ব, জগদ্-বোধ) বা সিসৃক্ষাকেই তাঁহার **স্ব-ভাব** বলা যায়। শ্রুতি এই স্থলে জগৎ কারণের এই ঈক্ষণ-শক্তি পুনঃপুনঃই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি পাঠ কর; উপর্যুক্ত বাক্যের অব্যবহিত পরেই আছে—

(আ)। **ছান্দোগ্যে**—

২। তৎ তেজ **ঐক্ষত** বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তদ্ অপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদ্ অধ্যাপো জায়ন্তে। [অ, ৬, ২, ৩]।

* ইহাই আদিত্য বা সূর্য্যসৃষ্টি। গায়ত্রী সন্ধ্যার অঘমর্ষণ মন্ত্রে দেখ, প্রথমেই সূর্য্যসৃষ্টির কথা আছে—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ।" শ্রুতিতে অন্যত্রও তাহা আছে, যথাস্থানে দেখিতে পাইবে।

৩। তা আপ **ঐক্ষন্ত** বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েম হীতি। তা অন্নম্ অসৃজন্ত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদ্ এব ভূয়িষ্ঠম্ অন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদ্ অধ্যন্নাদ্যং জায়তে। [অ, ৬, ২, ৪]।

৪। তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্ ইতি।

[অ, ৬, ৩, ১]।

৫। সেয়ং **দেবতৈক্ষত** হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব **জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য** নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

[অ, ৬, ৩, ২]।

৬। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণীতি। সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব **জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য** নামরূপে ব্যাকরোৎ। [অ, ৬, ৩, ৩]।

টীকা।—২। [তস্য সৎস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ তেজোরূপেণ আবির্ভাবানন্তরং] তৎ (ব্রহ্ম-স্বভাবভূতং) তেজঃ (তেজ-উপহিতং চিদ্ বস্তু) ঐক্ষত প্রজায়েয়েতি (স্থূলতর রূপেণ জায়েয় ইতি)…। তস্মাৎ যত্র ক্ব চ (যত্র কুত্রচিৎ যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ দেশে কালে বা) পুরুষঃ শোচতি (মনস্**তাপেন** শোকং করোতি ক্রন্দতি) বা (কিংবা) স্বেদতে (দেহ**তাপেন** ঘর্মাক্তঃ ভবতি), তৎ (তত্র দেশে কালে) তেজসঃ এব অধি (বিবর্ত্তনাৎ রূপান্তরেণ) আপঃ জায়ন্তে (আবির্ভবন্তি)।

৩। বহ্ব্যঃ (বহু+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে, বহুবচনে বহ্ব্যঃ অনেকাঃ)। অন্নম্ (ভোগ্যম্ স্থূলবস্তুজাতম্ পৃথ্বীভূতম্)। বর্ষতি (বৃষ্টির্ভবতি)। তদ্ এব (তত্র এব)। ভূয়িষ্ঠং (প্রচুরতমম্) অন্নং (পৃথ্বীবিকারং ব্রীহিযবাদিকম্) ভবতি। যতঃ ব্রীহিযবাদিকং পৃথ্বীরূপান্তরং মাত্রং ততঃ] তৎ (পৃথ্বীময়ম্) অন্নাদ্যম্ অদ্ভ্যঃ এব অধি-জায়তে (বিবর্ত্তরূপেণ আবির্ভবতি)।

৪। তেষাং (তেজোজলান্নানাং মধ্যে) খলু (নিশ্চিতম্) এষাং ভূতানাং (জীবানাং) ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি। জীবজং (জরায়ুজম্)।

৫। সা ইয়ং (তেজোসাদীনাং কারণভূতা সদাখ্যা চিৎ-স্বরূপা) দেবতা ঐক্ষত (সংকল্পং কৃতবতী)—হন্ত (উৎসাহসূচকম্—অত্রমূলভূত-সৃষ্টিমাত্রেণ বিবর্ত্তন-বিবর্তা ন ভূতা ইতি ভাবঃ) অহম্ [পূর্ব্বকল্পবৎ] অনেন (অতদ্‌বিকারভূতেন ভূতত্রয়রূপ-বিকারাবশিষ্টেন) **জীবেন** (জীবত্বাভিমানিনা প্রাণাভিমানিনা অহংবোধশীলেন) **আত্মনা** (আত্মবোধরূপেণ নিজবোধরূপেণ **স্বরূপভূত** চৈতন্যময়েন ভাবেন) ইমাঃ (তেজোজলান্নরূপাঃ **স্বভাবভূতাঃ**) তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য (প্রতিভূত সৃষ্টানন্তরং তং তং ভূতং প্রবিশ্য—গূঢ়রূপেণ অন্তঃ প্রবিষ্টা সতী) নামরূপে ব্যাকরবাণি (বিচিত্রসৃষ্টিসম্পাদনার্থং ভেদসূচকে নামরূপে বিদধানি) ইতি। *

৬। তাসাং (তেজোজলান্নরূপাণাং দেবতানাং তেজসাদীনাং ভূতানাং) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ভাগপূর্ব্বকং তিসৃভিঃ তিসৃভিঃ মিশ্রীকৃতং ত্রিতয়াত্মকম্) একৈকাম্ (একাম্ একাং) করবাণি (বিদধানি) ইতি। সা ইয়ম্ (আদিকারণভূতা সচ্চিৎ-স্বরূপা) দেবতা অনেন (**স্বরূপভূতেন**) জীবেন আত্মনা এব ইমাঃ (**স্বভাবভূতাঃ**) তিস্রঃ দেবতাঃ (ত্রীণি মূলভূতানি) অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ (ভেদসূচকেন নামরূপেণ বিচিত্রসৃষ্টিং ব্যদধাৎ)।

অর্থ।—২। [সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের তেজো-

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। অ ৭।৪, ৫]।

এই অংশ এতৎসহ মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

রূপে আবির্ভাবের পর] সেই (ব্রহ্মস্বভাবভূত) তেজঃ (তেজ-উপহিত **চিদ্‌বস্তু**) মনন করিলেন—"বহু হওয়া যাউক, স্থূলতররূপে ব্যক্ত হওয়া যাউক"; [তখন] তিনি জলরাশি সৃষ্টি করিলেন (সংকল্প বলে জলরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন)। এই জন্যই যখনই কোন পুরুষ [মনস্তাপে] ক্রন্দন করে কিংবা [দেহতাপে] ঘর্ম্মাক্ত হয়, তখনই তেজের বিবর্ত্তনে (রূপান্তরে) জল দেখা দেয়।

৩। সেই (স্বভাবভূত) জল (জলোপহিত **চিৎ**) মনন করিলেন—"বহু হওয়া যাউক, স্থূলতররূপে ব্যক্ত হওয়া যাউক"; [তখন] তিনি অন্ন (স্থূলতম ভোগ্যবস্তু—পৃথ্বীভূত) সৃষ্টি করিলেন (সংকল্প বলে অন্ন বা পৃথ্বীরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন)। এই জন্য যখনই কোনস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তখনই সেখানে প্রচুর অন্নাদি উৎপন্ন হয়, [যেহেতু ব্রীহিযবাদি পৃথ্বীরই রূপান্তর মাত্র, অতএব] সেই (পৃথ্বীময়) [ধান্যযবাদি] অন্নসমূহ জলেরই বিবর্ত্তরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

৪। সেই তেজসাদি ভূতগণ মধ্যে নিশ্চয়ই এই প্রাণিগণের তিনপ্রকার বীজ হয়—অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ। [অচেতন তেজসাদি ভূতবর্গ হইতে এই চেতনাচেতনাত্মক সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইল? তাহা পরবর্ত্তী বচনদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে]—

৫। সেই (আদিভূত সৎ-চিৎ-স্বরূপ) দেবতা (ব্রহ্ম) [মূলভূত-সৃষ্টিমাত্রেই বিরত না হইয়া আরও উৎসাহের সহিত] মনন করিলেন—"বেশ বেশ! আমি [পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায়] এই (আমার অধিকারীভূত চৈতন্যময়) আত্মা দ্বারা [প্রাণাভিমানী অহংবোধশীল] জীবাত্মরূপে এই (তেজ, জল ও অন্নরূপ-স্বভাবভূত) তিন দেবতার মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, [বিচিত্র সৃষ্টিসম্পাদনার্থ ভেদসূচক] নাম ও রূপের বিধান করি।"

৬। "ঐ দেবতাত্রয়ের (ভূতত্রয়ের) প্রত্যেকটীকে ভাগপূর্ব্বক পরস্পর মিশ্রিত করিয়া ত্রিতয়াত্মক এক একটী [রূপবান্ স্থূলভূত] নির্ম্মাণ করা যাউক।" সেই (আদি কারণভূত সচ্চিৎস্বরূপ) এই দেবতা (ব্রহ্ম), এই (স্বভাবভূত) তিন দেবতার মধ্যে (প্রত্যেক মূল ভূতের সৃষ্টির পরই সেই সেই ভূতের মধ্যে) এই জীবাত্মরূপেই (স্বরূপভূত অহমভিমানী আত্মরূপেই) গূঢ় ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া [ভেদসূচক] নাম ও রূপ [সহকারে বিচিত্র-সৃষ্টির] বিধান করিলেন।

—শ্রীজ্ঞানানন্দ
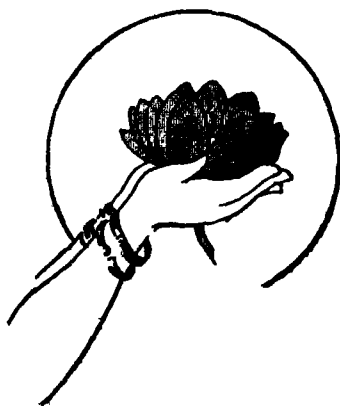
নানক-চয়ন

দ্বিতীয় গুচ্ছ

(জপজী হইতে)

ওঁকার সতিনামু করতা পুরখু নিরভউ
নিরবৈরু অকাল মূরতী অজুনী সৈভং গুরপ্রসাদী।

॥ জপু ॥

ওঁকার সতের [সদৈকরস সত্যের] নাম, [সেইসৎ] [সমস্ত বিশ্বের] কর্ত্তা, [চৈতন্যময়] পুরুষ, [তিনি] নির্ভয় [ভয়াতীত] [ও] নির্বৈর [বৈরভাবশূন্য], [তাঁহার] কালাতীত স্বরূপ, [কোন] জীব [হইতে] সৃষ্ট নহে [কারণ] তাহা স্বয়ম্ভু, গুরু প্রসাদে [তাহা লাভ হয়]।

॥ [এই মন্ত্র অর্থাৎ 'ওঁকার' হইতে 'গুর প্রসাদী' অবধি বার বার] জপ করিয়া যাও ॥

(১)

আদি সচু জুগাদি সচু।
হৈভি সচু নানক! হোসী ভি সচু ॥

আদিতে [যখন অন্য কিছুই থাকে না তখন] সত্যস্বরূপ, যুগ সৃষ্টির সময়েও সত্যস্বরূপ, সৃষ্টির পরও [বর্ত্তমানে] সত্যস্বরূপ, হে নানক! ভবিষ্যতেও [সৃষ্টি ধ্বংসের পর] সেই সত্য স্বরূপ [থাকেন]।

সোচই সোচি ন হোবই জে সোচো লাখবার।

[সেই সত্য অতি দুর্লভ কেবল] বিচারের দ্বারাই [তাহার উপলব্ধি] হইবে না। লক্ষ বার বিচার [দ্বারা তাহা অনুভব] করিবে।

চুপই চুপ ন হোবই জে লাই রহা লিব তার।

[আবার কেবল] মৌন থাকিলেও হইবে না, যে [কেবল মৌন থাকিয়াই] তাহার পথ গ্রহণ করিবে [অর্থাৎ সেই সত্যস্বরূপের অনুভবের পথে যাইবে]।

ভুখিয়া ভুখ ন উতরী জে বনা পুরিয়া ভার।

[হে] ক্ষুধাতুর! [তোমার] ক্ষুধার শান্তি [সংসারের ভোগের দ্বারা] হইবে না, যে সারা সংসার ভোগ [করিয়া তাহার নিবৃত্তি] করিবে। [কারণ তোমার ক্ষুধা সত্যের, তাহা লাভ না হইলে তোমার ক্ষুধা শান্তি হইবে না]।

সহস সিআণ পা লখ হোহি ত ইকন চলৈ নালি।

[হে চতুর তুমি চতুরতার দ্বারা তাহাকে পাইবে না] লক্ষ লক্ষ চতুরের মধ্যে একজনও সেই সত্যের নিকট যাইতে পারে না [কারণ সত্য লাভের চতুরতা তাহাদের নাই]।

কিব সচি আরা হোই এ কিব কুড়ৈ তুটে পালি।

[তবে] কি প্রকারে [সত্য লাভ করিয়া] সত্যময় হইব আর কি করিয়াই বা [আমার ও সত্যের মধ্যে যে অসত্যের ব্যবধান [রহিয়াছে তাহা] চূর্ণ হইবে?।

হুকমি রাজাই চলনা নানক। লিখিআ নালি ॥ ১॥

[হে] নানক। [সেই] সত্য-রাজের আদেশ মানিয়া চল [তবেই হইবে] সে আদেশ তোমার সমীপেই [হৃদয়ে] লিখিত আছে ॥ ১ ॥

(২)

হুকমী হোবনি আকার।

[তাঁহার] আদেশে [সমুদয়] সাকার বস্তু সৃষ্ট হয়।

হুকমু না কহিয়া যাই।

[সেই] আদেশ [এত গূঢ় যে] ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

হুকমী হোবনি জীঅ হুকমৈ মিলৈ বড়ি আই

[সেই] আদেশেই জীব [সৃষ্ট] হয় [আবার সেই] আদেশেই [জীবের মনুষ্যাদিরূপে] উন্নতি।

হুকমী উতমু নীচু, হুকমি লিখি দুখ সুখ পাই অহি।

[সেই আদেশেই] ভাল মন্দ যাহা কিছু [আর] [সেই] আদেশেই লিখিত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ।

ইক্না হুকমী বখসীস্, ইকি হুকমী সদা ভবাই অহি।

এক আদেশে [মুক্তিরূপ] পুরস্কার, আর এক আদেশে সদা ভবে আগমন [রূপ শাস্তি]।

হুকমৈ অন্দর সভুকো বাহরি হুকম না কোই।

সকলেই সেই আদেশ [চক্রের] মধ্যে, আদেশের বাহিরে কেহই নহে।

নানক! হুকমৈ জে বুঝেত হউমে কহে ন কোই ॥ ২ ॥

হে নানক। [এই ঈশ্বর] আদেশের মহিমা যাহারা বুঝিয়াছে তাহারা কেহই 'আমি বলিয়াছি' [ইত্যাদি অহঙ্কার সূচক বাক্য] বলে না ॥ ২ ॥

(৩)

গাবৈ কো তাণু হোবৈ কিসৈ তাণু।

কাহারও মধ্যে [পরমাত্মার] সুর আসিলে সে তখন সেই [পরমাত্মার ভজনরূপ] সুর আলাপ করে।

গাবৈ কো দাতি জানৈ নীসাণু।

কেহ বা তাঁহার দানের [পরিচয়] চিহ্ন [চারিদিকে] দেখিয়া [ভাবে বিভোর হইয়া] তাঁহার ভজন [আলাপ] করে।

গাবৈ কো গুণ বড়ি আইআ চার।

[এই ভজনমুখে] কেহ তাঁহার মহত্ব প্রকাশকারী [বিশেষ] গুণ ও লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করে।

গাবৈ কো বিদি আ বিখমু বীচারু।

কেহ বা অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া [সেই ভাবে তাঁহার] গান করে।

গাবৈ কো সাজি করে তনু খেহ।

কেহ গায় [পরমাত্মা] শরীর সৃষ্টি করিয়া [আবার তাহা] ধ্বংস করিয়া দেন [অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না]।

গাবৈ কো জীঅলৈ ফিরি দেহ।

কেহ গায় [তিনি] জীবন লইয়া [আবার] ফিরাইয়া দেন [অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়]।

গাবৈ জাপে কো দিসৈ দূরি।

গাবৈ কো বেখৈ হাদ্‌রা হদুরি।

কেহ গায় পরমাত্মা অতি দূরে, আবার কেহ বা গায় [যেন তাঁহাকে] অতি নিকটে [দেখিতেছে]।

কথনা কথী ন আবৈ তোটি

কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি।

[তাঁহার] কথা কহিয়া শেষ করা যায় না। কোটী [মনুষ্য] কোটী কোটী কাল কহিয়া [ফিরিলেও তাহার শেষ] হয় না।

দেদা দে লৈদে থকি পাহি।

[তাঁহার দান অফুরন্ত] তিনি [অনন্ত কাল ধরিয়া] দিয়া যান [শ্রান্ত হন না] [কিন্তু] যাহারা লয় [তাহারা এত পায় যে] শ্রান্ত হইয়া যায় [আর লইতে পারে না]।

জুগা জুগং তরি খাহী খাহি।

বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া [জীব তাঁহার দান] ভোগ করিতেছে।

হুকমী হুকমু চলাএ রাহু।

নানক! বিগসৈ বেপরবাহু ॥

আদেশ কর্ত্তার আদেশেই সবচালাইতেছে। [কিন্তু] হে নানক! তিনি সদা নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

(ক্রমশঃ)

— অচিন্ত্যানন্দ

প্রাচীন বাংলার বিদুষী নারী

শ্রীঅবনীমোহন গুপ্ত, এম-এ

রাণী নবকিশোরী

(খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী)

বরেন্দ্রভূমিতে 'চলন বিল' একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান রাজসাহী ও দিনাজপুর জেলাদ্বয়কে উত্তর দক্ষিণে স্পর্শ করিয়া ইহা অবস্থিত। ইহার দক্ষিণভাগে জায়গীর সান্যালগড় বা সাতোড় রাজ্য। উত্তরে ভাদুড়ী চক্র বা ভাদুড়িয়া রাজ্য। ভাদুড়িয়াগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন, তবে গৌড় বাদশাহকে বার্ষিক নামমাত্র একটাকা নর্মা দিতেন। সেইজন্য ভাদুড়ী চক্রের অপর নাম 'একটাকিয়া' হইয়াছিল। চলন বিল লইয়া একটাকিয়াদের সহিত সাতোড় রাজ্যের প্রায়ই বিবাদ হইত।

এই চলন বিলের মধ্যস্থিত এক দ্বীপে শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ নামক দুই বারেন্দ্র কায়স্থ বাস করিত। ইহাদের বাসস্থানের নাম হইয়াছিল "শ্যামারামার ভিটা"। ইহারা জলপথে দস্যুতা করিয়া দেশময় ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। "সাতোড়" বা "ভাদুড়িয়া" কেহই ইহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এমন কি স্বয়ং গৌড় বাদসাহ-ও নহে। ইহারা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত; কেবল ব্রাহ্মণ হইলে প্রাণে মারিত না, একখানা নববস্ত্র ও তিন কাহন কড়ি দিয়া বিদায় করিয়া দিত। ইহাদের অধীনে অসংখ্য লাঠিয়াল ও দস্যু ছিল।

সান্যালগড়ের জমীদার রাজা অবনীনাথ ইহাদিগকে দমন করিবার ইচ্ছায় ইহাদিগের গুরু কালীকিশোর আচার্য্যের শরণাপন্ন হয়েন। অবনীনাথ প্রস্তাব করেন: শ্যামা-রামাকে নাম মাত্র জমায় প্রভূত জমী দান করা হইবে এবং উভয় ভ্রাতা বার্ষিক ১০১, টাকা বেতনে অনুচর-বর্গ সহ তাঁহার সেনাদলে কার্য্য করিবে। কিন্তু তাহারা প্রতিজ্ঞা করিবে যে, আর কখনো দস্যুতা করিবে না, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে।" কালীকিশোরের মধ্যস্থতায় দস্যুদ্বয় এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। অবনীনাথ এই প্রকারে দুই দস্যুকে দলবল সহ স্বপক্ষে আনয়ন করেন।

ইহাতে ভাদুড়ী চক্রের গৌরব ও স্বার্থহানী দেখিয়া উক্ত রাজ্যের রাজা গণেশ নারায়ণ চলন বিল অর্দ্ধার্দ্ধি ভাগ করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইবার জন্য অবনীনাথকে পীড়াপীড়ি করেন। অবনীনাথ উহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধোদ্যম হইতে থাকে।

ইত্যবসরে কালীকিশোর রাজা গণেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "মহারাজ, যদি আমি এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি যাহাতে সাতোড় এবং ভাদুড়িয়া উভয় পক্ষের জয় হয়, উভয় পক্ষের গৌরব এবং স্বার্থ বৃদ্ধি হয়, অথচ যুদ্ধাদিতে অনর্থক লোকক্ষয় না হয়, তাহাতে আপনি স্বীকৃত আছেন কি না?" রাজা গণেশ স্বীকৃত হইয়া বলেন, "কি সে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া বলুন।" কালী কিশোর বলেন, "একবার আমি রাজা অবনীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি, তাহার পর বলিব।" তিনি অবনীনাথের নিকট গিয়াও উক্তরূপ প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার সম্মতি

পাইয়া বলেন, "আপনার কন্যা নবকিশোরীর সহিত রাজা গণেশ নারায়ণের একমাত্র পুত্র যদু নারায়ণের বিবাহ দিন এবং চলন বিলের উত্তরার্দ্ধ যৌতুক স্বরূপ জামাতাকে দান করুন। ইহাতে উভয় পক্ষের স্বার্থ ও গৌরব অক্ষুন্ন থাকিবে।"

উভয় রাজাই কুলীন ব্রাহ্মণ এবং আভিজাত্য গৌরবে উন্নত। অবনীনাথ বাৎস্য গোত্রীয় এবং গণেশ কাশ্যপ গোত্রীয়। যদু এবং নবকিশোরী উভয়েই পরম সুন্দর। সুতরাং সেই প্রস্তাব উভয় রাজাই সাগ্রহে স্বীকার করিলেন। যুদ্ধের পরিবর্ত্তে নৃত্য গীত বাদ্য মহোৎসবের সহিত যদু নারায়ণ সহ নবকিশোরীর বিবাহ হইল।

তখন শ্রীমতী নবকিশোরীর বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। তিনি যেরূপ সুরূপা তেমনি সুশীলা, বুদ্ধিমতী এবং বীর্য্যবতী ছিলেন।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবকিশোরী কোনরূপ দুঃখকষ্ট পান নাই। রাজ অন্তঃপুরে পরম সুখে ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া শিক্ষা করায় অপূর্ব্ব বিদুষীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনের ২৪ বৎসর স্বামীর আদর যত্ন ভিন্ন কখনো কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার পান নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের এক কঠোর পরিবর্ত্তন ও পরীক্ষার সময় আগত হয়। সে কথা পরে বলিতেছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে :— "ইলিয়াস শাহের বংশ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করে, এই সময়ে গণেশ নামে একজন হিন্দু জমীদার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং ইলিয়াস শাহের বংশধরগণকে সরাইয়া নিজে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়েই আবার বঙ্গদেশের সিংহাসনে দনুজমর্দ্দন দেব নামে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। ইনি উত্তর পশ্চিমে পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মত,এই যে .গণেশ নিজেই দনুজমর্দ্দন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের পুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে পরিচিত হন।" *

রাজা গণেশের সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড় বাদশাহ সৈফুদ্দিনের দুই পুত্র সামসুদ্দিন ও আজিম রাজ্য লইয়া বিবদমান হয়। আজিম গণেশকে সাহায্যার্থ নিজ পক্ষে বরণ করেন। উভয়ে বিভিন্ন পথে সামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে, আজিম স্বীয় অনবধানতা বশতঃ সামসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। গণেশ সামসুদ্দিনের বিরুদ্ধে যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিরত হয়েন নাই—সম্মুখ যুদ্ধে সামসুদ্দিনকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আজিম শাহের বেগম এবং কন্যা আসমান তারা রাজা গণেশের তত্ত্বাবধানে থাকেন। তিনি যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের সহিত গৌড়ের রাজ প্রাসাদে তাঁহাদিগকে সমাদরে রক্ষা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়াতে রাজা গণেশের অপর এক রাজধানী ছিল। পট্টমহিষী রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী সাধারণতঃ পাণ্ডুয়ার রাজ প্রাসাদে থাকিতেন। গণেশ গৌড়ে অবস্থান কালে রাজ কার্য্যার্থ অনেক সময় মুসলমান আদব কায়দা মানিয়া চলিতেন। কিন্তু পাণ্ডুয়াতে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের চালে চলিতেন।

গণেশের পুত্র যদু নারায়ণ ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। অর্ব্বাচীন যদু আজিম শাহের কন্যা আশমান তারার প্রতি আসক্ত। পিতার মৃত্যুর পর যদু কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমবেত করিয়া প্রশ্ন করেন, যবনীকে শুদ্ধিপূর্ব্বক হিন্দুরাণী

* ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার।

করা যায় কিনা এবং ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবহা করিতে পারে কি না?" পণ্ডিতগণ একবাক্যে উত্তর করেন, "কদাপি ন"! যবনীকে হিন্দুয়ানী করা যায় কিন্তু সে শূদ্রাণী হয়। ব্রাহ্মণের সহ তাহার বিবাহ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অসিদ্ধ।

যদু দেখিলেন, সনাতন ধর্ম্ম তাহার তথাকথিত রাজনীতি এবং দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে আদৌ স্বীকৃত নহে। সে অভিশপ্ত ধর্ম্ম বরং হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তুকে স্বহস্তে দূরে নিক্ষেপ করিবে তথাপি দুষ্ট ঋষিদিগের বিধান হইতে একতিল বিচলিত হইবে না।

কামান্ধ যুবক, যদু রাজা, এই প্রকারে নিজেই মুসলমান হইলেন এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করিলেন; সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি আশমান তারাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করেন।

সে সময়ে যদুর বৃদ্ধা মাতা রাণী ত্রিপুরা সুন্দরী, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী রাণী নবকিশোরী এবং এবং তাঁহার শিশুপুত্র অনুপ নারায়ণ পাণ্ডুয়াতে ছিলেন। যদুর এই অপকীর্ত্তির সংবাদ রাণীদিগের নিকট পঁহুছিলে, তীব্র করুণ রোদন ধ্বনিতে পাণ্ডুয়ার রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্তু রাণী নবকিশোরী দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠেন। রোদন পরিহার পূর্ব্বক তিনি শ্বশ্রূমাতা ত্রিপুরাসুন্দরী সহ সদল বলে গৌড়ে যাত্রা করেন।

যদু এদিকে সংবাদ পাইয়া আসমান তারাসহ গৌড় দুর্গে প্রচ্ছন্ন হইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দেন।

সৈন্য সামন্ত অমাত্য ভৃত্যবর্গসহ রাণীরা গৌড়ে আসিয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া স্তব্ধ হইলেন। লোকজন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং বিচলিত প্রায় হইল। ইত্যবসরে একটী ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। চকিতের ন্যায় সকলে দেখিল আলু-লায়িত কেশা কে বামা ভয়ঙ্করী, প্রজাদিগের পুরোভাগে গৌড়ের দুর্গদ্বারে খড়্গ হস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় দণ্ডায়মানা—দুঃখে ক্রোধে আত্মবিস্মৃতা রাণী নবকিশোরী কখন আসমান তারাকে কাটিতে বাহির হইয়াছেন। সকলে দেখিল দুর্গদ্বারে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যতা রাণী নবকিশোরী ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—পরে কি মনে করিয়া দশনাগ্রে জীহ্বা কর্ত্তন করিলেন। "এ যে আমার স্বামীর বিধান"—এই বলিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই ঘটনার পর হইতে নবকিশোরী স্বামী বা তৎ সম্পর্কীয় কাহারো উপর ক্রোধভাব পোষণ করেন নাই। এখন হইতে প্রবৃত্তি পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং জীবনকে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহার শাশুড়ী রাণী ত্রিপুরা কিন্তু সমস্ত সৈন্য, সামন্ত, ভৃত্য ও প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। উক্ত সভায় সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তিনি এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রমতে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ মৃত্যুতুল্য। যদুর ধর্ম্মত্যাগ ও জাতিনাশ হেতু সমস্ত স্বত্ব, নাশ হইয়াছে। এখন তৎপুত্র এই অনুপনারায়ণ প্রকৃত রাজ্যাধিকারী। আমি তাহাকে বাদশাহী প্রদান করিব। তোমরা আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হও। তোমরা পুরুষানুক্রমে স্বর্গীয় মহারাজার আশ্রিত ও পালিত। তোমাদের রক্ত মাংস তাঁহারই অন্নে গঠিত। নিমকহারাম হইও না, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কর। এই শিশুকে উপেক্ষা করিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে না।"

রাণী নবকিশোরী বক্তৃতাকালে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু স্বয়ং কিছু বলেন নাই।

সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইল, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যদুর দেওয়ান রাজা জীবন নারায়ণ রায় অনেক চিন্তা

করিয়া নিজ বক্তব্য বলিলেন—"রাণীমাতার বাক্য শাস্ত্র সঙ্গত সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল ব্যবস্থারই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মভ্রষ্ট রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে গেলে অনেক বৃথা লোকক্ষয় হইবে। এক্ষণে দেশমধ্যে মুসলমান অতি প্রবল। আপনার সেনাপতি ও সৈন্যের সারাংশ মুসলমান। মহারাজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাহারা তুষ্ট। যুদ্ধ বাধিলে তাহারা বিদ্রোহী হওয়াই সম্ভব; মহারাজ নিজে অতি বুদ্ধিমান, বীরপুরুষ। তিনি কেবল লজ্জাপ্রযুক্ত অন্তোগোপন করিয়া আছেন, ভীত হয়েন নাই। আপনারা তাঁহার বিরোধী হইলে অনেকের প্রাণনাশ এবং অবশিষ্টের ধর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে একটাকিয়ার জলপিণ্ড লোপ পাইবে। বিশেষ ভাদুরীচক্রই একটাকিয়ার প্রকৃত রাজ্য। আপনারা সেখানে অনুপকে রাজা করুন। তাহাতে বোধ হয় বাদশাহ আপত্তি করিবেন না—করিলেও ধর্ম্মতঃ আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে, এমন কি বিরুদ্ধাচরণ করিতেও প্রস্তুত। আশমানতারা গৌড় বাদশাহের কন্যা। তাঁহার সন্তানকে গৌড়ে বাদশাহী করিতে দিন। ইহাতে সবদিক রক্ষা হইবে এবং সর্ব্বতো মঙ্গল হইবে।"

সভাস্থ সকলে "সাধু, সাধু" বলিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিল। অগত্যা রাণীরাও ইহাই সৎপরামর্শ বিবেচনা করিলেন।

রাজা গণেশের পৈত্রিক রাজ্য ভাতুড়িয়ার রাজধানী সপ্তদুর্গা বা সাতগড়া চলন-বিলের উত্তর সীমান্তে একটী দ্বীপে অবস্থিত ছিল। রাণী-দিগের সাতগড়া গমনের জন্য ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গৌড়ের ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন এবং গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজপ্রাসাদস্থ যাবতীয় ধনরত্ন নৌকা জাত হইল। পরে বৃদ্ধা রাণী ত্রিপুরা জীবনরাওকে তোষাখানা (Treasury) খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। দেওয়ানজী নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া বাদশাহের নিকট এত্তেলা দিলেন। বাদশাহ বলিলেন—"তোষাখানা খুলিয়া দাও। রাণীমা'র যাহা যাহা ইচ্ছা লইয়া যাউন, কোন বাধা দিও না। যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র চলিয়া যান তাহার ব্যবস্থা কর।"

রাণীরা অনুপের জন্য কুবেরের ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া সাতগড়া যাত্রা করিলেন। যদু দূতদ্বারা মাতাকে প্রণাম পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী ত্রিপুরা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "যদু, যদু মরিয়াছে—এখন এই অনুপই আমার পুত্র, পৌত্র, সর্ব্বস্ব।" দূত ভীত হইয়া দূরে অপসরণ করিল।

রাণী ত্রিপুরা সাতগড়ায় আসিয়া, একটা-কিয়ার রাজারা গৌড়-বাদশাহকে যেরূপ নর্ম্ম্য (নজরানা) দিতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অনুপের অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনুপ যদুর কুশনির্ম্মিত মূর্ত্তি দাহ করিলেন এবং জাতিভ্রষ্টের শ্রাদ্ধ হয় না বলিয়া মস্তকমুণ্ডন ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেই অবধি রাণী নব-কিশোরী বৈধব্য আচরণ করিলেন এবং অলঙ্কার প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন কেবল হাতের শাঁখা ও লোহা খুলেন নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্র, পণ্ডিত বিধি বিধান কিছুই মানিলেন না।

এখন হইতে হবিষ্যান্ন ভোজন, ব্রত, উপবাস, জপ, পাঠ, ধ্যান ধারণায় নবকিশোরীর দিনাতিপাত হইতে লাগিল। সংসারের সম্পদ বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ, রাণী নবকিশোরীকে আঘাত করিয়া চলিল, কিন্তু পদ্মপত্রের ন্যায় তাহাকে সিক্ত করিতে পারিল না। ঈশ্বর প্রসাদে রাণী নবকিশোরীর মাতৃহৃদয়ের কোমলতা ও বীরহৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক্রমে সহজ হইয়া আসিল।

অনুপের ষোড়শ বর্ষ বয়সে রাণী ত্রিপুরা

তাহার বিবাহ ও রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিলেন। তিনি যদুকে কিছুই জানাইলেন না। কিন্তু নবকিশোরী ব্যঙ্গগাম্ভীর্য্য মিশ্রিত করিয়া বাদশাহকে নিম্নলিখিতরূপ নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন :—

"প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত জেলালুদ্দিন শাহ বাহাদুর রাজোন্নতিষু—লম্বা সেলাম পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

মৃত মহারাজা যদু নারায়ণ খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান অনুপনারায়াণ শর্ম্মা খাঁ সাহেবের শুভ বিবাহ ও ভাতুড়ী রাজ্যে অভিষেক হইবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হুজুরআলি বেগমসহ আগমন পূর্ব্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন এবং সময়োচিত সভাসৌষ্টব করিবেন। ইতি আজ্ঞাধীনা শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ।"

বাদশাহ পত্র পাইয়া মনে করিলেন, "যদুনারায়ণ এখন প্রকৃতই মৃত। এখন আর ব্রাহ্মণ হইতে পারিব না। বরং আত্মগ্লানি প্রকাশ করিলে মুসলমানেরাও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। এখন রাণী নবকিশোরীকে কি পত্রের উত্তর দেই, কি পাঠাই বা লিখি ?"

অনেক চিন্তা করিয়া নিজ পক্ষ হইতে উত্তর না দিয়া বেগমের পক্ষ হইতে উত্তর লিখিলেন—

"প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী নবকিশোরী দেবী বাহাদুরা রাজোন্নতিষু—
প্রণামা নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

শ্রীযুত বাদশাহের নামিক আপনার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান অনুপনারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুত বাদশাহ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষলাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশ নারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়ার দেবালয়ে এবং গৌড়ের মসজিদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ শ্রীযুত রাজা জীবনরায় দেওয়ানজীকে অভিষেক সামগ্রী সহ পাঠাইলাম। লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদসাহ নিজে যাইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি—আজ্ঞাধীনা শ্রীআশমান তারা বেগম।"

বিদুষী নবকিশোরী যদুর হস্তাক্ষর বিলক্ষণ চিনিতেন। স্বামীর প্রেরিত ঠাণ্ডা চিঠি তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব হর্ষ-বিষাদ উৎপন্ন করিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মনোভাব দমন করিয়া অনুপ-নারায়ণের অভিষেক উৎসব কার্য্যের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া ফেলিলেন।

অভিষেকান্তে রাণী নবকিশোরী নিজের সমুদয় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার একটি ঝালি পেটরা ভরিয়া আশমানতারাকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। তৎসহ এইরূপ একপত্র লিখিলেন :—

"সকল মঙ্গলালয়া শ্রীশ্রীমতী আশমানতারা বেগম বাহাদুরা রাজোন্নতিষু—
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

দেওয়ানজী সহ তোমার প্রেরিত দ্রব্যজাত যথাসময়ে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীমানের অভিষেক নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমি বিধবা, আমার শাড়ী ও অলঙ্কার অব্যবহার্য্য। অনুপের বধুকে রাণীমা সমস্তই নূতন তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমার বসন ভূষণ তোমাকে পাঠাইলাম। তুমি ভাগ্যবতী, তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক করিবে। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
শ্রীনবকিশোরী দেব্যাঃ

এতৎসহ নবকিশোরী বাদসাহকে একটি গজদন্তনির্ম্মিত কৌটা উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। বাদসাহ কৌটা খুলিয়া দেখেন তন্মধ্যে ভগ্ন শাঁখার টুকরা এবং ভূর্জ্জত্বক। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ শ্লোক লেখা আছে :—

"যবনীর তরে যদি স্বামী দেয় জাতি
কি পাঠ লিখিবে তাঁরে কহ গৌড়পতি।

* * * *

ধর্ম্মার্থে রমণীগণ পতিব্রতা হয়
ধর্ম্মার্থে কিশোরী পতি ছাড়ি দূরে রয়।
জীবিত থাকিতে পতি বিধবা কিশোরী
হেন অভাগিনী কেবা আছে মরি মরি॥"*

বাদসাহ পত্র পাইয়া নীরবে আত্মগ্লানি ভোগ করিলেন। যথাসময়ে পতিব্রতা নবকিশোরী, কঠোর হইতে কঠোরতর তপস্যা দ্বারা শরীর ক্ষয় করিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন।

* মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য

পুঁথি ও পত্র

১। শ্রীশ্রীমহাবিরাট যুগ লীলা বা শ্রীশ্রীদুর্গা চরণ নাগ মহাশয়ের জীবনী—শ্রীগুরু পদ ভৌমিক লিখিত—প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিজের বাড়ী দেওভোগ। মূল্য ১৲। লেখক এই পুস্তকে শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র লিখিত নাগ মহাশয়ের জীবনী "সর্ব্বৈব মিথ্যা" প্রমাণ করিয়াছেন। লেখকের মতে নাগ মহাশয়ের রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না, মাত্র দেখা শুনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার দায়িত্বশূন্য লেখায় তাঁহাকে পরমহংসের শিষ্যরূপে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন, ইহা "সর্ব্বৈবমিথ্যা"। নাগ মহাশয়, রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর যে অসংখ্য ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ একজন স্বতন্ত্র ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে নাগ মহশয়ের শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অধীনতা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহাতে কোনও তাৎপর্য্য নাই, মাত্র যেগুলি তাঁহার প্রশংসা সূচক সেগুলিতেই তার তাৎপর্য্য। আমরা শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্রের বই পড়ি নাই, অতএব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও মতামতও নাই; এবং লেখক অনেক আট ঘাট বাঁধিয়া যে শরৎ বাবুর পুস্তকের অনেক ঘটনার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কাহারটি সত্য এবং কাহারটি মিথ্যা তাহাও আমাদের পক্ষে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তবে তিনি যে লিখিয়াছেন, নাগ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ৺বঙ্ক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই তাঁহাদের গুরু বলেন এবং পূর্ব্বেই স্বপ্নে দীক্ষা পাইলেও পুনরায় সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা নেন—একথা শরৎ বাবুও তাঁহার "সাধু নাগ মহাশয়" নামক গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও লেখক জানেন। কিন্তু শিক্ষা গুরুকেও লোকে গুরু বলে, শরৎ বাবু নিশ্চিত এই ভাবেই রামকৃষ্ণকে নাগ মহাশয়ের গুরু বলিয়াছেন। তবে যদি লেখক বলেন, নাগ মহাশয়ের শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা লাভও "সর্ব্বৈব মিথ্যা" তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নাগ মহাশয়ের, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তে শ্মশানে যাওয়ার প্রতিবাদের সহিত, উহার কয়েক লাইন পূর্ব্বে যে নাগ মহাশয়, শ্রীরামকৃষ্ণ জিহ্বা-স্পর্শিত প্রসাদ পাইয়া, "প্রসাদ—প্রসাদ—মহা-প্রসাদ বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। খাইতে খাইতে পাতাখানি পর্য্যন্ত তাঁর উদরস্থ হইয়া গেল" এ কথাটীরও প্রতিবাদ না করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞার ছিদ্র রাখিলেন কেন? উক্ত ঘটনাটি আমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের নিকট শুনিয়াছি এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঐ প্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে নাগ মহাশয়কে দেন। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিজ্ঞার আর একটি রন্ধ্র রখিয়াছেন, সেটি স্বামী শিষ্য-সংবাদের উত্তর কাণ্ডের নবম বল্লীতে স্বামিজী ও নাগ মহাশয়ের মিলনের প্রতিবাদ না করিয়া। কারণ সেখানে নাগ মহাশয় স্বামিজীকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আজ দিব্য চক্ষে দেখচি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!" তৃতীয় রন্ধ্র হইতেছে, "সাধু নাগ মহাশয়" গ্রন্থের ১২২ পৃঃ নাগ মহাশয়ের "শেষ জন্ম না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে বিশ্বাস হয় না"—এ কথাটির প্রতিবাদ না করায়। এইরূপ চতুর্থাদি অনেক ফাঁকই আছে, সে গুলিও "সর্ব্বৈব মিথ্যা" বলিয়া তাঁহার প্রমাণ করা উচিত ছিল। আমরা নাগ মহাশয়কে রামকৃষ্ণাদির

স্থায় অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলেও, তাঁহার গার্হস্থ ধর্ম্মের আদর্শের তুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অপর কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবার নয়, ইহা স্বীকার করি।

২। **ছুতোরের ছেলে রাজা** শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মূল্য নয় আনা। সূত্রধর পুত্র এব্রাহীম লিঙ্কলন কিরূপে নিজ অদ্ভুত প্রতিভা এবং অধ্যাবসায় বলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি হইয়াছিলেন, এ পুস্তকখানি তাহারই বিবৃতি। প্রত্যেক বালক বালিকার এই পুস্তক পাঠ করা দরকার। এই লিঙ্কলন চরিত্র প্রত্যেক অবসাদ গ্রস্ত হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে।

৩। **বাঙ্গালার পল্লীসংস্কার ও বেকারের উপায়**—শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্ত প্রণীত পুস্তিকা—মূল্য দুই আনা—প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা টেলারিং একাডমী, ৭৮।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

৪। **চিন্তাধারা**—প্রণেতা শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কৃষ্টি-সম্পন্ন চিন্তাশীল মানবের মনে স্বভাবতঃ যে প্রকার চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, গ্রন্থকার তাহারই একটি আভাষ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তবে পুস্তকখানির বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ। পুস্তকের লিপিবদ্ধ বিষয় যদি আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এবং সুনিয়মে গ্রথিত হইত তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আরও সহজেই বোধগম্য হইত।

পুস্তকের ভাষা, ছাপা, ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক। মূল্য অত্যধিক।

পত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সহযোগিতার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বিশ্বের মনীষিবৃন্দ কিরূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুরাগের সহিত ঐ কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত **মহাত্মা** লিখিতেছেন—

প্রিয় বন্ধু,

ওয়ার্দ্ধা

আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের) পৃষ্ঠপোষক হইতে নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করি। আমি মাত্র একজন নগণ্য সেবক হইতে পারি।

১৩।১২।৩৪ আপনাদের অকপট (বন্ধু)

স্বাঃ এম, কে গান্ধী

* * *

বিশ্ব সাহিত্যিক **রোঁমা রোঁলা** লিখিতেছেন,—

সুইট্জারল্যাণ্ড

৮।১।৩৫

প্রিয় স্বামী—

* * শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী অনুষ্ঠান সমিতির সহঃ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া আমার পক্ষে পরম গৌরবের জিনিষ। এই মহাপুরুষের নামের সহিত আমার নাম যে কত অনুরাগ ও প্রীতির সহিত জড়িত করি, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন—একাধারে অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং সার্ব্বজনীন।

আমি ফ্রান্স হইতে প্রায়ই অনেকের চিঠি পাই এবং তাহা হইতে বুঝিতে পারি তাঁহার কথা ও উদাহরণ কেমন পাশ্চাত্য নরনারীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে

আমি প্যারিসের জনৈক চিকিৎসকের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইনি এলেক্স ইমান্থুয়েলের নামে একখানি চমৎকার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তিনি প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ধার্ম্মিক নরগণের জীবন কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতিকে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে আমি নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করিব।

(স্বাঃ) রোঁমা রোঁলা

* * *

—ডাঃ ইলাইট, প্যারিসের একজন বিখ্যাত নাগরিক এবং সাহিত্যিক লিখিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সমিতির সভ্য হইবার নিমিত্ত আহূত হওয়ায় আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত এবং আমার জীবনে এক মহৎ আনন্দ অনুভব করিতেছি। নিশ্চয়ই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাতে আমার সাহচর্য্য জ্ঞাপন করিতেছি। যদি আপনারা প্যারিসে আমাদ্বারা কিছু করিতে চাহেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আদেশ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির নিমিত্ত আমি অসম্ভব কার্য্যও করিতে পারি। তিনিই আমাকে জীবনের উদ্দেশ্য দান করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার একজন ভৃত্য।

(স্বাঃ) জে, ই, ইলাইট

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-প্রসাদ নিউ দিল্লী হইতে লিখিতেছেন।

আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে কার্য্যবিবরণী আমার নিকট পাঠাইয়াছেন সাধারণ ভাবে তাহার সকল কার্য্য-সূচীই আমি অনুমোদন করি। আমি সেই বিষয়টিতে আমার যথাসম্ভব সময় নিয়োগ করিতে প্রস্তুত যে বিষয়টিতে প্রত্যেক স্থলে দুঃখ কষ্টের আগমনের সহিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' নামটি ঘরোয়া শব্দরূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি সেবাকার্য্যের কথা বলিতেছি। যদি আপনারা যোগ্য মনে করেন, অর্থের নিমিত্ত যে কোন আবেদন পত্রে আমার নাম ব্যবহার করিতে পারেন।

১২।২।৩৫ (স্বাঃ) রাজেন্দ্র প্রসাদ

সংঘ ও বার্ত্তা

দিনাজপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ—বিগত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল দিনাজপুরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শততম জন্ম মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তদুপলক্ষে দিনাজপুর আশ্রমে শুভ পদার্পণ করিয়া ভক্তগণকে অশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। তাঁহার সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহারাজও সর্ব্বশেষে সকলকে তাঁহার শুভাশীষ জ্ঞাপন করেন। ৭ই তারিখে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। আশ্রমে ঐ দুইদিন ভজন, পাঠ, পূজা ইত্যাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মহারাজকে একটি অভিনন্দন পত্র দান করেন। ৯ই তিনি আশ্রম পরিচালিত সারদেশ্বরী বিদ্যামন্দির পরিদর্শন এবং ছাত্রছাত্রী সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই অল্প কয়েকদিনের অবস্থানেই তাঁহার সরল, অকপট, সকরুণ ব্যবহারে সহরের অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার—লণ্ডন হইতে মিস্ মারি বি ক্লার্ক ২৭।৩।৩৫ তারিখের পত্রে স্বামী অব্যক্তানন্দের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে স্বামী অব্যক্তানন্দ প্রায় ছয় মাস হইল এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ভারতীয় বেদান্তধর্ম্ম প্রচার ও পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞান শিক্ষা। মিসেস্ ম্যাডেলিন হার্ডিঞ্জ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আগমনের দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাশ আরম্ভ করেন এবং এখন তিনি সপ্তাহে তিনটি ক্লাশ করিতেছেন। স্বামী অব্যক্তানন্দ ইতিমধ্যেই মিসেস্ রাই ডেভিড্, থিয়সফিক্যাল

সোসাইটির সম্পাদক মিসেস্ জোসেফিন র‍্যানসম, ভারতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্বের লণ্ডন সমিতির সম্পাদক জজ ব্রিস্‌টো, মিঃ ষ্টার্ডি (যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকা হইতে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন) প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বিগত অক্টোবরে সর্ব্বপ্রথমে আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্ত সম্বন্ধে এবং পরে ঐ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। এক্ষণে তিনি একটি ধ্যানের ক্লাশও আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গেও পরিচিত হইয়াছেন এবং অর্থনীতি, শিল্পকলা, সমাজাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এই প্রচার কার্য্য তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণ ও ম্যাডেলিন হার্ডিঞ্জ, মিস্ ম্যাকলাউড্, মিস চিলডার্স এবং অপরাপর ইংরাজ বন্ধুগণের সাহায্যেই চলিতেছে।

শ্রীহট্টে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সমিতি—শ্রীহট্ট জিলায় সুনামগঞ্জ মহকুমায় যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় তদুদ্দেশ্যে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ মহারাজ শত বার্ষিকী সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

তিনি বিগত ২৫শে মার্চ্চ স্থানীয় টাউন হলে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুড়িতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মমহোৎসব—গত ১৭ই মার্চ্চ রবিবার এখানে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন ব্যাপী কীর্ত্তন, সভা ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রায় ৭ হাজার নরনারী যোগদান এবং তিন হাজার বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে Asst. School Inspectress শ্রীযুক্তা নিরুপমা সেন, এম-এ, বি-টি মহোদয়ার সভানেতৃত্বে বিরাট জনসভা হয়। সভায় স্বামী বিমলানন্দ, রংপুর কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। পরে সভানেত্রী তাঁহার লিখিত অভিভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও অনন্ত ভাবধারার বিস্তৃত আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবন:—সহরের হৈ চৈ হইতে দূরে, দমদমের উপকণ্ঠে নিরিবিলি গৌরীপুর পল্লীতে আশ্রমটি বিস্তীর্ণ ৯০ বিঘা জমির উপরে স্থাপিত। ১৯৩৪ সনে আশ্রমটি ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের সবটা অথবা আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ভজন পূজা ইত্যাদি ছেলেদের করণীয়। ছেলেরা যাহাতে শক্তিমান, স্বাবলম্বী, চরিত্রবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং ভগবন্মুখী হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহার জন্য আশ্রমের সামর্থ্যানুযায়ী কোনও প্রচেষ্টার ত্রুটি কখনও হয় না। ছেলেরা নিজেদের 'বাড়ীর মত স্বচ্ছন্দে থাকে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে ও প্রেরণায় আশ্রমটি আরম্ভ হয় এবং তাঁহার উৎসাহেই উহা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাঁহার দেহত্যাগে আশ্রমবাসিগণ ও পরিচালকগণ সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

বিগত বর্ষে ১৭টি ছেলে নূতন ভর্ত্তি হয়। ছাত্রেরা একটি হাতেলেখা মাসিক কাগজ চালায়। বিগতবর্ষে মোট জমা ১৯২১৪।/১০ পাই এবং মোট ব্যয় ১৫০৩০॥১ পাই। আমাদের মত গরীবদেশে এজাতীয় প্রতিষ্ঠান যে কত উপকারী, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতগণ এবং কলিকাতার বিশেষ নাগরিকগণ এই আশ্রমটি দেখিয়া অশেষ সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং এই রকম প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। এই আশ্রমের অনুকরণে বাংলার কয়েকটি জেলায় যে বিদ্যার্থিভবন সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা হইতেও আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। আশ্রমটি

ক্রমশঃ একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার আশা রাখে। আশা করি সহৃদয় জনসাধারণ এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিবেন।

মহামান্য ভারত সম্রাটের রজত-জুবিলী—

সম্রাটের রাজত্বের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বিগত ৬ই ও ৭ই মে, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করা হইয়াছে। প্রজার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রীরামচন্দ্রের দেশের জনবৃন্দ রাজা-প্রজার মধুর সম্বন্ধ ও আদর্শ কী তাহা অবগত আছে। তাই দেখা যায় ভারত ভারতী সর্ব্ব যুগেই রাজভক্ত থাকিবার গৌরব ও সুযোগ লাভ ইচ্ছা করে। আজ এই শুভদিনে শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা সম্রাট দীর্ঘ জীবন ও শান্তির অধিকারী হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী আবেদন

প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম ও অদ্ভুত সাধনার কথা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার "যত মত তত পথ" রূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী অল্পকাল মধ্যেই জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মনীষীই একবাক্যে তাঁহাকে জগতে কোন এক মহৎ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ অতিমানব বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী তাঁহাকে "ভারতের ৩০ কোটী মানবের সহস্র সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক সাধনারভাবঘনমূর্ত্তি এবং সমগ্র জগতের যুগযুগান্তরের আচরিত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মূর্ত্ত-সমন্বয়-প্রতীক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহামানবের পরিচয়কল্পে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আগামী ১৩৪২ সালে তাঁহার আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ণ হইবে। সেই সময়ে "বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায়" তাঁহার প্রাণপ্রদ উপদেশাবলী যাহাতে পৃথিবীময় প্রচারিত হইয়া জগতে যথার্থ সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে সাহায্য করে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। এই অনুষ্ঠান যাহাতে ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, সেইজন্য ১৯৩৪ সনের ২৫শে নভেম্বর বেলুড় মঠে একটী জনসভায় বিস্তৃত কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য আকস্মিক বিপদে পর্য্যুদস্ত জন-সাধারণের সাহায্যকল্পে সেবাকার্য্যের নিমিত্ত ও সাধারণের ভিতর কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা প্রচলনের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন, এবং জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীভাব সংঘটনার্থ একটী কৃষ্টি-ভবন প্রতিষ্ঠা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত একটী সাধারণ সমিতি, একটি কার্য্যকরী সমিতি, একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও কয়েকটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সাধারণ সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন। প্রত্যেক সদস্যের চাঁদার হার ন্যূনকল্পে ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

যাহাতে আমরা শতবার্ষিকীর পরিকল্পনা সর্ব্বোত্তভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হই, তদুদ্দেশ্যে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীকে আমরা সাধারণ সমিতির সদস্য হইতে এবং শতবার্ষিকী অর্থভাণ্ডারে যথাসম্ভব সাহায্য দান করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

এতদুদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) কোষাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী, পোঃ বেলুড় মঠ, জিঃ হাওড়া।

(২) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৪, ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ৮৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৫) ম্যানেজার, উদ্বোধন, ১, মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

অখণ্ডানন্দ
তেজ বহাদুর সাপ্রু
আন্নামেলাই চেট্টিয়ার
এম্, আর, জয়াকর
সি, পি, রামস্বামী আয়ার
এইচ্, রাধাকৃষ্ণন্
উ, সেট্, রেঙ্গুন
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি
এইচ্, ডবলিউ, দেশনায়ক, সিংহল

লালুভাই সমলদাস
বিজ্ঞানানন্দ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মদনমোহন মালব্য
রাজেন্দ্রপ্রসাদ
পি, সি, রায়
এম্, এন্, মুখার্জ্জি
রোমাঁ রোলাঁ
বদ্রিদাস গোয়েন্কা
শুদ্ধানন্দ
নীলরতন সরকার
এন্, সি, কেল্‌কার
হরিশঙ্কর পাল
এইচ্, এন্, গুহ
ডি, এন, মিত্র
হাজারিমল দুধুয়ালা
কে, নটরাজন্
এস্, জে, জিনোয়ালা
বিরজানন্দ

স্বামী ত্রিগুণাতীত

জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ অঃ মহাসমাধি—১৯১৫ খৃঃ অঃ

আষাঢ়—১৩৪২

ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে সকল ধর্ম্ম প্রণালী পৌরাণিক ভাব-বহুল ও অনুষ্ঠান প্রচুর সেই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন। যে সকল শুষ্ক গোঁড়ামীপূর্ণ ধর্ম্ম-প্রণালীতে, যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু ভগবৎপথে স্খলিতপদে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ সমুদয় ভাব-গুলিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চাহে, সেই সকল ধর্ম্ম শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে কেবল অন্তঃসারশূন্য একটি আধার মাত্র—অনন্ত শব্দরাশি ও তর্কাভাসের স্তূপ মাত্র, হয়ত একটু সামাজিক আবর্জ্জনা নিরাকরণ বা তথাকথিত সংস্কার প্রিয়তার গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

—বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-শত-বার্ষিকী

আজি হোতে বর্ষশত পূর্ব্বে তুমি যেদিন প্রথম
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-গৃহে হে বরেণ্য! লভিলে জনম,
সেই দিন—কে জানিত, জাতির এ কঙ্কাল-সংস্থান
তোমার আত্মার মাঝে ফিরে পাবে আপনার প্রাণ?
সেই দিন—জাতির সে পরম সুদিন—স্মরি আজি,
পূর্ণ শত বর্ষ পরে রেখে গেনু এই অর্ঘ্য সাজি
হে প্রভু! তোমার লাগি,
ভারতের দিব্য জন্ম মাগি।
আজ হোতে বর্ষ-শত পূর্ব্বে তুমি পূজারী যেদিন
আছিলে দক্ষিণেশ্বরে—ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি-সম দীন,
সেই দিন, হে জাতির যোগ্য পুরোহিত! কে জানিত,
স্থান তব যজ্ঞের সে পুরোভাগে আছে নিরূপিত?
যাজক যাচক নয়—স্মরি তাঁর কর্ত্তব্য মহান্,
শতবর্ষ পরে আজি রেখে গেনু সভক্তি প্রণাম
হে প্রভু! তোমার লাগি,
ভারতের দিব্য ভাগ্য মাগি।
আজি হোতে বর্ষশত পূর্ব্বে তুমি খেলিতে যেদিন
তুচ্ছ শত বাল্যখেলা, কে জানিত, কহ, সেই দিন,
শত শতাব্দীর পর, ভারতের প্রবুদ্ধ চেতন
রামমোহনের মাঝে পুনঃ সদ্যঃ লভিয়া জনম,

আপন কস্তুরী-গন্ধে লুব্ধ মুগ্ধ হারাইয়া দিশা,
খুঁজিয়া ফিরিতেছিল হেথা সেথা,—অনন্ত সে তৃষা!
বুঝি বা তোমারে মাগি,
প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্নে জাগি।
তারপর! ভারতের সে বিক্ষিপ্ত প্রবুদ্ধ সম্বিৎ
যেদিন তোমার মাঝে হে আত্মস্থ! শান্ত সমাহিত—
খুঁজে পেল—আপনার পরম সে রহস্য সন্ধান।
নাভি-মূলে কস্তুরি যে, হেথা সেথা বৃথা অভিযান—
বুঝিল যেদিন, সেই দিন!—স্মরি সেই শুভদিন,
আজি শতবর্ষ পরে রেখে গেনু অম্লান এ চিন
হে প্রভু! তোমার লাগি,
ভারতের নিত্য জয় মাগি।
হে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি না আসিতে, বিক্ষিপ্ত ভারত
নিজের অখণ্ড রূপ—সংহত সে শক্তির সম্পৎ
পারিত কি নিতে চিনি, তপঃশৌর্যে আত্মস্থ হইয়া?
শতচ্ছিন্ন—ছিল ভয়—যাইত সে ধূলিতে মিশিয়া।
হে নরেন্দ্র! স্মরি আজি তোমার সে দিব্য আবির্ভাব
পূর্ণ শতবর্ষ পরে রেখে গেনু মনের এ ভাব
হে প্রভু! তোমার লাগি,
ভারতের দিব্য ভাব মাগি!
যুগে যুগে যে যেখানে কোরেছিল যা কিছু সাধনা,—
বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত সে তপস্যার বিচিত্র ব্যঞ্জনা,
ঘুচাইয়া দেশ-কাল-পাত্রের এ শত ব্যবধান,
তোমার আত্মার মাঝে খুঁজে পেল প্রকাশের স্থান।
ভারতের হে পরম পরিপূর্ণ দিব্য সম্ভাবনা,
হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ! করি আজি তোমারে বন্দনা,
দিব্য ভারতের লাগি,
পূর্ণ শতবর্ষ পরে জাগি!
আগত বা অনাগত, অতীত বা আগামী দিনের—
মহা সমন্বয়-কেন্দ্র তুমি প্রভু! সর্ব্ব ভারতের!
তব মাঝে নিত্য হেরি ভারতের অতীত সাধনা,
তারি পাশে পুনঃ তার অনাগত সর্ব সম্ভাবনা।
প্রাচীন ও অর্বাচীন হেথা আসি গিয়াছে মিশিয়া!
তোমার অচিন্ত্য লীলা আজি প্রভু! স্মরিয়া স্মরিয়া
দুঃস্থ ভারতের লাগি,
নিত্য জয় তব ঠাঁই মাগি।
নাভি-শতদলে যার হে পদ্মজ! উদ্ভব তোমার,
কহ, প্রভু! বিশ্ব কবে পূর্ণ হবে সৌগন্ধে তাহার?
পূর্ণ তুমি, ধন্য তুমি, হে পরম অখণ্ড স্বরূপ!
তব মাঝে কহ, দেব! ভারতের হেরিব কী রূপ
আজি হোতে বর্ষ-শত পরে পুনঃ? ওগো নরবর!
ছন্দ মোর ঘুরে মরে ইঙ্গিতে সে জানিতে খবর।
হে প্রভু! তাহারি লাগি,
আত্মা মোর নিত্য রবে জাগি।

—শ্রীসাহাজী

* দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী জন্ম মহোৎসব সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা

১—৫—২৭ রবিবার

স্থান—বেলুড় মঠ

সু—বাবু, ন—বাবু আর আমি একত্রে মঠে পৌঁছিলাম। প্রথমে পূঃ কে—র সহিত দেখা হইল, তারপর মহাপুরুষের ঘরের দিকে চলিলাম। তিনি তখন খোকা মহারাজের ঘরে ছিলেন। জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিতে-ছিলেন—"Known and unknowable (জানা অজানা) যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই আমাদের ঋষিরা আরম্ভ করেছেন। West (পাশ্চাত্য) কিন্তু known and unknowable পর্য্যন্ত এসে থেমেছে। তারপর আর কি আছে তারা জানতে চায় না। তাদের God (ঈশ্বর) সম্বন্ধে ঐ পর্য্যন্তই ধারণা। স্বামিজী এই কথা বলতেন। এখন কিন্তু, উহারা বুঝতে ইচ্ছা করছে যে, ঐখানেই শেষ নয়, আরও আছে। উহারা materialist (জড়বাদী)। বড় materialist বলিয়াই শান্তি পাচ্ছে না।" উহার পর মহাপুরুষ কোন কারণে বাহিরে গেলেন। পথে একটী ছেলে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কি যেন বলিতেছিলেন। তাহার দু একটী কথা আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। কথাগুলি অমৃতমাখা। মহাপুরুষ মহারাজ—"তোমাদের খুব ভক্তি বিশ্বাস, প্রেম হউক। ····· তোমাদের হতেই হবে।" তিনি ফিরিয়া আসিলে অল্পই কথা হইল। সন্ধ্যা হইল। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

৮—৫—২৭ রবিবার

স্থান—বেলুড় মঠ, মহাপুরুষের গৃহ

৪টার সময় আমি উপস্থিত হইলাম। জনৈক ভদ্রলোক কলিকাতা হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সম্বন্ধে কথা তুলিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ—উহাও ভগবানের ইচ্ছা। মঙ্গলের জন্যই হইতেছে। হিন্দুরা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সব তারই চিহ্ন। এতে মঙ্গলই হবে।

ভবানীপুরের প্র—র ছেলের বয়স মাত্র ৪ বৎসর। এই বয়সেই সে চিত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ন—বাবু বলিলেন "এই সব পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। তা না হলে এত অল্প বয়সে (এরূপ) হওয়া অসম্ভব।" "তা, হবে অসম্ভব কি?" এমন সময়ে কয়েকটী মেয়ে ভক্ত আসিলেন। তাহাদের একজন খোকা মহারাজের নিকট দীক্ষিতা, ঢাকা বাড়ী। শালকিয়াতে কোন আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়াছেন। এই প্রথম দর্শন। মহাপুরুষজী তাঁহাদের সঙ্গে এমন অমায়িক ব্যবহার করিলেন, দেখিলে মনে হইবে কত কালের আত্মীয়া। এমন প্রাণ ঢালা ভালবাসা ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তের প্রতি, এমন আত্মীয়তা বোধ, ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। খোকা মহারাজ সেদিন মঠে ছিলেন না বলিয়া ভক্তটী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তার কিছুক্ষণ পরে আসিলেন মিসেস কুক। তিনি পূঃ শরৎ মহারাজের শিষ্যা। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন,—"মিসেস কুক, অন্য মিসেস্ বেণ্টলি এসেছিলেন। বড় ভাল লোক। তিনি এদেশে মেয়েদের প্রসূতি আগার সম্বন্ধে কিছু লিখবেন, তাই সব information gather (খবর যোগাড়) করবার জন্য এসেছিলেন। She really feels for Indian women (তিনি ভারতীয় মেয়েদের দুঃখ যথার্থ ই অনুভব করেন) ইত্যাদি।" আমরা প্রণাম করিয়া ৭-৩০ ষ্টীমারে বাসায়

ফিরিলাম। পথে বাগবাজারে পূঃ শরৎ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলাম।

২২—৫—২৭ রবিবার

যথারীতি মঠে পৌঁছিলাম—বেলা তখন ৪টা। মহাপুরুষের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অনেক ভক্তই উপস্থিত। নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ধর্ম্ম কথা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ বিদেশের কথা, হাসি তামাসা আবার পারিবারিক কথা, সবটাতেই তাঁহার সমান আনন্দ—'অ' কে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমাদেরও তোমাদের মত anxiety আছে, তবে সেটা কিরূপ জান? আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামিজীর জীবন দেখেছি, তাঁদের সমাধি অবস্থা দেখেছি, সেই সব দেখে ও নিজেরাও দেখে সব ঠিক হয়েছে। এমন একটা অবস্থা আছে, সেখানে কোন anxiety নেই—সেখানে সৃষ্টিই নেই, (সেটা) সৃষ্টির বাইরে। সেখানে আর কিছুই নেই, আছে কেবল শান্তি। এই যে সৃষ্টি দেখছ, এই ত বাহিরের। সেখানে কিছুই নেই। তাই আমরা সেখানে পৌঁছিলে আর আমাদের anxiety থাকে না। আমাদের anxiety এই মিশন সম্বন্ধেই কোন কোন সময়ে হয়। দিন দিন কাজ বেড়ে যাচ্ছে, নানা প্রকার জটিল কাজ আসছে, হয়ত বা কারো অসুখ, বাঁচবার আশা নেই—এসব আর কি।"

কথা প্রসঙ্গে

(আ-সমাধি মনের ক্রমবিকাশ ও সাধন)

বিগত ১৩৪১, শ্রাবণের কথা প্রসঙ্গে আমরা "যোগব্যাধি ও তাহার উপশম" সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এক্ষণে আমরা মনন ও ভক্তিযুক্ত শুদ্ধ মনের স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ হলে অভিজাত (সুনির্ম্মল) মণির (স্ফটিকের) মত গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎস্থিতা ও তদঞ্জনতা সমাপত্তি হয়। শেষের তিনটি কথার মানে,—তাতে অবস্থিত হয়ে তদাকারতা প্রাপ্তি হয়। যেমন স্ফটিকের পাশে যে রঙের ফুল রাখা যাবে স্ফটিকও ঠিক তেমনি আকার প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ স্ফটিক সদৃশ শুদ্ধ মনে সকল বস্তুরই স্বরূপ প্রকটিত হয়। ভাষ্যকার ব্যাস পাতঞ্জল দর্শনের ১।৪০ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলচেন, যখন শুদ্ধ মনে (ক) গ্রহীতৃ, (খ) গ্রহণ ও (গ) গ্রাহ্য পদার্থের ধ্যান করা যায়, তখন মন ঠিক ঠিক স্বরূপকে উপলব্ধি করে। (ক) গ্রহীতৃ বা দ্রষ্টা তিন অর্থে ব্যবহার হয়—(১) ঈশ্বর—শুদ্ধমনে ঈশ্বরের ধ্যান কালে তদাকারতা লাভ করে; (২) মুক্তপুরুষ—বুদ্ধ খৃষ্টের ধ্যান কালেও তাই ঘটে; এবং (৩) বুদ্ধিযুক্ত অহং—শুদ্ধচিত্তে ধ্যানকালে এদের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হয় অর্থাৎ অস্মিতা সমাধি লাভ করে। (খ) গ্রহণ বা করণ বা যন্ত্র দু প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়। বাহ্যেন্দ্রিয় আবার তিন প্রকার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণেন্দ্রিয়; আর অন্তরেন্দ্রিয় হচ্চে—মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্ত। শুদ্ধ মনে এদের ধ্যানকালে, এদের স্বরূপ ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায়। (গ) গ্রাহ্য বা বিষয় হলো ত্রিবিধ—(১) বিশ্বভেদ—অসংখ্য ঘটপটাদি ভৌতিক পদার্থ; (২) স্থূলভূত—ক্ষিতি প্রভৃতি; এবং (৩) সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দাদি তন্মাত্র।

শুদ্ধমনে ধ্যানকালে এদেরও স্বরূপ প্রকটিত হয়। এরপর শুদ্ধমনে সকল বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি কালে কোন্ শ্রেণীর সমাধি হয় এবং বস্তুর বিশ্লেষণ কিরূপ মনে ঘটে থাকে, তা বলা হচ্চে।

শুদ্ধমনে স্থূল বস্তুর যে জ্ঞান বিশ্লেষিত হয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করে, তাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বা মনের তদাকারতা বলে। আমাদের মনে বস্তুর শব্দার্থ জ্ঞানের বিকল্প জ্ঞান হয়। এখন এই শব্দ + অর্থ + জ্ঞানের বিকল্প জ্ঞান কী? গো একটি শব্দ, এর মধ্যে তিনটি জিনিষ সংকীর্ণ (মিশ্র) রয়েচে—(১) গো শব্দ, (২) গো অর্থ এবং (৩) ঐ উভয় (শব্দার্থ) দ্বারা নিষ্পন্ন গো-জ্ঞান। সাধারণতঃ গো-জ্ঞান যা আমাদের হয় তা অস্পষ্ট, এরই নাম বিকল্প। এই মিশ্র গো জ্ঞানের তিনটি অংশ থাকলেও, আমাদের সেটাকে অমিশ্র গো-জ্ঞান বলে বোধ হয়। কিন্তু শুদ্ধমনে যখন গো শব্দের জ্ঞান হয়, তখন তার শব্দ + অর্থ + জ্ঞান তিনটে বেশ স্পষ্ট করে বোধ হয়। এর নাম হলো সবিতর্ক সমাপত্তি।

স্মৃতি পরিশুদ্ধ হলে বাহ্য স্থূল বস্তুর যে চরম জ্ঞান, অর্থাৎ শব্দ (নাম)-হীন অর্থ মাত্র, তাহাই হয়; ঐ জ্ঞান স্বরূপ-শূন্য অর্থাৎ 'আমি জানচি' এরূপ ভাব থাকে না। এই নির্বিতর্ক সমাপত্তিকালে, বৌদ্ধেরা বলেন, "রূপী মন রূপকে শূন্য দেখেন,"—"রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্।" কিন্তু ঐ শূন্য অবস্তু নয়, অতি সূক্ষ্ম অবয়বী। বৌদ্ধেরাও এই সমাপত্তি, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ে অতিমাত্র স্থিতি হেতু, 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ ভাবের বিস্মৃতি এবং নামশূন্য অর্থজ্ঞান জন্য যে বস্তুর অরূপবৎ বোধ, মানে। কিন্তু শূন্যকে অভাব বলায় ঔপনিষদ্ দর্শনের সঙ্গে মেলে না। নির্বিতর্ক সমাধি দ্বারা যে বাহ্য স্থূলের চরম জ্ঞান তা এইরূপ—ঘট একটি অবয়বী, তার লক্ষণ নিম্নরূপ বলে বোধ হয়—এক মহৎ (বড়) বা অণু (ছোট), স্পর্শবান্ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য), ক্রিয়াধর্ম্মক (যার ক্রিয়া হেতু অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয় ও যা কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রাহ্য) এবং অনিত্য (যার আবির্ভাব তিরোভাব আছে)। এই শব্দহীন জ্ঞানের স্থূল অবস্থা শব্দযুক্ত ঘট।

পাতঞ্জল মতে নাম ও নামী (শব্দ ও অর্থ) পৃথক। কিন্তু বেদান্ত মতে অভেদ। তাঁরা বলেন, নির্বিতর্ক সমাধিকালে অবয়বী (ঘট) যে শব্দশূন্য বলে বোধ হয়, তা ঠিক নয়। শব্দের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম চারটি অবস্থা আছে। স্থূল শব্দ বা ধ্বনিকে বৈখরী বলে; কেবল চিন্তাকালে যে শব্দ উচ্চারণ তাকে বলে মধ্যমা; যে শব্দ-মূল স্বর ও ব্যঞ্জনকে বলে পশ্যন্তি এবং প্রকৃতি লীন অবস্থায় শব্দকে পরা বলে। নির্বিতর্ক সমাপত্তিকালে শব্দহীন অবয়ব থাকতে পারে না, সেখানেও এই মধ্যমা সূক্ষ্ম শব্দ থাকে। যতক্ষণ নামী বা অর্থ থাকবে, ততক্ষণ শব্দও থাকবে। অনাদিনিধন জ্ঞানাত্মক শব্দরাশিকে শূন্য বা অশব্দ বলে বোধ হয়, বাস্তবিক অবয়বী থাকলেই শব্দ বা নামও সেখানে নিশ্চিত আছে। যা হোক এর দ্বারা নির্ম্মল মনের সূক্ষ্ম-বিষয়া সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা সমাপত্তি ব্যাখ্যাত হলো। এখন আরও ভাল করে বোঝবার জন্য জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—বস্তু সম্বন্ধে সবিচার প্রজ্ঞা কী? না—যা অভিব্যক্ত ধর্ম্মক এবং নিজে সূক্ষ্ম হয়েও দেশ, কাল ও নিমিত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং আন্তর সূক্ষ্ম শব্দের দ্বারা মিশ্র। একটি ঘটের আন্তর সূক্ষ্ম সবিচার প্রজ্ঞাকালে, সেই ঘটের কারণীভূত সূক্ষ্ম উপাদান তন্মাত্র বর্ত্তমান কাল ও দেশাবচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু নির্ব্বিচার জ্ঞান কালে ঐ আন্তর সূক্ষ্মভূত বর্ত্তমান দেশকালাবচ্ছিন্ন না হয়ে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থার অর্থাৎ সর্ব্বদৈশিক ও কালিকরূপে প্রজ্ঞা হয়। কিন্তু সবিচার প্রজ্ঞা এক এক প্রকারের অর্থাৎ বর্ত্তমান দেশকালাবচ্ছিন্ন।

তা হলে সমাপত্তিগুলিকে নিম্নরূপে বিভাগ

করা যেতে পারে—(১) শব্দার্থ-জ্ঞানবিকল্প সংকীর্ণ স্থূল ঘট—সবিতর্কা (analytic concrete)—নাম, আকার, প্রকার, ইত্যাদি। (২) শব্দহীন স্বরূপশূন্য অর্থ মাত্র নির্ভাস স্থূল ঘট—নির্ব্বিতর্কা (analytic abstract)—গুণ মাত্র। (৩) শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ হতে দেশকালাবচ্ছিন্নভূত সূক্ষ্ম = (ক) গ্রাহ্য—ঘটপটাদি বিশ্বভেদ, স্থূলভূত, পঞ্চ তন্মাত্র ; (খ) গ্রহণ—তান্মাত্রিক বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় ; এবং (গ) গ্রহিতা—অহং + বুদ্ধি = সবিচার = শব্দ + অর্থ + তন্মাত্র + বর্ত্তমান দেশকালাবচ্ছিন্ন। (৪) শব্দহীন স্বরূপশূন্য অর্থমাত্র নির্ভাস—সূক্ষ্ম গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা—নির্ব্বিচার বা সানন্দ, সাস্মিতা—শব্দহীন সর্ব্বদৈশিক মহৎ-তত্ত্ব। এদেরই সবীজ সমাধি বলে। মোটের ওপর, স্থূল বিষয়ে—সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা ও সূক্ষ্ম বিষয়ে—সবিচার ও নির্বিচারা সমাপত্তি হয়ে থাকে।

যা লীন বা নাশ হয় তাকে লিঙ্গ বলে। যার নাশ নেই তাকে অলিঙ্গ বলে। অব্যক্তা প্রকৃতিই অলিঙ্গ। যত সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তার শেষ অলিঙ্গ 'প্রধান'। ক্ষিতির সূক্ষ্মাংশ গন্ধ তন্মাত্র, অপের রস তন্মাত্র, তেজের রূপ তন্মাত্র, বায়ুর স্পর্শ তন্মাত্র, আকাশের শব্দ তন্মাত্র। সবিতর্ক সমাধিতে স্থূল গন্ধের স্থূল শব্দযুক্ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়। নির্বিতর্ক সমাধিতে স্থূল গন্ধের শব্দশূন্য গন্ধমাত্র গুণধর্ম্মক অবস্থা অবগত হওয়া যায়। রসাদি পক্ষেও এইরূপ। সবিচার সমাধি কালে তন্মাত্র বা পরমাণুতে দৈশিক প্রভাব (space) কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন না ; কিন্তু সাংখ্য এবং বেদান্ত বলেন, পরমাণুতে দৈশিক প্রভাব অস্ফুট ভাবে আছে। তন্মাত্র বা পরমাণু জ্ঞানে কালিক প্রভাব (time) সকলেই স্বীকার করেন। সাংখ্য মতে এই তন্মাত্রের মূল হচ্ছে সূক্ষ্ম অহংকার, অহংকারের চেয়েও সূক্ষ্ম হচ্ছে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, আর মহৎ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হচ্ছেন অব্যক্তা প্রকৃতি। সাংখ্য মতে পুরুষ, প্রকৃতি হতে আর একটা পৃথক তত্ত্ব। বেদান্ত মতে—ব্রহ্ম হতে অভেদ মায়া শক্তি ব্রহ্মকে আবরণকরায় বিক্ষেপরূপ প্রথম যে ইদং মাত্র বিষয় তাহাই প্রকৃতি।

নির্বিচারা প্রজ্ঞায় বিশারদ হলে, অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ হয়। তাই ১।৪৭ যোগসূত্রে ভাষ্যকার ব্যাস বলচেন—অশুদ্ধ-আবরণ-মল-হীন, প্রকাশশীল বুদ্ধি, সত্ত্বরজস্তমের দ্বারা অনভিভূত, স্বচ্ছ-স্থিতি-প্রবাহকে বৈশারদী প্রজ্ঞা বলে। শৈলস্থ পুরুষ যেমন ভূমিস্থ ব্যক্তিদের দেখেন, তেমনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহন করে, নিজে অশোচ্য হয়ে শোক-কারীদের অবলোকন করেন। ওই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কালে যে জ্ঞান, তা অনুমানাদির মত। অনুমিতি ও আগম জন্য জ্ঞান সামান্য-বিষয়ক এবং প্রত্যক্ষ বিশেষ-বিষয়ক। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা সমাধিকালে এই বিশেষ জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎকর্ষ লাভ হয়। ঋতম্ভরা মানে, যা ঋত বা সত্যকেই একমাত্র ভরণ বা ধারণ করে।

আপ্ত এবং অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সমাধি-প্রাপ্ত জ্ঞান তা থেকে বিশেষ বলে ভিন্ন। মাত্র বাক্যার্থ জ্ঞান এবং অনুমানে ঠিক ঠিক বিশেষ জ্ঞান হয় না, সাধারণ একটা জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষের দ্বারাও বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয় না—মাত্র যেটুকু প্রতীয়মান হয় sense data, সেইটুকুই জ্ঞান হয়। বাস্তবিক কিন্তু প্রত্যক্ষও পরোক্ষ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত দ্রষ্টার ইন্দ্রিয় ব্যবধান থাকে। বেদান্তীরা বলেন, বেদের যথাথ অর্থজ্ঞান হলেই সত্যজ্ঞান হয়। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান বেদার্থ জ্ঞানের সহায়ক। যেমন একটা সূত্র পড়লুম—প্রথমটা একটা শব্দ উচ্চারণ হোল কিন্তু তার অর্থ অনভিব্যক্ত রইল। ক্রমে পদশক্তির দ্বারা একটা জ্ঞান হোল, কিন্তু তখনও যথার্থ অর্থ জ্ঞান হোল না। ক্রমে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি প্রভৃতি পদ সকলের পরস্পরের সম্বন্ধের দ্বারা

একটা জ্ঞান হলো ; কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ বলে বোধ হতে লাগলো, তারপর জহৎ, অজহৎ এবং জহদজহৎ প্রভৃতি লক্ষণা দ্বারা একটা অর্থ পাওয়া গেল। তারপর গ্রন্থকর্ত্তার মনোভাব অবগতির জন্য (১) গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি প্রভৃতির দ্বারা আরও স্পষ্ট অর্থজ্ঞান হয়। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সকল বা বেদান্তের সাধন-চতুষ্টয়ের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি আরও নির্ম্মল হলে, অর্থজ্ঞান আরও প্রকৃষ্ট হয় এবং শেষ সমাধির দ্বারাই বেদবাক্যের উৎকৃষ্ট অর্থজ্ঞান হয়। একজন শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বৈজ্ঞানিকের একটি বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বাক্য-জ্ঞান পৃথক। কিন্তু উভয়েই বাক্যদ্বারা অর্থজ্ঞান লাভ করে। অব্যক্ত সমাধিকালে, এই শব্দ পরা, নির্বিচারা ও সবিচারা সমাধিকালে ঐ শব্দ পশ্যন্তী, নির্বিতর্ক সবিতর্ক সমাধিকালে ঐ শব্দ মধ্যমা, আর ব্যবহার কালে বৈখরী।

তর্ক সম্বন্ধে অমীমাংসক দার্শনিকদের মত এইরূপ, "মীমাংসকদের মধ্যে আচার্য্য শংকরই শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতে, 'তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তা দিয়ে মূল জগৎ কারণ নির্ণয় করতে পারা যায় না ; কারণ একজন যা তর্কের দ্বারা স্থির করলে, তার চাইতে অধিক তর্ককুশল ব্যক্তি, তা নিরাস করে দিতে পারে। এ ভাবে কখনও কিছু স্থির হবার যো নেই।' কিন্তু ঠিক একই কারণে শংকরের তর্কের দ্বারা শ্রুত্যর্থ নির্ণয় করতে যাওয়া অন্যায় হয়েচে। কারণ তাঁ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁর তর্কজাল ছিন্ন করে শ্রুতির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করতে পারেন। অতএব শ্রুতির ব্যাখ্যাও অপ্রতিষ্ঠ।" কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, গ্রন্থের উপক্রম-উপসংহার না দেখলে গ্রন্থতাৎপর্য্য বোঝা যায় না, —যেমন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি। উক্ত যুক্তিতে শাংকর ভাষ্যের খানিকটা উদ্ধৃত করে খণ্ডন করা হয়েচে। এতদ্‌ ত্তরে আমরা জনৈক নৈয়ায়িকের বিচার এখানে উপস্থিত করতে পারি—

"বেদান্ত সূত্রে বেদ ব্যাস 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি' (২।১।১১) এই কথা বলিয়া পরেই আবার ঐ সূত্রেই বলিয়াছেন, 'অন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্য-বিমোক্ষপ্রসঙ্গ।' যদি বল অন্য প্রকারে অনুমান করিব, তাহা হইলেও অর্থাৎ অনুমান করিতে পারিলেও সেই অনুমান-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ শাস্ত্র নিরপেক্ষ কেবল-তর্ক-জন্য জ্ঞান মোক্ষ সাধন নহে। বেদব্যাস তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, এই কথা বলিয়া শেষে আবার ঐ কথা কেন বলিয়াছেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার আচার্য্য শংকর বলিয়াছেন যে, তর্ক মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে লোক-যাত্রার উচ্ছেদ হয়। পরন্তু যদি তর্ক মাত্রই অপ্রতিষ্ঠ হয়, অনুমাত্রেরই প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রই যে অপ্রতিষ্ঠ, ইহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবে? কতকগুলি তার্কিক অপ্রতিষ্ঠা দেখিয়া তদ্দৃষ্টান্তে তর্কের দ্বারাই অর্থাৎ অনুমানের দ্বারাই তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তর্ক মাত্রই যদি অপ্রতিষ্ঠ বা সন্দিগ্ধ-প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠাও তর্কের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। শংকর এইরূপ অনেক কথা বলিয়া তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাই বুঝাইয়াছেন। শেষে বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রমাণ সহকারী অনেক তর্কবিশেষও আবশ্যক, সুতরাং তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠ বলা যায় না, ইহাও বলিয়াছেন। উহা সমর্থন করিতে সেখানে পূর্ব্বোক্ত "প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ" ইত্যাদি মনুবচন দুইটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে গিরি মনুবচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মনুবচনে ধর্ম্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মও পরিগৃহীত। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয়ের ন্যায় ব্রহ্মনির্ণয়েও বেদশাস্ত্রের অবিরোধী

তর্ক আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম বেদান্তদর্শন বা শারীরক ভাষ্যে তর্কমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠ বলা হয় নাই। পরন্তু শাস্ত্রার্থ নির্ণয়ে অনুমান প্রমাণ ও প্রমাণ সহকারী তর্কবিশেষ আবশ্যক, ইহা আচার্য্য শংকর সমর্থনই করিয়াছেন।" শংকর বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের ১ম সূত্রের শেষে বলেছেন—"তস্মাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্ত-বাক্য--মীমাংসা-তদবিরোধি--তর্কোপকরণা প্রস্তূয়তে।" এর ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে বলছেন, "বেদান্ত-মীমাংসা তাবৎ তর্ক এব, তদবিরোধিনশ্চ যেঽধ্বরেঽপি তর্কা অধ্বর মীমাংসায়াং ন্যায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদি-প্রামাণ্য-পরিশোধনাদিযুক্তাস্তে উপকরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা।"

যা হোক, তজ্জঃ অর্থাৎ সমাধি থেকে যে প্রজ্ঞা লাভ হয়, তার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা নিরোধ-সংস্কার লাভ হয়। এই নিরোধ সংস্কার ব্যুত্থান বা সৃষ্টি-সংস্কারের বিরোধী। প্রথমে জ্ঞান হয়। তারপর সে বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষাদির দ্বারা ছাপ বা সংস্কার জন্মে। সংস্কার দু রকম—(১) জ্ঞান-সংস্কার এবং (২) ক্রিয়া-সংস্কার। কোনও বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান-সংস্কার যখন স্মরণ হয়, তখন তাকে স্মৃতি বলে। আর ক্রিয়া-সংস্কার যখন কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ হয়, তখন তাকে স্বারসিক চেষ্টা (automatic reflex) বলে। এই প্রজ্ঞাকৃত নিরোধ-সংস্কারও যখন নাশ হয়, তখন নির্বীজ সমাধি লাভ হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি হচ্ছে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত। তারপর অব্যাকৃত বা প্রকৃতিতে অবস্থানকালে প্রকৃতিলীন বা বিদেহ-সমাধি। এইসব সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা যখন চিতি-শক্তি অবলম্বনে নিরোধসংস্কার দ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং পরে নিরোধ সংস্কারও পুনঃ পুনঃ কৈবল্য বা আত্মস্থিতি হেতু আর থাকে না, তখন হলো একেবারে নির্বীজ সমাধি। নিরোধ স্থিতিরও কালক্রম অনুমান করা যায়--কাজেকাজেই তাহাও কালের বশবর্ত্তী, কাজেকাজেই তাহাও আত্মস্থিতির জন্য পরিত্যাজ্য। ঈশ্বর এই নিরোধ-সংস্কার কালীন নির্ম্মাণ-চিত্তের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং অবতারাদিরূপে আগমন করেন।

শুদ্ধ মনের শক্তি এই সমাধি পর্য্যন্ত সাধককে পৌঁছে দিয়ে, নিজে সরে পড়ে। প্রভুর ভাষায়, এ মন হলো "সত্ত্ব-গুণী ডাকাত।" এক্ষণে আমরা এই সমাধি লাভের সাধন সম্বন্ধে ধীরে ধীরে আলোচনার সহিত অগ্রসর হব। যোগশাস্ত্রে সাধনের প্রথম স্তর হচ্চে—তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান ও ক্রিয়াযোগ। (১) তপঃ—মনের ক্লেশ বা মল নাশ করবার জন্য এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি ও সেবার নিমিত্ত যে তপস্যা। যথা---ব্রত, উপবাস, মৌন, ধৈর্য্য, শীত, উষ্ণ সহ্য প্রভৃতি শারীরিক কৃচ্ছ্রতা। (২) স্বাধ্যায়—ইষ্টমন্ত্র জপ, মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন, স্তোত্র পাঠাদি। (৩) ঈশ্বর প্রণিধান—সমস্ত কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ ও ভক্তিভাবে তাঁর উপাসনা। (৪) ক্রিয়া যোগ—আসন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, ধ্যানাদি। ক্রিয়া-যোগ সেবা করলে সমাধি ভাবিত অর্থাৎ উদ্দীপিত এবং ক্লেশ-সংস্কার তনু অর্থাৎ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। যেমন একটা দেহের অঙ্গ ব্যবহার না করলে, তা শুকিয়ে যায়, তেমনি মনের বৃত্তি নিরোধ করতে করতে তা ক্ষীণ হয়ে আসে। যেমন "আমি শরীর" একে বলে ক্লিষ্টা সংস্কার। আর "আমি আত্মা বিভু" একে বলে অক্লিষ্টা সংস্কার বা বিদ্যা সংস্কার বা প্রজ্ঞাসংস্কার।

মনের ক্লেশ পঞ্চবিধ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। (১) অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তি বা অবিবেক যার জন্য মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়। যেমন, সিংহ-শিশু

মেষের সঙ্গে পালিত হয়ে মেষের মত হয়ে গিয়েছিল বা রাজপুত্র ব্যাধের নিকট পালিত হয়ে ব্যাধের মত হয়ে যায়। (২) অস্মিতা—অহং কর্ত্তা ভোক্তা—স্থূল এবং সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি। (৩) রাগ—সুখেতে আসক্তি। (৪) দ্বেষ—দুঃখে ঘৃণা। (৫) অভিনিবেশ—সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি। অবিদ্যাই হচ্ছে সকল ক্লেশের মূল ক্ষেত্র। অবিদ্যা থেকেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ জন্মায়। এই পঞ্চবিধ সংস্কারের চারটি অবস্থা আছে:—

১। প্রসুপ্ত—সংস্কার যখন বীজশক্তিরূপে থাকে। মনে হচ্ছে যেন আমার রাগ, দ্বেষ, অহং কিছু নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই জেগে উঠবে। যেমন বীজ জল বায়ু মাটি পেলেই অঙ্কুরিত হয়।

২। তনু—ক্রিয়া যোগের দ্বারা বা জ্ঞান বিচারের দ্বারা বা ভক্তিযোগের দ্বারা ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়ায় অবিদ্যা প্রসূত সকল সংস্কার ক্ষীণ বা তনুভাবে অবস্থান করে। আবার সংসারের একটা বিষয়ে মন থাকলে অন্য বিষয়ের সংস্কারগুলো প্রসুপ্ত বা তনুভাবে থাকে।

৩। বিচ্ছিন্ন—একটা বিষয়ে আসক্তিবশতঃ অন্য সংস্কারগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যেমন একটা বিষয়ে ব্যস্ত আছি বলে, সংসারের অন্যান্য বিষয়গুলি নেই বলে বোধ হয় কিন্তু তারা আছে—বিচ্ছিন্ন হয়ে সূক্ষ্মভাবে আছে।

(৪) উদার—যে সংস্কার লব্ধ-বৃত্তি হয়েছে, অর্থাৎ যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা কাজে ব্যস্ত আছি।

এখন এই অবিদ্যা কী? না, অনিত্যে নিত্য জ্ঞান, অশুচিতে শুচি জ্ঞান, দুঃখতে সুখ জ্ঞান, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান। অনিত্য কার্য্য যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, স্বর্গাদি নিত্য মনে করা। শরীর অশুচি তাতে শুচি বোধ। অশুচি কেন? না, শরীরের এই কটি দোষ আছে:—

(১) স্থান—অশুচি জরায়ুতে তার উৎপত্তি।

(২) বীজ—অশুচি শুক্র-শোণিতই দেহের কারণ।

(৩) উপষ্টম্ভ—অশুচি ভুক্তপদার্থের সংঘাতে শরীর পুষ্ট হয়।

(৪) নিস্যন্দ—অশুচি স্বেদ, মল, মূত্র শরীর থেকে বেরয়।

(৫) নিধন—মৃত্যু হলে শরীর অশুচি হয়।

(৬) আধেয়-শৌচত্ব—সর্ব্বদা পরিষ্কার না করলেই শরীর অশুচি হয়।

আমাদের যখন অনিত্যে নিত্য জ্ঞান হয়, তখন আমরা অভিনিবেশ বা তীব্র আসক্তি জন্য ক্লেশ পাই। অশুচি দেহে যখন শুচি জ্ঞান হয়, তখন রাগ ক্লেশ—ইন্দ্রিয় সুখভোগ হেতু ক্লেশ উপস্থিত হয়। দুঃখে যখন সুখ বোধ হয়, যেমন অপরের ওপর ক্রোধ দেখিয়ে নিজেদের বেশ সুখ বোধ হয়, তখন দ্বেষ বা ঘৃণা ক্লেশ উপস্থিত হয়। আর অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধ কালে, অস্মিতা (অহঙ্কার হেতু) ক্লেশ উপস্থিত হয়।

যোগ-শাস্ত্রে অবিদ্যাকে অখ্যাতিবাদ বলে। এ মতে আত্মা ও অনাত্মার বৈপরীত্য স্বীকৃত হয় না। এঁরা বলেন, রজ্জু ও সর্প দুটি বিপরীত বস্তু নয়, পরন্তু দুটি বিভিন্ন বস্তু। রজ্জুতে যে সর্প ভ্রান্তি তা অবিদ্যা নয়, বিপর্য্যয়। পক্ষান্তরে, বেদান্তীরা বলেন, রজ্জু-সর্প উদাহরণ ভ্রান্তি বোঝবার জন্য দৃষ্টান্ত, এ ব্রহ্ম ও জগৎ বোঝবার জন্য দৃষ্টান্ত নয়। এই ভ্রান্তি যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সৎ বলে বোধ হয়, কিন্তু ভ্রান্তি অপগত হলে অসৎ। সেই জন্য বেদান্তীদের অবিদ্যাকে অনির্ব্বচনীয়া খ্যাতি বলে। রজ্জু সর্প দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁরা ভ্রান্তি কালে মনে কীরূপ অবস্থা হয়, তাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন ভ্রান্তিকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ প্রত্যক্ষকালে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হওয়া চাই, কিন্তু মানুষ যখন রজ্জুতে সর্প দেখে, তখন সর্পের সহিত তার

ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয় না। কাজে-কাজেই সর্পকে মানস কল্পনা বলতে হয়। যদি বলা যায়, ঐ কল্পনা পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ সর্প-সংস্কারের স্মৃতি। না, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তিকে স্মৃতিও বলা যায় না, কারণ, যখন আমরা কোনও একটা বস্তুর স্মরণ করি, তখন তার সঙ্গে পূর্ব্বদৃষ্ট তার অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বস্তুও স্মৃতিপথে উদিত হয়। ধরুন, ঐ নন্দন পাহাড়টা দেখছি, এটাকে যখন কলকাতায় গিয়ে স্মরণ করব, তখন ওর পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলোও আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হবে। কিন্তু রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রান্তি হয়, তখন সর্প ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি যোগ-দার্শনিকেরা বলেন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান প্রমাণ ও স্মৃতি সাহায্যে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যা মিথ্যা তাতে প্রমাণের অভাব। তারপর সাহায্য ও কারণ এক বস্তু নয়। যেমন ফুলের টবের জন্য ঝুড়ি করে মাটি আনা হয়েছিল বলে ফুলের কারণ ঝুড়ি বলা চলে না। কাজেকাজেই ভ্রান্তির কারণ প্রমাণ বা স্মৃতি নয়,—অবিদ্যা। যোগ-শাস্ত্রের "অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ" শব্দের অর্থ – 'যা যা নয়, তাতে তাই বোধ'।

এক্ষণে অস্মিতা ক্লেশের বিবরণ লেখা হচ্ছে—দৃক্‌শক্তি (Subject) ও দর্শনশক্তির (Instrument) এক-আত্মতাই হচ্ছে অস্মিতা-ক্লেশ। দৃক্‌শক্তি হচ্ছেন শুদ্ধা জ্ঞানশক্তি আর দর্শনশক্তি হচ্ছে, সেই দৃক্‌শক্তি যখন বুদ্ধিরূপ অধিকরণে থেকে বিশেষ কোন বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। যেমন বিদ্যুতের কোনও বিশেষ আকার নেই কিন্তু বাল্‌বের তারের অনুযায়ী সে দীপ্ত হয়ে ওঠে। করণ বা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সঙ্গে যখন আত্মা বা শুদ্ধ জ্ঞানের অবিবেক বশতঃ ঐক্য বোধ হয়, তখন তাকে বলে অবিদ্যা। পঞ্চশিখ আচার্য্য বলেন, "আকার (সদা বিশুদ্ধি), বিদ্যা (চৈতন্যরূপতা), শীল (সাক্ষিস্বরূপতা) প্রভৃতি পুরুষ বা আত্মার লক্ষণ না জেনে যখন মানুষ অবিদ্যা বশতঃ বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করে, তখন তাকে অস্মিত ক্লেশ বলে।

তারপর রাগ ক্লেশ। সুখের সংস্কার স্মৃতিতে আরূঢ় হয়ে যখন মানুষের মনে আশয় অর্থাৎ গর্দ্ধ (স্পৃহা), তৃষ্ণা, লোভ এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে বলে রাগ। পরবর্ত্তী ক্লেশের নাম দ্বেষ। দুঃখের স্মৃতি হতে মানুষের মনে যে প্রতিঘা (প্রতিঘাতের ইচ্ছা), মন্যু (মানসিক ক্ষোভ), জিঘাংসা (হননেচ্ছা) উপস্থিত হয়, তখন তাকে বলে দ্বেষ। তারপর আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক প্রাণীরই, তা বিদ্বানই হোক আর অবিদ্বানই হোক, জাতমাত্র স্বাভাবিক 'আশীঃ' বা প্রার্থনা হচ্ছে, 'আমি যেন বেঁচে থাকি, না মরি।' কৃমি কীটেরও সর্ব্বদা এই মরণ ভয় দেখা যায়। জীবনের প্রতি এই মমতার নাম অভিনিবেশ। এই অনিত্য শরীরে যে নিত্যেচ্ছা এ-ই সকল আসক্তির মূল। মানুষের কার্য্য-কলাপ যদি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তা হলে দেখা যায়, তার সকল পরিশ্রমের মূলে এই জীবনেচ্ছা।

এই আশীঃ এবং অভিনিবেশই পুনর্জ্জন্মবাদের মূল সূত্র। আমাদের মনে, যদি পূর্ব্বে কোনও বিষয়ের অভিজ্ঞতা না হয়ে থাকে, তা কখনও উঠতে পারে না। তা হলে জন্মমাত্র শিশুর মনে এই মৃত্যুভয় ওঠে কী করে? তাই পূর্ব্বজন্ম মানতে হয়। যদি বলা যায় ঐ সংস্কার বাপ মা থেকে পুত্রে সংক্রামিত হয়, তা হলে বাপ মার সকল সংস্কারই পুত্রতে থাকত। তা ত দেখা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাপ মার সংস্কার এক রকম, ছেলে-মেয়ের সংস্কার আর এক রকমের। এক বাপ মার যমজ ছেলে, তারা বড় হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠলো। একই রকমের শিক্ষা এবং আচার ব্যবহারের মধ্যে রাখলেও ছেলে-পুলেদের হাব, ভাব, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য বিভিন্ন হয়ে পড়ে। তাই ইহ-জন্ম পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত সংস্কারের অধীন বলে স্বীকার করতে হয়।

তত্ত্বানুসন্ধান

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

আমাদের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, দার্শনিকগণ তাহা তিনটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। এই তিনটিই পরস্পর সাপেক্ষ,—পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয় হয়। জগৎ ও ঈশ্বরের সম্পর্কেই জীবের পরিচয়, জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্কেই জগতের পরিচয়, এবং জীব ও জগতের সম্পর্কেই ঈশ্বরের পরিচয় এই সম্পর্ক ব্যতীত কাহারও কোন পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না। কাহারও সম্পর্কে কিছু বলা, এমন কি, চিন্তা করাও সম্ভব হয় না। এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নিত্য বিদ্যমান, এই তিনটির সম্মিলিত সত্তাই পরিপূর্ণ সত্তা।

জীবের স্বরূপটি সহজভাবে 'আমি' বা 'অহং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। 'আমি' কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা। কর্ম্ম, ভোগ, জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি ব্যাপারের সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিতে হইলেই ইহাদের আশ্রয় রূপে একটা 'আমি' বা 'অহং'-এর ধারণা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কর্ত্তা ছাড়া কর্ম্ম হয় না, ভোক্তা ছাড়া ভোগ হয় না, জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়, ইত্যাদি। কর্ম্ম, ভোগ, জ্ঞানাদির যে আশ্রয়, সেই 'আমি', অহং বা জীব। আমার কর্ম্ম, ভোগ, জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতির আশ্রয় যেমন এই 'আমি', তেমনি অন্যত্র কর্ম্ম ভোগ জ্ঞানাদির বিদ্যমানতা অনুভব করি বলিয়াই সেই সব স্থলেও এক একটা 'আমি'র অস্তিত্ব উপলব্ধি গোচর হয়। এইরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার রাজ্যে অসংখ্য 'আমি'র সত্তা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং আমাদের জ্ঞানে জীব অসংখ্য। চৈতন্যই জীবমাত্রের প্রধান ধর্ম্ম বা লক্ষণ। চৈতন্য ব্যতীত কোন ব্যাপারের প্রকাশ হয় না, চৈতন্য ব্যতীত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না। চৈতন্যই সর্ব্ববিধ ব্যাপারের আশ্রয়। চৈতন্যধর্ম্মী অসংখ্য 'আমি',-সমূহই জীবতত্ত্ব।

পক্ষান্তরে, বিষয় ব্যতীত কর্ম্ম, ভোগ, জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, মনন প্রভৃতি ব্যাপারের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। কর্ম্ম হইতে হইলেই কার্য্য আবশ্যক, ভোগ হইতে হইলেই ভোগ্য আবশ্যক, জ্ঞান হইতে হইলেই জ্ঞেয় আবশ্যক, এইরূপ দর্শন শ্রবণ মননাদি হইতে হইলেই দৃশ্য, শ্রাব্য, মন্তব্য প্রভৃতি রূপে বিষয়ের সত্তা আবশ্যক। কার্য্য ভোগ্য জ্ঞেয়াদি বিষয় ব্যতীত কর্ম্ম ভোগ জ্ঞানাদি ব্যাপারের কোন অর্থই ধারণা করা যায় না। ব্যাপারের যেমন অসংখ্য প্রকার শ্রেণীভেদ, বিষয়েরও তেমনি অসংখ্য প্রকার শ্রেণীভেদ। এই বিষয়রাজ্যই 'জগৎ'-নামে অভিহিত হয়। অসংখ্য প্রকার-বিষয়-সমন্বিত দেশে কালে সুবিস্তৃত, সর্ব্বদিক্ প্রসারিত, অন্তরে বাহিরে অনুভূয়মান, কার্য্য, ভোগ্য, জ্ঞেয়, দৃশ্য, শ্রাব্য, চিন্তনীয় প্রভৃতি রূপে প্রকাশ্যমান এই বিশাল রাজ্যই 'জগৎ' বলিয়া পরিচিত। আশ্রয়ের ধর্ম্ম যেমন চৈতন্য, বিষয়ের ধর্ম্ম তেমনি জড়তা। জীব চেতন, জগৎ জড়। জীব প্রকাশক, জগৎ প্রকাশ্য। জীব স্থির, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আশ্রয়স্থানীয় জীবের নিত্যতা থাকাতেই বিষয়স্থানীয় সদা-পরিণামশীল জগতের ঐক্য তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে।

এই বিষয় জগৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন রূপে প্রতীয়মান হয়। স্থূল বিষয় সমূহের সহিত আশ্রয় স্থানীয় জীবের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য স্থূল ইন্দ্রিয় শক্তি বা বহিঃকরণ বিদ্যমান, সূক্ষ্ম বিষয় সমূহের সহিত জীবের সম্বন্ধের জন্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি বা অন্তঃকরণ বর্ত্তমান। বিষয় রাজ্যের কারণাবস্থা রূপ অব্যক্ত জগতের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কোন ইন্দ্রিয় বা করণ নাই, এবং এই সম্বন্ধ কি ভাবে হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক বিভিন্ন উপায়ে এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা আমাদের এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে। এই করণ সমূহও জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। জীব বা 'আমি' বিষয় ও করণের অতীত,—পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যময়।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানে জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধেই উভয়ের পরিচয় লাভ হয়। আশ্রয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত বিষয়ের কোন ধারণা হয় না, এবং বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত আশ্রয়ের কোন পরিচয় লাভ হয় না। কার্য্য ভোগ্যজ্ঞেয়াদি বিষয়ের কর্ত্তা ভোক্তা জ্ঞাতা প্রভৃতি রূপেই চেতন জীবের পরিচয় হয়, তদ্রূপেই আমার অস্তিত্ব আমি জানিতে, বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারি। নচেৎ আমার অস্তিত্ব ও স্বরূপ আমার নিকটও অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। বিষয় প্রতিফলিত হইয়াই আমার সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমার বোধোদয় হইয়া থাকে। আবার, আমার সম্বন্ধ ব্যতীত, আমার কার্য্য, ভোগ্য, জ্ঞেয়, অনুভাব্য প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত হওয়া ব্যতীত, বিষয় জগতের অস্তিত্ব ও স্বরূপ কল্পনাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং উভয়ের সত্তা ও স্বরূপ উভয়কে আশ্রয় করিয়াই বিদ্যমান।

অসংখ্য চেতন জীব বা 'অহং' এবং অসংখ্য জড় বিষয় বা 'ইদং' লইয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই চেতন জড়ময়—আশ্রয় বিষয়ময়—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ময়—ভোক্তৃ-ভোগ্যময়—কর্ত্তৃকার্য্যময় বিশাল বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান, যাঁহার দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে নিয়ন্ত্রিত ও অন্তিমে যাঁহার মধ্যে বিলীন হয়, এরূপ একজন অদ্বিতীয় পূর্ণ-চৈতন্যময় পরমপুরুষের সত্তা বিবিধ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তত্ত্ববিৎ দার্শনিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে;

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং পরমাত্মা স উচ্যতে॥

এই বিশ্বজগতে বিচারনিপুণ দৃষ্টির নিকটে অশেষবিধ ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাম্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য নিঃসংশয়রূপে প্রতীয়মান হয়, বিশ্বের প্রত্যেক বিভাগে ও প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে যে অখণ্ডনীয় নিয়মের রাজত্ব পরিদৃষ্ট হয়, ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও পরিণামের মধ্যে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়, উপরোক্ত সর্ব্বকারণ-কারণ অদ্বিতীয় মহাসত্তাকে স্বীকার না করিলে ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না, বিশ্বজগতের একটি সৌসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা করাও সম্ভব হয় না। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সত্তাতেই সকল জীব ও জড়ের সত্তা, তাঁহার ইচ্ছা দ্বারাই সকলের সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার স্বভাব নিহিত নিগূঢ় উদ্দেশ্যই জীব-জগতের মধ্যে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত ও সাধিত হইতেছে। তাহাতেই জীব-জগতে ভেদের মধ্যে অভেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে সাম্য, বিচিত্র পরিণামের মধ্যে একটি ঊর্দ্ধাভিমুখী গতি নিত্য বর্ত্তমান।

আমাদের জ্ঞানে জীব ও জগতের পরিচয় যেমন পরস্পরের সম্পর্কাধীন, ঈশ্বরের পরিচয়ও তেমনি জীব ও জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়াই থাকে। জ্ঞানী ভক্ত ও কর্ম্মী

মহাত্মাগণ তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বকল্যাণগুণাকর, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, কর্ম্ম-কর্ম্মফল বিধাতা, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং নানা ছন্দে, নানা সুরে, নানা ভাষায় তাঁহার অনুপম সর্ব্বাতীত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, এ সব বিশেষণই আপেক্ষিক। জীব ও জগতের সম্বন্ধ ব্যতীত কোনও বিশেষণেরই কোন অর্থ হয় না। জীব-জগতের সৃষ্টি-কর্ম্মে ব্যাপৃত বলিয়াই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। স্বকীয় সত্তা দ্বারা বা শক্তিদ্বারা বা ইচ্ছাদ্বারা তিনি জীব-জগতের সত্তা সুনিয়তভাবে নিত্য রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাকে স্থিতিকর্ত্তা বলা হয়। অন্তিমে সকল সৃষ্ট পদার্থকে আপনার ভিতরে অব্যক্তরূপে বিলীন করেন বলিয়াই তিনি প্রলয় কর্ত্তা রূপে বর্ণিত হন। দেশে কালে সীমাহীন অসংখ্য পদার্থ-রাজি সমন্বিত এই বিশাল বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ উপাধিতে ভূষিত হন। এই বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি স্থিতিগতি তাঁহার জ্ঞানে নিত্য প্রকাশিত বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বিশেষণ।

অবিদ্যাগ্রস্ত সংসার তাপক্লিষ্ট কর্ম্মফল প্রপীড়িত পাপপুণ্যে নিরত জীবগণ নিজেদের সম্পর্কেই এই বিশ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে কর্ম্ম-কর্ম্মফল বিধাতা, পাপের দণ্ডদাতা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, রাজাধিরাজ বলিয়া বর্ণনা করে। প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমপূত দৃষ্টিতে জীব-জগৎকে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় অবলোকন করিয়া, তাহার কারণরূপেই তাঁহাকে পরম সুন্দর, পরম মধুর বলিয়া ধ্যান ও আরাধনা করেন। জগতে পাপী তাপী দুঃখদৈন্যগ্রস্ত বেদনাভিভূত কৃপাভিখারী জীব বিদ্যমান আছে বলিয়াই তাঁহার দয়াময় অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভৃতি বিশেষণে গৌরবান্বিত হইবার হেতু বর্ত্তমান। বিচিত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব-জগতের সহিত সম্বন্ধ বাদ দিলে, ভগবানের সব বিশেষণ, সব শক্তি ও গুণের বর্ণনা, সব নাম ও রূপ, নিরর্থক হইয়া পড়ে। জীব ও জগতের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াই তাঁহার স্বরূপটি অনন্যসাধারণ জ্ঞান-গুণ-শক্তি-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—'অহং', 'ইদং' ও 'তৎ'—পরস্পরের সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট, এবং পরস্পরের সম্পর্কেই প্রত্যেকের স্ব-স্ব-স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। এই বিচার-দৃষ্টি অবলম্বন করিলে, বিশ্ব কারণ জীবজগদাশ্রয় নিরুপমগুণশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের সত্তা এক হিসাবে জীব ও জগতের সত্তার সহিত সমজাতীয় তত্ত্ববিচারে সত্তার প্রকারভেদ স্বীকার করিলে, পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও পরস্পরের সম্পর্কে পরিচিত সব তত্ত্বই সমসত্তা-বিশিষ্ট, সমক্ষেত্রে বিরাজমান। সুতরাং জীব ও জগতের সহিত সম্পর্কান্বিত ও তৎসম্পর্কে পরিচিত বিচিত্রোপাধিভূষিত শ্রীভগবান সত্তা হিসাবে জীব ও জগতের সহিত—'অহং' ও 'ইদং'এর সহিত—সমান ভূমিতে বিরাজমান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হইতেই বিচারশীল মানবসমাজে নানাপ্রকার দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, নানাজাতীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। জড় দেহেন্দ্রিয় ও জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত জীবের সত্তা ও স্বরূপের পরিচয় এই জগতে উপলব্ধিগোচর হয় না। জড় দেহেন্দ্রিয় অবলম্বনে ও জড় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধেই চেতন জীব আপনাকে জগতে অভিব্যক্ত করে। প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল দেহের নিত্য অপরিণামী আত্মারূপে বিরাজমান থাকিলেও, জীব দেহের সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া—দেহের ধর্ম্ম আপনাতে ও আপনার ধর্ম্ম দেহে

আরোপ করিয়া বিষয় জগতের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে। দৈহিক ধর্ম্মাবশিষ্ট জীব আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই—আপনার প্রয়োজনানুযায়িনী দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই—জগদ্‌-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করে এবং যখন বিচারশক্তির বিকাশ হয় ও ঈশ্বরের সত্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়, তখনও আপনাকে ও প্রত্যক্ষীভূত বিষয় জগৎকে কেন্দ্র করিয়াই তৎসম্পর্কান্বিত ঈশ্বরের স্বরূপ আলোচনা করে। বলা বাহুল্য যে, অসংখ্য জীবদেহের মধ্যে একমাত্র মানব দেহেই এই বিচার শক্তির উদ্বোধন হয়, একমাত্র মানব দেহেই জীবাত্মা আপনাকে বিষয় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট 'অহং'-রূপে সজ্ঞানে অনুভব করে, জগৎকে আপনার, দৃশ্য, ভোগ্য, কার্য্য, জ্ঞেয় প্রভৃতি রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এবং আপনার ও বিষয়জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা সর্ব্বকারণ কারণ একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণা-গোচর করিতে সক্ষম হয়।

মানুষের বিচারশক্তির ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে, জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা ও বিচার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত ও যে পরিমাণে দেহে তাঁর আত্মবোধ থাকে, এবং বাসনা কামনা দ্বারা তাহার বিচারশক্তি প্রভাবিত থাকে, সে পর্য্যন্ত ও সেই পরিমাণে দেহকে কেন্দ্র করিয়া ও বাসনা কামনাকে ভিত্তি করিয়াই জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ তাহার প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। বিচারশক্তিকে সর্ব্বপ্রকার বাসনা কামনা, সকল প্রকার সংস্কার ও আসক্তি, সকল প্রকার প্রয়োজন ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি হইতে মুক্ত করিয়া, বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন বিচার প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ঐসব তত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়, তাহা নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টাই দার্শনিক গবেষণার কার্য্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টাসত্ত্বেও বিচারশক্তি সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইতে না পারায় প্রায়শঃ সম্যক্ দৃষ্টি লাভ হয় না, এবং নানাপ্রকার মতভেদ স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়।

মানুষ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশাল বিষয়জগৎ আপনার সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পায় এবং স্বভাবতঃই তাহার বিচারশক্তির প্রচেষ্টা এই জগতের সহিত ক্রমশঃ নিবিড় ও ব্যাপক পরিচয় স্থাপনের দিকে ধাবিত হয়। তাহার জীবনের সাক্ষাৎ প্রয়োজনও এই বিষয় জগৎকে লইয়া। এই জগতেরই দ্রষ্টা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, মন্তা প্রভৃতি রূপে সে আপনার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করে, এবং এই জাগতিক পদার্থ ও ব্যাপার সমূহকেই বিশেষরূপে ও সম্যক্‌রূপে দেখিতে, জানিতে, ভোগ করিতে, চিন্তা করিতেও ইহাদের উপর আপনার ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে সে যত্নবান হয়। তাহার ভিতরে যে সব শক্তির জাগরণ হয়, জগৎই সেই সব শক্তির বিলাস ও প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র, উপাদান ও বিষয় তাহার নিকট উপস্থিত করে। সুতরাং জগতের সহিতই তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই জগতের সহিত সম্বন্ধেই মানবদেহধারী জীব ঈশ্বরের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে প্রয়াসী হয়। এই বিষয়জগৎ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ঈশ্বরের পরিচয় জীবের নিকট উপস্থিত করে এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধানও সৃষ্টি করে। অশেষ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাসমন্বিত এই বিশাল জগতের পরম কারণরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ অনুমান করিয়া, মানবাত্মা তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্—বিশ্বনাথ—বিশ্ববিধাতা প্রভৃতি অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য জ্ঞাপক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া চিন্তা করে। বিষয় জগতের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও অদ্ভুত শৃঙ্খলা বিশ্বকারণ ভগবানের অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, এবং অচিন্ত্যসৃষ্টিনৈপুণ্য ও শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করে। আবার,

এই পরিচয় দ্বারাই সূচিত হয় যে, এই জগতের একদিকে ভগবান্, অপরদিকে জীব,—এই ভবসাগরের দুই পারে দুই জন অবস্থিত, একের সহিত অন্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপলব্ধি গোচর হয় নাই। জীব জগৎকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, এবং ঈশ্বর জগতের মধ্যে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া জীবের নিকট পরোক্ষভাবে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। জগৎ জীবের নিকট যতদূর সত্য, জগৎ কারণ ঈশ্বরও তাহার নিকট ততদূর সত্য। জগৎকে বাদ দিয়া ঈশ্বরের কোন পরিচয় তাহার নিকট নাই।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ যখন আরো কিছু নিকটতর হয়, যখন বিষয়জগতের সম্পর্কে ভগবান্‌কে চিন্তা না করিয়া জীবরাজ্যের সম্পর্কে তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিবার যোগ্যতা হয়, তখন তাঁহাকে কর্ম্ম-কর্ম্মফল-বিধাতা, পাপের শাস্তিদাতা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, ন্যায়বান্ শাসনকর্ত্তা বলিয়া ধারণা করা হয়। এখানে অসংখ্য জীবের সম্পর্কেই মুখ্যতঃ ঈশ্বরের ধারণা, বিষয়জগতের সম্পর্ক এস্থলে গৌণ। এই প্রকার চিন্তাধারার মধ্যে, জাগতিক ব্যাপার সমূহেও যেন জীবকে কেন্দ্র করিয়াই সম্পাদিত হইতেছে, অসংখ্য জীবের কর্ম্ম ও ভোগ, সাধনা ও তাহার ফল সুনিয়তভাবে সৌসামঞ্জস্যের সহিত বিধান করিবার জন্যই বিষয়জগতের ব্যাপারসমূহ প্রয়োজনানুরূপ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, বিষয়জগতের যাবতীয় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার মূলে জীবরাজ্যের কর্ম্ম-কর্ম্মফল বিধান,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। জীবের জন্যই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, জীবের সঙ্গেই ঈশ্বরের মুখ্য সম্বন্ধ এবং জীবের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই তাঁহার জগদ্‌বিধান। কিন্তু এস্থলেও জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণই যেমন ভগবানের ভগবত্তার পরিচয়, তেমনি এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল—জীবের কর্তৃত্বাভিমান ও ভোক্তৃত্বাভিমান জীবের পুণ্যপাপ ও সুখদুঃখ—মধ্যস্থলে থাকিয়া ভগবানের সহিত জীবের ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অগণিত জীবের কর্ম্ম-কর্ম্মফল-বিধানের মধ্যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে, তাঁহার অপ্রমেয় জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য যেমন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেই ভাবেই আমরা তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাইতেছি। এ পরিচয়ও গৌণ পরিচয়, তাঁহার সহিত আমাদের এ সম্বন্ধও অব্যবহিত সম্বন্ধ নয়।

এই পরিচয় যখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়, তখন মানবাত্মা অনুভব করে যে, ঈশ্বর বাহির হইতে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ও দণ্ডবিধান করিয়া জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নিয়ন্ত্রিত এবং জাগতিক ব্যাপার সমূহ পরিচালিত করেন না। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভিতর হইতেই সব ব্যাপার পরিচালিত করেন। তিনি জীবেরও অন্তর্য্যামী এবং জগতেরও অন্তর্যামী। তিনি সকল আত্মার আত্মা—পরমাত্মা। জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বব্যাপী।

এই জগতে দেহাভিমানী মানবাত্মা আপনার প্রয়োজন সাধনের জন্য, কামনা বাসনা পূরণের জন্য, অভাব-অভিযোগের নিবৃত্তির জন্য, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সন্তাপের জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, আনন্দ সম্ভোগ ও দুঃখ পরিহারের জন্য, যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া, নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন ও ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, যখন নিজের দৈন্য ও অসামর্থ্য উপলব্ধি করিতে থাকে, নিজের শক্তি বুদ্ধির অল্পতা অনুভব করিতে থাকে এবং আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত একটা বিরাট্ শক্তির আনুকূল্যের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে, তখন তৎসম্পর্কেই সে ঈশ্বরকে পরম কারুণিক, অহেতুককৃপাসিন্ধু, শরণাগতবৎসল, বাঞ্ছাকল্পতরু

প্রভৃতি উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া আরাধনা করিতে অগ্রসর হয়। এইভাবে যখন ভগবান্‌কে চিন্তা ও উপলব্ধি করা যায়, মানবাত্মা যখন ভগবানের এবম্বিধ পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আগ্রহান্বিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিবিড়তর হয়, বিষয় জগৎ বা জীব-রাজ্যের সম্পর্কে ভগবানের যে পরিচয়, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া মানবাত্মা নিজের সম্পর্কে ভগবানের পরিচয় লাভে প্রয়াসী হয়। জীবের হৃদয়ের সঙ্গে যে ভগবদ্‌হৃদয়ের যোগ আছে, জীবের মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়া তাহার প্রতীকারের প্রতি ভগবানের যে সদয় দৃষ্টি আছে, ভগবান্ যে কেবলমাত্র হৃদয়হীন ন্যায়বান্ অসীমশক্তিশালী সৃষ্টিকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা নহেন, তিনি যে প্রাণের দরদী, তিনি যে জীবের দুঃখমোচন প্রয়াসী, জ্ঞানপ্রেমদাতা, মুক্তিবিধাতা,—এই পরিচয়টি যখন লাভ হয়, তখন তাঁহাকে আপন জন বলিয়া অনুভব হয়, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রেম সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে হৃদয় দান করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হয়।

কোন ব্যক্তির পিতৃত্ব যেমন তাহার সন্তান স্বীয় সন্তানত্বের অনুভূতি দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারে, সন্তানত্ববোধ বর্জ্জিত অপরের যেমন তাহার সেই পিতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই; তেমনি তাহার স্বামিত্ব যেমন তাহার পত্নী স্বীয় পত্নীত্বের অনুভূতি দ্বারাই অনুভব করিতে পারে, অপর রমণীর যেমন তাহার ভিতরে স্বামিত্ব উপলব্ধি করিবার অধিকার নাই, সেইরূপ মানবাত্মা আপনার দৈন্য ও অক্ষমতার উপলব্ধি সহ শরণাগতির অনুভূতি দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ নিহিত দয়াবত্তা, বাৎসল্য ও বাঞ্ছাকল্পতরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেই অনুভূতির অভাব থাকিলে, কেবলমাত্র বিচার সাহায্যে তাঁহার করুণা বা বাৎসল্যের উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারাই হৃদয়ের পরিচয় লাভ করা সম্ভব, ভালবাসার অনুভূতি দ্বারাই ভালবাসার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

সুতরাং ভগবান্‌কে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, ন্যায়বান্ ও কর্ম্ম-কর্ম্মফল-বিধাতা, বলিয়া জানা অপেক্ষা দয়াময় বলিয়া জানার মধ্যে জীব ও ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ও গভীরতর জ্ঞানের পরিচয় হয়। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এক্ষেত্রে ব্যবধান অল্পতর। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের তুলনায় এই জ্ঞান অপরোক্ষ। এস্থলে জীব যেন ভগবানের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার পরিচয় লাভ করিতেছে, বিষয় জগৎ ও অন্যান্য জীব সম্বন্ধীয় ব্যাপার সমূহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে অনুমান করিতেছে না।

ভগবানের এই স্বরূপের যখন পরিচয় লাভ হয়, তখন জীব জগৎ ও বিষয় জগতের দিকে চাহিয়াও সর্ব্বত্রই তাঁহার দয়ার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, জগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার মধ্যে এবং জীবের কর্ম্ম-কর্ম্মফল বিধানের মধ্যেও ভগবানের দয়াই কার্য্য করিতেছে, বিশ্বের যাবতীয় নিয়মই তাঁহার করুণার উৎস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি তখন করুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবকে তাহার আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি ও সংসারবন্ধন জ্বালা হইতে ক্রমশঃ মুক্তি দান করিবার উদ্দেশ্যে এবং সম্যক্ জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই জীব-জগৎ ও বিষয়-জগতের যাবতীয় নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই তখন উপলব্ধি গোচর হয়।

কিন্তু তখনও জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সকল ব্যবধান তিরোহিত হয় নাই। জীবের দৈন্য

ও অক্ষমতার অনুভূতি, তাহার দুঃখ ও পাপ হইতে মুক্তিলাভের প্রবৃত্তি, সকল জ্ঞান শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আধার ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ ও শরণাপত্তি, একদিকে যেমন ভগবানের করুণাময়ত্বের পরিচয় তাহার নিকট উপস্থিত করে, অন্যদিকে তাহার সহিত ভগবানের ব্যবধানও বহুত্বর সহিতই রক্ষা করে। জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব দুর্ব্বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, জীব মায়াধীন, পাশবদ্ধ, দুঃখ জ্বালাযন্ত্রণায় জর্জ্জরিত, এবং ঈশ্বর মায়াধীশ সর্ব্বপাশবিমুক্ত, নিত্য পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত। জীব কৃপার ভিখারী ঈশ্বর কৃপাসিন্ধু; ঈশ্বরের নিকট জীবের কোন দাবী নাই, ঈশ্বর করুণাবিগলিত হইয়া স্বশক্তিতে তাহার বাঞ্ছা পূরণ করেন এবং তাহার দুঃখ-পাপ-বিমুক্তির ব্যবস্থা করেন। জীব শরণাগত, ঈশ্বর শরণাগত বৎসল,—জীবকে আশ্রয় দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই পার্থক্যের অনুভূতি ব্যতীত ঈশ্বরের দয়ার অনুভূতি হয় না।

জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ যখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়, জীবের—বাসনা কামনা এবং তজ্জনিত পাপতাপ ও দুর্ব্বলতার অনুভূতি যখন তিরোহিত হয়—জীব যখন নিজের ঐহিক বা পারত্রিক, বৈষয়িক বা আধ্যাত্মিক, কোন প্রকার প্রয়োজন সাধন বা অভিলাষ পূরণের জন্য ঈশ্বরের শরণাগত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চায়, তখন ঈশ্বর জ্ঞানময় ও প্রেমময় স্বরূপে তাহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ঈশ্বর জীবকে ভালবাসেন,—জীব যে ঈশ্বরের আপনার জন, আপনার আত্ম-বিলাসক্ষেত্র, আত্মপ্রকাশ স্থল। আপনস্বরূপের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, গুণ ও শক্তি, আপনি সম্ভোগ করিবার নিমিত্তই তিনি অসংখ্য চেতন জীব আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অসংখ্যপ্রকার জাগতিক অবস্থার সহিত জড়িত করিয়া, তাহাদের সম্পর্কে আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ ও সম্ভোগ করিতেছেন। সব জীবই যদি জ্ঞানী, প্রেমিক ও আনন্দপূর্ণ হইত, তাহা হইলে ভগবৎস্বরূপের বিচিত্রভাবের বিলাস সম্ভব হইত না। সেই হেতুই জগতের মধ্যে জীব সমূহকে তিনি বিচিত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট, বিচিত্র অবস্থাপরিবেষ্টিত এবং জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের বিচিত্র স্তরে অবস্থিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই তাঁরই অংশ, তাঁরই খেলায় সহচর, তাঁরই ভাবের প্রকাশক। সুতরাং জীব যে নেহাৎ ক্ষুদ্র, তাঁর করুণার ভিখারী, তা নয়। তাঁহাকে ব্যতীত যেমন জীবের চলে না, জীব সমূহ ব্যতীত তাঁহারও চলে না। জীব ও ঈশ্বরে সর্ব্বত্র মাখামাখি। উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের সম্বন্ধ।

যে মানবাত্মা ভগবানের এই প্রেম স্বরূপত্ব উপলব্ধি করে, ভগবানের সঙ্গে নিজের ও জীবমাত্রের এই নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করে, তাহার নিকট ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিত্ব প্রভৃতি বিশেষণ সমূহ নিতান্ত গৌণ লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সব শক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তাহার নিকট বড় জিনিষ নয়, ইহা দ্বারা ভগবানের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হয় না। যে জীবের জ্ঞানে বিষয়-জগৎ যত বড়, তাহার নিকটই এই জগৎ-প্রসবিনী শক্তি, জগদ্বিষয়ক জ্ঞান, জগদধীশ্বরত্বের ঐশ্বর্য্য তত বড় বলিয়া প্রতীত হয়। আবার, যে সব জীব বাসনা কামনা দ্বারা এই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বদ্ধ আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে এবং নিজেদের ক্ষুদ্রতার আপকারির দ্বারা জগতের পরিচয়লাভে যত চেষ্টা করে, সেই সব জীবের নিকটই জগৎ তত বড় বলিয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ বাসনা কামনারই স্বরূপ এই বিশ্ব জগৎ। জাগতিক

বাসনা কামনা যত তিরোহিত হয়, জগৎ তত ছোট হইতে থাকে, অকিঞ্চিৎকর হইতে থাকে এবং জীব স্বয়ং তত বড় হইতে থাকে, তাহার জ্ঞানের মাপ-কাঠিও তত বড় হইতে থাকে। কামনাবাসনামুক্ত শুদ্ধ জীবের জ্ঞানে, জগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্যের সম্পর্কে ভগবানের ভগবত্তার যতটুকু প্রকাশ, তাহা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, জীবের অভাব অভিযোগের নিরাকরণ ও তাহাকে আশ্রয় দান সম্পর্কে ভগবানের ভগবত্তার যতটুকু প্রকাশ হয়, তাহাও বিশেষ মহিমান্বিত বোধ হয় না। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহারই মধ্যে ভগবানের ভগবত্তার যথার্থ প্রকাশ হয়। ঈশ্বর স্বরূপতঃ পূর্ণ সচ্চিদানন্দময়, এবং জীব ঈশ্বরেরই খণ্ড খণ্ড সচ্চিদানন্দঘনরূপে বহুধা আত্মপ্রকাশ। উভয়ের মধ্যে নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ। উভয়ে উভয়ের নিতান্ত আপন জন। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন সংকোচ নাই, কোন বাধা নাই, কোন কুণ্ঠা নাই। প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে বড় ছোটর ব্যবধান নাই।

বলা বাহুল্য যে, প্রেম ব্যতীত প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব নয়। জীব যখন নিজে সমস্ত অন্তঃকরণটিকে ভগবৎপ্রেমে ভরপুর করিতে পারে, তাহার দৃষ্টি যখন প্রেমপূত হয়, তখনই ভগবান্‌কে সে অখণ্ড প্রেমময় বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হয়। প্রেম অহেতুক আত্মদানকারী ও পরস্পর বশীকারী। প্রেমিক ভক্ত ভগবানের নিকটে কিছু চায় না; স্বভাবতঃ প্রাণের টানে ভগবানের নিকটে আত্ম-সমর্পণ করে এবং প্রেমের দৃষ্টিতে ভগবানের সব ব্যাপার নিরীক্ষণ ও সম্ভোগ করে। এই দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের প্রেমস্বরূপ প্রকটিত হয়, এবং তাঁর সব লীলা সুন্দর ও মধুর বলিয়া সে আস্বাদন করে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ভগবানেরই লীলাবিলাস বলিয়া নিরতিশয় সুন্দরী হইয়া উঠে। সর্বত্র সে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে। সে যেমন প্রেমে আত্মদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হইয়া যায়, ভগবান্‌ও প্রেমে তাঁহার নিকট আত্মদান করেন ও তাঁহার বশীভূত বলিয়া অনুভূত হন। জীবরাজ্যের ও বিষয়রাজ্যের যাবতীয় নিয়মশৃঙ্খলা ভগবানের প্রেমেরই উৎস হইতে প্রবাহিত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। প্রেম দ্বারাই সব গঠিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই প্রেমে জীবের চিত্ত যে ভাবে ভাবিত হয়, ভগবান্‌ও তদনুরূপ ভাবময় দেহেই তাহার নিকট প্রকাশিত হন। পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে, সখারূপে বা সখীরূপে, স্বামিরূপে বা স্ত্রীরূপে, পুত্ররূপে বা কন্যারূপে,—যে কোনরূপে প্রেমময় ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, এবং এই সব রূপের কোনটিই মিথ্যা বা কল্পনা নয়।

প্রেম যখন গাঢ় হইয়া মানবাত্মার সমগ্র সত্তাকে ভগবন্ময় করিয়া ফেলে, তখন সে নিজের সত্তা ও জগতের সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া একমাত্র ভগবানকেই অনুভব করিতে থাকে। তাহার অনুভূতিতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। একমাত্র সচ্চিৎপ্রেমানন্দঘন ভগবানই স্বমহিমায় নিত্যপরিপূর্ণস্বরূপে বিরাজমান, ইহাই উপলব্ধি হইতে থাকে। জীব তখন উপলব্ধিস্বরূপ হইয়াই বিদ্যমান থাকে। তখন দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, অনুভবিতা, অনুভাব্য ও অনুভব, আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদনের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ থাকে না।

যাহারা ভক্তি ও প্রেমের অনুশীলন না করিয়া, ভক্তিভাবিত ও প্রেমভাবিত দৃষ্টি লাভ না করিয়া, কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুশীলন করে ও নিরপেক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবত্তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, সেই সব মানবাত্মা ভগবানকে করুণাময় ও প্রেমময়রূপে অনুভব করে না, ভগবানের করুণাময় ও প্রেমময় স্বরূপ তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না; ভগবানের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-

কারিত্বের ন্যায় করুণাময়ত্ব এবং প্রেমময়ত্বও তাহারা আপেক্ষিক ও ঔপাধিক বলিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার নিরপেক্ষ ও নিরুপাধিকস্বরূপ অবগত হইবার জন্য সূক্ষ্ম বিচারপন্থা অবলম্বন করে। জীব ও জগৎকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাদের সম্পর্কে ঈশ্বর যে সব ভাবে, যে সব শক্তি, গুণ, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, দয়া, প্রেম, প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, সেই সব ভাবই আপেক্ষিক ও ঔপাধিক, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় হয় না। জীব-জগৎ নিরপেক্ষ স্বরূপে ঈশ্বর যে কিরূপ, তাহার জ্ঞান ঐ সব বিশেষণ দ্বারা হয় না। জ্ঞানিগণ সেই স্বরূপানুসন্ধানে রত হন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা দেখিতে পান যে, নিরপেক্ষভাবে কোন বিশেষণই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অথচ ঈশ্বর যখন জীব ও জগতের একমাত্র কারণ, তখন কার্য্য নিরপেক্ষ স্বরূপ তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। জীব ও জগতের সত্তা তাঁহার সত্তার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তাঁহার সত্তা ত জীব ও জগতের সত্তার উপর নির্ভর করে না। তাঁহার শক্তি হইতেই জীব ও জগতের উৎপত্তি, জীব ও জগতের উৎপত্তির অপেক্ষা না করিয়াও ত তাঁহার একটি স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে। ঈশ্বরের সেই স্বরূপটি কি?

এই তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে জ্ঞানিগণ ঈশ্বরকে পরমার্থতঃ জীবজগৎ-নিরপেক্ষভাবে সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তিনি নিজের সত্তায় সত্তাবান্, তিনি নিজেরই চৈতন্য-জ্যোতিতে স্বয়ং প্রকাশ, তিনি স্ব-স্বরূপে নিত্য পরিপূর্ণ বলিয়া পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত। এতদতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, ভাবা যায় না, কিছু বলিতে বা ভাবিতে চেষ্টা করিলেই অন্য কিছুর জীব বা জগতের—সত্তার অপেক্ষা রাখিবে। সুতরাং তাঁহাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' 'প্রজ্ঞানমানন্দম্' ইত্যাদি রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে।

তিনটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে দুইটির প্রতি উদাসীন হইয়া তৃতীয় তত্ত্বটিকে যদি এরূপে স্বতন্ত্রভাবে নিরপেক্ষভাবে ধারণা করিতে চেষ্টা করা হয়, তবে সে ধারণা অপূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। তিনটির মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে এই সম্বন্ধই নিরূপিত হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য, ঈশ্বরের আশ্রিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ঈশ্বরের সত্তায় তাহাদের সত্তা, এবং ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র কারণ, একমাত্র আশ্রয় ও নিয়ন্তা, একমাত্র স্বতন্ত্র সত্তায় সত্তাবান্। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কারণের সত্তা ব্যতীত কার্য্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কারণই কার্য্যের যথার্থ স্বরূপ। কারণনিহিত শক্তিই কার্য্যরূপে প্রতিভাসিত হয় এবং সেই শক্তি কারণ বস্তু হইতে পৃথক কিছুই নয়। কার্য্য শক্তি হইতে অভিন্ন এবং শক্তি কারণ হইতে অভিন্ন। সুতরাং কারণই বস্তুতঃ বিদ্যমান আছে, কার্য্যের কোন বাস্তব সত্তা নাই। কারণই বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়াই তাহাদের কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধও বাস্তব নয়।

অতএব জীব ও জগতের সম্পর্কে ঈশ্বরের যে সব উপাধি নিরূপিত হয়, তাহা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নয়, তদ্দ্বারা তাঁহার নিজস্বস্বরূপের পরিচয় লাভ হয় না। জীব ও জগৎ যে বস্তুতঃ তিনিই নিজের সঙ্গে নিজের আবার সম্বন্ধ কি? সর্ব্বসম্বন্ধাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। এই পরিচয় লাভ হইলে জীব নিজেকে

ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়াই অনুভব করে। এই অনুভূতিতে 'আমি' 'তুমি' 'তিনি' নাই, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" 'সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং "দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম' ব্রহ্মকেই তখন জীব নিজের পারমার্থিক স্বরূপ বলিয়া অনুভব করে। এই জ্ঞান লইয়া বিষয় জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও সর্ব্বত্র সে সেই এক ব্রহ্মকেই দর্শন করে। প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক স্পর্শ, প্রত্যেক রূপ, প্রত্যেক রস, প্রত্যেক গন্ধ যেন বলিতে থাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। প্রত্যেক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের অন্তর ভেদ করিয়া যেন উচ্চারিত হইতে থাকে, "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তাহার জ্ঞানময়ী দৃষ্টি প্রত্যেককেই সম্বোধন করিয়া যেন বলিতে থাকে 'তত্ত্বমসি' 'তত্ত্বমসি'। সে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকে,

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং
বরিষ্ঠম্॥

সকল 'অহং', সকল 'ত্বং', সকল 'ইদং', সকল 'তৎ', তখন এই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। তখনই তাহার অনুসন্ধান সার্থকতা মণ্ডিত হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ডাঃ শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র, এম্-এস, পি-এইচ্-ডি

১৯১০ সনের অক্টোবর মাসে ৩রা কি ৪ঠা তারিখে ত্রিগুণাতীত স্বামিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এও এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমেরিকা রওনা হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে এক দিন বাগবাজারের মঠে যাই এবং স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার আমেরিকা যাওয়ার মনোভাব জ্ঞাপন করি। আমেরিকা গিয়া তথায় Self-supporting হইয়া কোন Universityতে পড়িতে পারিব কি না ইহাই তাঁহার কাছে আমার বিশেষ জিজ্ঞাস্য ছিল। অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর তিনি আমাকে সাহস দিলেন এবং San Franciscoতে স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে একখানা পরিচয় পত্র দিলেন। তখন ভাবি নাই যে এই চিঠিখানাই আমাকে এবং আমার এক বন্ধুকে এক বিশেষ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে।

সকলেই হয়ত জানেন যে বর্ত্তমানে আমেরিকা যাইতে হইলে বিশেষ ছাড়পত্র, সুপারিশ চিঠি এবং এতদ্ব্যতিত যথেষ্ট নগদ টাকা (অন্ততঃ ১০০০৲ টাকার ব্যাঙ্ক চেক্) দেখাইতে হয়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাদের দেশে বিদেশী শ্রমিকদিগের প্রবেশ বন্ধ করিয়াছে। এই কার্য্যের সূত্রপাত ১৯১০ সনের শেষ ভাগে আরম্ভ হয় এবং আমার সহপাঠী বন্ধুটী ও আমি এই emigration rule এর কবলে পড়ি। এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যখন ষ্টীমার San Franciscoতে পৌঁছে তখন আমাদের pass port, recommendation letters এবং Industrial and Scientific Association, Calcuttaর চিঠি থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে steam launchএ তুলিয়া

Angel Island নামক একটী দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। সন্দেহযুক্ত emigrant'দের এই দ্বীপে আটকাইয়া রাখা হয়। এখানে আমরা সাত দিন এক প্রকার কয়েদ ছিলাম। এখানে একটা tribunal আছে। তিন জন বিচার কর্ত্তা emigrantরা যথার্থ কি উদ্দেশ্যে আমেরিকা আসিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া তাহাদের হয় নামিতে দেন, আর তা না হইলে যে জাহাজে আসিয়াছে সেই জাহাজে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। তৃতীয় দিনে আমাদের বিচার আরম্ভ হয় এবং আমরা আমাদের কাগজপত্র দাখিল করি। এখানে তখন একজন বাঙ্গালী ছাত্র (Mr S N. Guha) interpreter এর কাজ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমি স্বামী ত্রিগুণাতীতের চিঠিখানা দিই। তৎপর দিন সকালে প্রায় ১০টার সময় স্বামিজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের নাম, ধাম এবং কি উদ্দেশ্যে আমেরিকায় আসিয়াছি এসব কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং ভরসা দিয়া গেলেন যে কোন ভয় নাই—২।১ দিনের মধ্যেই আমরা এস্থান হইতে মুক্ত হইব। যদিও tribunal বুঝিয়াছিলেন যে আমরা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আমেরিকায় গিয়াছি এবং তদনুযায়ী আমাদের চিঠিপত্র আছে, কিন্তু তথাপি আমাদের হাতে প্রত্যেকের মাত্র ৫০ ডলার (প্রায় ১৫০৲ টাকা) সম্বল থাকায় তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে একমত হইতে পারিতেছিলেন না। স্বামিজী নিজে আসিয়া যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে এরা ছাত্র এবং এরা বাড়ী হইতে টাকা পয়সা পাইবে এবং তিনি সে বিষয়ে আমাদের ভার নিতে রাজী আছেন তখন তাঁহারা আর কোন আপত্তি করেন নাই। বলা বাহুল্য ইহার পর দিনই আমাদিগকে steam launch এ করিয়া সকালে প্রায় ১১টার সময় San Francisco সহরে নামাইয়া দেওয়া হয়।

এই অজ্ঞাত সহরে নামিয়াই প্রথমে আমরা স্বামিজীর ঠিকানা অনুযায়ী ট্রামে চড়িয়া "Hindu Temple"এ যাই। ট্রাম হইতে নামিয়াই অদূরে হিন্দু মন্দিরের ন্যায় মঠের চূড়া, মস্‌জিদের ন্যায় গম্বুজ শোভিত একটী বড় বাড়ী দেখিতে পাই। দরজার Door knob এ টিপ দেওয়া মাত্র automatically দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়াই ডান দিকের কামরায় স্বামিজীকে দেখিতে পাইলাম এবং তাঁহার চরণ প্রান্তে আমাদিগের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তিনি একটী বৈদ্যুতিক বোতাম (electric knob) টিপিয়া ছোট স্বামী অর্থাৎ প্রকাশানন্দ মহারাজকে খবর দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। ওখান হইতে আমরা প্রায় ৩টায় রওনা হইয়া Berkely সহরে (University Town) প্রায় ৫টায় সময় পঁহুছিলাম।

প্রথম যখন স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে দেখি তখন বুঝিতে পারি নাই যে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একজন পার্ষদ এবং বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী; কারণ পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণতঃ ওদেশী সম্ভ্রান্ত Protestant ধর্ম্ম যাজকদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই কাল long coat, high collar, bow tie এবং বড় ফেল্ট হ্যাট পরিতে দেখিয়াছি তবে বক্তৃতা দিবার সময় তিনি গেরুয়া আলখাল্লা পরিতেন।

স্বামিজী সাধারণতঃ বড় অল্পভাষী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে কখনও বৃথা তর্ক করিতে বা গল্প গুজব করিতে দেখি নাই। যখন গিয়াছি তখনই তাঁহাকে তাঁহার ডেস্কের উপর কাজ করিতে দেখিয়াছি। তিনি যে

কর্ম্ম জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ San Francisco সহরের এই Hindu Temple এই মন্দির একটি টালু জমির উপর স্থিত। ইহার উপর (তেতলা) হইতে San Francisco Bay—এক পারে Mount Tamalpa ও অপর পারে Oakland ও Berkely সহর এক অতি সুন্দর দৃশ্য। এতৎ ব্যতীত উত্তর পশ্চিম দিকে Golden gate এর দৃশ্যটীও বিশেষ মনোরম। উপরোক্ত এই তেতলাতেই শিব মন্দির। এখানেই ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে এবং এখানে পূজার যাবতীয় উপকরণ আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়-বাদ বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ করিবার এই এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি আমেরিকাবাসীদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মন্দিরে আমরা মাঝে মাঝে যাইতাম এবং তিনিও মাঝে মাঝে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আজও তাঁহার তিনটী কথা কাণে বাজিয়া আছে, "এসেছে, ভাল আছ, যাও ছোট স্বামীর কাছে।" তাঁর সঙ্গে কোন দিন এছাড়া আর বড় আলাপ হয় নাই।

স্যানফ্রান্সিস্কোর এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে কোথায় কি ভাবে তিনি কাহার সহায়তা লাভকরেন তাহা বিশেষ জানি না এবং কোনদিন জানিতেও চাই নাই। এই মন্দির ছাড়া তিনি প্রায় ২০০ মাইল দূরে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে যাইয়া কখন কখন থাকিতেন এবং তাহাদিগকে সাধন প্রণালী শিক্ষা দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মন্দির সংলগ্ন একটী বাড়ীতে Catholicদের মত একটী nunnery স্থাপন করেন এবং সেখানে স্বতন্ত্র কর্ম্মকর্ত্রী নিয়োগ করিয়া উহার কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বে, আমার বিশ্বাস, তিনি প্রায় ১ লক্ষ ডলারের (৩ লক্ষ টাকার) সম্পত্তি ও আসবাবপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এই সম্পত্তির ট্রাষ্টী যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এই মন্দিরের কার্য্য চিরস্থায়ী হইবে।

একটা বিষয় বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন এবং অনেক সময় তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ বলিয়া মনে করিয়াই কার্য্য করিয়া যাইতেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে বড় বিরত করিতে পারিত না। স্বামিজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। একদিন তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মিঃ ব্রাউনকে বলিতে শুনিয়াছি, "স্বামিজী আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন তাহা আমাকে প্রাণ পাত করিয়াও করিতে হইবে, এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আমি অসমর্থ।" কেন এবং কি বিষয়ে তিনি একথা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে নাই। তাঁহার বাক্যে সব সময়েই দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতা প্রকাশ পাইত। এই দৃঢ়তার জন্যই তিনি সময় সময় শিষ্যদের উপর দৃশ্যতঃ রূঢ় ব্যবহার করিতেন এবং তজ্জন্য কোন কোন শিষ্য তাঁহার ভাব ঠিক ঠিক ধরিতে পারিত না। তিনি যে আদেশ স্বামিজীর আদেশ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন সেই আদেশ অমান্য করিলে তিনি ভীষণ চটিয়া যাইতেন। বলিতে কি তাঁহার এই কঠোরতাকে আমরা সকলেই বড় ভয় করিতাম। তবে তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু আজ ২০ বৎসর পরে বিশেষভাবে হৃদয়ে এটা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি যে তিনি যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী, কর্ম্মবীর, সত্যপ্রিয় এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হইতেন তাহা হইলে বিদেশে নিঃসম্বল ভাবে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া এইরূপ একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। হায়, এই কঠোরতাই তাঁহার জীবনের কাল হইল। ইহার বশবর্ত্তী

হওয়াই তিনি তাঁহার এক অন্তরঙ্গ শিষ্যা "ডেব্‌রা"কে মন্দিরে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মস্তিষ্ক বিকৃত ডেব্‌রা গুরুর প্রতি কঠোর প্রতিশোধ নিল।

স্বামী ত্রিগুণাতীতের কি রকম সত্যনিষ্ঠা ছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত যাহা ছোট স্বামীর মুখে শুনিয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। একবার এক বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজকের বাড়ীতে তাঁহার ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। খাওয়া দাওয়ার পর তিনি স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামী তোমার খাওয়া ভাল হল ত? তিনি প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজকও নাছোড়বান্দা, তিনি আবার তাঁহাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন স্বামিজী সরল ভাবে বলিয়া ফেল্‌লেন, "দেখ, যখন তুমি আমায় একথা বার বার জিজ্ঞেস করছ, তখন আমি তোমাকে সত্য কথা না বলে পারছিনা, আমি তোমাদের এ খাওয়া মোটেই পছন্দ করি না।" যদিও একথা শুনে ধর্ম্মযাজক বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে এ ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলিবে না। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামী, আমি তোমার কথায় বিশেষ সুখী হলাম, তুমি মিথ্যা বল্‌তে পার না—সামাজিক রীতিনীতি বা বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। কিন্তু তোমাকে আমি একটী কথা বলে দিই, যদি কখনও কোন বাড়ীতে খেতে যাও তবে এরূপ সত্য কথা বোল না, তাহা হলে লোকে তোমাকে নিন্দা করবে।" স্বামিজীও সেদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। শুনিয়াছি সে অবধি কাহারও বাড়ীতে আর খান নাই।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহাকে কখনও আমিষ খাইতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তিনি স্বপাকে খাইতেন। মন্দিরের অন্যান্য সকলের খাওয়া একত্র হইত, কিন্তু তিনি অপর একটা কামরায় নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। ছোট স্বামীর নিকট শুনিয়াছি তিনি রোজ পাক করিতেন না এবং একবেলাই পাক করিতেন। একাহারীই ছিলেন, তবে রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ করিতেন। যেদিন তাঁহার ইচ্ছা হইত, ভাল কোন তরকারী পাক করিয়া অন্যান্য সকলকে দিতেন, তাঁহার পাকের কামরার সঙ্গে একটা pulley ছিল। সেই pulleyতে একটা basket ও দড়ি বাঁধা থাকিত। যা কিছু খাবার ওখান দিয়া নামাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যা ডাল, চাউল, ইত্যাদি দরকার হইত তাহা এই pulley দিয়া উপরে উঠাইয়া দিতে হইত। মনে হয় দুই বার তাঁহার রাঁধা খিচুড়ী খাইয়াছি। তিনি খুব ভাল রান্না করিতে পারিতেন। ছোট স্বামী বলিয়াছেন যে তিনি রোজ রাঁধিতেন না। তাই একদিন রান্না করিলে তার পরদিন সেই ভাতেই তাঁহার কাজ চলিয়া যাইত। আমার মনে হয় তিনি বাজারের পাঁউরুটীও খাইতেন না।

একদিন ছোট স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বড় স্বামীর শোবার ঘর কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন "ওখানেই" অর্থাৎ অফিস কামরাতেই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওঁর, বিছানা পত্র কোথায়?" তিনি বলিলেন, "ওঁর বিছানার দরকার হয় না, উনি সন্ন্যাসী!" সত্যই তাঁহার কোন বিছানা ছিল না। তিনি প্রায় ১০।১১টার সময় শয়ন করিতেন। সে জন্য তাঁহাকে কিছু করিতে হইত না। প্রথমে পোষাক খুলিয়া roll-top টেবিলখানার উপর উহা রাখিতেন। পরে revolving-chair খানা সরাইয়া গালিচা পাতা মেজের উপর একখানি কম্বল পাতিতেন আর একখানা গায় দিতেন। তাঁহার দক্ষিণ হাতই বালিশের কাজ করিত। তিনি খুব প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন এবং আর কেহ উঠার পূর্ব্বে তাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিক সব শেষ

করিতেন। ৮টার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সেই কালো পোষাকে ভূষিত হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন। তাঁহার নিজ জীবনের চলা ফেরা একরূপ ভাবে কতকটা mysterious ছিল। তাঁহার কৌপীন তাঁহার নিজের Bath room এ একদিন দেখিয়াছি। স্বামিজীর কোন দিন অসুখ দেখি নাই। শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। যে কঠোর সাধনায় তিনি দেশে থাকা কালীন অন্যান্য গুরু ভাইদের সঙ্গে রতছিলেন আমেরিকা যাইয়াও সেই কঠোর সাধনার বোধ হয় কিছুমাত্র তাঁর কম হয় নাই। আমরা বাহিরে তাঁহার কর্ম্ম জীবনই দেখিয়াছি কিন্তু ভিতরে তিনি কি গভীর ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেন তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ভোগ ঐশ্বর্য্যশালী আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে থাকিয়াও তিনি যে নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা কি কঠিন ত্যাগ ও নিঃস্বার্থের নিদর্শন তাহা সহজে বুঝা যায় না।

১৯১৫ সনে San Francisco তে World's Exhibition হয়। স্বামিজী তাহাতে একজন Director নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সনের June কি July মাসে তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। একদিন মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, দেখি তিনি পশ্চাৎ হইতে রাস্তা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে অভিবাদন করার পরে বল্লেন "এয়েছ, তা বেশ।" মন্দিরের পাশে ফুট পাথের সংলগ্ন একটু খালি জায়গা দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে একটা রেলিং তৈরী কর্ব্বো, আর তার উপর লতান গাছ বাইয়ে দেব, দেখ্‌তে বেশ হবে। আগামী বৎসর—Exhibition আস্‌ছে এ জায়গাটা একটু ভাল করে সাজাতে হবে।" সুস্থ শরীরে তাঁহার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।

যতদূর সম্ভব ১৯১৪ সনের শেষভাগে সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন সকালের কাগজে "Incendiarism in Hindu Temple Swami badly hurt by Bomb" প্রভৃতি Head line দেখিয়া আর একটী বন্ধুর সঙ্গে প্রায় ১১টার সময় আসিয়া temple এ পঁহুছিলাম। সেখানের বক্তৃতা হলে প্রবেশ করিয়া যে বর্ণনা শুনিলাম তাহাতে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। এই বক্তৃতা হলে রবিবার সকালে বক্তৃতা কালীন জনৈক মস্তিষ্ক বিকৃত Austrian স্বামিজীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। সেই বোমাতে তাহার নিজের মাথা উড়িয়া যায় আর স্বামিজীর দক্ষিণ পায়ের নীচ হইতে কোমর পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়। audience (শ্রোতা) দের ভিতর কেহই আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। যখন শুনিলাম যে স্বামিজীকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তখনই সেদিকে ছুটিলাম। একটী নার্সকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সাংঘাতিক আঘাতের কথা শুনিলাম। কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার পাশ ফিরিবার ক্ষমতা নাই। কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল ঠোঁট কাঁপিতেছে। আমি দাঁড়াইবার কিছুক্ষণ পরেই একটু চাহিলেন এবং সেই পরিচিত স্বরে বলিলেন, "এয়েছ, তা বেশ।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?" তখন উত্তর দিলেন, "বেদনা আছে, তবে বড় বিশেষ টের পাচ্ছি না। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। আর কি, প্রাক্তন, যা হবার তাই হবে। ও বিষয় ভাবি না। মা, মা," এই বলে নিরস্ত হইলেন। দেখলাম তিনি ভীষণ কষ্ট পাইতেছেন তবে তাঁহার মুখে সেই পূর্ব্বেরই গম্ভীর ভাব—কোন কথা বা মনোবেদনায় কোন উচ্ছ্বাস নাই। ধীর, স্থির, নিশ্চল। নমস্কার করে বিদায় হলুম, আর তিনি "এস" বলে একটু চাইলেন এবং আবার সেই চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত হইয়া রহিল। নার্স

(Nurse) বল্লে, "ওঁর case এখনও কিছু বলা যায় না, septic হলে আর ওঁকে বাঁচা যাবে না। ওঁর আঘাত ভীষণ। ওঁর ধৈর্য্য শক্তি অসীম, এমন ধীর, শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু রোগী দেখি নাই। জীবনে এই তাঁহাকে আমার শেষ দর্শন। নার্সের কথাই সত্য হইল। এর একদিন পরই তিনি এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পায় লীন হইলেন।

টেলিফোনে এই খবর Berkely-তে পঁহুছিলে প্রায় ১০ টার সময় রওনা হইয়া প্রথমে hospital, পরে Temple অবশেষে এক undertaker-এর বিস্তৃত সুসজ্জিত বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম, দেখিলাম রাস্তার পার্শ্বে বহু মটর এবং বাড়ীর ভিতর ও বাহির লোকাকীর্ণ। এক পথ দিয়া লোক ভিতরে ঢুকিতেছে এবং অপর পথ দিয়া বাহিরে আসিতেছে। স্বামিজীর শেষ দেহ দর্শন মানসে যে এত লোক হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বড় লোক এবং ধর্ম্মযাজক। তখন বিশেষভাবে বুঝিলাম যে ইনি এত বৎসর San Francisco সহরে থাকিয়া কেবল মাত্র যে নিজের শিষ্যদের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন তাহা নয়, এখানকার অধিকাংশ Catholic, Protestant এবং ইহুদী ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যেও বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহারা তাঁহার প্রতি সম্মানার্থে এই স্থানে থাকিতেন না। দুঃখের মধ্যেও বড় আনন্দ পাইলাম।

আস্তে আস্তে বাড়ীর পাশে আসিয়া সেই গড্ডলিকা প্রবাহে মিলিত হইলাম। ভিতর হইতে church hymn শুনিতে পাইলাম। লাইনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিয়া খোলা coffin-এ স্বামিজীর সেই পূর্ব্ব পরিচিত ধরণের নূতন কালো পোষাকে আবৃত দেখিতে পাইলাম তাঁহার সেই নশ্বর দেহ। স্বশরীরে তাঁহাকে এই শেষ দেখা। তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যেই নামিতে যাইতেছি তখন পার্শ্বে ছোট স্বামীকে একটা ধাপের উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। স্বামিজী আমাকে দেখিয়াই বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেখানে দাঁড়াইবার আর স্থান নাই বলিয়া বাহিরে আসিলাম। যখন শুনিলাম যে তাঁহাকে crematory-তে নিবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই, তখনই সেখান হইতে crematory অভিমুখে Tram-এ রওনা হইলাম। যখন তথায় পঁহুছিলাম তখন দেখিলাম ইতি পূর্ব্বেই স্বামিজীর দেহ সেখানে নেওয়া হইয়াছে। সেখানেও দেখিলাম সেই লোকের ভীড়। সেই সৌম্য মূর্ত্তি, সেই অটল অচল ভাবেই যেন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। অনতি বিলম্বেই coffin খানা লোহার ফ্রেমের উপর স্থাপিত হইল। নিমেষ মধ্যে উহা খোলা জ্বলন্ত Electric furnace-এর ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং পুনরায় বন্ধ হইল। নির্নিমেশ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ সে ভাবে ছিলাম মনে নাই। দরজা খোলা হইলে চমক্ ভাঙ্গিল, দেখিলাম জনৈকা শিষ্যা একটা পাত্রে স্বামিজীর শেষ চিতা ভস্ম লইতেছেন। বুঝিলাম তাঁহার নশ্বর দেহ এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মানস চক্ষের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলাম এবং মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

রস-বিচার

সখ্য রস

শ্রীকানাইলাল পাল, এম-এ, বি-এল্

বিগত ১৩৪১ ভাদ্রে, প্রীতি-সামান্য বা দাস্যভাবের বিচার মোটামুটী করা হইয়াছে এবং সেই ভাবটী বুঝিবার জন্য কতকগুলি ভক্ত-চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। অতঃপর আমরা সখ্য রসের বিচারে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শান্ত ভক্তের গুণ—ইষ্টে নিষ্ঠা ইতর-বিষয়ে তৃষ্ণা ত্যাগ, দাস ভক্তের গুণ তাহা ছাড়া সেবা। সখ্য রসের ভিত্তি বিশ্বাস, শান্ত ও দাস্যভাবের যাহা তাহা ত আছেই।

বিমুক্ত সংভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ
প্রায় সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়ি শব্দভাক্।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

পরস্পর সমান দুইজনের মধ্যে সম্ভ্রম বা গৌরব শূন্য বিশ্বাসময়ী রতি সখ্য রসে স্থায়িভাব। এই সখ্য রতি ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া প্রণয় প্রেম স্নেহ রাগরূপে পরিণত হয়। সখ্য রতির সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন।

সম্ভ্রম বা গৌরবের সম্ভাবনা বা যোগ্যতা থাকিলেও, যদি সম্ভ্রমের লেশমাত্রও স্পর্শ না করে তবে তাহাকে প্রণয় বলা যায়। গোচারণে শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে কত স্তবস্তুতি করিতেন, কত অর্চ্চনাদি করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজসখা অর্জ্জুন (ইনি পাণ্ডব নন) সেই সব স্তব-স্তুতি অর্চ্চনাদি দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না, তাঁহার সম্ভ্রম বুদ্ধি হৃদয়ে মোটেই জাগরিত হইত না, তিনি স্বচ্ছন্দে নিজ সখাসনে শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলে যে প্রীতি বা ভালবাসা ধ্বংস হয় না তাহাকে প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ছিলেন তিনি স্বয়ং ভগবান—"কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থ"; তথাপি পাণ্ডবগণের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস, পরগৃহে দাস্য কর্ম্ম প্রভৃতি (আপাততঃ দৃষ্টিতে) কত দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তথাপি পাণ্ডবদিগের সখ্যভাব কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই বরং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের সখ্য ভাবকে প্রেম আখ্যা দেওয়া চলে।

এই প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে স্নেহ, নাম ধরে; তখন ক্ষণিক বিরহও অসহ্য বোধ হয়, এই অবস্থায় চিত্তের দ্রবীভূত অবস্থা লাভ হয়।

অঙ্কে তদঙ্ঘ্রিপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১৫।১৮

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে করিতে বিশ্রাম করিলে কতকগুলি সখা-স্নেহে আর্দ্রচিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে তদনুরূপ মনোহর গীত সকল গান করিতে লাগিলেন।

স্নেহের গাঢ়তা হইলে রাগ আখ্যা ধারণ করে। এই অবস্থায় শ্রীভগবৎ সম্পর্কে গভীর দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে অশ্বত্থমা দুষ্পরিহার্য্য বাণ সকল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন লম্ফ দিয়া ঐ বাণ সকল আপনার হৃদয়ে (বক্ষোপরি) ধারণ করিলেন। এ বাণ বৃষ্টি তাঁহার নিকট পুষ্প বৃষ্টি মনে হইয়াছিল।

এই সখ্যরসকে প্রেয়ঃ রসও বলা হয়। শ্রীহরি ও তাঁহার সখাগণ এই রসে আলম্বন স্বরূপ। শ্রীহরি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। তন্মধ্যে ব্রজে আলম্বনরূপী শ্রীহরির কান্তি ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও সুন্দর, তাঁহার হাস্য কুন্দ পুষ্পকে তিরস্কার করে, বসন—প্রফুল্ল স্বর্ণ কেতকীর স্থায় পীতবর্ণ, গলে বৈজয়ন্তি মালা, অধরে মুরলী, শিরে ময়ূরপুচ্ছ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমধারী। ব্রজ ভিন্ন অন্য স্থলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভুজচতুষ্টয় বিশিষ্ট, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি দেদীপ্যমান চতুর্দ্দিকে কিরণমালা।

প্রেয়োরসে আলম্বনরূপী শ্রীহরি সমুদয় স্বলক্ষণা প্রাপ্ত সুবেশযুক্ত, বলিষ্ঠ, বিবিধ প্রকার ভাষাবেত্তা, বাবদূক, সুপণ্ডিত, অতিশয় প্রভাবশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাগুণ-যুক্ত, লোক সমূহের অনুরাগভাজন, সমৃদ্ধিমান ও সুখী বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহারা রূপ গুণ বেশ দ্বারা সমান, দাসের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত নন, সম্পূর্ণ বিশ্বাসী তাহাদিগকে বয়স্য বলে।

ব্রজের সখা ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইলে অতীব দুঃখিত হন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন ও কৃষ্ণগত জীবন। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বয়স, গুণ, বিলাস, বেশ ও শৌর্য্য। শ্রীকৃষ্ণ সাত দিন গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে তাহারা বলিয়াছিলেন, "হা কষ্ট! তোমার এত পরিশ্রম হইয়াছে, আর পর্ব্বত ধারণের প্রয়োজন নাই—শ্রীদামের হস্তে সমর্পণ কর—তোমাকে এরূপ দেখিয়া আমাদের মর্ম্মভেদ হইতেছে।"

ব্রজের মধ্যে চারি প্রকার বয়স্য—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা প্রিয়নর্ম্মসখা। যাহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক এবং যাহাদের সখ্য বাৎসল্যগন্ধ বিশিষ্ট ও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করেন, তাহারা সুহৃৎ পদবাচ্য।

সুহৃৎগণের মধ্যে শ্রীবলদেবই প্রধান। তিনি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রকান্তিশালী তাঁর এক কর্ণে কুণ্ডল, বিশাল বক্ষে উৎকৃষ্ট গুঞ্জাহার, কস্তুরী দ্বারা চিত্র বিচিত্র তিলকযুক্ত আজানুলম্বিত ভুজবিশিষ্ট।

যাহারা কনিষ্ঠ তুল্য-যাহাদের সখ্য দাস্যগন্ধ যুক্ত তাহাদিগকে শুধু সখা বলা হয়। তাহাদের কেহ পদতলে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন কেহ চূর্ণ কুন্তল বিন্যাস করেন, কেহ অঙ্গ সম্বাহন করেন।

যাহারা তুল্য বয়স কেবলমাত্র সখ্যভাবাক্রান্ত দাস্য বা বাৎসল্য গন্ধযুক্ত নহেন তাহাদিগকে প্রিয়সখা বলা যায়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা বিবিধ কেলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান করেন—কেহ নর্ম্ম পরিহাস করেন, কেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন, কেহ বা পশ্চাৎ হইতে চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিয়া ধরেন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শ্রীদামই প্রধান।

প্রিয় নর্ম্মসখা, সুহৃৎ সখা ও প্রিয়সখা হইতে শ্রেষ্ঠ বিশেষ ভাববিশিষ্ট, অত্যন্ত রহস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সুবল ইহাদের মধ্যে প্রধান। এই নর্ম্ম-সখাগণ কেহ—শ্রীকৃষ্ণকে কোন প্রেয়সীর সন্দেশ, কেহ অপর কোন প্রেয়সীর তাম্বুল, কেহ বা কাহারও প্রদত্ত তাম্বুল, কেহ বা কাহারও কন্দর্প লেখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন।

এই সখাসকল তিনপ্রকার—নিত্যপ্রিয়, দেবতা ও সাধক। কেহ স্বভাবসিদ্ধ স্থিরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মন্ত্রীর ন্যায় উপদেশ করেন। কেহ চপল স্বভাব পরিহাসাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য করান, কেহ সরল ব্যবহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, কেহ বক্রভাব দ্বারা তাঁহাকে বিস্মিত করেন, কেহ প্রগল্ভতাবশতঃ তাঁহার সহিত বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং কেহ বা সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করেন।

ব্রজ ছাড়া পুরসম্বন্ধি সখা—অর্জ্জুন, ভীমসেন

দ্রৌপদী, সুদামা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনই প্রধান—তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে মস্তক অর্পণ করিয়া নব নব পরিহাসবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স, রূপ, শৃঙ্গ বেণু শঙ্খবাদন, বিনোদন, পরিহাস, পরাক্রম প্রভৃতি গুণ সখ্যরসের উদ্দীপন। বয়সের মধ্যে কৌমার বাৎসল্য রসের উপযুক্ত, পৌগণ্ড সখ্যরসের ও কৈশোর মধুর রসের। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণে তৎপর হইল তাঁহার বেণুধ্বনি তাঁহার স্থিতি জানাইয়া তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করে। পাঞ্চজন্য শঙ্খের কথা প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে শ্রবণ করা গিয়াছিল, তাহার ধ্বনি শুনিয়া পাণ্ডবগণ আনন্দে সিংহ তুল্য হইয়াছিলেন। বিনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোনদিন শ্রীরাধারাণীর মত বেশ প্রকাশ করিলে সুবলাদি নর্ম্ম-সখাগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন। পৌগণ্ড বয়সের পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে সুন্দরভাবে পাওয়া যায়—

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামেপাণৌ মসৃণ কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ॥
১০।১৩।১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক্ হইয়াও বালকোচিত ক্রীড়াপরবশ হইয়া গোপবালকগণের মধ্যে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন কিরূপে?—উদর ও বসনের মধ্যে তাঁহার বেণু রাখিয়া বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র ও বাম হস্তে দধ্যাদি সংস্কৃত অন্ন ধারণ করিয়া ও সেই অন্ন দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলির মধ্যে রুচিজনক পিলুর সহিত আস্বাদন করিতে করিতে সর্ব্বতোভাবে সুহৃৎগণকে স্বীয় পরিহাস বাক্যে হাস্য করাইতেছিলেন; স্বর্গের দেবতাগণও ঐ ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন।

বাহুযুদ্ধ কন্দুকক্রীড়া, বাহ্যবাহক অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ ও বহন, পরস্পর যষ্টি ক্রীড়া, আসন ও দোলা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন, পরিহাস, জলবিহার প্রভৃতি সখ্যরসের অনুভাব। কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ বাহ্যবাহক ক্রীড়ায় শ্রীদামের নিকট পরাজিত হন, তখন শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "ছেলেবেলা ভাল করে স্তন্য পান করিস নি তাই বুঝি হেরে গেলি, নে এইবার কাঁধে কর।" এই বলিয়া শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িলেন, যিনি অনন্ত শক্তি সম্পন্ন তিনি যেন শ্রীদামের ভার বহন করিতে পারিতেছেন না, তাই দেখিয়া শ্রীদাম পুনরায় বলিতেছেন, "ভাল করে পাদুটো বুকের কাছে জড়িয়ে ধর—পড়ে যাব যে—নে জোর করে চল ভাণ্ডীর বন পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে, জানিস ত খেলার পণ ছিল।" ধন্য সখ্য ভাব, "তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম।" কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদেশ, হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করান, সকল কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সুহৃৎগণের প্রধান কার্য্য।

তাম্বুল অর্পণ, তিলক নির্ম্মাণ, চন্দন লেপন, বদনে চিত্রাঙ্কন সখাদিগের প্রধান কর্ম্ম।

যুদ্ধে পরাজিত করণ, বস্ত্রাকর্ষণ, পুষ্প কাড়িয়া লওয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হওয়া, হাতাহাতি যুদ্ধ করা—প্রিয় সখাগণের প্রধান বিনোদ।

ব্রজকিশোরীর দৌত্য করণ, তাহাদের প্রণয়ের অনুমোদন, তাহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কলহ উপস্থিত হইলে চাতুর্য্য প্রকটন, কণাকণি কথন, প্রিয়নর্ম্ম সখাদিগের প্রধান বিলাস।

বন্য পুষ্পে ও রত্নালঙ্কার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূষিত করা, তাঁহার অগ্রে নৃত্যগীত, অঙ্গ মর্দ্দন, মাল্য গ্রহণ, বীজন, গো শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যে সখাগণের দাসের সহিত সাদৃশ্য আছে।

এই রসে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব সকল প্রকাশ পায়।

উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ছাড়া অন্য সমুদয় ব্যভিচারী ভাব প্রেয়োরসে প্রকট হয়। তাহার মধ্যে অযোগ বা বিরহে মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা, ধৃতি ও মিলন অবস্থায় মৃতি, ক্লান্তি, ব্যাধি, অপস্মৃতি, দীনতা ব্যভিচারী ভাব প্রকাশ পায় না। বিরহের অবস্থা বিশেষে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বন শূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি ভাবগুলি প্রকাশ পায়।

ব্রজ সখাদের ক্রীড়ার পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে পাওয়া যায় আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গানি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালান্ আরোহন্তশ্চতৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎ প্রস্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১০।১২.

শ্রীমদ্ভাগবত ৬—১১

যদি কখনও বন শোভা দর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণ দূরে যাইতেন তাহা হইলে সখারা 'আমি আগে ধরিয়াছি' 'আমি আগে ধরিয়াছি' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আনন্দে কেহ কেহ বেণু বাদন করিতে করিতে, কেহ বা শৃঙ্গ বাজাইতে, কেহ ভৃঙ্গের অনুকরণে গুণ গুণ করিতে, কেহবা কোকিলের মতন কূজন করিতে, করিতে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ ভঙ্গিপূর্ব্বক পক্ষীচ্ছায়ায় ধাবমানে, কেহ বা হংসের অনুকরণে গমনে, কেহ বা বকের মত উপবেশনে, কেহ বা ময়ূরের মত নৃত্য প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বা বৃক্ষ-শাখায় লম্বিত বানর পুচ্ছ বা বানর শাবককে আকর্ষণ, কেহ বা তাহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণ, কেহ বা তাহাদের মত দন্তদর্শন ও মুখাকৃতি করিয়া এক শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ বা ভেকের মত ক্ষুদ্র জলাধার সকল উল্লঙ্ঘন, কেহ বা প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস, কেহ বা প্রতিধ্বনির প্রতি আক্রোশ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন! যিনি জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখরূপে অনুভূত হন, ভক্তের নিকট পরমদেবতা, শ্রীভগবান-রূপে প্রকট হন, মায়াধীন, জীবের নিকট নরবালক-রূপে প্রতীয়মান হন, সেই শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বহুপুণ্যশালী গোপবালকগণ ঐ প্রকারে বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁহাকে মাত্র অনুভব করেন, সাধারণ ভক্তজন যাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া উপাসনা অর্চ্চনাদি করেন, তাঁহার সহিত সমভাবে বা সখাভাবে ব্রজ বালকগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আবার এই ব্রজবালকেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোষ্ঠে গমন করিতেন, তখন সকলে নিজ নিজ মাতৃগণের প্রদত্ত খাদ্য বিশেষের আস্বাদ পৃথক পৃথক দেখাইয়া হাস্য পরিহাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিতেন।

সর্ব্বে মিথোদর্শয়ন্তঃ স্বস্ব ভোজ্য রুচিং পৃথক।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্য বজহ্রুঃ সহেশ্বরা ১০।১৩,৮

আমরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ লইয়া সখ্য রসের অনেক কথাই বলিলাম কিন্তু অন্য অবতার সম্বন্ধেও যথাযথ ভাবে সখ্য রসের আলম্বন স্থায়ী ভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারী ভাব প্রভৃতি গ্রহণীয়। শ্রীরাম অবতারে সুগ্রীব সখার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু

আমাদের মনে হয় শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য বিকাশ গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতাতে সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকেও আলিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত নন। মনে হয় এইখানেই শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সমধিকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় দরিদ্র সুদামা বিপ্রের কথা অনেকেই জানেন। যখন তিনি দ্বারকার ঈশ্বর, শ্রীরুক্মিণীদেবী প্রভৃতি স্বর্ণ চামর লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে প্রস্তুত, সেই সময় বাল্যসখা সুদামা উপস্থিত হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া সেই ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র পরিধায়ী দরিদ্র সুদামাকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া শীঘ্র স্বর্ণভৃঙ্গারে জল লইয়া শ্রীরুক্মিণী-দেবীকে পদধৌত করিতে আদেশ করিলেন। ইহারও কি তুলনা হয়? তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে দরিদ্র শ্রীধরের সহিত হাস পরিহাস তার থোড় মোচা কলা প্রভৃতি অর্দ্ধমূল্যে বা বিনামূল্যে গ্রহণ ব্যাপারে গুপ্ত সখ্যভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় ব্যাপার, গুপ্ত বলিলাম কারণ এবারে যে গুপ্তভাবে তিনি আসিয়াছিলেন।

সখাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেমন অনুরাগ, একটী মহাজনের পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করি—

আজু গোঠে ভূপতি ভেল কানাই
সঙ্গের বালকগণ করে উপাসন
ভোজন পান যোগাই।
অরুণ তরুণ দল আনিয়া তরুর তল
কুসুম সেজ সাজাই॥
কৈ বরুক রব উরুপর শিয়র
পদসেবা কৈ পাই।
বহুবিধ কুসুম মনোহর মনোরম
কৈ দেয়ত মাল বনাই॥
শিখিদল নিকর করে জুরি সুন্দর
কৈ শ্যাম অঙ্গে চামর ঢুলাই॥
অবিরত সেবি বিধি শিব অজ আদি
নারদ অন্ত না পাই।
সেহি চরণ ধন রামকৃষ্ণগুণ
কোন তপে গোপ পাই॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিবেকানন্দের বাণী

অধ্যাপক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

স্বামিজী বলিয়াছেন যে "আমি অশরীরী বাণী।" তিনি এই যুগের যুগবাণী। প্রত্যেক যুগে অবতার পুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া একটা বাণী দিয়া যান। সেই বাণী সেই যুগের ধর্ম্ম। যুগ ধর্ম্মই যুগের বিশিষ্ট সাধনার ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যুগ ধর্ম্মই স্তুপীকৃত আবর্জ্জনা-রাশি বহুকাল সঞ্চিত মলিনতা ও আবিলতাকে ভাসাইয়া দিয়া সনাতন সত্যের অনন্ত প্রবাহে মিলাইয়া দেয়। সেই বাণীই সমগ্র জাতির মিলনভূমি। অবতার পুরুষেরা শুধু একটী দেশ বা জাতিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেন না— তাঁহারা সংকীর্ণতার গণ্ডিকে ভাঙ্গিয়া এক উদার সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর সমগ্র মানব জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন। স্বামিজী বর্ত্তমান কালোপযোগী যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন সনাতন সত্যের প্রতি

দৃষ্টি না রাখিয়া ভ্রান্তপথে চলিতে থাকে, যখন লক্ষ্য হারা হইয়া অশান্তির আগুণে মানুষ যন্ত্রনায় ব্যাকুল হয়, তখন মহাপুরুষেরা অভয়বাণী শুনাইয়া প্রেমের অমৃতধারায় শান্তিবর্ষণ করেন। উনবিংশ শতাব্দী সেই অশান্তির যুগ। নানাবিধ কৃষ্টিরধারা এই যুগে মিলিত হইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষ আপনার গন্তব্য পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একদিকে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা কলহ ও সংকীর্ণতা এবং অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারজাত অনাচার অপরদিকে নবজাত বিজ্ঞানের কশাঘাত—যুক্তি বিচারমূলক ভাবতে সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্তরালে জড়বাদের অভিযান। শুধু ভারতে নয় সমগ্র জগতের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা। পুরাতন মতগুলি যেন বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছিল না। এই সন্ধিক্ষণে বড় বড় মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান মনীষার দ্বারা একটা সার্ব্বজনীন মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার জন্য নূতন নূতন মতের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতি তাহাতে সায় দিতে পারে নাই। এই বিপ্লবের প্রবল প্রবাহে মানব সভ্যতা জড়বাদকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিল। অর্থাৎ মানুষ শাস্ত্র-ধর্ম্ম সাধনা ও আধ্যাত্মিক সাধনাপদ্ধতিকে একটা মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতার আবরণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। এই চরম-মুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁহার অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব সাধনা। তিনি শ্রীদক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী মূলে আসীন হইয়া জগতের যাবতীয় সাধনপ্রণালীর এক মিলনভূমি হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন এবং প্রেমপূর্ণ স্বরে ঘোষণা করিলেন, "যত মত তত পথ।" কাহাকেও বর্জ্জন করিতে হইবে না—কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে হইবে না—সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র—সকল মহাপুরুষেরা একই সত্যকে প্রকাশ করিতেছেন। "সব শেয়ালের এক রা।" এই উপলব্ধি জগতের ইতিহাসকে নূতন—মানব সভ্যতার-কৃষ্টির এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়া দিল। যে মহাশক্তি এই যুগধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রকাশিত হইলেন—সেই মহাশক্তিই—বাণী-রূপে বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই বাণীই সমুদ্র পারে সমুদ্র গম্ভীর ধ্বনিতে নিনাদিত হইল। চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর সম্মুখে এক কৌপীন সম্বল অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী যুবা যে প্রেমমন্ত্রে আহ্বান করিলেন, তাহা আজিও সমগ্র জগতে প্রবলতর তেজে ধ্বনিত হইতেছে। সেই আহ্বানের আকর্ষণ দিন দিন উত্তরোত্তর প্রবলবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে সমগ্র মানব সমাজকে আন্দোলিত করিয়া অজ্ঞাতে—অলক্ষ্যে সমগ্র মানবহৃদয়-তন্ত্রীকে স্পন্দিত করিতেছে, মানুষ জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেই অগ্রগতি লক্ষ্যে চলিয়াছে। সকলেই মিলন তীর্থের যাত্রী। বর্ত্তমানকালে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্ব স্ব ধর্ম্মকে বিশ্বজনীন ও অপূর্ব্ব উদার বলিয়া দাবী করিতেছে। পরমত সহিষ্ণুতাই এখন সকলেই দেখাইতেছেন। ইহাই কাল বা যুগধর্ম্ম। কিন্তু কৃত্রিম বা মৌখিক ভ্রাতৃভাব ক্ষণস্থায়ী—তাহা শুধু কপটতার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। বাহ্যিক উদারতার ভাণ দেখাইলে চলিবে না। তাই আজ কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ করিয়া সাম্প্রদায়িক দলাদলি বা সংকীর্ণতা মানুষের জীবনে উৎকটভাবে প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিতে হইলে সেইরূপ সাধনা চাই। সাধনায় প্রেমের অনুভূতি না হইলে কে সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ভেদ করিতে সক্ষম? স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারিত সত্যই স্বীয় জীবনে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন,

বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন
সেবিছে ঈশ্বর॥

জীবকে প্রেমের দ্বারা সেবা করিতে হইবে—তাহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা করিতে হইবে, আর্ত্ত, দরিদ্র, অজ্ঞান, দুর্গত নারায়ণদের পূজা করিতে হইবে। সে পূজা জবা বিল্বদল বা স্তব আবৃত্তিতে নয়, সে পূজা সেবার দ্বারা দুঃখের মোচন করা বা প্রত্যেকের অভাব দূর করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া—সে পূজা জীবের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করা। সে পূজায় ত্যাগের মহিমাও জলন্ত বৈরাগ্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া প্রেমের হোমাগ্নিতে স্বীয় জীবনকে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সবল পবিত্র চিত্তই ইহার নৈবেদ্য। জগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা তখনই স্থাপিত হইবে যখন মানুষ এই প্রেমের পূজায় স্ব স্ব জীবনকে অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদান করিবে। ইহা উপলব্ধির কথা সাধনার দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না। কি জ্ঞানযোগে, কি কর্ম্মযোগে, কি রাজযোগে, কি ভক্তিযোগে স্বামিজী দেখাইয়াছেন ধর্ম্মজীবনে ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে। প্রেমের মহিমায় উদ্দীপিত না হইলে কোন সাধনাই পূর্ণাঙ্গ হয় না। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এই প্রথম তত্ত্ব প্রচার করিতেছে। জীবনকে এই অদ্বৈতভূমিতে স্থাপিত করিলে সমাজ, ধর্ম্ম, জগৎ—কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিকভাবে এক বিচিত্র প্রেমে অনুরঞ্জিত হইবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

দীনতা

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণ

দীনতার দুই রূপ। এক রূপ মনুষ্যত্বের সঙ্কোচ জ্ঞাপক—আত্মার অবনতি সূচক. আর এক রূপ—মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ব্যঞ্জক—আত্মার স্বরূপ বোধক।

মানুষ যখন ঐহিকের ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হয়, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি পাশব ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিতে না পারে, সাংসারিক ক্ষতির আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়, তখন সে সত্যভ্রষ্ট হয়—প্রবলের বশ্যতা স্বীকার করে, তখন সে দাম্ভিক হয়—পরের প্রাণে তীক্ষ্ণ শেল হানে। দীনতার এই যে রূপ, উহা আত্মার ঘোরতর অবনতি সূচনা করে। এই প্রকৃতির দীনতা মানুষকে নির্দ্দয়—নির্ম্মম করে, স্বার্থপর—হিংসুক করে, ইন্দ্রিয় পরায়ণ—শঠ করে।

নশ্বর জগতের নশ্বর দেহ এবং তুচ্ছ দেহাত্মবোধকে কেন্দ্র করিয়াই দীনতার এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ। নরকের বিভৎস নগ্ন চিত্র—দুষ্কারজনক পূতি গন্ধ যেখানে, সেইখানেই এই দীনতা। দীনতার আর এক রূপ আছে, তাহা অনিন্দ্যসুন্দর, অতুলনীয় এবং দেব বাঞ্ছিত। এই অসাধারণ ভুবন মোহন রূপ বিরল-দৃষ্ট অতি ভাগ্যবান পুরুষের বা নারীর মধ্যে প্রকট হয়। এইরূপে—ভোগাকাঙ্ক্ষার কালিমা নাই, অসত্যের কলঙ্ক নাই, আর নাই স্বার্থবোধের নারকীয়

ভাব। স্বার্থলেশ-শূন্য ত্যাগ মহিমামণ্ডিত, অহঙ্কার পরিবর্জ্জিত এই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি আত্মার মহোচ্চ অবস্থার পরিজ্ঞাপক। মহাভাগ্যবান্ যে ব্যক্তির মধ্যে এই মূর্ত্তি শোভা পায়, তিনি মানব জাতির মুকুটমণি। এই ক্ষণজন্মা মহামানব নির্ভীক বীরের ন্যায় ঐহিকের সকল আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া—জীবনের সকল অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া অচিন্ত বিরাট পুরুষের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া রিক্ত নিঃস্ব হন। এই রিক্ততাই তাঁহার পরম সম্পদ। আর এই রিক্ততাতেই আছে বিপুল নির্ভয় আনন্দ। যে মানুষের অভিমান নাই—যাঁহার অন্তরে প্রতিনিয়তই "নাহং নাহং" "তুঁহু তুঁহু' ধ্বনি—তাঁহার আবার দুঃখ কি, সুখ কি, ভয় কি, লজ্জা কি, আর ঘৃণাই বা কি! তাঁহার কোন্ সাধনা আর অবশিষ্ট রহিল? . .

দীনতার এক প্রান্তে 'বৃহৎ অহং' অম্বরস্পর্শী পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কৃপার বাতাস রুদ্ধ করিতেছে; অপর প্রান্তে 'ক্ষুদ্র নাহং' অতি তুচ্ছ ধূলি কণার ন্যায় অবাধ কৃপার বাতাসে স্বচ্ছন্দ গতিতে সদানন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এক প্রান্তে—ভীতির শাসন—মায়ার প্রভাবে নির্জ্জিত মানবতা; অপর প্রান্তে—"মা ভৈঃ" মন্ত্রের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি—মায়া মুক্ত আত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ।

দীনতার এই দুই রূপ। এক রূপ—মর লোকের দুঃখ মলিন, ভীতি বিজৃম্ভিত; আর এক রূপ—অমৃত লোকের, আনন্দাভয় সমুদ্ভাসিত।

স্বামী শিবানন্দ ও প্রাচীন মঠের অস্ফুট স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইতিমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজের গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরিমহারাজ) ২১শে জুলাই ১৯২২ সনে মহা সমাধি লাভ করিলেন। হরিমহারাজ বাল্যকাল হইতেই ত্যাগ তপস্যা ও শাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলে—তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, "ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি ধরতে পারিস্।" শ্রীভগবানের আশ্রয়ে স্নেহে প্রদর্শিত সাধনপথে চলিতে চলিতে তিনিও কৃতকৃত্য হইলেন। অমৃতের অধিকারী হইলেন।

স্বামিজী তাঁহাকে সাধুর আদর্শজীবন দেখাইবার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে শুনিলেন—স্বামিজী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি মঠে পৌঁছিয়াই বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন, তথা হইতে হৃষীকেশ, উত্তরকাশী, নাগাল, অনুপসহর প্রভৃতি স্থানে গঙ্গাতীরে মাধুকরী ভিক্ষা অবলম্বন করিয়া সাধন ভজন করিতেন।

বেলুড় মঠে ১৯২৬ সনে মঠ ও মিশনের কনভেনসন্ (Convention) হয়। প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল মহাপুরুষ মহারাজের অধ্যক্ষতায় সময়ে ইহা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সময়ে মহাপুরুষ মহারাজের হৃদয়ের বিকাশ আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভক্ত সমাগম খুব আরম্ভ

হইল, মা লক্ষ্মীর কৃপায় অর্থাগমও অপর্য্যাপ্ত হইতে লাগিল। দীক্ষার সমস্ত অর্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় ও সাধুসেবায় দিতে লাগিলেন। মাসান্তে মঠের যে অভাব পড়িত সমস্ত শোধ করিয়া দিতেন। মঠের কর্ম্মকর্ত্তাদের বলিয়া দিতেন গরীব দুঃখী কেহ যেন অভুক্ত না যায়। পাখী, কুকুর ও গরুর সেবা বিশেষ যত্নের সহিত হইতে লাগিল। যে কেহ যে কোন প্রকার দুঃখ জানাইয়া খালি হাতে যাইত না। ভক্তেরা প্রণাম করিতে আসিলেই অতি স্নেহের সহিত বলিতেন—প্রসাদ পেয়ে যাবে। ১৯২৭ সালের ১৯শে আগষ্ট শ্রীমৎস্বামী সারদানন্দজী মহারাজ মহাপ্রস্থান করেন। যিনি আজীবন সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন, নানাপ্রকার বিপদের সময়েও ধীর স্থির হইয়া কাজ চালাইয়াছেন, যিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই, বঙ্গভাষাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ,' যাঁহার অপূর্ব্ব দান, সেই অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মহাপ্রস্থান করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজ তাঁহার স্থানে সম্পাদকের কাজ করিতে ব্রতী হইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার অধ্যক্ষতার সময় দুই বার দাক্ষিণাত্য ও ভারতের বহুস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শেষ সময়ে তাঁহার শরীরে রক্ত চাপ অধিক হওয়াতে প্রায় একপ্রকার অচল হইয়া পড়িলেন। এমন কি উপর হইতেও নীচে নামিতেন না। ১৯৩০ সালে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা খুব ধুমধামের সহিত হয় এবং পূজাতে মহাপুরুষ মহারাজের খুব উৎসাহ ছিল। হরিধনের বাগান ঐ সময়ে ২৪ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয় ও অধিবাসের দিবস দখল নেওয়া হয়। মহাষ্টমী দিবসে মহাপুরুষ মহারাজ আরামচেয়ারে করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমা দর্শন করিতে নীচে আসেন। চিন্ময়ী মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া চিন্ময়পুরুষ উপরে চলিয়া গেলেন। শরীর শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, ডাক্তারেরা বলিতে লাগিলেন, 'টেকা দায় জীবনীশক্তি মোটেই নাই'। নানাপ্রকার চেষ্টা চলিল—এ যাত্রা ধীরে ধীরে ভাল হইলেন। হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তাঁর কাজের জন্য শরীরটা রেখে দিলেন, আরও কিছুদিন চলুক।" একটি ডাণ্ডী আনা হইল, চড়িয়া মাঝে মাঝে মঠ বেড়াইয়া আসেন। একদিন বলিলেন—"আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ব্যাধি শরীরের, শরীর ষট্‌-বিকারী। উৎপত্তি বিনাশ—শরীরের। রোগ, শোক, মোহ এই সব শরীরের সংস্পর্শে হয়, আত্মা নির্লিপ্ত নিত্যমুক্ত কোনও উপাধি নাই। শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে বিনাশ হইবে। এই সময় শ্রীশ্রীভগবানের অন্যতম শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ (খোকামহারাজ) ২রা ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে মহাপ্রস্থান করেন। ১৯৩৩ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পূর্ব্ব দিন ডাণ্ডীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। নবনির্ম্মিত উৎসবের চালায় গেলেন। লুচি ও বুঁদিয়া ভাজা হইতেছে তরকারী কোটা হইতেছে, খাবার যায়গায় সামীয়ানা খাটান হইতেছে, দেখিয়া বালকের ন্যায় খুব খুসী। উৎসব হইয়া গেল, খুব লোক সমাগম হইয়াছিল। তাহার পর ২৪শে এপ্রিল সকালে ডাণ্ডীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন —সঙ্গে সাধুবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলী। চেতনপুরুষ বিচরণ করিতেছেন, চিন্ময়দৃষ্টি—সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন যেন বালক—অহংবুদ্ধির লেশমাত্র নাই। সবই যেন আপনার লোক, কোনপ্রকার ভেদ বা আবরণ নাই—ব্রহ্মাকারাবৃত্তি। স্বামিজীর মন্দিরের দক্ষিণদিকে বেলতলায় আসিয়া ফিরিয়া চলিলেন। ২৫শে এপ্রিল ১৯৩৩ সাল সকালে তিনজন ভক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বেলা ১১.১০ মিনিটে আহার

করিতে বসিয়াছেন। আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ভাত রুটী ঝোল খাইলেন, ঘোল খাইবেন—এমন সময় ডানদিকে কাত হইয়া পড়িলেন—দক্ষিণ অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল ; সন্ন্যাস রোগ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বহু ডাক্তার ও অনেক ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল। টেলিফোন যোগে অনেককে সংবাদ দেওয়া হইল, চতুর্দ্দিকে তার পাঠান হইল। মহা উৎকণ্ঠা—কখন কি হয়। দু একদিনের মধ্যে ২০ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দশবারজন ডাক্তার দেখিতে লাগিলেন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান, পূজা, জপ, হোম, তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া, সাতটী দেবীর মন্দিরে একদিনে ষোড়শোপচারে পূজা প্রভৃতি করা হইল। কয়েকদিন পর ডাক্তার সরকার বলিলেন এখন নিরাপদ বলা যাইতে পারে। অঙ্গচালনা ও কথা বলা বন্ধ হইয়া গেল, কেবল বাম হাতখানি তুলিয়া, ইঙ্গিতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ করিতেন। ধীরে ধীরে শরীর একটু একটু করিয়া ভাল হইল। কিন্তু কথাও কহিতে পারিলেন না, অঙ্গচালনও করিতে পারিলেন না। প্রসন্নবদন দেখিয়া মনে হইত পরমানন্দে আছেন। শরীরের সুখদুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধ খুবই কম। পূজা নিকটবর্ত্তী হইল, মহাষ্টমীর দিবস মাকে দর্শন করিতে চেয়ারে করিয়া নীচে আসিলেন—দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্মতিথি নিকটবর্ত্তী হইল। বলা হইল উৎসব হইবে—কোন প্রকার উৎসাহ নাই—আত্মস্থ। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগরাগ হইবে, ভক্তগণ প্রসাদ পাইবে—কোন বিকার নাই। যখন বলা হইল গরীবদের ভাল করিয়া খাওয়ান হইবে, কম্বল দেওয়া হইবে, তখন বুঝাইলেন—বেশ ভাল। উৎসব হইয়া গেল—ভক্তগণ আসেন, দর্শন করে, হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ ইঙ্গিতেই চলে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব নিকটবর্ত্তী—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ সনে তিথিপূজা হইয়া গেল, ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সাধারণ উৎসব হইবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দ্বিপ্রহর হইতে মহাপুরুষ মহারাজের অসুখ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তাররা দেখিয়া বলিলেন—রাত্রি পার হওয়া কঠিন। সকালে উৎসব—লক্ষ লক্ষ নরনারী উৎসবে আসিবে আনন্দ করিবে, কত গান, ভজন, সৎপ্রসঙ্গ ও প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি হইবে, বিশেষ চিন্তার সহিত রাত্রি এবং সমস্ত দিনও একপ্রকার কাটিয়া গেল। শ্রীভগবানের কৃপায় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল, কেবল ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত একটু শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। উৎসবের পরদিন সোমবার একটু ভাল দেখা গেল, মঙ্গলবার সকালে অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল—খুবই খারাপ। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ আহারাদি সকাল সকাল শেষ হইয়া গেল, অপরাহ্ণে ৩টার সময় দেখা গেল—নাড়ীর বেগ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, সকল সাধুভক্ত উপরের ঘরে ও ছাদে চলিয়া গেলেন—সকলে অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন শ্বাস চলিতে লাগিল—শ্রীভগবানের নাম সকলে মিলিয়া সমস্বরে শুনাইতে লাগিলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সন অপরাহ্ণ ৫টা ৩৫ মিনিটে তাঁহার আত্মা পাঞ্চভৌতিক দেহগণ্ডি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলীন হইলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তদের টেলিফোনযোগে খবর দেওয়া হইল, ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন ; সন্ধ্যা-আরত্রিক নাম মাত্র হইল, তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় আবেগপূর্ণ সুমধুর ভজন হইতে লাগিল। মঠসীমার মধ্যে সংস্কার কার্য্য সমাধানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমতি লওয়া ও ঘৃত চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতিরও যোগাড় হইল। ভক্তগণ ফুলের তোড়া মালা প্রভৃতি লইয়া আসিয়া মঠপ্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন, দেখিতে দেখিতে

মঠপ্রাঙ্গন ভর্তি হইয়া গেল, সকলে স্বতন্ত্রভাবে জপধ্যান করিতে লাগিলেন। বাক্যালাপ অতি সন্তর্পণে সামান্য সামান্য চলিল, রাত্রি প্রায় ৯টার সময় দেহ নীচে আনয়ন করা হইল। সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়া সদাশিবকে স্নান করাইয়া চন্দন ও গন্ধদ্রব্যাদি লাগাইয়া নববস্ত্র পরিধান করান হইল। পুনরায় খাট করিয়া মঠপ্রাঙ্গনে আনা হইল। চরণের ছাপ এবং পূজা ও আরত্রিক কার্য্য শেষ হইল। একে একে সন্ন্যাসিগণ, তৎপর স্ত্রীভক্তগণ শেষে পুরুষভক্তগণ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিলেন। সন্ন্যাসিগণ পূজা শেষ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শিষ্য, মহাপুরুষ মহারাজের গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুষ্পাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি আসিবামাত্র পথ করিয়া দেওয়া হইল, তিনি আসিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতাকে মালা পরাইয়া ও পার্শ্বে ফুলের তোড়া সাজাইয়া দিলেন—হস্তে পুষ্প লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

"বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্"

তিন বারই পুষ্প চরণে দিয়া প্রণাম করিলেন। সমস্ত মঠ নিস্তব্ধ, সকলেই স্থির হইয়া দৃশ্যটি দর্শন করিতেছেন—প্রতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের প্রাণ ভক্তি গদ্‌গদ্ হইল, প্রত্যেক প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তগণেরও হৃদয় প্রণতঃ হইল। মহাপুরুষ মহারাজ শরীর ত্যাগ করিয়াছেন—আর তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছেন তাঁহারই গুরুভ্রাতা কালি-তপস্বী। এ দৃশ্য—এ সন্ধিক্ষণ এইপ্রকার যোগাযোগ সৃষ্টিতে কদাচিৎ হয়। তাঁহাদের ভাষা ও ব্যবহার অপরে বুঝুক বা না বুঝুক প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। হৃদয় ভক্তিতে, এবং চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। সকলের পূজা শেষ হইয়া গেল। শবদেহ বহন করিয়া স্বামিজীর মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে আনা হইল। চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা হোমকুণ্ড প্রস্তুত হইল। মহা-হোমের সামগ্রী শবদেহে স্থাপিত হইল, শিষ্যগণ অগ্নিহস্তে প্রদক্ষিণ এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা অতীত হইয়াছে। অনেক ভক্ত চন্দন, ঘৃত, যব গুগ্‌গুল তিল প্রভৃতি হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়া তখনই নিজ নিজ আলয়ে চলিয়া গেলেন—কার্য্যশেষ হইতে রাত্রি প্রায় ৪টা হইল। তাহার পর ভোগ হইল, ভক্তগণ কিছু কিছু প্রসাদ পাইলেন। কয়েকখানা বাস আগে হইতেই মঠে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, যেমন যেমন ভর্তি হইতে লাগিল, তেমন তেমন চলিয়া গেল। চেতনপুরুষ মহাপ্রস্থান করিলেন—তাঁহার উপদিষ্ট সাধনপথ ভক্তগণের হৃদয়কে উত্তরোত্তর অমৃতের পথে লইয়া চলুক।

শাস্ত্র ব্রহ্মবিদের তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন—শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ। এই তিনটি লক্ষণই তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত। প্রথম শ্রোত্রিয়—অধীত-বেদবেদান্ত এবং গুরুপদেশ দ্বারা স্থির লক্ষ্য। দ্বিতীয় ব্রহ্মবিৎ—নিজ আত্মাতে ব্রহ্মোপলব্ধি। তৃতীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ—ব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, লোকৈষণা, বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণার দিকে মোটেই লক্ষ্য না থাকা। তিনি সব সময়েই আত্মস্থ। ব্রহ্মনিষ্ঠা ভিন্ন বিষয় নিষ্ঠা বা বিষয়কে জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়া তাহার প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা তাঁহাতে কখনই দেখা যায় নাই। অন্যত্র শাস্ত্র বলিয়াছেন—আত্মজ্ঞান, মনোনাশ, ও বাসনাক্ষয় এই তিনটি ব্রহ্মবিদের লক্ষণ। তাহাও তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত। প্রথম—আত্মজ্ঞান—স্বস্বরূপে জ্ঞান, মনোনাশ—যখন পাশ্চাত্য মনীষী রোঁমা রোলা জিজ্ঞাসা করিয়া

পাঠাইলেন—মহাপুরুষ মহারাজের সমাধি হইয়াছে কি না—তিনি অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন—তৎপরে উত্তরে বলিয়াছিলেন, "হাঁ হইয়াছে"। বাসনা ক্ষয় না হইলে সমাধি হয় না।—শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "ছেলেরা বেজীর গলায় ইট বাঁধিয়া দেয়—নিজ গর্ত্তে গিয়া শুইতে চায়, পাবে না, যেই একটু নিদ্রা আসে, ইটের ভারে নামিয়া আসে। ভিটির মধ্যে গর্ত্ত থাকে, ইটটি নীচে ঝুলিতে থাকে। বাসনারূপ ইট গলায় বাঁধা থাকিলে মন গিয়া সমাধিস্থ হইতে পারে না, বাসনাক্ষয় যেই হইবে মন তখনই সমাধিস্থ হইবে। সংস্কারযুক্ত হইলেই মন, নির্বিষয় হইলেই আত্মা ব্রহ্ম। সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ। মেঘ চলিয়া গেলেই আবরণশূন্য স্বয়ং প্রকাশ। মন বাসনাশূন্য হইলেই আত্ম-জ্ঞানস্বরূপ—নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত-পূর্ণব্রহ্ম-অখণ্ডসচ্চিদানন্দ।

হে পাঠক! এই জগৎ এই প্রকারেই চলিবে। শরীর থাকিতে রোগ শোক ও অভাবের কখনও শেষ নাই। ভোগেরও শেষ নাই। যযাতি পুত্রের যৌবন সহস্র বৎসর উপভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমান বিচারবান উপেক্ষা অপেক্ষা না করিয়া সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করুন—অমৃতের অধিকারী হউন। ইহাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ—ইহাই পরম পুরুষার্থ॥ ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

স্বামী করুণানন্দ

বুদ্ধ শরণে

শুনেছি দুখের দুর্য্যোগে যবে
বিপদের দেয়া ডাকে;
ব্যথিতা ধরার বক্ষ চিরিয়া,
আসে বাহিরিয়া ব্যথায় পীড়িয়া,
গ্লানি ভরা শ্বাস, আকাশ ঘিরিয়া
অগ্নি আখর আঁকে,
ভগবান আসি হাসির আলোকে
ঘুচায় সে বেদনাকে! ১

শুনেছি এমনি বহুযুগ আগে
পাপের তামসী রাতে,
অসহায় ধরা করি হাহাকার,
হানি যুগ পাণি বুকে বার বার,
যেদিন শরণ যাচিল তোমায়
প্রবল অশ্রুপাতে,
সব দুখ-নাশি এসেছিলে হাসি
প্রেমের পূর্ণিমাতে! ২

পুণ্য পরশে পরম হরষে
সুখের সে দিন গুলি,
ফাগুন প্রাতের পাখীর মতন,
আকাশের গায়ে জাগায়ে কাঁপন
কোথায় যে ভেসে গেল সে কখন
ভাবের বাতাসে দুলি;
কেহ জানিল না অনাদরে গেল
দেবতা দুয়ার খুলি। ৩

তার পরে হায়, হাজার হাজার
বছর কাটিল ধীরে,
ধরণীর রূপ শত শোকাময়,
প্রলয় নাচনে পেয়ে গেল লয়,
কত সভ্যতা জেগে হলো ক্ষয়
কত বার ফিরে ফিরে;
তব নাম তবু জাগে আজো প্রভু,
কালের জলধি-তীরে!

শত শত যুগ কাটায়েছি মোরা
উদাসীন ঘুম ঘোরে।
নয়নে মোহের আবরণ টানি,
ভুলিতে চেয়েছি তব মুখখানি,
চাহিনি লভিতে অমৃত-বাণী
প্রাণের পেয়ালা ভরে',
শমন শিয়রে তবুও দাঁড়ায়ে
রয়েছে করুণা করে'। ৫

বিষয়-মদের নেশায় আবার
ধরণী উঠেছে মাতি ;
ঈর্ষা-অনলে দহিয়া দহিয়া,
মিথ্যা বিষের যাতনা বহিয়া,
নিখিল বিশ্ব বহিয়া রহিয়া
কাঁদে আজ দিবা রাতি,
হিংসা ও লোভ-কামনার ধূমে
ঢেকেছে ধবম ভাতি! ৬

দিকে দিকে তাই উঠে হাহাকার
বিপুল আর্তনাদে :
পাপভারে ধরা উঠিছে দুলিয়া,
প্রলয়ের বান্ গরজে ফুলিয়া,
দৈন্যে ও রোগে পড়িছে খুলিয়া
লজ্জা মানের বাঁধ,
স্বার্থদ্বন্দ্বে মত্ত মানব—
পেতেছে মরণ ফাঁদ। ৭

সকলিত তুমি নেহারিছ প্রভু,
তবু আছ কেন দূরে ?
বল বল আজি হে করুণাময়,
এখন কি তব হয়নি সময়
বল কবে এসে দানিবে অভয়—
মানবের প্রাণ-পুরে ;
শুনাবে বিশ্বে মৈত্রীর বাণী
তেমনি গভীর সুরে ? ৮

হাজার হাজার বছর আগের
সেই পূর্ণিমা রাত্,
আজিও এসেছে তেমনি গোপনে,
ভরেছে জোছনা সোনার স্বপনে,
অজানার বাণী কতনা শ্রবণে
পশিছে অকস্মাৎ ;
ভ্রান্ত পিকের কণ্ঠে ধ্বনিছে—
"আগত সু-প্রভাত!" ৯

এ কি মিছে কথা ব্যর্থ বারতা,
শুধুই মায়ার ছল্।
অতীতের নর প্রাণীর ব্যথায়,
অতীত দিনের দুখের কথায়,
ভরিত তোমার প্রাণ মমতায়,
বহাত নয়নে জল ;
সে কৃপা লভিতে বর্ত্তমানের
নাহি কি গো কোন বল্। ১০

সেই ত ধরণী রয়েছে তেমনি—
চাহিয়া আকাশ পানে,
বনে বনে তার দোলে অঞ্চল,
বহে বায়ু তার গীতি চঞ্চল,
কালেরে নিয়ত বলি;—চল্ চল্—
কোথা ধায় সেই জানে।
মহাশূন্যের পথের নেশায়
তেমনি ত তারে টানে! ১১

এখনো তেমনি সাঁঝে শশিলেখা
ললাটে ধরেন শিব ;
ছায়া পথে পথে দেবতার মেয়ে,
হেসে চলে যায় ধরা পানে চেয়ে,
জ্বালে সারা রাত নীলাকাশ ছেয়ে
রূপালী তারার দীপ,
এখনো প্রভাতে পরে উষারাণী
সোনালী রবির টিপ। ১২

এখনো ধরায় শত লুম্বিনী
　　ফুলে ফুলে ফুলময় ;
সবুজ পাতার ঝিল্‌মিলে ঢাকি,
বিহগ বিহগী গাছে থাকি থাকি,
ঘুঘু ফিরে তার সাথীটিরে ডাকি,
　　সুখে তৃণ শিহরয় ;
এখনো তেমনি আশাভরা বাণী
　　দূরাগত হাওয়া বয় ! ১৩

তেমনিত ওগো রয়েছে সকলি,—
　　আসে যায় বার মাস ,
তুমি শুধু দেব রহিয়াছ দূরে,
বল অভিমানে আছ কোন্ পুরে,
ভকত তোমার কাঁদে ঘুরে ঘুরে,
　　দরশন অভিলাষ ;
আজো কি দেবতা রহিবে আড়ালে
　　বহাতে বেদনা শ্বাস ? ১৪

এই ত বুদ্ধ সেই পূর্ণিমা,
　　এই ত সে শ্যামা সন্ধ্যা ;
নিখিল কপিলাবস্তু ভবনে,
তৃষিতা জননী শিশুর স্বপনে,
যাচিছে তোমারে মরমে গোপনে—
　　ঘুচাতে সে শাপ বন্ধ্যা ;
হ'ও হে আগত ওগো তথাগত
　　হোক্ সার্থক এ-সন্ধ্যা। ১৫

এস হে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ
　　বুদ্ধ জগত-প্রাণ !
জাগাও আবার বিপুল সঙ্ঘ,
ত্রিশরণে সেই সাধন-অঙ্গ,
সত্য নীতির তেজ-তরঙ্গ
　　প্রাণ-স্রোতে কর দান ;
আত্ম ত্যাগের শক্তি সাধনে
　　হউক মৃত্যু ম্লান ! ১৬

মহান্ হিংসা—নাগিনীরে প্রভু,
　　শেখাও করিতে নাশ ;
দাও অন্তরে সেই মহা প্রেম,
সেই বিরাগের নিকষিত হেম,
সেই অনুভূতি, ক্ষমা, যোগ, ক্ষেমে ,
　　নাশ নির্ব্বাণে আশ।
করম-বাঁধন ছিঁড়িয়া ঘুচাও
　　জনম মরণ-ত্রাস !! ১৭

ব্রহ্মচারী অমূল্যকুমার

উত্তর কাশীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
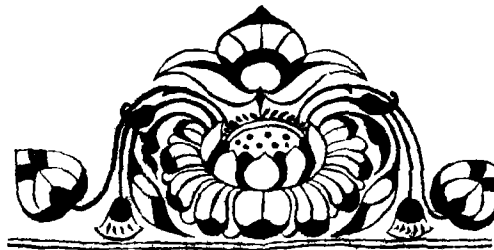
পূর্ব্ব কাশীর ন্যায় উত্তর কাশীতেও গঙ্গা উত্তর বাহিনী। এখানেও বরুণা ও অসী নদীদ্বয় ইহার দুই প্রান্ত বেষ্টনপূর্ব্বক গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানেও ⁄বিশ্বনাথ, ⁄অন্নপূর্ণা ও ⁄কেদারনাথ বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রাচীন মন্দির ও আশ্রম বর্ত্তমান আছে। মণিকর্ণিকার ঘাট এখানেও রহিয়াছে। পূর্ব্ব কাশীর ন্যায় ইহাও মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্কন্দ পুরাণে উত্তর কাশীর এইরূপ বর্ণনা আছে :—

যত্র ভাগীরথী পুণ্যা গঙ্গা চোত্তরবাহিনী।
সৌম্যকাশীতি বিখ্যাতা গিরৌ বৈ বারণাবতে ॥
অসী চ বরুণা চৈব দ্বে নদ্যৌ পুণ্যগোচরে।
যত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহেশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ॥
নিত্যং সন্নিহিতাঃ যত্র মুক্তি ক্ষেত্রে তথোত্তরে।
যত্রর্ষীণাঞ্চ স্থানানি আশ্রমাশ্চ তথা শুভাঃ ॥
যত্র মারকতীং ভাসং বিভ্রত্যেব সদাশিবঃ।
নিক্ষিপ্তা যত্র পূর্ব্বং হি সংগরে দৈবতাসুরে ॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র শক্তির্ধাতুময়ী শুভা।
জমদগ্নিসুতো যত্র তপস্তেপে সুদুষ্করং ॥
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সাবধানোঽবধারয়।
যত্র পুণ্যানি তীর্থানি সর্ব্বকামপ্রদানি হি ॥
যেষাং সংদর্শনাদেব ন চ ভূয়োঽভিজায়তে।
ইয়মুত্তরকাশীতি প্রাণিনাং মুক্তিদায়িনী ॥

(স্কন্দ পুরাণ, কেদার খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, ১১—১৭শ শ্লোক)

সৌম্য কাশী বা সৌম্য বারাণসী উত্তর কাশীর অপর নাম। মহাকালীর অষ্ট ধাতুময়ী বিরাট ত্রিশূল এখানেই পতিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ইহা ⁄বিশ্বনাথের মন্দির সমক্ষে প্রোথিত দেখা যায়। স্কন্দ পুরাণ মতে পাণ্ডব ধ্বংসের জন্য জতুগৃহদাহ ⁄উত্তর কাশীস্থ বারণাবত পর্ব্বতে ঘটিয়াছিল। উক্ত পুরাণে এইরূপও লিখিত আছে যে, কলি-কালে পূর্ব্বকাশী যবনদ্বারা কলুষিত হইলে কেদার মণ্ডলস্থিত উত্তর কাশীই পবিত্র কাশী রূপে বর্ত্তমান থাকিবে :—

কলাবস্তর্হিতা কাশী যবন প্রবলোদ্ধৃতা
ভবিষ্যতি তদা যস্যাং কাশীসংজ্ঞা সুমুক্তিদা।

(স্কন্দপুরাণ, কেদার খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, ৮৩ শ্লোক)

ঐতিহাসিকদিগের মতে,—যে বারণাবতে জতু-গৃহদাহ হইয়াছিল উহা মিরাট জেলার অন্তঃপাতী বারণওয়া নামক স্থান। ইহা মিরাট সহরের ১৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনোদ্দেশ্যে পণ্ডব পক্ষ হইতে যে পাঁচটি গ্রাম দুর্য্যোধনের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদিগেরই অন্যতম। মহাভারতের আদি পর্ব্বে যে জতুগৃহ দাহের বর্ণনা আছে, তাহা হস্তিনা-পুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ঘটিয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর। কাজেই পুরাণমত অপেক্ষা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়। কলিকালে পূর্ব্ব-কাশীর মাহাত্ম্য যবন প্রভাবে বিলুপ্ত হইবে, ইহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় ?

উত্তর কাশী গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। গঙ্গা ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত বেষ্টনপূর্ব্বক বহিয়া যাইতেছে। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত। স্থানটী একটী বিস্তীর্ণ সমতল বিশেষ। গঙ্গা ও হিমগিরির মধ্যবর্ত্তী এই পরমরমণীয় ভূখণ্ডে টিহরী গাড়োয়ালের

একটী ক্ষুদ্র সহর বর্ত্তমান। উহা সাধারণতঃ বরহাট নামে পরিচিত। সহরের মধ্যে বাড়ী, ঘর, দোকান পাট, স্কুল, খেলার মাঠ, কাছারী, ডাক্তারখানা, পোষ্টাফিস, মন্দির ধর্ম্মশালা ইত্যাদি রহিয়াছে। স্কুল গৃহটী একটী প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে অবস্থিত। অত বড় মাঠ উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর কাশীর পর গঙ্গোত্তরীর রাস্তায় কোন পোষ্টাফিস দেখিতে পাই নাই।

সহরের বাহিরে গঙ্গাতীরে 'জ্ঞানসু', 'উজ্জালি', ও 'লক্ষেশ্বর' নামে তিনটী জনকোলাহলশূন্য শান্তিময় স্থান আছে। তথায় একান্ত সেবী ভজনশীল সাধুদের জন্য আশ্রম ও কুটীয়া রহিয়াছে। অনেক সাধু তথায় সাধন ভজনে নিরত আছেন। সহরের মধ্যে কয়েকটী ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে তিনটী সমধিক প্রসিদ্ধ, যথা:— কালী কমলিবাবার ধর্ম্মশালা, জয়পুর রাজের সত্র, ও পাঞ্জাবী সিন্ধুক্ষেত্র। এই তিনটী অন্নসত্র হইতে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে নিয়মিত সময়ে সাধু সন্ন্যাসিগণকে রুটি, ভাত ও তরকারি ভিক্ষা দেওয়া হয়। উত্তর কাশীতে আশ্রমবাসী সাধুগণও সত্রের ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করেন। এই হেতু তাঁহারা সাধন ভজন ও পঠন পাঠনে যথেষ্ট সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। রন্ধনাদির ব্যবস্থা একমাত্র কৈলাসমঠে আছে। কোন কোন সাধু মহাত্মা মাধুকরীর দ্বারাও শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

উত্তর কাশীতে পৌছিয়া আমরা কালী কমলিবাবার সুবৃহৎ ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলাম। ধর্ম্মশালাটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট বড় অনেকগুলি কুঠরী এবং মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড গোলাঘর বর্ত্তমান। কুঠরীগুলি ইতিপূর্ব্বেই গৃহস্থ যাত্রিগণে পূর্ণ হইয়াছিল। সাধুদের অনেকেই বারান্দায় অবস্থান করিতেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর তত্ত্বাবধায়ক আমাদের জন্য একটী কুঠরী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। স্নানাদি সারিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। ভিক্ষার সময় হওয়াতে আমরা তাড়াতাড়ি যাইয়া তিনটী অন্নসত্র হইতে ভিক্ষা লইয়া আসিলাম। প্রত্যেক অন্নসত্র হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য উপস্থিত প্রত্যেক সাধুকে দেওয়া হয়। উহা একজনের উদর পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এইজন্য প্রায় প্রত্যেক সাধুকেই তিনটী অন্নসত্র হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোকটী ভিক্ষান্নের অংশ গ্রহণ অনুচিত মনে করিয়া হোটেলে যাইয়া আহার করিলেন।

এখানে সেই গুজরাটী যাত্রিদলের সহিত পুনরায় দেখা হইল। অনেক দিন পর দেখা হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা নিকটে আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার দুই হাঁটু ও পা ফুলিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ৫।৬ দিন যাবৎ তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে। বেদনাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু বৃদ্ধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি দিনের পর দিন পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের সঙ্গী ভদ্রলোকটী সুযোগ পাইয়া ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া বৃদ্ধাকে পায়ে মালিশ করিতে দিলেন। ভাবাবেগে বৃদ্ধার মুখ উৎফুল্ল ও লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা সদলে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যের একটী প্রকাণ্ড 'সিধা' লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। উহাতে উত্তম বাসমতী চাউল, মুগের ডাল, ঘি, চিনি যাবতীয় মসলা ও অন্যান্য সব উপকরণ ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সত্র হইতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি,

বলিয়া উহা অতি শিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই ছাড়িলেন না। হাত জোড় করিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "কৃপা কীজিয়ে মহারাজ, কৃপা কীজিয়ে।" অগত্যা পরদিন ব্যবহারের জন্য আমাদিগকে উহা রাখিয়া দিতে হইল। এই সুযোগে কয়েকজন হিন্দুস্থানী সাধুও ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল, "মাইজী, মুঝ্‌ কো ভি কুছ্‌ মিল্‌না চাহিয়ে, মুঝ্‌ কো ভী কুছ্‌ দীজিয়ে, মাইজী"। বৃদ্ধা বলিলেন, "নেহি, নেহি, বাঙালী মহাত্মা লোগ্‌কো ভোজন দেগে। আউর কিসীকো নেহি।" বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইল। বৃদ্ধা যেন কতই কৃতার্থ হইয়াছেন, এইভাবে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গুজরাটীদের এইরূপ বাঙালী প্রীতি আরও অনেক স্থলে লক্ষ্য করিয়াছি। (ক্রমশঃ)

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম

সমাপ্ত

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

তাঁহারা সকলেই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভরত বন্ধুবর্গ সমক্ষে রামকে কহিলেন, "পিতা প্রথমতঃ আপনাকে রাজ্য দান করিয়া, পরে আমার মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে যে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাহা আপনারই প্রদত্ত, অতএব আমি সেই আপনার প্রদত্ত রাজ্য আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে সেই রাজ্য ভোগ করুন।" ভরতকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধীর প্রকৃতি রাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ। তুমি স্থির হও, শোকের বশীভূত হইওনা, অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর। সত্যপরায়ণ পিতা তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা ভোগ কর, আর আমিও পুণ্যকর্ম্মা পিতা কর্ত্তৃক যে স্থানে থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছি, সেই স্থানে থাকিয়া মহামান্য পিতার আদেশ প্রতিপালন করিব। আমি বনবাস দ্বারা পিতৃবাক্য পালন করিব। যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ধার্ম্মিক গুরুর আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। আমাদের পিতা দশরথের পুণ্যচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া, তুমি তোমার স্বভাবগুণে নিজ শুভ অনুষ্ঠান কর।"

রাম এইরূপ অর্থযুক্ত কথা বলিয়া মৌন হইলে, ধর্ম্মাত্মা ভরত পুনরায় রামকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলেন, তবে কেন আপনি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন? বিদ্যা ও কনিষ্ঠত্ব অনুসারে আমি আপনা অপেক্ষা বালক, অতএব আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি অযুক্ত হইয়া কিরূপে পৃথিবীশাসন করিব? আমি অল্পবুদ্ধি অল্পগুণ, কনিষ্ঠ ও বালক বলিয়া আপনি ব্যতীত একাকী কোন স্থানে থাকিতে সাহস করি না, তবে কিরূপে রাজ্য পালন করিব? ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বান্ধবগণের সহিত স্বধর্ম্ম দ্বারা এই পরমোৎকৃষ্ট পৈতৃক রাজ্য পালন করুন।

মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠের সহিত ঋত্বিকগণ ও সচিবগণ একত্রিত হইয়া এইস্থানে আপনাকে অভিষিক্ত করুন।"

ভরত এইকথা বলিলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "তুমি নৃপতি শ্রেষ্ঠ দশরথ হইতে কৈকেয়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবাসুর যুদ্ধকালে পিতা আহত হইলে তোমারি জননীর সেবায় প্রীত তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে তোমার যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী পিতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করেন। উহার মধ্যে প্রথম বরে তোমার রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই দুই বর প্রদান করেন। সেই হেতু আমি পিতৃবাক্য পালনের জন্ম এই বনবাস পালনে নিযুক্ত হইয়াছি। ত্বরায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তোমারও আমার ন্যায় পিতাকে সত্যবাদী করা কর্ত্তব্য। ভরত! তুমি আমার সন্তোষার্থে রাজাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞান, অতএব পৃথিবীপতি পিতাকে পরিত্রাণ কর এবং জননীকে অভিনন্দিত করিতে যত্নবান হও।"

রাম কিছুতেই রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত না হইলে ভরত পুনরায় মন্ত্রী ও জ্ঞাতিগণ সমক্ষে বলিলেন, "আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও তাহার জন্ম অনুরোধ করি নাই এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ রামের বনবাসের জন্ম সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। তথাপি যদি পিতার আদেশ পালন করিতে হয়, তবে আমি স্বয়ং জটাবল্কল পরিধান করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব।"

পরে মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠযুক্ত শ্যামবর্ণ পদ্মপত্রবৎ আরক্তলোচন ভ্রাতা ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার যে স্বাভাবিক বিনয়-সম্পন্ন বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতে তুমি পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। সুহৃদ, অমাত্য ও বুদ্ধিমান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিও। **যদ্যপি চন্দ্র হইতে শোভা বিচলিত হয়, হিমালয় যদি শৈত্য পরিত্যাগ করেন এবং সাগর যদি বেলা ভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না।**

> "লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
> অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ"॥

(অযোধ্যাকাণ্ড—দ্বাদশাধিক শততমঃ সর্গঃ, ১৮)

ভাই। তোমার মাতা ইচ্ছাক্রমে বা লোভ-বশতঃ এইরূপ করিয়াছেন ইহা মনে করিও না ; মাতাকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে"। সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন কৌশল্যাতনয় এইরূপ বলিলে, ভরত প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন রামকে সবিনয়ে বলিলেন, "আর্য্য। আপনি এই সুবর্ণভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করুন, ইহাই সমস্ত লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" মহাতেজস্বী রাম পাদুকাদ্বয়ে পদসংযোগপূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রাঘবকে বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করত, আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে বাস করিব ; যেদিন চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তবে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিব।"

"চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি জটাচীর ধরোহ্যহম্।
ফলমূলশনোবীর ভবেয়ং রঘুনন্দন॥
তবাগমনসাকক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্বহিঃ।
তব পাদুকয়োর্ন্যস্ত রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ॥
চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাঙ্ক প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥
(অযোধ্যাকাণ্ড দ্বাদশাধিক শততমঃ সর্গঃ ২৩-২৫)

রাম 'তাহা হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি ও সীতা তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি মাতা কৈকয়ীকে রক্ষা কর, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না।" রাম এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভরতকে বিদায় দিলেন। পরে হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাম যথাক্রমে গুরুগণ, মন্ত্রিমণ্ডল, প্রজা সকল ও সমস্ত জনগণকে সংবর্দ্ধনা করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় দিলেন। মাতৃগণ বাষ্পাকুল-কণ্ঠ রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না। রাম তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস কালপূর্ণ হইলে রামচন্দ্র হনুমানকে তাঁহার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন সংবাদ জানাইতে পাঠাইয়া দিলেন। হনুমান বহু নদ, নদী, জনপদ পার হইয়া অযোধ্যা হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত ভরতের মাতুলালয় নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন ভরত অতি দীনভাবে চীর কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন এবং তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীর পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রামের পাদুকা যুগল সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। কাষায় বসনধারী সেনাপতি ও শুচি পুরোহিতগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। ভরত রাজ-ভোগ ত্যাগ করিয়া চীর কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া ধার্ম্মিক পুরবাসিগণও সর্ব্ব প্রকার ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন। পবননন্দন হনুমান ভরতের নিকটস্থ হইয়া করজোড়ে বলিলেন, "জটা বল্কল ধারণ করিয়া আপনি যাঁহার জন্য শোক করিতেছেন, সেই রামচন্দ্র আপনাকে কুশল সংবাদ দিয়াছেন। দেব! আমি আপনাকে সেই শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আপনি শীঘ্রই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন; সুতরাং এই নিদারুণ বেশ পরিত্যাগ করুন। রাম সম্মুখ সমরে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া জনক নন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করত সফল মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মহাবল লক্ষ্মণ ও সসীতা রামচন্দ্র এখনই আসিতেছেন।

ভরত হনুমান মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় আনন্দ সহসা ভূমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক প্রিয় সংবাদদাতা হনুমানকে আলিঙ্গন ও অশ্রুবিন্দুদ্বারা অভিষিক্ত করতঃ বলিলেন, "সাধো! তুমি কি মনুষ্য, না কৃপাপরবশ হইয়া কোন দেবতা আসিয়াছ? তুমি যেই হও, যেরূপ সুসংবাদ শুনাইলে তোমাকে তদনুরূপ পুরস্কার দিব এমন কিছুই দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, তোমার অনুরূপ না হইলেও একলক্ষ গো, একশত গ্রাম, শুভাচারসম্পন্না কুণ্ডলাবৃতা ষোড়শকন্যা এবং শোভন নাসিকসমন্বিতা ও কুলজাতি সম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা হেমচন্দ্রাননা বহুসংখ্যক বামোরু রমণী প্রদান করিতেছি।"

আমরা বিভিন্নজাতির ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই যে রাজ্য লাভের জন্য কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে হত্যা

করিয়াছে, কত নরহত্যা ও পৈশাচিক কাণ্ডের তাণ্ডবলীলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাপ্ত রাজ্য জ্যেষ্ঠকে পুনঃ প্রদানের জন্য ভরত যে আত্মত্যাগ, অদ্ভুত ভ্রাতৃপ্রেম, ও দীর্ঘকাল ব্যাপী কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। রামায়ণ মহাকাব্যে আমরা যে সমস্ত সৎচ্চরিত্রের অভিনয় দেখিতে পাই, তাহা বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্বরূপ। একদিকে লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব জ্যেষ্ঠানুগত্য, ব্রহ্মচারী বেশে দীর্ঘ চতুর্দ্দশবর্ষ ভ্রাতৃসেবা, ভরতের অদ্বিতীয় ভ্রাতৃপ্রেম রামের বনবাসকাল পর্য্যন্ত জটাবল্কল বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার পাদুকা সিংহাসনোপরি রাখিয়া রাজ্য পালন, জনকনন্দিনী সীতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য, রাজদুহিতা ও রাজরাণী হইয়াও আজীবন কষ্টে কাল যাপন, অপরদিকে মহাবীর হনুমানের অসামান্য প্রভুভক্তি, অদ্ভুত বীরপণা, পাণ্ডিত্য ও আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য, রামায়ণ মহাকাব্যকে জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ করিয়া রাখিয়াছে।

যে হিন্দুজাতির অতীতেতিহাস এত মহৎ ও গৌরব পরিপূর্ণ, তাহা প্রতীচ্যের শিক্ষা প্রভাবে হউক অথবা অন্য কোন কারণে হউক, আজ তাহার পুরাতন আদর্শ বিস্মৃত হইয়া অসংযম ও বিলাসের স্রোতে পতিত হইয়া এক ভ্রান্তপথে চলিতেছে। যদি "ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে" এবাক্য সত্য হয়, তবে যে যে ঘটনা ইতিহাসের গৌরব কাহিনী পরিপূর্ণ, সেই অধ্যায়ে পুনঃ পদবিক্ষেপ করিতে হইলে, আমাদের সেই রামায়ণ মহাভারতের অঙ্কিত মহচ্চরিত্রগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ত্যাগ ও সংযমে ভারতের ধর্ম্ম, ত্যাগ ও সংযমে ভারতের শিক্ষা, ত্যাগ ও সংযমে সামাজিক, ব্যষ্টিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি,—ভোগ-বিলাসে নহে। সুতরাং পুরাতন প্রাচ্য আদর্শ অনুসরণ না করিলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। ভারতের প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হইলে লক্ষ্মণের ন্যায় ইন্দ্রিয় সংযম, ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃপ্রেম, তরুণযুবকদের মহাবীর হনুমানের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং তরুণী যুবতীদের সীতার ন্যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

ভারতে বিবেকানন্দ

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল

কিঞ্চিন্ন্যূন চারি বৎসর কাল বিদেশকে ধর্ম্মদানে কৃতার্থ করিয়া স্বামিজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সিংহলের কলম্বো নগরীতে অবতরণ করেন। উক্ত দিবস হইতে ঐ সনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল তিনি পুণ্য মাতৃভূমির সর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্ত হইতে উত্তরে হিমাচল পাদমূলস্থ আলমোড়া পর্য্যন্ত, আবার ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব, রাজপুতনা পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। যখন যে স্থানে তিনি গিয়াছেন সেখানেই অসংখ্য নরনারী, যুবক-বৃদ্ধ, সমবেত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে বিজয়মাল্য অর্পণ করত স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা করেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার স্বদেশবাসিগণ উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় স্বামিজীকে অভিনন্দন পত্র দানে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্বামিজীও সর্বত্র ঐ সকল অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রামকৃষ্ণের বাণী উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রচার করিয়া তাঁহার স্বদেশকে উদ্বুদ্ধ করেন। পাঠক, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা এবং বিবেকানন্দের স্বদেশে ধর্ম্ম প্রচারের মর্ম্ম ও প্রণালীর সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে স্বামিজীর ইংরাজী গ্রন্থাবলীর, "Lectures from Colombo to Almora" শীর্ষক বক্তৃতাবলী (Complete works of the Swami Vivekananda, Mayavati memorial Edition, Vol. III), অথবা ইহার বঙ্গানুবাদ, "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থ পাঠ করুন। আবার, হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত, পাশ্চাত্য-বিজয়ী বিবেকানন্দের এই ভারত প্রদক্ষিণের আনন্দ-সমুজ্জ্বল দৃশ্যাবলীর সঙ্গে সেই অনশন অনিদ্রা পীড়িত, দুর্ভাবনাক্লিষ্ট, ক্ষুধিত-দরিদ্রের দুঃখে ব্যথিত হৃদয়, অজ্ঞাতনামা পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ ভারত-পর্য্যটনের চিত্তবিদারী চিত্রের স্মৃতি স্বতঃই মনে জাগিয়া উঠে। সেই চারি বৎসর পূর্ব্বেকার দীনবেশ, মুণ্ডিত মস্তক নরেন্দ্রকে যে দেখিয়াছে, সে কি ভাবিতে পারে, সেই নরেন্দ্রই আজ ভারতের এবং সমগ্র সভ্য জগতের সম্মিলিত শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার পাত্র,—মহা-মহিমা মণ্ডিত **স্বামী বিবেকানন্দ**! এই অঘটনীয় ঘটনায় অন্ধ ছাড়া সকলেই পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির লীলাভিনয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাইবেন।

বিবেকানন্দের ভারতে ধর্ম্মপ্রচার মূলতঃ তাঁর পাশ্চাত্য দেশে প্রচারেরই অনুরূপ। এখানেও তিনি স্বদেশবাসীকে রামকৃষ্ণের সেই সমন্বয় বাণী,—"সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্য, যত মত তত পথ"—এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছেন। এখানেও তিনি অদ্বৈত বেদান্তের অভয়-বাণী,—সমস্ত মানুষই "অমৃতের পুত্র", প্রত্যেক জীবই স্বরূপতঃ শিব,—এই কথা প্রচার করিয়াছেন। বিজ্ঞান (Science) ও প্রকৃত ধর্ম্মে বিরোধ নাই, জ্ঞান ও ভক্তি অভিন্ন, দ্বৈতবাদ অদ্বৈত-বিজ্ঞানের সোপান মাত্র,—এই সকল সর্ব্বসমন্বয় বিধায়ক তত্ত্বই তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। এদেশে এবং পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারের প্রণালীতে যাহা-কিছু পার্থক্য তাহা দুই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার পার্থক্য বশতঃ। এক সমাজের প্রকৃত উন্নতির পথে যে-সকল অন্তরায় দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা দূর করিবার জন্য তদুপযোগী তত্ত্বের বা উপায়টির উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজ আজ ধনদেবতাকে (Mammon) একমাত্র সর্ব্বকল্যাণ হেতু পরমেশ্বর জ্ঞানে দেহ-মন-আত্মা তাহার তুষ্টি সাধনে আহুতি প্রদান করিতেছে। তাই তথা-কথিত গণতন্ত্রের ও সাম্যবাদের বুলি পাশ্চাত্যেরা আওড়াইয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ধনী ও নির্ধনের, শ্রমিক ও বণিকের মধ্যে বিষম বিরোধ প্রতিদিন বিষমতর হইয়া উঠিতেছে। আবার, অর্থ-সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বশতঃ ঐ সমাজে রজঃশক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, ধনী, নির্ধন, কাহারও একমুহূর্ত্ত শান্তচিত্তে পারলৌকিক বিষয়ে মন দিবার অবসর নাই। আবার, মানবের আদিম পাপবাদে বিশ্বাস খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বের একটি অপরিহার্য্য অংশ হইয়া ঐ ধর্ম্মাবলম্বীকে দারুণ নিরাশার তিমিরে আচ্ছন্ন, অত্যন্ত নিঃসহায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এইসকল কারণে বিবেকানন্দ পশ্চিমদেশে অদ্বৈত-বেদান্তের মূলসূত্র,—মানবের দেবত্ব, মানবাত্মা পরমাত্মার একত্ব, রাজযোগের ধ্যান-প্রণালী, অন্তর্ম্মুখীনতার উপর সবিশেষ জোর দিয়াছেন এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনা, কোনও মতবাদে বিশ্বাসমাত্র নহে; পক্ষান্তরে পরমেশ্বরের সত্তার অপরোক্ষ উপলব্ধিই ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য,—এই কথা বারংবার বলিয়াছেন। অপরদিকে, ভারতীয় হিন্দুসমাজের দেহ অন্নাভাবে কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে, নানা ঐতিহাসিক কারণে তাহার মানস-শক্তি ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছে ; শিক্ষা ও অর্থের অভাবে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন অসহনীয় হইয়া পড়িতেছে। আবার, অবনতির যুগে উদ্ভূত নানারূপ সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রের সাম্য, মৈত্রী, ঐক্যের শিক্ষা সামাজিক জীবনে আচরিত হইতেছে না। তাই বিবেকানন্দ ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়কে সর্ব্বাগ্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জন-সাধারণের দেহ পুষ্টির পথ খুলিয়া দিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, কর্ম্ম শক্তি, মানসিক বল, আত্ম-প্রত্যয় লাভের জন্য বারম্বার "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ", উপনিষদের এই মন্ত্রের উপর জোর দিয়াছেন, শিবজ্ঞানে জীব সেবারূপে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগই পরম ধর্ম্ম, এই শিক্ষা প্রত্যেক ভারতীয় যুবকের চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, উচ্চতর শ্রেণীর দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরের মানব-সাধারণ যে আজ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ, পশুর অধম বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহা দূর করিয়া প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানের সাম্য-মৈত্রী জীবনের প্রতিকার্য্য ও আচরণে প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশীয় যুবকবৃন্দকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। আর সর্ব্বোপরি, নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইয়া, ঋষিত্ব লাভ করিয়া, প্রাচীন ঋষিগণের আধ্যাত্মিক সম্পদ্, অমৃতের ভাণ্ডার সমগ্র জগতের নিকট মুক্তহস্তে বিলাইয়া দেওয়াই বর্ত্তমান ভারতের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ব্রত,—এইটিই বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের অন্যতম, মূলগত কথা। আমরা যদৃচ্ছা স্বামিজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলী এবং ভারতবাসীর নিকট লিখিত পত্রাবলী হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এদেশে ধর্ম্মপ্রচারের আভাস দিব।

চিকাগো হইতে তিনি ১৮৯৪ ইংরাজীতে মান্দ্রাজের কোনও যুবককে লিখেন :—"দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যাবসায়শীল হও, ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাজে লাগো, আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে,— জন সাধারণের উন্নতি বিধান। মনে রাখিবে—দারিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। * * জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে সাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার ? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার ? ইহাই করিতে হইবে। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীর হৃদয় যুবক বৃন্দ।" অন্য পত্রে লিখেন :—"আমার সিদ্ধান্ত এই, —পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন। ভারতের দুর্দ্দশার মূল—জন সাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচ প্রকৃতি, আর আমাদের দেব প্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই যে, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া —এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি সাধন করিতে পার। পুরোহিতগণ, বিদেশীয় রাজগণ (অভিজাত্য গর্ব্বিতগণ) তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে।" আবার :—"পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। * *

হে যুবকবৃন্দ, ! যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই সে মৃত, প্রেত বই আর কি? হে যুবকবৃন্দ! দরিদ্র, অজ্ঞ অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমার অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে, অদম্য উৎসাহ, অনন্তশক্তি আসিবে। * * যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। * * প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাটিয়া ফেল, দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ। ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার?" আবার লিখিয়াছেন:—"পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্য্যের নিশান,—কায়, মন, বাক্য, "জগদ্ধিতায়" দিতে হইবে। পড়েছ,—"মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব"। আমি বলি,—"দরিদ্রদেবোভব, মূর্খদেবোভব,"—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, আর্ত,—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম্ম জানিবে।".

আজ মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তিন সপ্তাহের অনশন ব্রত ধারণ করিয়া জীবন আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অদ্য হইতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয় ভারতের এই তথাকথিত অস্পৃশ্য নবদেবতাদের জন্য কিরূপ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাহা উক্ত সনে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশের স্বদেশবাসী সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতি তীব্রধিক্কার-বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছিল:—" * * * ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ, সব পলায়ন। এখন আছে কেবল ছুঁৎমার্গ,—আমায় ছুয়োনা, আমায় ছুয়োনা। ভালামোর বাপ!! হে ভগবান্। এখন ব্রহ্ম হৃদয়-কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে। পূর্ব্বে মহতের লক্ষণ ছিল, "ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ", এখন হচ্ছে আমি পবিত্র, আর দুনিয়া অপবিত্র। * * আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ" (বসন্তের ন্যায় লোক-কল্যাণ আচরণ করেন),—এই আমার ধর্ম্ম। অলস, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাইনা। যার ভাগ্যে থাকে সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা 'কর্ত্তে পারে।"—এই মহাপাপের, বিকৃতিপ্রাপ্ত বর্ণ বিভাগের এই বিষময় পরিণামের প্রতিকার কি তাহা বিবেকানন্দ, "Vedanta, the only remedy for the evils of the Age" শীর্ষক বক্তৃতায় তাঁর স্বদেশবাসিগণকে বলিয়াছেন:—"ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। আমাদের আভিজাত্যের আদর্শ অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আধ্যাত্মিক সাধন সম্পন্ন, মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আবার যখন যুগ-চক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগ-চক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে, আমি তোমাদের দৃষ্টি

এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। * সুতরাং উচ্চবর্ণকে অবনত করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগ সুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতি-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিকধর্ম্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়,—তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে। * * ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ আছে। * * সে আদেশ এই—'চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম 'পারিয়া' (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলেরই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।'—বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে,—সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। * * আমি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ নহে।"—

কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয়দের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি কি, তাহা কিরূপে দূর করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কি, জগতের নিকট দায়িত্ব কি ও তাহা কিভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে,—এই বিষয়গুলিই বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে প্রচারের মুখ্য কথা। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র, প্রায় সমস্ত বক্তৃতায়ই ঐ বিষয়ে কর্ত্তব্য সাধনে যুবক বৃন্দকে আহ্বান করিয়াছেন, অগ্নিগর্ভ ভাষায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। আমরা দু একটি বক্তৃতার কয়েকটি অংশের অনুবাদ নমুনা স্বরূপ পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিব :—

"ভারতে আমাদের অভাব কি, প্রয়োজন কি? * * আমাদের উপনিষদ্ যতই বড় হউন, অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ যতই বড় হউন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য,—ইহা আমাদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না, একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর। * * * শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে ইহা বদলাইয়া সবল-মস্তিষ্ক হইতে হইবে,—আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম্ম পরে আসিবে। * * তোমাদিগকে আমি বলিতেছি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা 'গীতা' অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু সতেজ হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভালরূপে বুঝিতে পারিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ্ ও আত্মার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। * * শত শত শতাব্দী ধরিয়া আভিজাত্য সম্প্রদায়, রাজশক্তি * * তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিয়াছে, * * তোমরা এক্ষণে পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের ন্যায়। * * আমাদের চাই এখন বল, চাই এক্ষণে বীর্য্য! (ক্রমশঃ)

---

* "তিনি (রামকৃষ্ণ) যে দিন থেকে জন্মেছেন, সেইদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত মূর্খের ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। * * * হিন্দু মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান্ হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদ, লড়াই ছিল তা অন্যযুগের, এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। * * * ভারতে দুই মহাপাপ,—মেয়েদের পায়ে দলন, আর জাতিজাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all, high and low (তিনি স্ত্রীজাতির উদ্ধার কর্ত্তা, জনসাধারণের উদ্ধার কর্ত্তা, উচ্চ নীচ, সকলের উদ্ধার কর্ত্তা)।"

"বিবেকানন্দের পত্রাবলী", ৩য় ভাগ, ১৪০—৪১ পৃষ্ঠা।

পুঁথি ও পত্র

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্‌সা, ৺কাশীধাম হইতে স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

গ্রন্থ প্রণেতা স্বামী কৈবল্যানন্দ দীর্ঘকাল সাধন ভজনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ পূজা জপ ধ্যান প্রভৃতি ব্যাপারে রত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন।

ইহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর পূজা, নারায়ণ পূজা, শিবরাত্রি পূজা, দাক্ষিণা কালিকা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সংক্ষেপ সন্ধ্যাবিধি, আরাত্রিক বিধি, সংক্ষিপ্ত হোম প্রভৃতি শ্রীভগবানের ভক্তগণের মনোরঞ্জক যাবতীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ভক্তগণের নিকট ইহা অতি আদরের সহিত গৃহীত হইবে নিঃসন্দেহ।

ছেলেদের গান—(২য় সংস্করণ) স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত। মূল্য চার আনা। প্রকাশক গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা।

'ইহা একখানি চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত পুস্তক। পুস্তক প্রণেতা নিজে অভিজ্ঞ-সুগায়ক। ছাত্র সমাজের উপযোগী গান সমূহ এই পুস্তকে মুদ্রিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিকট ইহা যোগ্য আদর লাভ করিবে।

পতাকা এবং কর্ম্ম বিজ্ঞান (প্রথম ভাগ)—প্রণেতা ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ। প্রকাশক স্বামী আত্মানন্দজী—প্রধান অধ্যাপক, শরৎ কুমারী সংস্কৃত বিদ্যাশ্রম, ৬ নং গোদৌলিয়া, বেনারস সিটি।

মানব মনের অন্তর্নিহিত বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক। অন্তরস্থিত ভাব যখন বাহিরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় তখনই জনসমাজ উহাকে ঠিক ঠিক জানিতে পারে। সেই অভিব্যক্তিকেই পতাকা বলা হয়। গ্রন্থকার এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

কর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'নিয়মের বাঁধন এবং যশের উৎসাহ দ্বারা মানুষকে ঈশ্বরীয় ভাবের কর্ম্মী করিতে পারা যায় না, যদি মানুষ নিজের বিবেকের অধীন, অথবা অন্য কোন প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর অধীন না হইতে পারেন।' ইহা অতি সুন্দর কথা। পুস্তকে অন্যান্য অনেক আলোচনা আছে। কিন্তু অধিকাংশই অতি সংক্ষিপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী পত্র

মেরাণো
২৬।৩।৩৫

মিসেস্ ক্রাঁ এইচ্‌ ফেরা, হামবার্গের একজন বিখ্যাত মহিলা। তিনি ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী এবং হামবার্গ ও জার্ম্মানীতে ভারতীয় ছাত্রগণের বিশেষ সাহায্যকারী। তিনি মেরাণো হইতে লিখিতেছেন—

"* * * রামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী সমিতির সাধারণ সভ্য হইবার নিমিত্ত আহুত হইয়া আমি নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করিতেছি। আপনারা যে সভ্য হইবার সম্মান আমাকে দান করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, যতই আমি

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং ভারতীয় সাহচর্য্য লাভ করিতেছি ততই আপনাদের দেশের আধ্যাত্মিক এবং কৃষ্টিগত আন্দোলন সম্বন্ধে জানিয়া উৎসাহিত ও মুগ্ধ হইতেছি। সেইজন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি সভাপদ স্বীকার করিলাম।

(স্বাঃ) ফ্রাঁ এইচ্ ফেরা

প্যারি হইতে অধ্যাপক সিলভান্ লেভি লিখিতেছেন—

"* * রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করিতেছি। তাঁহার হৃদয় ও মন যেমন সর্ব্বদেশের জন্য ছিল, তাঁহার নামও তেমনি সমস্ত মনুষ্য জাতির সম্পত্তি। এই স্মৃতি উপলক্ষে পৃথিবীর সকল দেশ—অন্ততঃপক্ষে যে দেশ সমূহ গোষ্ঠীগত গণ্ডির পারে ও উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া মানবের দেবত্বে বিশ্বাস করে, সে সকল দেশ একত্রিত হইতে পারে।

(স্বাঃ) সিলভান্ লেভি

প্রিন্সিপি এনড্রি বন্‌কম্ প্যাগ্‌নি লুডোভিসি—শতবার্ষিকীর অন্যতম সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া রোম হইতে লিখিতেছেন—

"আপনাদের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইয়া আপনাদিগকে সদয় ধন্যবাদ দিতেছি। শতবার্ষিকীর অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত হইয়াছি এবং ঐ পদ আমি সানন্দে গ্রহণ করিতেছি। শত বার্ষিকীর এই সুন্দর আদর্শের নিমিত্ত আমি যথা সম্ভব কার্য্য করিবার আশা করি।

(স্বাঃ) এনড্রি বন্‌কম্ প্যাগ্‌নি লুডোভিসি

১৯।৪।৩৫

হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারত-তত্ত্বের' অধ্যাপক ওয়াল্টার ইস্থ্রিং লিখিতেছেন—

"শতবার্ষিকীর সাধারণ সভ্য হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হওয়ায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যাঁহারা আপনাদের দেশের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ও চিন্তার বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি এই অবশ্য করণীয় স্মৃতি-যজ্ঞে যোগদান করিবেন না। বর্ত্তমান কালের আধ্যাত্মিক ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার সম্মানের জন্য স্থাপিত সমিতির সভ্য হইবার জন্য আমি আনন্দিত হইতেছি এবং আপনাদের প্রস্তাবিত কার্য্যাবলী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন।

ভবদীয়

(স্বাঃ) ওয়াল্টার ইস্থ্রিং

মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর স্যার আলাদি কৃষ্ণ স্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ ভারতের ভেঙ্কট-গিরির মাননীয় কুমার রাজা বাহাদুর শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর জেনারেল কমিটির সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

মিসেস গিলেলা মুনিভা ক্রেগ্ রোমের একজন বিশিষ্টা মহিলা, তিনি ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসাহী। তিনি রোমে সুফি আন্দোলনের সম্পাদিকা, উক্ত মহিলা শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর জেনারেল কমিটির সভ্য হইয়া নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছেন—

ভিলেনো ক্যাটেরিনা
রোম

প্রিয়—

আপনাদের পত্রের নিমিত্ত ধন্যবাদ। অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাদের শতবার্ষিকীর সভ্য হইবার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি।

জে, ই, ডব্লিউ, সি এ বিষয়ে জগজ্জননী কালী সম্বন্ধে লিসেয়াম ক্লাবে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। উহা খুব আদরণীয় হইয়াছিল।

(স্বাঃ) গিলেলা মুনেভা ক্রেগ

সংঘ ও বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, সারগাছি
(মুর্শিদাবাদ)

সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সপ্তমবার্ষিক উৎসব গত ১৯শে মে সবিশেষ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবের দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট পূজা ভোগ রাগাদির অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণকে ভজন সঙ্গীত ও কীর্ত্তন দ্বারা আপ্যায়ন করা হইয়াছে। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি-এ, বি ই, মহাশয় সভায় শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর পক্ষ হইতে আশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই প্রথম অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামিজী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৮৯৭ সনে মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য্যের বর্ণনা করেন। ঐ সনেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯১২ সনে আশ্রমের জমি ক্রয় করা হয়। এই অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। সভায় নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ বাঙ্গলায় এবং বেলুড় মঠের স্বামী ঘনানন্দ ইংরাজীতে সময়োপযোগী বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। প্রায় পনর শত ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পর দিন শ্রীমান রণেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতার নেতৃত্বে, মহুলা গ্রামের ছাত্রগণ আশ্রম প্রাঙ্গণে 'ব্রতাচারী নৃত্য' কলা দেখাইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

তমলুকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শততিতম জন্মোৎসব—তমলুক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শততিতম জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২০শে মে, সোমবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ তমলুকে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এক শোভাযাত্রা সহ অভ্যর্থনা করা হয়, ঐ দিন সন্ধ্যায় মহিলাগণের জন্য একটী ধর্ম্মালোচনা সভা আহূত হইয়াছিল, প্রায় চারিশতাধিক মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। পর দিবস ২১শে মে মঙ্গলবার অপরাহ্নে স্থানীয় পাঁচটী স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক বিতরণ করা হয়, অতঃপর সন্ধ্যায় রাজা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সভাপতিত্বে স্বামিজীকে দেশবাসী ও কর্ম্মিগণের পক্ষ হইতে দুইটী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে স্বামিজী সমবেত ভক্ত, কর্ম্মী, ভদ্র-মহোদয় ও মহিলাবৃন্দকে—ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে বেলুড় মঠের স্বামী আত্মানন্দ হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়। পরদিবস সকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ আশ্রম পরিচালিত

অবৈতনিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আশ্রম প্রাঙ্গণে অপর একটী ধর্ম্ম-মহাসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামী আত্মানন্দ উক্ত সভায় 'সেবা-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই উৎসবে প্রায় তিন হাজার ভক্ত ও ষোল শত দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদান্ত সোসাইটী ওয়াশিংটন (আমেরিকা) ওয়াশিংটন সহরের বেতার ষ্টেশন (W O. L) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেদান্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী ভারত এবং ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ৭টী বক্তৃতা দান করিয়াছেন। নয়টী প্রধান বেতার ষ্টেশন হইতে এই বক্তৃতা আমেরিকার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় :—

(১) ভারতের আদর্শ, (২) ভারতে জাতি বিভাগ, (৩) হিন্দুনারী, (৪) ভারতীয় কাব্যে অজ্ঞেয়বাদ, (৫) আদর্শ মানব—গান্ধী, (৬) হিন্দু উপাখ্যান, (৭) নব্য ভারতের অবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—বিগত ১৮ই মে চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভুক্ত স্বামী বিবেকানন্দজীর পূর্ব্বপুরুষগণের ভদ্রাসন তারাগুণে গ্রামে শ্রীযুক্ত মনীগোপাল ঘোষের বাটীতে বেলুড়মঠের স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, স্বামী আত্মবোধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজ গমনপূর্ব্বক যথোপযুক্ত শাস্ত্রীয় বিধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ সপ্তশতী হোম ও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন। অপরাহ্নে স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও শ্রীযুক্ত রামপদ কাব্যতীর্থ "যুগধর্ম্ম" ও "সেবা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং রাত্রে স্বামী বাসুদেবানন্দজী ছায়াচিত্রে "হিন্দুধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহুলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

টাকীতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও বক্তৃতা :—টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২শে মে তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ ও নির্ব্বেদানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। তৎপর দিন টাকী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত এ, কে, রায় মহাশয়ের গৃহের বিরাট প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রে "হিন্দু ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে স্বামী বাসুদেবানন্দ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সৈয়দপুর বিগত ১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেবের শত বার্ষিক জন্মোৎসব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তন, পূজা পাঠ, হোম ও ভোগরাগাদি হয়। অপরাহ্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী এবং নিলফামারীর শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১লা এপ্রিল হইতে দিবসত্রয় স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী সায়াহ্নে বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণকে মোহিত করেন।

হাইলাকান্দী (কাছাড়) শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রম। গত ৪ঠা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

বেলুড়মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ মহারাজের পদার্পণে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য সব্-ডিভিসনেল অফিসার মিঃ মজুমদার সাহেবের সভাপতিত্বে ও স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বার এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বিশ্বাস, বি-এল, মহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঐ তারিখে আশ্রম প্রাঙ্গণে ই, এ, সি, মিঃ ইমামুদ্দিন খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে তিনি "ধর্ম্মে অনৈক্য ও তাহার প্রতিকারের উপায়" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। সভায় বিপুল জন সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি মিঃ খান সাহেবের অভিভাষণও অতি সুন্দর হইয়াছিল।

স্বামী করুণানন্দের পর্য্যটন ও বক্তৃতা। বেলুড় মঠের স্বামী করুণানন্দজী গৌহাটী, মণিপুর, লামডিং, শিলচর, আগরতলা, প্রভৃতি স্থান হইয়া চাঁদপুরে আগমন করিয়াছিলেন, সকল স্থানেই তিনি বক্তৃতা ও নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা। শ্রীবুদ্ধের জন্মোৎসব। গত ১৯শে মে, রবিবার, ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে এক ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল, "বৌদ্ধধর্ম্ম কি নাস্তিক্যবাদ ?" সম্বন্ধে একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক্যবাদ নয়, তৎসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীবুদ্ধের ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতার যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখান। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গুলী বৌদ্ধস্তূপ, মূর্ত্তি, বিহার, ও স্থপতি সম্বন্ধে গবেষণামূলক বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, বি-এল, বুদ্ধের জীবনী ও ও শিক্ষার অন্যান্য দিক সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ও শাঙ্কর দর্শন আলোচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যে বাস্তবিক নাস্তিক্যবাদ নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

শোক সংবাদ

আমরা শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদে মর্ম্মাহত। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এইজন্য আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। গঙ্গাচরণ বাবু জন সাধারণের নিকট মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ উকিল ও রইস্ বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু তাঁহার অন্তরের রূপ আমাদের নিকট বিশেষ ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় ছিল ধর্ম্মজ্ঞানে আলোকিত এবং তাঁহার প্রাণটি ছিল শিশুর মত সরল। সংসার কার্য্যে তিনি যেরূপ সুদক্ষ নিরলস ও উচ্চ আদর্শে প্রণোদিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, পারত্রিকের চিন্তায়, দরিদ্র নারায়ণের সেবার ঐকান্তিক চেষ্টাতেও তিনি ঠিক সেই ভাবেরই নীরব অক্লান্ত কর্ম্মী, অনুসন্ধিৎসু এবং সাধননিষ্ঠ ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয়ের ক্লেশ বার্ত্তায়, আর্ত্ত দরিদ্রের ব্যাকুল আহ্বানে, তাঁহার হৃদয় স্বতঃই করুণাসিক্ত হইত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার চির শান্তির জন্য আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য-প্রণালী—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী আন্দোলনে সাহায্য দানের উপায়নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ এ, কে ফজলুল হক্ সাহেবের সভাপতিত্বে গত ৩০শে মে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রিয় মিউনিসিপাল্ অফিসগৃহে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, অলডারমেন্ এবং পদস্থ ও সাধারণ কর্ম্মচারিবৃন্দের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

মেয়রের আবেদন—মেয়র সাহেব একটী নীতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এবং শতবার্ষিকীর জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে সকলের নিকট আবেদন জানান। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে এতদুদ্দেশ্যে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা সার্ব্বজনীন জনহিতকর সেবা কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যয় করা হইবে।

কার্য্য-প্রণালী—ডেপুটী মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বেলুড় মঠের জনসভায় গৃহীত শতবার্ষিকীর সবিস্তৃত কার্য্যপ্রণালী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

অতঃপর মিঃ সি, সি, বিশ্বাস মহাশয় বলেন যে এই সভার উদ্দেশ্যাপেক্ষা উন্নত কল্পনা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না। তিনি ব্যক্ত করেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হাতে একটী পয়সারও অপব্যবহার হইবে না। তিনি বিশেষ ভাবে জন সঙ্ঘের নামে কর্পোরেশনের সকলকে এই কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"এই সভা শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর কার্য্য প্রণালী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারমেন এবং পদস্থ ও সাধারণ কর্ম্মচারিবৃন্দকে এই মহৎকার্য্য সাধনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিহার রিলিফ—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক বিহার ভূমিকম্পে পর্য্যুদস্ত জন সঙ্ঘকে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাহায্য দানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে "মেয়র ভূমিকম্প রিলিফ্ ফণ্ড' হইতে মিশনের রিলিফ্ ফণ্ডে যে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল উহার সদ্ব্যবহার সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

ফণ্ড কমিটি—মিঃ জে, সি, গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ইহাকে অন্যান্যভাবে সাহায্য করিবার জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—মেয়র, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ, সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্তভাস্কর মুখার্জ্জি ও মিঃ এচ্, সি, রায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলপতি চাটার্জ্জি, সহ-কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি—শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের প্রস্তাবে সাধারণ কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য নিম্নোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে,—

সভাপতি—মেয়র, সভ্যগণ—মিঃ এস্, কে, রায় চৌধুরী, সার্ হরিশঙ্কর পাল, কে-টি, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, মিঃ জুমার্, আমেদ, মিঃ এম্, এম্, বর্ম্মণ, মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি, ডাঃ বি, এন, দে, মিঃ এম্, এন্, বসু, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ, সহ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জ্জি, মিঃ বি, সি, রায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শৈলপতি চাটার্জ্জি, সহ-কোষাধ্যক্ষ—মিঃ ডি, এন, গাঙ্গুলী।

অর্থের জন্য আবেদন—কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ কে, সি, মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, খান বাহাদুর এইচ্, এ, মমিন, মাননীয় বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি কে, টি, মিঃ প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইলে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রাবণ—১৩৪২

এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে? দুনিয়া ছেলে খেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু এবমস্তু, শিবোঽহং শিবোঽহং!

—বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যান

দিব্যকাঞ্চনবর্ণাভং গুম্ফশ্মশ্রুবিমণ্ডিতম্।
নাতিস্থূলং নাতিকৃশং চন্দনং চর্চ্চিততনুম্॥

আজানুলম্বিতং বাহুং বদ্ধাঙ্গুলিপরম্পরম্।
যোগাসনস্থং যোগীন্দ্রং স্মিতহাস্যং মুখাম্বুজম্॥

শ্বেতবস্ত্র-পরিধানং তদর্দ্ধোত্তরীয়ান্বিতম্।
ধ্যানাবস্থিতং সুশান্তং অর্দ্ধনিমিলিতেক্ষণম্॥

বিপ্রকুলোদ্ভবং শুদ্ধং নিখিলতাপনাশনম্।
বাঞ্ছাকল্পতরুং ধ্যায়েৎ রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্॥

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী ধ্যান

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং বস্ত্রালঙ্কার-শোভিনীম্।
মুক্তকেশীং জগদ্ধাত্রীং অচিন্ত্যশক্তিরূপিণীম্॥

পদ্মাসনাং পদ্মহস্তাং পদ্মনেত্রাং সুহাসিনীম্।
বরাভয়করাং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্॥

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং রামকৃষ্ণ-পরায়ণাম্।
রামকৃষ্ণময়ীং রাম-কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

লজ্জাম্বরবিভূষিতাং পবিত্রতাশিরোমণিম্।
পতিকথারতাং দিব্যাং নানা সদ্‌গুণধারিণীম্॥

পতিলোকগতাং সৌম্যাং নিত্যবিদ্যাস্বরূপিণীম্।
ধ্যায়েৎ প্রযত্নতো নিত্যং মাতরং সারদেশ্বরীম্॥

শ্রীচারুচন্দ্র বিদ্যার্ণব

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ

—মহারাজ—শুধু ধ্যান জপ নিয়ে থাকা বড়ই কঠিন। আমি ত বেশীদিন পারলাম না। শ্রীশ্রীমহারাজ—দুএকবার পারিস্‌নি বলেই পারবিনি কেন? বার বার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে সাতবার পড়ে যায়, তবুও ছাড়ে না, শেষে দৌড়ুতে শেখে। প্রথমতঃ কর্মের মধ্যে থাকলে একটা training (শিক্ষা) হয়, তখন সেই মনকে সাধন ভজনে লাগান যায়, নইলে ভাসা ভাসা রাখলে সাধন ভজনের সময় সেই রকমই হয়। একটা সময় আসে যখন সব কাজ ছেড়ে শুধু জপ ধ্যান নিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়, তখন কাজও ছুটে যায়। মন যখন জাগ্রত হয়, তখন এটা হয়। নইলে জোর করে করতে গেলে দুচারদিন ভাল লাগে, তার পরই আবার monotony (এক-ঘেঁয়েমী) আসে। কেউ কেউ হয়ত পাগল হয়ে যায়, কেউ কেউ ভাসা ভাসা রকমে করে—আর দশটা জিনিষে মন থাকে। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা খুব শক্তি হয়—একটা লোক পঁচিশটে লোকের কাজ করতে পারে। আগেকার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মের মধ্যে কতকগুলো কাজ ছিল—জপ, ধ্যান স্বাধ্যায়, তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গ—এই সব। নিজের কিসে ভাল হবে সবাই কি-তা জানতে পারে? সেইজন্য গুরু সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হয়। তোমাকে পুরো freedom (স্বাধীনতা) দিচ্ছি কর দেখি? কদিন চলতে পার? দুচার দিন। মন এখন কাঁচা বলে, trained (শিক্ষিত) নয় বলে, যত গোল হচ্চে। আড্ডার মত শত্রু নেই, ওতে একেবারে ruin (ধ্বংস) এনে দেয়। নির্জ্জন বাস না করলে মনের working (গতি) বুঝতে পারা যায় না। নানারকম হট্টগোলের মধ্যে থাকলে জ্ঞানের একটা development (বৃদ্ধি) হওয়া শক্ত। হিমালয়ের মত জায়গা আছে? কি নির্জ্জন! কেমন পবিত্র জায়গা—গিয়েই ধ্যান মাথা ঠাণ্ডা রাখে—চার ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় হয়ে যায়।

আমি সকলকে freedom (স্বাধীনতা) দিই। নিজের নিজের ভাবে এগিয়ে যাক। [illegible] পারছে না, তখন help (সাহায্য) করি। একটা জায়গায় স্বামিজী ঠাকুরের কাজ নিয়ে লেগে থাকলে সব রকমে ভাল হয়। এক জায়গায় অমনি বেশীদিন থাকলে হয়ত মনে হতে পারে, 'কিছু করি না, বসে বসে খাই', অন্য লোকও বলতে পারে। একটা কাজ নিয়ে থাকলে মনও থাকে ভাল শরীরও থাকে ভাল। আমরা যখন কাজ করতাম, তখন শরীর মন কেমন থাকতো; তারপর কাজ ছেড়ে দিয়ে যে অবস্থা—এ দুটোর তুলনা করলে আগেরটাই ভাল বলে বোধ হয়। এ আমাদের ভেতরকার কথা বলছি। লোকে মনে করে, 'ওঁরা কাজ করেন না (যেমন আমি একটা স্থূল উদাহরণ বলচি), তেমনি আমরাও থাকব না কেন?' ওরকম বুদ্ধি করিসনি কখনও। অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে, দুচারটে জন্ম না হয় তাঁদের কাজে দিয়ে দিলি; ভুলও যদি হয়, না হয় দুচার জন্ম গেলই। কিন্তু তা হয় না। তাঁদের কৃপায় দেখিস হাউয়ের মত কোথায় উঠে যাবি। ওরকম আলগা দিয়ে আর কাটাসনি। ল্যাদাড়ে হলে সাধন ভজনও হবে না। যেটুকু কাজ করবি ষোল আনা মন দিয়ে করবি—এই হলো কাজের secret (কৌশল)। স্বামিজীও আমাদের তাই বলতেন। লেগে যা। একখানা কাগজ চালান তোদের পক্ষে কিছুই নয়। কাজ করবার সময়

একবার প্রণাম করবি, করতে করতে মাঝে interval (অবসর) পেলে স্মরণ করবি, আর কাজ শেষ করে প্রণাম করবি। তাঁদের কথা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের উপদেশ, আজ্ঞা এই সব চিন্তা করে দিন কাটাবি। মনে করিসনি যে কোনও লোকের কাগজ, ভাববি যে ঠাকুর ও স্বামিজীর কাগজ। কেউ কিছু বললে মনে করবি যে বড় ভাই দু'টো বলেছে। সব এক পরিবারের লোক। ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ব্যবহার হয় তেমনি করবি। তোরা সকলেই আমার কাছে সমান, আপনার।

মনকে শান্ত রাখতে হবে। Inertiaর (জড়তার) প্রশ্রয় না দিয়ে, স্থির ভাবে মনকে প্রশান্ত করতে হবে। নতুবা reaction (প্রতিঘাত) সামলান যায় না, ফলও খারাপ হয়। জপ ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই সংযত হয়ে আসে। কিন্তু প্রথম তাদের বশে রাখবার চেষ্টা করতে হয়। জপ ধ্যান এক sittingএ (বসায়) অনেকক্ষণ ধরে, পরে হয়। প্রথম দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার বসতে অভ্যাস করা ভাল। মন লাগুক আর না লাগুক, প্রথম জপ করে যাওয়া উচিত। কারণ, এমনি করে বসতে বসতে মন একাগ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ঐ শান্ত ভাবটার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও করে যাওয়া ভাল। কুণ্ডলিনী চেতন হলে রিপু-টিপু কোথায় পড়ে থাকে, তখন মনেও হয় না যে সে সব আছে।

প্রশ্ন—মন ত কিছুতেই স্থির হয় না মহারাজ?

শ্রীশ্রীমহারাজ—প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ করবে—কোনদিনও বাদ দেবে না। মন চঞ্চল বালকের ন্যায় কেবল পালাতে চাচ্ছে, তাকে পুনঃপুনঃ টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন করবে। এই রকম দু'তিন বৎসর করলেই দেখবে যে প্রাণে কী অনির্বচনীয় আনন্দ। তখন মনও স্থির হয়ে আসবে। প্রথম প্রথম জপ ধ্যান নীরসই লেগে থাকে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার মত জোর করে মনকে ইষ্ট-চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হয়। তবে ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। লোকে পরীক্ষায় পাশ করতে কত খাটে, কিন্তু ভগবান লাভ তার চাইতেও অনেক সহজ। কেবল প্রশান্ত অন্তঃকরণে সরলভাবে তাঁকে ডাকতে হয়। পরীক্ষায় পাশ করতে পারি, আর ভগবান লাভ করতে পারব না? এক একবার অত্যন্ত নিরাশা আসে, মনে হয় এত জপ করে যখন কিছুই অনুভব করতে পারলাম না, তখন বোধ হয় এসব কিছুই নয়। না—না, নিরাশ হবার কোনই কারণ নেই। কর্মের ফল অনিবার্য্য, হেলায় হোক আর খুব ভক্তির সহিত হোক, নাম করলে তার ফল হবেই। কিছুকাল নিয়মিত খুব সাধন করবে, এইরূপ সাধন করলেই দেখবে ক্রমে হৃদয়ে শান্তি এবং আনন্দ আসবে। ধ্যানে কেবল মনের নয়, শরীরেরও উন্নতি হয়। রোগাদি কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্যও ধ্যানাদি করা উচিত।

প্রশ্ন—মহারাজ মন্ত্রের কি প্রয়োজন? নিজে নিজে যে কোনও ভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেই ত হয়?

শ্রীশ্রীমহারাজ—মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়ত একরূপ ভাল লাগলো, কাল হয়ত আর একরূপ ভাল লাগলো, পরন্তু নিরাকারে মন গেল—ফলে কোনটারই একাগ্রতা হবে না। খুব করে যাও। প্রথম প্রথম ব্যাগার দেওয়ার মতই লাগে। যেমন ক খ লিখতে প্রথম প্রথম হয়। তার পরে ক্রমে শান্তি আসবে। আমাদের নিকট মন্ত্র নিয়ে যারা কেবলই complain (অভিযোগ) করে, 'মশাই কিছু হলো না'—আমি প্রথম দু'তিন বছর ও সব কোন কথাই শুনি নে। তার পর দেখা হলে বলে, 'হাঁ মহারাজ, কিছু কিছু হচ্ছে।' এসব রাজ হবার

জিনিষ নয়। দুতিন বছর করে যাও, তার পর দেখবে। আজ কাল অনেকেই ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চায়। (কেদার বাবুকে) বেশী হাঁক পাঁক করে কিছু হয় না—সময় না হলে হাঁক পাঁকে ফল নেই। ঠাকুর বলতেন, 'সময় না হলে পাখী ডিম ফুটোয় না। এ সময়কার মনের অবস্থা বড় কষ্টদায়ক। একবার আশা, একবার নিরাশা। কখনও হাসি কখনও কান্না আছেই। তবে তেমন গুরু মিললে তাঁরা মনটাকে তুলে নিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বেশী অসময়ে তুলে নিলে, শিষ্য তা সহ্য করতে পারে না। প্রাণায়ামাদি যোগ অভ্যাস ও-সময় ও-অবস্থার উপযোগী নয়। সাধুদের পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দরকার, খাওয়া দাওয়া ঠিক সাত্ত্বিক হওয়া চাই, আবার সদ্‌গুরুর উপদেশ চাই। প্রথম প্রথম ধ্যান ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ। ক্রমাগত পলাতক মনকে টেনে এনে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লাগাতে হয়। কাজেই এতে একটু পরেই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাই প্রথম প্রথম খুব brain exert (জোর করে মস্তিষ্ক চালনা) করতে নেই ও দমবন্ধ করে বেশীক্ষণ রাখতে নেই। যখন প্রকৃত ধ্যান হয়, তখন দুচার মিনিট বসে থাকলেও ধ্যান জপের পর, ঠিক সুষুপ্তির পর মনের মত, মন খুব refreshed (তাজা) বোধ হয়, আর শরীর মন খুব প্রফুল্ল বোধ হয়। শরীরের সঙ্গে মনের খুব নিকট সম্বন্ধ বলে, পেট গরম হলে সেদিন আর কিছুতেই ধ্যান হবে না। সেইজন্য খাওয়া দাওয়ার অত ব্যবস্থা। পেটের অর্দ্ধেক অন্নলে, এক পোয়া জল খাবে, আর এক পোয়া বায়ু গমনাগমনের জন্য খালি রাখবে।

কথা প্রসঙ্গে

(ধর্ম্মের প্রেক্ষাভঙ্গি)

হিন্দুর ধর্ম্ম আলোচনা করলে দেখা যায় জীবনের এমন কোনও ঘটনা নেই যার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। কাজেকাজেই হিন্দুর "ধর্ম্ম" শব্দটা ইংরেজী "রিলিজিয়ন্" শব্দ দ্বারা বোঝান যেতে পারে না। হিন্দুর "ধর্ম্ম" ও 'জীবনের বিকাশ" একই কথা। ধর্ম্ম শব্দটি ঋগ্বেদ এবং প্রাচীন-বাইবেলের প্রাচীনত্বের তুলনায় খুবই আধুনিক। কারণ তখন জীবনের রক্ষা ও সুখ কল্পে প্রত্যেক ঘটনাই ছিল ধর্ম্ম, কাজেকাজেই "ধর্ম্ম" শব্দের তখন কোনও ভাবের বিশিষ্টতার জন্য প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু আধুনিক নৃ-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে দর্শন, বিজ্ঞান ও রূপায়ণ শিল্পের জন্মদাত্রী হচ্চে ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তারা এখন সাবালক হয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করছে। তাঁদের মতে মানবের বিশ্বাস এবং ধারণা যখন অযৌক্তিক বা অন্ধ ছিল তখনই ছিল ধর্ম্মের শাসন; কিন্তু বিশ্বাস যত যুক্তি-মার্জ্জিত হয়ে উঠ্‌চে ততই তারা স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করায় ধর্ম্ম জিনিষটা ক্রমেই প্রত্নশালার জিনিষ হয়ে আসচে। আদিম যুগে দেবতাদের ইচ্ছাই ছিল বিধি-নিষেধ। নীতি "টাবু" (taboo) দ্বারা নির্ণীত হোত। দেবতার মূর্ত্তি ও মন্দির গড়তে গিয়ে শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। দেবতার পৌনঃপুনিক স্তুতি ও তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি হতেই নৃত্য ও গীতের উৎপত্তি। নাটকাদির

উৎপত্তি যাজ্ঞিক-ক্রিয়াকাণ্ডের বিচিত্র ক্রম হতে। পুঁথি প্রাচীন হলেই হয় শাস্ত্র।

কিন্তু হিন্দুর ধর্মাদর্শ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চতুর্বর্গ এক অখণ্ড মহাপ্রাণ সর্ব ব্যক্তিতে সমভাবে বিকশিত না হওয়ায়, প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শের তারতম্যেরও প্রয়োজন আছে। রূপায়ণ (Art), বিজ্ঞানাদি এই চতুর্বর্গের সাধক, তাই তারাও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত—বৈদিক ও ঐতিহাসিক যুগে একই কারণে যে কোন বিষয়ের আবিষ্কারকই ঋষি পদ বাচ্য। তবে চতুর্বর্গের সাধক, বিভাগ ভেদ ছিল—পরা বা মুক্তি-সাধক অপরা বা ইহ ও পারলৌকিক সুখ-সাধক। কিন্তু ক্রমে পরাবিদ্যাই শ্রীবুদ্ধের পর হতে "ধর্ম" আখ্যায় পরিচিত হয়ে পড়লো। কিন্তু ধর্ম শব্দের সঠিক অর্থ—স্বভাব, কাজেকাজেই যা অন্তর্নিহিত সর্ব-দিকস্পর্শী আত্মস্বভাব—শাস্ত্রে যাকে 'সর্বজ্ঞত্ব'—সর্ববাধাহীন 'মুক্তি'—দুঃখের আত্যন্তিক অভাব—আনন্দ বলা হয়েছে, তার পরিপূর্ণতার জন্য জীবনের কোনও বিশিষ্ট-অনুশীলনে ধর্মকে গণ্ডিবদ্ধ করা চলে না; অথবা কোনও অনুশীলনকে ধর্ম বা আত্মস্বভাব হতে বিচ্যুত করলে আত্মার অখণ্ড স্বভাব যে বিশিষ্ট উপাধির মধ্যে স্বীয় অভিব্যক্তি, সর্বজ্ঞত্ব ও রসবত্তার বৈচিত্র্য সম্পাদন কোরে বিশিষ্ট বিজ্ঞান রূপায়ণাদির সৃষ্টি করচেন—এই বিশ্বজনীন ভাবের অভাবে—ঐক্যের স্থলে অনৈক্য, সমন্বয়ের স্থলে সংঘর্ষ, সুরসঙ্গম স্থলে সুরসংগ্রাম সৃষ্টি হবে।

অন্ধ-বিশ্বাস বলতে জগতে কিছু নেই। যে কোনও লোকের জ্ঞান যতই স্থূল হোক না কেন, সে মনে করে না যে তার ধারণা অন্ধ বা অযৌক্তিক—আমার নিকটই তার জ্ঞানটা অন্ধ। দেশকালপাত্র, দেহ ও মনের সঙ্কোচ ও বিকাশ ভেদে মানুষ অল্প বা অধিকতর সত্যের ধারণা করছে। মানুষ কখনও অসত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করে নি। তার কোনও স্তরেই 'খ-পুষ্প' বা 'শশশৃঙ্গ' কে সত্য বলে গ্রহণ করতে দেখা যায় না। মানুষ চলেছে, অল্প সত্য হতে অধিকতর সত্যে। যখন মানুষ বিশ্বাস করত মৃত্তিকা একটা মৌলিক পদার্থ—তখনও তারা অন্ধ ভাবে তা গ্রহণ করে নি—তাদের একটা বেশ যুক্তি ছিল—কিন্তু মানুষ যখন ক্ষিতি পরমাণুর আবিষ্কার করলে তখন তারা আরও অধিকতর সত্যে উপনীত এবং পূর্বের বিশ্বাসটা তাদের কাছে অন্ধ বা অযৌক্তিক বলে পরিগণিত হলো। ক্রমে যখন আর এক দল এসে বললে, অজ্ঞেয় জগতের যে অংশ নাসিকা গ্রাহ্য তাই ক্ষিতি, যা রসনা গ্রাহ্য তাই অপ—তখন আবার রাজ্যে আর এক বিবর্তন উপস্থিত হলো। দেশের প্রতি যেমন মানুষের একটা প্রীতি আছে, কালের প্রতিও সেইরূপ। প্রত্যেক যুগের মানুষ মনে করেছে যে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যৌক্তিক এবং অতীত চিরকালই অন্ধ। হিন্দুরা প্রাচীন বেদে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁদেরও প্রত্যেক যুগের শাস্ত্রকারগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন এবং চিরকালই অতপ্রায় অতীত আগামীর প্রতি দোষক্ষেপ করেচেন। একটা বেশ ইংরেজী কবিতা মনে পড়েচে—

My grandad notes the world's worn cogs
And says we're going to the dogs.
His grandad in his house of logs
Thought things were going to the dogs.
His dad amoung the flemish bogs,
Swore things we're going to the dogs.
The cave man in his queer skin togs
Knew things were going to the dogs.
Yet this is what I'd like to state,
These dogs have had an awful wait.

পক্বান্তরে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম প্রকাশ করেছিলেন বা টলেমি সৌরজগৎ পৃথিবী কেন্দ্র

এবং কোপার্নিকস সূর্য্য-কেন্দ্র বলেছিলেন বলে, আইনষ্টিনের ছাত্রেরা আপেক্ষিকতার দিক থেকে তাঁদের মিথ্যাবাদী বা দুরভিসন্ধ আখ্যা দিতে পারেন না—তাঁরা আধুনিক সকল দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের মতই আন্তরিক ও সত্যবাদী ছিলেন। ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদ ও উপবেদ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। জগতের ঋষিরা জগতের বৈষম্যে, অজ্ঞানে, অর্দ্ধ ও আবরিত সত্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়েই অধিকতর সাম্য, জ্ঞান ও স্পষ্টতার আবিষ্কার করেছেন। ধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট অর্থেও (অর্থাৎ যদি মাত্র ঈশ্বর-তত্ত্ব ধরা যায়) বিভিন্ন ব্যক্তির ধীরে ধীরে অধিকতর আত্মিক অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের যদি কোন এক ব্যক্তিও কোন একটি তত্ত্ব সত্য-সত্যই উপলব্ধি করে এবং তার জন্ম যদি বিজ্ঞানের সকল তথ্যকেই পুনর্ব্যাখ্যা করতে হয়—সত্যের খাতিরে তাও করা উচিত, তবুও সেই যথার্থ তত্ত্বটিকে উপেক্ষা করা চলে না।

আবার সত্য বললেই যে মানুষ গ্রহণ করে, তা নয়। জগতের অধিকাংশ সত্যবাদীরা পাগল বলে পরিচিত—কারণ তাঁদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্যের অধিকতর আভাস পাওয়ায় তাঁরা বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট হতে পারেন না; তাই তাঁরা যা অধিকতর সত্য তা ধ্বনিত করতে থাকেন এবং তদনুযায়ী সমাজ গড়বার জন্ম 'জন'কে আহ্বান করেন। কেহ কেহ হয়ত তাতে যোগ দেয়; পরন্তু অধিকাংশেরই নিকট তাদের দেহ ও মনের অযোগ্যতা হেতু, সত্যকে মিথ্যা বলে বোধ হয়—ফলে সমস্ত সমাজের পদ্ধতিতে গোলযোগ বাধায় সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকে "criminal" (দোষী) বলে অধিকাংশ যুগ-সন্ধিক্ষণে আত্ম প্রাণ বলি দিতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপে মিশর দেশীয় রাজা 'আখেন অতেনের' কথা বলা যেতে পারে। ১৩৮৮ খৃঃ পূঃ তিনি থিব্‌সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩ বৎসর বয়সে রাজা হন। আজ প্রায় ৩৫০০ হাজার বছরেরও আগের কথা। কিন্তু সেই বহু ঈশ্বরবাদ, মাতা ও ভগ্নি বিবাহ, ধাপ্পাবাজী ও পশুবলের যুগে আমরা এমন একটা মানুষ পাই, যিনি বিংশ শতাব্দীর কোন উচ্চচিন্তকের অসমকক্ষ নন। অতি প্রাচীন কিন্তু আধুনিক ইতিহাসের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আমরা এমন একজন সুচিন্তাশীল রাজর্ষিকে পাই যিনি একেশ্বরবাদী, এক প্রাণরূপী সূর্য্যের উপাসক,—'দেবগণ' শব্দের লোপকারী, শান্তিবাদী,—সকলেই সূর্য্য-হতে জাত, তাই শত্রু বর্দ্ধমান হতে থাকলেও তিনি যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হন নি, শিল্প বিষয়ে বস্তু-তান্ত্রিক, শাসনে গণ-তান্ত্রিক, প্রাচীন-ধর্ম্ম-বিদ্রোহী, মানব-সেবক, আন্তর্জ্জাতিক এবং আধুনিক ধর্ম্মের একজন প্রাচীন প্রতিনিধি। তাঁর পিতা তৃতীয় অমেন হোটেপ্ একজন প্রাচ্য-দেশীয়া অজ্ঞাতনামা কন্যাকে বিবাহ করেন। পুত্রের ওপর মাতার প্রভাব ছিল খুবই বেশী। আখেন অতেনের সূর্য্যাস্তোত্রগুলি বৈদিক সূক্তগুলির সমকক্ষ। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক দিঙ্মণ্ডলে বোধহয় তিনিই প্রথম শিক্ষা দেন—পিতা ও স্বামীর কিরূপ হওয়া উচিত, সাধুলোকের আচরণ কিরূপ, ঋষিভাবের খনি কোথায়, বৈজ্ঞানিকের অগ্রসর পদ্ধতি কি ভাবের এবং দার্শনিকের চিন্তাধারার উদ্দেশ্য কোথায় পরিসমাপ্ত। কিন্তু এই অতি-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবের পরিণাম হলো, যা খৃষ্টকে, গালিলিও-কোপার্নিকাসকে পরবর্ত্তী কালে ভোগ করতে হয়েছে।

এমনি ভাবে পৃথিবী যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের একক্ষণে প্রাণের সর্ব্বদিকস্পর্শী অনুশীলন আরম্ভ হয়, সপ্তসিন্ধু প্রদেশে—যা এখন তদ্দেশীয় বংশধরগণের নিকট ধর্ম্ম বলে পরিচিত। বর্ত্তমানকালে জীবনের ও প্রকৃতির বিভিন্ন ধারাকে অবলম্বন করে যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং বিভিন্ন

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে অবলম্বন করে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনের সৃষ্টি—ঠিক সেই অতি প্রাচীন যুগে, যখন 'ধর্ম্ম' অর্থে প্রাণের বিকাশের সাধক ছিল, তখন প্রাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তির বিশিষ্ট জ্ঞানকে অবলম্বন করে এক অখণ্ড প্রাকৃত (জগৎ সম্বন্ধীয়) ও আধ্যাত্মিক (আত্মসম্বন্ধীয়) দর্শনের সৃষ্টি হয়। তাঁরা প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সহায়ে নির্ণয় করলেন যে এই যে ঘূর্ণায়মান সংসারচক্র—যার স্বভাব কাল ও পরিবর্ত্তন, সূক্ষ্ম-শরীরের পুনর্জনন শক্তির প্রভাবেই চলেছে। সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্নিহিত সংস্কাররূপ বীজ শক্তিই পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীরের স্রষ্টা। আর এর ভোক্তা ও কর্ত্তা হচ্চে 'অহং' বোধ। অহং হচ্চে অন্তকরণের সংস্কার স্রোতে প্রতিবিম্বিত অলাত-চক্রবৎ জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট উপাধি। জ্ঞান যা তা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবিশেষ; পরন্ত প্রতিবিম্ব প্রবাহকারে নিত্য, সংস্কার-শক্তির গতির মত চির পরিবর্ত্তনশীল, কেবল ক্ষিপ্রতা-হেতু সেটাকে পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে স্থিতিশীল—ক্ষণিক পৌনঃপুনিক ভোক্তৃ ও কর্ত্তৃ বৃত্তি সমূহকে এক অখণ্ড অহং বোলে ভ্রান্তি হচ্চে। এই যে সংসারচক্র—স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্ম-মানসিক-বৃত্তিসমূহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ জীবকে অসংখ্য জীবন-মরণের ভেতর দিয়ে অনাদিকাল হতে ঘোরাচ্চে; অজ্ঞান বশতঃই এই ঘূর্ণন। কিন্তু জীব স্বরূপতঃ নিত্য, স্থির—তার স্বভাব 'অহং'এর চির-চাঞ্চল্য নয়—'আত্মজ্ঞানের' চির-শান্তি। বাসনার নাশে অভিমান নাশ হয়, অভিমান নাশে 'অহং' অন্তর্হিত হয়—তখন থাকে মাত্র নিরুপাধিক অখণ্ড সত্য-জ্ঞানানন্দ। যাঁরা ভারতীয় সমাজ, ধর্ম্ম, বীক্ষা শাস্ত্রের (Æsthetics) এই মূল-সূত্রটি ধরতে না পেরেছেন, তাঁদের কাছে এই বিরাট ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য নরনারীর অসংখ্য মতি, গোষ্ঠী, জাতি, দল, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতি একটা বিশৃঙ্খল উদ্দেশ্যহীন অরণ্যজাত আগাছা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"ভগবন্নস্থিচর্ম্মস্নায়ু-মজ্জমাংস-শুক্রশোণিত-শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাবিণ্মূত্র-বাতপিত্তকফসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসারেঽস্মিঞ্ছরীরে কিং কামোপভোগৈঃ॥ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহভয়বিষাদের্ষ্যেষ্ট-বিয়োগানিষ্ট-সংপ্রয়োগক্ষুৎ পিপাসা-জরামৃত্যুরোগশোকাদ্যৈরভি-হতেঽস্মিঞ্ছরীরে কিং কামোপভোগৈঃ॥" (মৈত্রায়ণী উপনিষদ, ১।৩)—'হে ভগবন্! অস্থিচর্ম্মাদি শরীরে কামোপভোগের দ্বারা কি হবে? কাম ক্রোধাদি, জরামৃত্যু রোগাদিযুক্ত শরীরে কামোপ-ভোগের দ্বারা কি হবে?' অনেকে বলেন যে যেদিন হতে বেদের ভেতর এইরূপ শ্লোক ঢুকলো সেই দিন হতে ভারতের পার্থিব প্রগতি রুদ্ধ হয়ে এলো। নইলে ভারতীয় আর্য্যদের এক সময়ে জীবনের প্রতি সবিশেষ প্রীতি ও নিজেদের সামর্থ্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং পৃথিবীকে আনন্দের চক্ষে তাঁরা দেখতে জানতেন। ভারতীয় আদিম কৃষ্টির সহযোগে তাঁরা যে নব অনুশীলনীয় জাগৃতী এনেছিলেন সে যেন একটা নাটকীয় ব্যাপার। কিন্তু ত্যাগ-বৈরাগ্যের ওপর জোর দেওয়ায় বাস্তবিকই কি ভারত অবনতিকেই বরণ করে নিয়ে এসেছিল?—না, একটা বিশিষ্ট সীমার মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভিত্তি এক বিরাট-সভ্যের সৃষ্টি করেছিল, যেটাকে বিংশ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও—বর্ত্তমান রাজনীতির জটিলতা, এয়ারোপ্লেন এবং বোমারু বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করে—আন্তরিক ভাবে আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। পার্থিব-সম্পদ যদি জীবনকে শান্তিময় না কোরে উদ্বেগ ও অশান্তিরই সৃষ্টি করে, বিজ্ঞান ও রূপায়ণ যদি জীবনের উপভোগ্য এবং জ্ঞান ও আনন্দ বিকাশের সহকারী না হয়ে—মৃত্যুবাণেরই সৃষ্টি করতে থাকে, তা হলে সে সম্পৎশীল জীবনের তাৎপর্য্য কোথায়? লোকায়ত মতে 'জগৎকে